এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১: বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

প্রশ্ন ▶১ একটি দেশ দীর্ঘদিন যাবত বিদেশিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। দেশটি যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তার লড়াই অব্যাহত রয়েছে। দেশটি কৃষিপ্রধান হলেও তা অনুন্নত, শিল্পে অনগ্রসর, বিপুল জনসংখ্যা, শিক্ষার হার কম, খাদ্য ঘাটতি, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে তার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু সরকার আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় দেশটি দ্রুতই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হবে। *[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১]*

ক. গ্রামীণ খাত কী? ১

খ. বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন দেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩

ঘ. দেশটির অর্থনীতি সম্ভাবনাময়— তুমি কি এই ধারণার সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করছে।

বিশ্বায়নের ফলে স্বল্প ব্যয়ে কাঁচামাল আমদানির দরুন সামগ্রিক উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বে পুঁজি ও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ থাকায় দেশীয় শিল্প ও সেবা খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটছে। ফলে স্বল্প উন্নত অনেক দেশেই বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশ। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং উন্নতির মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হলেও অদ্যাবধি বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। নানামুখী সমস্যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিটাকে আজও শ্লথ করে রেখেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এ খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। সনাতন কৃষিব্যবস্থার কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং বিভিন্ন শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশে এখনও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। আবার, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম বলে দেশে বেকারের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে; যা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম একটি কারণ। এছাড়া অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার কারণে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সরকার বর্তমানে কিছু বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময়' এই ধারণার সাথে আমি একমত। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নানা ধরনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা (ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সকল প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন) গ্রহণ করায় জনগণ বিশ্বায়নের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

প্রশ্ন ▶২ বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। পূর্বে সামান্য উঁচু ভূমি ছাড়া সমগ্র দেশের ভূমি সমভূমি। জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই জলবায়ুতে নানারকম ফসল উৎপাদিত হয়। এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিও হচ্ছে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা বিভিন্ন উপাদান, শক্তি এবং বস্তুসমূহ মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে, তাকে পরিবেশ বলে।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো— অনুন্নত কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা।

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

https://teachingbd24.com

কিন্তু কৃষি জমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, কৃষকের দরিদ্রতা, স্বল্প বিনিয়োগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন হয়নি। তবে বর্তমানে কৃষকের সচেতনতা, উন্নত বীজ, সার, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে।

২. পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর একটি। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা ১৫.৮৯ কোটি (BBS, July, 2015)। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমছে। যেমন— জুলাই ২০০৪ এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৪২%। ২০১৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে ১.৩৭% হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো—

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের জিডিপিতে অবদান উন্নত পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপ সর্বত্র একরূপ নয়। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রধানত দুধরনের (যথা— সমভূমি এবং পাহাড়ি) হলেও এর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন- চট্টগ্রাম ও সিলেটের টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল; রাজশাহী অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় হলো প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর ভূমি বা সোপান যা প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে গঠিত। এ ছাড়াও রয়েছে খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুর এলাকার বনভূমি। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ১২০-২০০ সে.মি., বাতাসের আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৯% এবং সর্বনিম্ন ৩৬%।

ঘ বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

কোনো দেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝায়। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় বাংলাদেশ যেমন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ঠিক তেমনি এর ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এদেশের নদ-নদী, মৃত্তিকা, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। তবে খনিজ ও বনজ সম্পদ প্রভৃতি দিক দিয়ে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলোর সাথে এদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আবার সমুদ্রবন্দর ও নদীবন্দরগুলোর বিভিন্নমুখী ব্যবহার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নব দিগন্তের সূচনা করেছে। এছাড়া কৃষিকাজের অনুকূল পরিবেশের কারণে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিও হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ আজিম স্যার ক্লাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্রদের বললেন, গাছ পরিবেশ রক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। বাংলাদেশে প্রায় ২৫,০৮৭ বর্গ কি.মি. বনভূমি আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সুন্দরবন, মধুপুর ও ভাওয়াল গড় প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া প্রায় পুরো দেশেই বৃক্ষরাজির অভাব রয়েছে। তাই আমাদের নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনেই সারাদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। তাছাড়া দেশের ভূ-নিম্নস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল করা সম্ভব। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? ১

খ. বাংলাদেশে অর্থনীতি কৃষিনির্ভর কেন? ২

গ. ক্লাসে আজিম স্যারের দেওয়া তথ্যে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বনভূমি নিয়ে আজিম স্যারের হতাশা থাকলেও, ভূ-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে তিনি কেন আশাবাদী? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

খ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল; শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫.১ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।

কৃষি এদেশের মানুষের খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। কৃষি মানুষের বাসস্থানের উপকরণ যোগায় এবং গ্রামাঞ্চলে জ্বালানির উৎস হিসেবে কাজ করে। অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এসব কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর।

গ ক্লাসে আজিম স্যার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। দেশের মানুষের জীবিকা অর্জন, ভোগ, বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের যতগুলো উপাদান রয়েছে তার মধ্যে বনভূমি বা বনজ সম্পদ অন্যতম। বন বা বনজ সম্পদ যেমন মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন যোগান দেয় তেমনি জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। বনজ সম্পদের প্রভাবে কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা, বৃষ্টির পরিমাণ, জলবায়ু অনেক কিছু নির্ভর করে। তবুও বাংলাদেশে যে পরিমাণ বনজ সম্পদের প্রয়োজন তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বলা হয়ে থাকে মানুষের জীবন ধারণের জন্য একটি দেশে তার আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তা অনেক কম। সুন্দরবন এবং মধুপুর ও ভাওয়াল গড় ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে বনভূমির সংখ্যা অনেক সীমিত। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বনজ সম্পদকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বাড়ির আশপাশে বা খোলা স্থানে গাছ-পালা লাগানোর অভ্যাস তৈরি করতে হবে।

কাজেই বলা যায়, ক্লাসে আজিম স্যার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের তথা বনজ সম্পদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

ঘ বাংলাদেশের বনভূমির বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আজিম স্যার হতাশাগ্রস্ত হলেও, ভূমি-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে তিনি আশাবাদী। তার এমন ধারণার সপক্ষে নিম্নোক্ত বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি কম হলেও ভূমি-নিম্নস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ তথা খনিজ সম্পদ খুব একটা কম নেই। এদেশের ভূ-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো— প্রাকৃতিক গ্যাস। এ সম্পদে বাংলাদেশ বেশ সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো এদেশের জ্বালানি শক্তির প্রধান উৎস। যা সার, প্লাস্টিক, রাবার, কীটনাশক প্রভৃতি তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান বাড়লে তা এসব দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এদেশের বিভিন্ন কলকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর যোগান বাড়লে শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় কমবে।

এদেশে কয়েকটি জায়গায় সীমিত পরিমাণে পাথুরে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে; অন্যত্র কয়েকটি জায়গায় কয়লা মজুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে কয়লা প্রাপ্তি বাড়লে তা দেশে শক্তি সম্পদের যোগান বাড়াবে এবং শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। সিমেন্ট, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। সময়ান্তরে এর যোগান বাড়লে তা এসব শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সুতরাং, এদেশের ভূ-নিম্নস্থ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে আজিম স্যারের আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এ অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ধারা নিম্নরূপ:

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)		
	১৯৯০-৯১	২০০০-০১	২০১৩-১৪
কৃষি	২৯.২৩	২৫.০৩	১৬.৫০
শিল্প	২১.০৪	২৬.২০	২৯.৫৫
সেবা	৪৯.৭৩	৪৮.৭৭	৫৩.৯৫

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৫

[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ. 'বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কৃষিনির্ভর নয়।'— উদ্দীপকের ভিত্তিতে বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমোন্নয়নশীল বলে এদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

যে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ক্রমোন্নতির দিকে ধাবমান, সেই দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নত দেশের মতো কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শিল্পের উৎপাদন বাড়াচ্ছে। তাছাড়া, গত তিন বছরে গড়ে প্রবৃদ্ধি ৬% এর ওপরে ছিল এবং একটি দেশকে উন্নয়নশীল বলতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার সবগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

গ প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের GDP-তে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান নিচে দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

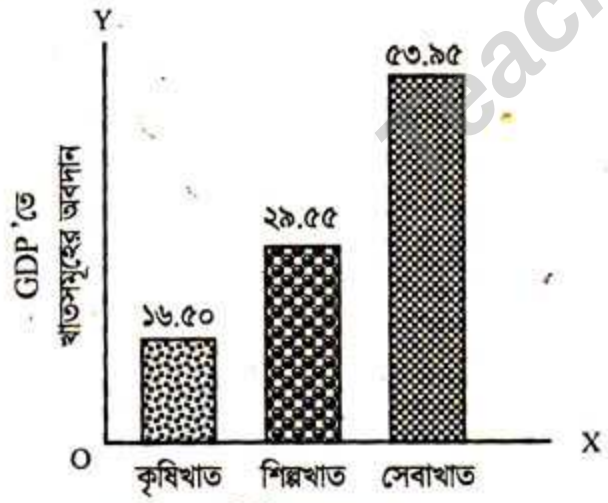

চিত্র : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের GDP-তে অবদানের দণ্ডচিত্র

উপরিউক্ত দণ্ডচিত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষিখাতের অবদান ১৬.৫০ যা সব থেকে কম, অন্যদিকে জিডিপিতে শিল্প খাত ও সেবা খাতের অবদান (২৯.৫৫ ও ৫৩.৯৫) অধিক।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ক্রমোন্নতির দিকে। এদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত কৃষি হলেও GDP-তে এর অবদান দিন দিন কমছে এবং শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বাড়ছে।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর করে। তবে, বর্তমানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের বিকাশ ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে GDP-তে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে বাংলাদেশের GDP-তে কৃষির অবদান ছিল ২৯.২৩%। কিন্তু ২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা কমে যথাক্রমে ২৫.০৩% এবং ১৬.৫০% হয়। অন্যদিকে, শিল্পের অবদান, ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যেমন— ১৯৯০-৯১, ২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের GDP-তে শিল্পের অবদান যথাক্রমে ২১.০৪%, ২৬.২০% এবং ২৯.৫৫% ছিল। একই অবস্থা সেবা খাতেও লক্ষ করা যায়। যদিও ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০০-০১ অর্থবছরে GDP-তে সেবা খাতের অবদান কিছুটা কম ছিল। তবে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান বেড়ে ৫৩.৯৫% হয়।

বাংলাদেশ উন্নত দেশের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা GDP-তে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বেড়েছে। অর্থাৎ, কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে শিল্প ও সেবা খাতের ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হচ্ছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন কৃষিনির্ভর নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের কারণে এদেশের অর্থনীতি ছিল অনুন্নত। অনুন্নত কৃষি, শিল্পের পশ্চাৎপদতা, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, জনাধিক্যের কারণে বেকারত্ব ছিল অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার বাস্তবমুখী নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে বিশ্বায়নের সুফল এদেশের জনগণ পেতে শুরু করেছে। আশা করা যায়, 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশের মোট সীমানা কত কিলোমিটার? ১

খ. মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে? উদ্দীপক হতে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মোট সীমানা হলো ৪,৭১২ কিলোমিটার।

খ মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বাংলার ইতিহাসে ১২০০ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম যুগ তথা মধ্যযুগ স্থায়ী ছিল। এ সময় বাংলা ছিল খাদ্য ও শিল্পে পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন পর্যটক, বণিক ও বিখ্যাত পরিব্রাজকদের আনাগোনা হতো এখানে। তাদের লেখায় তৎকালীন অর্থনীতির প্রাচুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। তখন খুব সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত এ যুগে। এজন্য মুসলিম যুগ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ স্বাধীনতা-উত্তর (১৯৭১-বর্তমান) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে তা উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন (১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর) হতে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৬ বছর পরেও আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির পরিপূর্ণ স্বাদ পাইনি।

প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এ দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। তাছাড়া এ দেশে সনাতন কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় কৃষিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। শিল্প ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে না পারায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার অতিরিক্ত জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা দেশকে আমদানি নির্ভর করে তোলে। ফলে এদেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্য এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে অনুন্নত কৃষি, শিল্পের পশ্চাৎপদতা, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, বেকারত্ব ইত্যাদি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, দেশে অভিজ্ঞ ও দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ইত্যাদি এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। তবে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বাস্তবমুখী নানান পরিকল্পনা দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পূর্ণ হয়েছে। যা অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ফলে ২০১৭ সাল শেষ মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। বর্তমান সরকার দেশেকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিও একসময় ঘুরে দাঁড়াবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নানা ধরনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে জনগণ বিশ্বায়নের সুফল পেতে শুরু করেছে।

সরকার 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন— আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম, সর্বত্র ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সকল কার্যপ্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন, কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৬ প্রায় ত্রিশ বছর আগে মি. জসিম লেখাপড়া শেষ করে কানাডায় চলে যান। তৎসময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নেতিবাচক। একটানা ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে তিনি অবাক। আগের বাংলাদেশ আর নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ আজ অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। মি. জসিম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দেশেই অবস্থান করবেন এবং অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করবেন। *[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামো— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

খ অর্থনৈতিক অবকাঠামোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি,

অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়। বিভিন্ন খাত-উপখাতের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থনীতির কাঠামোর এরূপ খাতসমূহের মধ্যে আছে কৃষিখাত, শিল্পখাত, সেবাখাত, বিভিন্ন ধরনের মালিকানা ভিত্তিক খাত, শহুরে ও গ্রামীণ খাত ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কাঠামো যত বেশি মজবুত হবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

গ হ্যাঁ, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল। একটি দেশের অর্থনীতি যখন পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান, কৃষি ও শিল্পের অগ্রসরতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হলে এসব দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়। কারণ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্র্যের হার কমছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের মি. জসিম প্রায় ত্রিশ বছর আগে লেখাপড়া শেষ করে কানাডায় চলে যান। ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরে এসে দেখেন বাংলাদেশের অর্থনীতি আর আগের মতো নেই। বাংলাদেশ এখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বেশ এগিয়ে গেছে। এসব সূচকের উন্নয়নের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

ঘ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এক সম্ভাবনাময় বিষয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, জ্বালানি তেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংকট ইত্যাদি বিষয় যখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চরম অনিশ্চয়তা ও মন্দার সৃষ্টি করছে, তখনও বাংলাদেশের অর্থনীতি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক এবং প্রবাসী শ্রমিকরা পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্দীপকের মি. জসিম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব রাখেন। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত ও শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৪.৭৯ শতাংশ এবং ৩২.৪৮ শতাংশ প্রাক্কলিত হয়েছে। সাক্ষরতার হার (৭+) বেড়ে হয়েছে ৬৩.৬ শতাংশ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দারিদ্র্যের হার ৬৫ ভাগ থাকলেও বর্তমানে তা ২৩.৫ ভাগে নেমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা খাত ও ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধির উন্নয়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এগুলো অনেক বড় অর্জন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বেড়েছে। আর অচিরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ডহীন হয়েছিল। আর তাই ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসতে বাংলাদেশকে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। *[সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমানার দৈর্ঘ্য কত কি.মি.? ১

খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নীতিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে, পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শোষণ, বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমানার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার।

খ বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত।

বাংলাদেশ উত্তরে ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্বে ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। এদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মায়ানমার এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগার অবস্থিত। এদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

গ 'ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন নীতিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ'-কথাটি যথেষ্ট।

১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে প্রায় ২০০ বছর শোষণ করে। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলার কাঁচামাল দ্বারা তারা ইংল্যান্ডে শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিল। আর এদেশ ছিল তাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের স্থায়ী বাজার। বিশ্বখ্যাত মসলিনের বুননকারীদের হাত ও আঙুল কেটে তারা এ শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশরা এদেশের কৃষকদেরকে জোরপূর্বক নীল চাষে সম্পৃক্ত করেছিল। এর ফলে এদেশে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল।

উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিল। মূলত, ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের দ্বৈতশাসন, অত্যাচার ও কোম্পানি শাসন ও শোষণের মাধ্যমে বাংলার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বলা যায়, ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নীতিই এদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ।

ঘ ব্রিটিশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাকিস্তান সরকারও বৈষম্য ও শোষণ নীতি অবলম্বন করে বাংলাদেশকে তাদের অস্থায়ী কলোনি হিসেবে গড়ে তুলেছিল। নিচে পাকিস্তান আমলের শোষণ, বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হলো—

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। যার দুটি প্রদেশ হলো পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পাকিস্তান আমলে রাজস্ব আয়ের বেশি অংশ অর্জন হতো পূর্ব পাকিস্তান হতে। অথচ, তার সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। যেমন— ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ১২% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল।

তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগে কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় সেখানকার ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ৮০ ভাগ চলে যায়। ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৯ টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল ৫০০ টাকা। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শোষণের ফলে এদেশে প্রবৃদ্ধির হারও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনার মাত্রা ছিল অসহনীয়। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ সম্প্রতি এক সেমিনারে বক্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। GDP-তে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান কমেছে। মানবসম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

[য. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১; অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কাকে বলে? ১

খ. কী কী শিল্পের জন্য মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বক্তাদের ধারণা অনুযায়ী, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার? আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না, এককথায় সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

খ মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলো হলো: কার্পাস বস্ত্র শিল্প, মসলিন বস্ত্র শিল্প, নৌ-শিল্প, চিনিশিল্প, লৌহ শিল্প, কামান শিল্প, বারুদ শিল্প, ভোজ্য তেল শিল্প, অলংকার শিল্প ইত্যাদি। এ সময়ে দেশে রেশম শিল্পও গড়ে ওঠে। তখনকার বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প ছিল মসলিন বস্ত্র শিল্প। বাংলার মসলিন তখন সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার বিবরণ দেওয়া হলো:

১. অতীতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬.০৬%, ৬.৫১%, ৭.২% ও ৭.২৪% যা প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নয়ন নির্দেশ করে। আবার দেশের সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্তনের গতিধারা লক্ষ করা যায়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে ২৬.০৬% ও ৩০.৩০% এবং বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩০.২৭ শতাংশ যা পূর্বে তুলনায় অনেক বেশি।

২. বিগত এক দশকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। এখন এ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় হলো ১৭৫২ মার্কিন ডলার। এক দশক আগে এ আয় ছিল ৪৬৫ মার্কিন ডলার।

৩. বিগত ৪-৫ বছরের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে তার অবদান কমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষিখাতের অবদান ধরা হয় শতকরা ১৪.৭৯ ভাগ। দেশে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত ক্রমেই উন্নত হওয়ায় এমনটি দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৩২.৪৮% ও ৫২.৭৩%।

সুতরাং বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়।

https://teachingbd24.com

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে বক্তরা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এমনটি হতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন। বর্তমানে এদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে; ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির এ হার বজায় রাখতে হবে।

২. ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৩. 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

৪. সাম্প্রতিককালে নানা কারণে দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। একে ঠিকমতো রুখতে না পারলে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৫. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান, যথোপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পিপিপি-এর অধীনে ভারী শিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৯ প্রাচীন যুগের অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডের অর্থনীতির চিত্র এক নয়। ৭০ দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে, যেমন: GDP এর প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান হ্রাস পেয়ে শিল্পের অবদান বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচয় লাভ করবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশা করেন। *[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পরিবেশ কী? ১

খ. কোন যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়? কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের সূচকগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে অর্থনীতিবিদদের বর্ণিত আশা বাস্তবায়িত হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা বিভিন্ন উপাদান, শক্তি এবং বস্তুসমূহ মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে তাকে পরিবেশ বলে।

খ মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

বাংলায় মুসলিম যুগ ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এ যুগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয় ও মহাজনী ব্যবসার বিকাশ ঘটে। এ যুগে বাংলা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় এখানে বস্ত্র, বিশেষ মসলিন বস্ত্র, চিনি, লৌহ, বারুদ, কামান, লবণ, কাগজ ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। বিদেশি পর্যটকদের লেখায় এ সময়ের বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির রূপটি ফুটে ওঠে। এসব কারণে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম যুগ স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	
অর্থবছর	উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৮০-৮১	১৪৯.৭
১৯৯০-৯১	১৮৮.৬
২০১৩-১৪	৩৭৭.৮২

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৪

[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]

ক. অবকাঠামো কাকে বলে? ১

খ. ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনের গতিধারা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য, সেগুলোকে অবকাঠামো বলা হয়।

খ ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অনুন্নত।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার অর্থনীতির ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। এ সময়ে বাংলায় তেমন কোনো শিল্প স্থাপন করা হয়নি। ব্রিটিশরা এদেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেছিল। ফলে বাংলার অর্থনীতিকে ব্রিটিশরা দু'শ বছর পিছিয়ে দিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করা হলো—

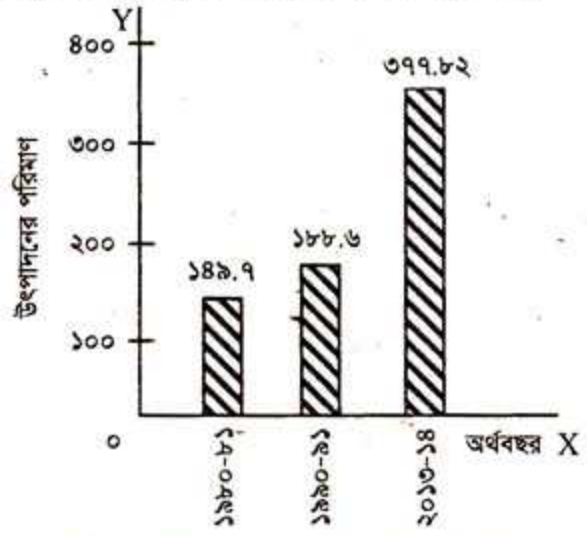

চিত্র: খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটি স্তম্ভচিত্র

ছকের তথ্য ব্যবহার করে অঙ্কিত চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) অর্থবছর এবং লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মে. টন। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৮.৬ লক্ষ মে. টন এবং পরবর্তীতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আরও বেড়ে তা দাঁড়ায় ৩৭৭.৮২ লক্ষ মে. টনে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, আধুনিক কৃষিব্যবস্থা উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও কৃষির উপকরণ সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে।

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষি খাতকে বাংলাদেশের সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লেগেছে। ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় কৃষিনীতির মাধ্যমে এ খাতটির

https://teachingbd24.com

উন্নয়নে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদন ছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মে. টন, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ১৮৮.৬ লক্ষ মে. টন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৬.৮৮।

গত এক দশকে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চালের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ সালাম আমেরিকা প্রবাসী। তার বাংলাদেশি বন্ধু জাহিদ আমেরিকা বেড়াতে গেছেন। সালাম তার বন্ধুকে বলল, আমেরিকা কত সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী। তোমরা অনুন্নতই রয়ে গেলে। জাহিদ জবাবে বলল, বাংলাদেশের অবস্থা এখন আগের মতো নেই। বিশ্ব মন্দার পরও কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি, কারিগরি জ্ঞানের প্রসার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. মূলধনের স্বল্পতাই কি অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তুমি কি মনে করো বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্দীপকে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ হ্যাঁ, মূলধনের স্বল্পতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।

মূলধন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। স্বল্প উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার খুবই কম কারণ জনগণের মাথাপিছু আয় কম। মূলধনের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যায় না। ব্যাংক ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত হয় না। ফলে পুঁজি গঠনের অভাবে ব্যাপক বিনিয়োগ হয় না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। এসব কারণে বলা যায়, মূলধনের স্বল্পতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।

গ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহকে আমি যথার্থ বলে মনে করি।

দারিদ্র্য বর্তমানে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা। তবে এই দারিদ্র্য দূরীকরণে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা হলো:

১. সরকার 'যুব উন্নয়ন বিভাগ' গঠন করে ১৫-৩০ বছর বয়স্ক যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করছে।
২. টেস্ট রিলিফ কর্মসূচিতে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে।
৩. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির মাধ্যমে কাজে নিয়োজিত গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে টাকার পরিবর্তে খাদ্য দেওয়া হয়।
৪. বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
৫. দেশের গ্রামীণ এলাকায় আবাসিক সমস্যা সমাধান করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।
৬. সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় দেশে ছাগল পালন কর্মসূচি চালু করেছে।
৭. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।
৮. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড সমবায়ের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষকদের জন্য ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে আসছে।
৯. সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তি এক্ষেত্রে আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২ রুবেল তার বিদেশি বন্ধু জেমস্‌কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও তার পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করলেন। রুবেল স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করলেন, অতীতে বাংলাদেশ ছিল ধন-সম্পদে ভরপুর। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণে এদেশ পরিণত হয় একটি গরিব ও অনুন্নত রাষ্ট্রে। পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ আমাদের জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ দেশকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন আর স্থবির রাষ্ট্র নয়। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে কী বোঝ? ১

খ. স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাকিস্তান শাসনামলের অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রুবেলের বক্তব্য— বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে, ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে,— তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়? মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামো বলতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়।

খ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির কারণে এদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। শুরুতে সম্পদ সৃষ্টি ও রপ্তানি আয়ের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির কারণে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দেশের পূর্ব অঞ্চল ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে রুবেল তার বিদেশি বন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের অর্থনীতির কথা শুনিয়েছে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল তা হলো:

১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ টাকা ও ৩৩০ টাকা সেখানে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে তা ৩২৭ টাকা ও ৪৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করত। অথচ মোট আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর শতকরা ৭০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তান ভোগ করত। পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি বিনিয়োগ কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৮০ ভাগ চলে গিয়েছিল। বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ৩০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হতো। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রেও একই রকম বৈষম্য বজায় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক আয়ের ২০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩১ শতাংশ ও

https://teachingbd24.com

৩৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট রাজস্ব আয়ের মাত্র ১২ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংক, বিমা কোম্পানিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার হতো।

ঘ বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে— রুবেলের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত ।

আয়তনে ছোট হলেও উদ্বৃত্ত জনশক্তি, পলিযুক্ত উর্বর কৃষিজমি, হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সামাজিক সূচকে অগ্রগতি এ দেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ায় জন্মহার হ্রাস পেয়েছে। তৈরি পোশাকের যে ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে তা ধরে রাখতে হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি সম্ভাবনা উজ্জ্বল করার সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে জাহাজ রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। রপ্তানিকৃত জনশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারলে তাদের আয় বহুগুণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। তথ্য সেবা সহজ হওয়ায় মানুষ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব রায়হান তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রায় ১৯০ বছর ইংরেজ শাসন ও শোষণ এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের হাত থেকে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে এবং অর্থনীতির বেশ কিছু সূচক যেমন—শিল্পের বিকাশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো কী? ১

খ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাথমিক খাতের প্রাধান্য রয়েছে' বলতে তুমি কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শাসন ও শোষণের তিনটি উদাহরণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে তুমি কি মনে কর বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে? আলোচনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির কাঠামো বলতে, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়।

খ কৃষিখাতকে প্রাথমিক খাত বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের প্রাধান্য রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের প্রায় ৭০% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আগের চেয়ে কৃষির উৎপাদন অনেক বেড়েছে। জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস, প্রধান পেশা, শিল্পের কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাথমিক খাত হিসেবে কৃষি খাতের প্রাধান্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনামলের শাসন ও শোষণের তিনটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো—

লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে পরাভূত করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার উন্নতির দিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাত করত না। বরং বৈষম্যমূলক আচরণ ক্রমেই প্রকট হতে থাকে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অর্থনৈতিক শাসন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয়ী হওয়ার পর ১৯০ বছর বাংলার ওপর যে ঔপনিবেশিক শোষণ চালায় তার ফলে এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্য, বস্ত্রশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত কাঁচাপাট, চামড়া, চা, ইক্ষু প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় করা হতো।

ইংরেজরা বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য বস্ত্র উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁতিদের আঙুল কেটে দিত। অন্যদিকে, সরকারি আফিস-আদালতে উচ্চ পদে নিয়োগের সংখ্যা ছিল বাঙালিদের তুলনায় পাকিস্তানিদের অনেক বেশি। এভাবে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা বাঙালিকে নানাভাবে শোষণ-নির্যাতন করেছিল।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিল্পের উন্নয়নে মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে ১৯৮০-৮১ সালে এ খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩২.৪৮% প্রাক্কলন করা হয় (বিবিএস-১৭)। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর World Economic Outlook (WEO) April, 2015-এর অর্থবছরে দেখানো হয়েছে, বিশ্বের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.৪% এবং ২০১৫ সালে ৪.০% অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫.৩% এবং ৫.৭% উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭% প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা ভালো।

ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ MDG-1 লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগামী হয়েছে। ২০১৫ সালে দারিদ্র্যসীমা কমিয়ে ২৯% তে আনার কথা ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালের পূর্বেই তা ৩১.৫% তে নেমে এসেছে। তাই বলা যায়, দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারিগরি জ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। কারিগরি শিক্ষা প্রসারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'ভিশন-২০২১' এর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণায় তথ্য ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে এবং শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের পথে ধাবিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ স্বাধীনতা লাভের আগে বিভিন্ন আমলে বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ রয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এখন কোনো স্থবিরতা নেই, বরং অর্থনীতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই গতিশীলতা এসেছে। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. অর্থনৈতিক মন্দা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কীরূপ? ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কখন এবং কেন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনীতিতে যখন বেকারত্ব, মুদ্রাসংকোচন, উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তাকে অর্থনৈতিক মন্দা বলে।

খ বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

দেশটির তিন দিকেই ভারতের অবস্থান। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের সাথেও কিছুটা সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। ভারত ও মায়ামনারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩,৭১৬ কি.মি এবং ২৮০ কি.মি. এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে ৭১৬ কি. মি. এর উপকূল রেখা রয়েছে।

গ স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ রয়ে যায়। কারণ স্বাধীনতা লাভের আগে বিভিন্ন আমলে বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল।

অতীতকাল হতেই ভারতীয় উপমহাদেশ শিক্ষা ও সম্পদে সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল। তখনকার সময়ে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকেও শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে ভিড় করত। শিক্ষা-দীক্ষায়, অগ্রসরতার কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ অঞ্চলের অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। ফলে বিভিন্ন শাসক শ্রেণির কড়া নজরে ছিল আমাদের এ জনপদ।

ইংরেজ শাসকেরা এ অঞ্চলে শাসন ও শোষণ চালিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করে ১৯০ বছর। এরপর পাকিস্তান তথা পশ্চিম পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন করেছে ২৪ বছর। তাদের উভয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এ অঞ্চল হতে লুণ্ঠিত সম্পদ। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আবির্ভূত হয়। এরপর যুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতি, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপুল জনসংখ্যার চাপ, সম্পদ ব্যবহারের অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তখন দুর্বল ও পশ্চাৎপদ হয়ে গিয়েছিল।

ঘ স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয় বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এখন কোনো স্থবিরতা নেই বরং অর্থনীতির প্রায় সবক্ষেত্রেই গতিশীলতা এসেছে।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ, কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, নিবিড় শস্য উৎপাদন পদ্ধতি, কৃষিশিক্ষার প্রসারসহ নানাবিধ কারণে বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের অবদান এবং উন্নয়নের গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিনিয়োগবান্ধব শিল্পনীতি প্রণয়নের ফলে ক্রমশ শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে বর্তমানে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.৬ শতাংশ। শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে দেশে বর্তমানে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে সেবাখাতের অবদান কম থাকলেও বর্তমানে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সর্বক্ষেত্রে গতিশীল।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বাংলাদেশ প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। তখন ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পেছনে এ দেশের কাঁচামালের যোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারপর বাংলাদেশ প্রায় দুই যুগ পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকে এবং দুর্ভাগ্যবশত তখনও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই কম অংশ উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ রাখত। এক সময় বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান বৃদ্ধি, শিক্ষাখাতে সাফল্য, সমুদ্র বিজয়, আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার, রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স অর্জন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

[যু. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ১]

ক. গ্রামীণ খাত কী? ১

খ. বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণগুলো নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকের বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হলো সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, কৃষকের দারিদ্র্যতা, বিপণন ও গুদামজাতকরণের অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এ খাতে আজও কাঙ্ক্ষিত উন্নতি লাভ করেনি। বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো কৃষিকের দরিদ্রতা। কৃষকের স্বল্প মূলধন থাকায় সে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করতে পারে না। যেহেতু কৃষিতে বিনিয়োগ স্বল্প সেহেতু উৎপাদও কম। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ দেশে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, যা কৃষি অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে যেতে ব্যাহত করেছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। ঔপনিবেশিক শোষণের তথা দ্বৈত শাসন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয় এবং এ সময় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, বস্ত্র, শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশরা এ দেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে। অথচ ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এখানকার মানুষজন নিজেদের গুণেই শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তখন এ দেশে মসলিনের মতো বিখ্যাত কাপড় এবং চিনি, লৌহ, লবণ, কাগজ, অলংকার ইত্যাদি উৎপাদন হতো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণে এগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের বিদায়ের পর বাংলাদেশে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শোষণ শুরু হয়। মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধি, ভোগ, ঋণদান, বিনিয়োগ, শিল্প-কারখানা স্থাপন, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, যা এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬

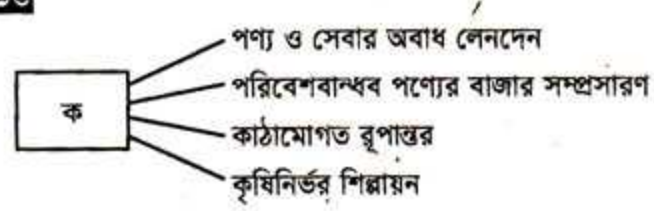

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

https://teachingbd24.com

ক. অবকাঠামো কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' অংশে যা নির্দেশ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নির্দেশিত 'ক' বিষয়টির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না, এককথায় সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

খ বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত।

বাংলাদেশ উত্তরে ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্বে ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। এদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মায়ানমার এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগার অবস্থিত। এদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

গ উদ্দীপকের 'ক' অংশে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়েছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ তাল মিলিয়ে চলছে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করছে। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়ায় কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপন এবং পরিবেশবান্ধব পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পণ্য ও সেবার অবাধ লেনদেন তথা মুক্তবাজার অর্থনীতি, পণ্যে বাজার সম্প্রসারণ, কাঠামোগত রূপান্তর এবং কৃষিনির্ভর শিল্পায়ন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থাকেই নির্দেশ করে। তাছাড়া, উদার বাণিজ্যনীতি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের রপ্তানি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত হয়েছে। যেমন- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪২৫৭.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্বের অর্থবছরের চেয়ে বেশি।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'ক' বিষয়টি তথা বিশ্বায়নের সম্ভাবনা যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। এ বিষয়টি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

আয়তনে ছোট হলেও উদ্বৃত্ত জনশক্তি, পলিযুক্ত উর্বর কৃষিজমি, হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন, সর্বোপরি সামাজিক সূচকে অগ্রগতি এবং বিশ্বায়নের নানাবিধ সুফল প্রভৃতি বিষয় বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে একটি। তাই বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি করা হলে মানবসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। যা দিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি আমদানি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়।

আবার, ভবিষ্যৎ সময়ের চাহিদার আলোকে কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে উদার শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পের অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং বেকারত্ব হ্রাসসহ দূরীকরণ সম্ভব হবে। যেমন- বাংলাদেশে ১৯১১ সালে দারিদ্র্যের হার ৫৬.৭ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে (২০১৬) তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। কাজেই বলা যায়, বিশ্বায়নের সুযোগগুলো ঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সুমন 'X' দেশে বাস করে। 'X' দেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পের অনগ্রসরতা সত্ত্বেও দেশটির বিভিন্ন খাতে গতিশীলতা বিরাজ করছে এবং প্রবৃদ্ধির হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের সময়কাল কত সন থেকে শুরু হয়?১
খ. স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে যে দেশটির কথা বলা হয়েছে সেই দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির অর্থনৈতিক স্তর সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য ব্যক্ত করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের সময়কাল ১৭৫৭ সালে শুরু হয়।

খ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির কারণে এদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। শুরুতে সম্পদ সৃষ্টি ও রপ্তানি আয়ের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির কারণে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দেশের পূর্ব অঞ্চলটি ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটি হলো বাংলাদেশ। নিচে এদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে সনাতন কৃষিব্যবস্থার কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ, মূলধনের স্বল্পতা এবং বিভিন্ন শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশে এখনও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। আবার, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম বলে দেশে বেকারের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে, যা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম একটি কারণ। এছাড়া অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার কারণে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সরকার বর্তমানে কিছু বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুমনের 'X' দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পে অনগ্রসরতা প্রভৃতি উক্ত দেশটির অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, 'X' দেশটি হলো বাংলাদেশ এবং এদেশের অর্থনীতিতে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' দেশ তথা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পন্ন হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় 'X' দেশটিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপের কারণে বিভিন্ন খাতে গতিশীলতা বিরাজ করছে এবং প্রবৃদ্ধির হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'

https://teachingbd24.com

হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। আবার, কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নানা ধরনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা (ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সকল প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন) গ্রহণ করায় জনগণ বিশ্বায়নের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

কাজেই আমি মনে করি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্তর একটি সম্ভাবনাময় অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশও সুফল ভোগ করছে। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। আশা করা যায় বাংলাদেশ ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক কাঠামো—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বৈশ্বিক সম্পর্ক কী অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকে প্রভাবিত করে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

খ অর্থনৈতিক অবকাঠামোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়। বিভিন্ন খাত-উপখাতের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থনীতির কাঠামোর এরূপ খাতসমূহের মধ্যে আছে কৃষিখাত, শিল্পখাত, সেবাখাত, বিভিন্ন ধরনের মালিকানা ভিত্তিক খাত, শহুরে ও গ্রামীণ খাত ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কাঠামো যত বেশি মজবুত হবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

গ বিশ্বায়ন বা বৈশ্বিক সম্পর্ক অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান যুগ হলো বিশ্বায়নের যুগ। যেখানে বিশ্বায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা অধিক জনগণের মধ্যে অবাধ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মূলধন বাজারের সমন্বয়ে পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তির অবাধ লেনদেনের সুযোগ তৈরি করে। এজন্য একটি দেশের বিভিন্ন (কৃষি, শিল্প ও সেবা) খাতের উৎপাদন ও উন্নয়ন অনেকাংশে বিশ্বায়নের ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বৈশ্বিক সম্পর্কের উন্নয়নের ফলে এদেশের জনগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করছে। এতে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে যা দেশটির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন পণ্য বা সেবা রপ্তানি করতে পারছে। কাজেই পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়ন একটি দেশের বিভিন্ন খাতে প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ জনবহুল বাংলাদেশে বিশ্বায়নের অপার সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

বর্তমানে প্রায় সমগ্র বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তার ঘটেছে। যা বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অধিক উৎপাদন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও ব্যবহার এবং শিল্পায়ন ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বিশ্বায়নের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। এভাবে এদেশের জনগণকে বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় শিক্ষিত করা গেলে মানবসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিশ্বায়নের সুযোগ গ্রহণ করে প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানবসম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই সম্ভাবনাময় এই শিল্পের আরো বিকশিত হলে ব্যবহৃত তুলা, সুতা, বস্ত্র তথা ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড শিল্পের বিকাশ সাধনের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য যেমন পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাট শিল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এদেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আবার, বর্তমানে বাংলাদেশের বহু তরুণ নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে বেশ আগ্রহী। যা নতুন নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী পারমিতা ও নবনীতা দু'জব বান্ধবী। তাঁদের শ্রেণিতে ম্যাডাম বললেন, বর্তমানের X দেশটি Y দেশ অপেক্ষা প্রায় ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত, তা সত্ত্বেও X দেশটি Y অঞ্চলকে অতীতে শাসন-শোষণ করেছে প্রায় দু'যুগ। উক্ত দেশটি অপর দেশের রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ আত্মসাৎ করলেও উন্নয়ন করেছে নিজেদের অংশকে। বর্তমানে নারী ও শিশু মৃত্যুহার, শিক্ষার হার, জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রতিটি সূচকে X পিছিয়ে পড়েছে। নবনীতা পারমিতাকে বললেন, আমার জন্মভূমি স্বাধীন হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে গল্পটির মিল রয়েছে। পারমিতা বললেন, আমাদের দেশের পরাধীনতার ইতিহাস ২০০ বছরের আর তোমার দেশের পরাধীনতার ইতিহাস প্রায় সোয়া দু'শত বছরের। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. ভগ্ন উপকূল রেখা, উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক মাধ্যম—বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে নবনীতার দেশটি চিহ্নিত করে উক্ত দেশের পূর্বাপর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের X ও Y দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা কি একই রূপ না ভিন্ন? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সামাজিক কার্যাবলির সমষ্টিগত ফলাফল যা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, তাই সামাজিক পরিবেশ।

খ ভগ্ন উপকূল রেখা উন্নয়নের জন্য সহায়ক।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর উপকূল রেখার প্রভাব লক্ষণীয়। এ রেখা ভগ্ন হলে এবং নিকটবর্তী সমুদ্র গভীর হলে সেখানে বন্দর নির্মাণ করা সহজসাধ্য হয়। দেশের ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে ল্যাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন ও মায়ানমারসহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পায়রা তৃতীয় সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাই বলা যায়, দেশের উন্নয়নে ভগ্ন উপকূল রেখা একটি সহায়ক মাধ্যম।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে নবনীতার দেশটি বাংলাদেশ। এদেশের অর্থনীতির পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো-

কৃষি বাংলাদেশের প্রধান ও বৃহত্তম খাত। স্বাধীনতার সময় এদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। এখন এটা কমে হয়েছে ১৯.২৯ শতাংশ। দেশের কৃষি উৎপাদন কিন্তু কমেনি, বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সে অনুপাতে মোট জিডিপি আরও বেড়েছে। এর পাশাপাশি শিল্প ও সেবাখাতের অবদানও বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত দেশের তুলনায় এদেশের কৃষিখাত নিম্ন উৎপাদনশীল হওয়া সত্ত্বেও বিগত প্রায় এক দশক যাবৎ নিবিড় চাষাবাদ ও ফসল বিকেন্দ্রীকরণের ফলে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতি সম্প্রতি দেশে শ্রমনিবিড় মাঝারি ও ছোট শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, নারীর ক্ষমতায়ন, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষরতার হার বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাচ্ছে। এসবের প্রেক্ষিতে দেশটিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অতএব বলা যায়, নবনীতার দেশে স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় যাবৎ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকলেও প্রত্যাশিত হারে উন্নয়ন ঘটে নি। তবে দেশটিতে আর্থ-সামাজিক কিছু সমস্যা থাকলেও ইতোমধ্যে সম্ভাবনার অনেক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের X দেশটি পাকিস্তান এবং Y দেশটি বাংলাদেশ। এ দুটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা ভিন্ন।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে দিন অতিক্রম করছে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয়-বৈষম্য দূরীকরণ, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় দেশ গঠনে মনোনিবেশ করলেও বারবার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধির হার গত এক দশকে ৬ শতাংশের ঘরে উঠানামা করছে। মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, গড় আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকে দুটি দেশ X ও Y। X দেশটি পাকিস্তান এবং Y দেশটি দ্বারা বাংলাদেশ বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নারী ও শিশু মৃত্যু হার, শিক্ষার হার, জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে X দেশ তথা পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা পাকিস্তানের অর্থনীতির গতিধারা থেকে ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ২০ কবির তার বিদেশি বন্ধু জনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও তার পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন যে, অতীতে বাংলাদেশ ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণে এ দেশ পরিণত হয় একটি গরিব ও অনুন্নত রাষ্ট্রে। পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ আমাদের জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ দেশকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন আর স্থবির রাষ্ট্র নয়।

[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. বাংলাদেশ কোন অক্ষাংশে অবস্থিত? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাকিস্তান শাসনামলের অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে" কবিরের এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্ভাবনাময়? মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ২০°৩৪′ ও ২৬°৩৮′ উত্তর-অক্ষাংশে অবস্থিত।

খ আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যোগাযোগব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

যে কোনো দেশের প্রভূত উন্নয়নের মূলে রয়েছে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন। উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা ছাড়া কোনো দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে না। দেশের সম্ভাব্য উৎপাদন, বণ্টন, মূল্য নির্ধারণ, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, ভৌত-অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হলে কৃষিপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল এবং শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে স্থানান্তর করতে সুবিধা হয়। এর ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে। এজন্য যোগাযোগব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে রুবেল তার বিদেশি বন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের অর্থনীতির কথা শুনিয়েছে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল তা হলো:

১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ টাকা ও ৩৩০ টাকা সেখানে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে তা ৩২৭ টাকা ও ৪৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করত। অথচ মোট আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর শতকরা ৭০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তান ভোগ করত। পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি বিনিয়োগ কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৮০ ভাগ চলে গিয়েছিল। বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ৩০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হতো। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রেও একই রকম বৈষম্য বজায় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক আয়ের ২০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩১ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট রাজস্ব আয়ের মাত্র ১২ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংক, বিমা কোম্পানিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার হতো।

ঘ বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে— রুবেলের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

আয়তনে ছোট হলেও উদ্বৃত্ত জনশক্তি, পলিযুক্ত উর্বর কৃষিজমি, হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সামাজিক সূচকে অগ্রগতির জন্য এ দেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে দেশের জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ায় জন্মহার হ্রাস পেয়েছে। তৈরি পোশাকের যে ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে তা ধরে রাখতে হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল করার সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে জাহাজ রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। রপ্তানিকৃত জনশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে পারলে তাদের আয় বহুগুণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এ দেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। তথ্য সেবা সহজ হওয়ায় মানুষ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত M নামক পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, দেশটির অর্থনীতির চিত্র এক নয়। M দেশটিকে N দেশ দীর্ঘ ২৪ বছর নানাভাবে শাসন ও শোষণ করে। বর্তমানে M দেশটি স্বাধীন। GDP-তে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা M দেশটির মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক বিবেচনা করে M দেশটিকে একস্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরণ করে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লেখ। ১

খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে M দেশে N-এর শাসন আমল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে M দেশের নতুন যাত্রা শুরু সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। বাংলাদেশ উত্তরে ২০.৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

খ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলতে সেসব উপাদানকে বোঝায় যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াতে সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। আর সামাজিক অবকাঠামো বলতে সেসব উপাদনকে বোঝায় যা দেশের সামাজিক বিকাশের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হয় এবং এর মধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, সামাজিক অবকাঠামোতে মানুষের বৃদ্ধি ও লালন-পালন করা হয় এবং তা মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পণ্য ও সেবার উৎপাদনের ওপর অর্থনৈতিক অবকাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও সামাজিক অবকাঠামোর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

গ উদ্দীপকের M দেশ হলো বাংলাদেশ এবং N দেশ হলো পশ্চিম পাকিস্তান। নিচে উদ্দীপক অনুসারে পশ্চিমা শাসন আমলের ব্যাখ্যা করা হলো—

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। যার দুটি প্রদেশ হলো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পাকিস্তান আমলে রাজস্ব আয়ের বেশি অংশ অর্জন হতো পূর্ব পাকিস্তান হতে। অথচ, তার সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। যেমন— ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ১২% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি নিয়োগ কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় সেখানকার ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ৮০ ভাগ চলে যায়। ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৯ টাকা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল ৫০০ টাকা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের ফলে এদেশে প্রবৃদ্ধির হারও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্রিটিশদের পদাঙ্ক অনুসরণ-করে পাকিস্তান সরকারও বৈষম্য ও শোষণনীতি অবলম্বন করে বাংলাদেশকে তাদের অস্থায়ী কলোনি হিসেবে গড়ে তুলেছিল। বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনার মাত্রা ছিল অসহনীয়। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

ঘ উদ্দীপকে M দেশ বলতে মূলত বাংলাদেশকেই বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নতুন যাত্রা শুরু করে।

স্বাধীনতা উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয় বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এখন কোনো স্থবিরতা নেই বরং অর্থনীতির প্রায় সবক্ষেত্রেই গতিশীলতা এসেছে।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ, কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, নিবিড় শস্য উৎপাদন পদ্ধতি, কৃষিশিক্ষার প্রসারসহ নানাবিধ কারণে বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের অবদান এবং উন্নয়নের গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিনিয়োগবান্ধব শিল্পনীতি প্রণয়নের ফলে ক্রমশ শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে বর্তমানে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৯%। শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে দেশে বর্তমানে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটছে। বাস্তবমুখী বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে সেবা খাতের অবদান কম থাকলেও বর্তমানে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে উদ্দীপকের M দেশের তথা বাংলাদেশের নতুন যাত্রা শুরু হয়।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব করিম উদ্দীন একটি কলেজের কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষে একজন ছাত্রের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু বাজারব্যবস্থার অভাব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, দালাল ও কৃষকের দরিদ্রতা' প্রভৃতি কারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পায় না। কিন্তু সরকার কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ ও সঠিক ওজন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষি কী? ১

খ. কেন শস্যবহুমুখীকরণের প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে কৃষকের কোন সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে কৃষকের সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফসল, বনায়ন, পশুপাখি, মাছ চাষ করতে মাটির জৈবিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে কৃষি বলা হয়।

খ শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।

একই জমিতে বছরে একটি মাত্র একই জাতের শস্যের উৎপাদন না করে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে শস্যের বহুমুখীকরণ বলে। একই ফসল সবসময় একই জমিতে চাষ করলে জমির উৎপাদিকাশক্তি বা রাসায়নিক উপাদান নিঃশেষ হতে থাকে। তাই ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষাবাদ করলে জমির উর্বরতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ফলনও ভালো হয়। আর কম খরচে ভালো ফলন হলে কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে কৃষকদের বিপণন সমস্যার কথা বলা হয়েছে।

কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ নমুনাকরণ, পরিবহন, ঝুঁকি গ্রহণ, মানোন্নয়ন প্রভৃতি কার্যাবলিকে বোঝায়। বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত নয়। ফলে কৃষক তাদের উৎপাদিত দ্রব্য তথা ফসল বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। কৃষিজাত পণ্য বিপণনের একটি প্রধান সমস্যা হলো অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে এনে বেশি দামে

https://teachingbd24.com

বিক্রি করতে পারে না। বাড়িতে বা গ্রামের হাট-বাজারে কম দামে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রি করে। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না। অন্যদিকে, এদেশের অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্যের কারণে তাদের উৎপাদিত ফসল মৌসুমে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আবার, আমাদের দেশে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্থিত্ব আছে। কৃষিপণ্যের বাজারে কৃষক তার পণ্য প্রকৃত ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করতে পারে না। কারণ প্রকৃত ক্রেতা ও কৃষকের মাঝে থাকে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা। মুনাফার প্রায় সবটুকুই এই সমস্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের হাতে বলে চায়। ফলে কৃষক তার পণ্যের মূল্যের একটি অংশ পায় মাত্র।

উদ্দীপকে শিক্ষক করিম উদ্দিন তার ক্লাসে কৃষকরা কেন তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না তার কারণ বলতে গিয়ে সুষ্ঠু বাজারব্যবস্থার অভাব, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, দালাল ও কৃষকের দরিদ্রতাকে দায়ী করেন। আর এগুলো কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যার কারণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কৃষকের কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যার কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। সেগুলো কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাধান করা সম্ভব নয়, যা সরকারের অংশগ্রহণেই সম্ভব। কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারের করণীয় দিকগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো- অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য তাই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিপুল মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় এবং তা থেকে সরাসরি কোনো মুনাফা অর্জন করা যায় না বলে এ কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ তেমন দেখা যায় না। একমাত্র সরকারেরই সক্রিয় ও অব্যাহত অংশগ্রহণের ফলে তার উন্নয়ন সম্ভব হয়। কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল পায় সে জন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে সারা দেশে সরকারি উদ্যোগে 'কৃষক বিপণন দল' (Farmers Marketing Group)' 'কৃষক ক্লাব' গঠনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বাজার উন্নয়ন এবং লিংকেজ তৈরির জন্য ঢাকাতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণকাজ (গাবতলীতে) সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষিপণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধন করতে হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমবায় সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে এদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন বাজারে কৃষকদের নিকট থেকে যাতে আড়তদারী, পাল্লাদারী, টোল, চাঁদা প্রভৃতির অজুহাতে অর্থ আদায় করতে না পারে, সে জন্য আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলো সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ, কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং ফসল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ অর্থনীতি বিষয়ক একটি সেমিনারে নিম্নোক্ত তথ্য তুলে ধরা হলো—

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা	২০১৮	১৯৯৭
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৭%	২.১৭%
মাথাপিছু আয় (বিলিয়ন ৳)	১৭৫২ ৳	২৫০ ৳
রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ৳)	২২৮৩৬	৪৩৮০
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৭.২৪%	৫.৩%
কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিক (%)	৪৫.১	৬৩.২

সেমিনারে বক্তারা মতামত প্রকাশ করলেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। মাথাপিছু আয়, নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন, মানবসম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে বলে তারা মনে করেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. অবকাঠামো কাকে বলে? ১

খ. ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বক্তাদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য, সেগুলোকে অবকাঠামো বলা হয়।

খ ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অনুন্নত।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার অর্থনীতির ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। এ সময়ে বাংলায় তেমন কোনো শিল্প স্থাপন করা হয়নি। ব্রিটিশরা এদেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেছিল। ফলে বাংলার অর্থনীতিকে ব্রিটিশরা দু'শ বছর পিছিয়ে দিয়েছিল।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা বর্ণনা করা হলো।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিকাশমান গতিধারা সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে একটি নিম্ন মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বিশ্ব উন্নয়ন ধারার সাথে প্রতিযোগী অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচির আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও কাঠামোগত পরিবর্তন আলোচনা করলে দেশের অর্থব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অতীতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে যে প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৫.৩%, তা গত তিন অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৬.০৬%, ৬.৫১% ও ৭.২%। যা প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নয়ন নির্দেশ করে। বর্তমানে ২০১৮ সালে এসে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.২৪%। সামনে তা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ১৯৯৭ সালে দেশের রপ্তানি আয় ছিল ৪৩৮০ বিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ২২৮৩৬ বিলিয়ন টাকা। এ ছাড়াও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ২৫০ মার্কিন ডলার। ২০১০-১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮১৬ ডলার, ২০১২-১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার ও ২০১৫-১৬ সালে ছিল ১৩৮৪ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ ডলারে উন্নীত হয়েছে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঊর্ধ্বমুখী গতি নির্দেশ করে।

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে বক্তরা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এমনটি হতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার নিচে তা আলোচনা করা হলো:

প্রথমত, বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন। বর্তমানে এদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে; ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির এ হার বজায় রাখতে হবে।

https://teachingbd24.com

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

চতুর্থত, সাম্প্রতিককালে নানা কারণে দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। একে ঠিকমতো রুখতে না পারলে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

পঞ্চমত, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান, যথোপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পিপিপি-এর অধীনে ভারী শিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ প্রাচীন যুগের অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডের অর্থনীতির চিত্র এক নয়। ৭০ দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে, যেমন: GDP এর প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান হ্রাস পেয়ে শিল্পের অবদান বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচয় লাভ করবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশা করেন।

[মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. পরিবেশ কী? ১

খ. কোন যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়? কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের সূচকগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে অর্থনীতিবিদদের বর্ণিত আশা বাস্তবায়িত হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা বিভিন্ন উপাদান, শক্তি এবং বস্তুসমূহ মানুষসহ সকল প্রাণীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে তাকে পরিবেশ বলে।

খ বাংলায় মুসলিম যুগ ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এ যুগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয় ও মহাজনী ব্যবসার বিকাশ ঘটে। এ যুগে বাংলা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় এখানে বস্ত্র, বিশেষ মসলিন বস্ত্র, চিনি, লৌহ, বারুদ, কামান, লবণ, কাগজ ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। বিদেশি পর্যটকদের লেখায় এ সময়ের বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির রূপটি ফুটে ওঠে। এসব কারণে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম যুগ স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ অর্থনীতির তামিম স্যার দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে বলছিলেন আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলাদেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। রাস্তাঘাট তেমন ছিল না। মানুষ মাটির পাতিল, ঘটিবাটি ব্যবহার করত। নিজ হাতে তৈরি পোশাক পরিধান করত তবে তারা খুব সুখী ছিল।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১]

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? ১

খ. কৃষিই ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তামিম স্যার বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ের বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে বর্তমান সময়ের অর্থনীতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ অতীতকাল থেকেই বাংলাদেশে কৃষিখাত বেশ সমৃদ্ধ ছিল।

আদিকাল হতেই মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। ধান ছিল প্রধান ফসল। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলফলাদি যেমন- আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বাংলায় উৎপাদিত ফসল দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপে রপ্তানি করা হতো। বাঁশ আর কাঠ ছিল বাঙালির উপার্জনের বড় উপায়। দেশের অসংখ্য নদ-নদী আর খাল-বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। এসব কারণেই কৃষিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে তামিম স্যার প্রাচীন যুগের অর্থনীতির কথা বলেছেন।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক আর মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গ্রামভিত্তিক সমাজ। কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও নৌ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এদেশ বেশ অগ্রসর ছিল। এদেশের বিভিন্ন শিল্প, কুটির শিল্প, ধাতু শিল্প, সুদক্ষ কারুশিল্প দেশে বিদেশে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তখনকার বাংলার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বিখ্যাত ছিল সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র। এ যুগেই আর্যরা এদেশে আগমন করেন। তাদের সভ্যতা ছিল উন্নত। এরপর বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের সূচনা হয়। এ যুগে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। তখন জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। কাজেই জনসংখ্যাজনিত সমস্যাও ছিল না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল না। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্যাভাব দেখা দিত। সর্বোপরি খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ও স্বল্পসংখ্যক কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা ও সহজ, সরল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবনযাত্রা পরিচালিত হতো।

উদ্দীপকে তামিম স্যারের কথানুযায়ী, মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। তখনকার সময়ে রাস্তাঘাট ছিল না। মানুষ মাটির পাতিল, ঘটিবাটি ব্যবহার করত। তারা বেশ সুখী মানুষ ছিল যা প্রাচীন যুগের অর্থনীতিই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে প্রাচীন যুগের কথা বলা হয়েছে। এ সময়ের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের অর্থনীতির পার্থক্য দেওয়া হলো-

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির প্রাধান্য ছিল। এ সময় অনেক শস্যসম্ভারের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন জমিতে ভালো ফসল হতো। স্থল ও জলপথের কেন্দ্র হওয়ায় দুষ্প্রাপ্য জিনিস সেখানে মজুদ হতো। কৃষিকর্ম ঋতু অনুযায়ী নিয়মিত ছিল। অন্যদিকে, বিগত ৪-৫ বছরের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে তার অবদান কমে এসেছে। দেশে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত ক্রমেই উন্নত হওয়ায় এমনটি হয়েছে। প্রাচীন যুগে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং নৌ যোগাযোগব্যবস্থার বিকাশ লাভ করে। কয়েকটি শিল্পজাত পণ্য যেমন সূতি বস্ত্র, রেশমি বস্ত্র, চিনি, লবণ, গুড়, মসলা ইত্যাদি স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি হতো। উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্যসহ এসব মানসম্পন্ন শিল্পপণ্য বিদেশের বাজারে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সমৃদ্ধ কুটির শিল্প ও সুদক্ষ কারুশিল্প ছিল এ ভূখণ্ডের অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, বর্তমান সরকারের বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির ফলে শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৃহৎ শিল্পের প্রসার ঘটেছে, জিডিপিতে পরিবর্তন এসেছে। কৃষি ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা বেড়েছে ও কৃষির আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন

https://teachingbd24.com

বেড়েছে। টেকসই উন্নয়নের উপযোগী করে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাত গড়ে উঠেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ঘটেছে। তথ্য-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বেড়েছে। অকৃষি খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

সামগ্রিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন থেকে জানা যায়, কিছুটা ব্যতিক্রম ও দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও এ ভূখণ্ডের মানুষের জীবনধারণ মোটামুটিভাবে সচ্ছল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ 'ক' X দেশে গিয়ে দেখলেন জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি, জীবনযাত্রার মান উন্নত, তাদের অর্থনীতি শিল্পনির্ভর। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পর্যাপ্ত ও বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত থাকে।

[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. বিশ্বায়ন কাকে বলে? ১

খ. সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে X দেশের অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনামূলক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশকে X দেশের অর্থনীতির পর্যায়ে উন্নীত করা কি সম্ভব? তোমার মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বায়নের ফলে প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। এতে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক যুগে তথা বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্ব একটি বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে বিশ্বের যেকোনো ব্যক্তি, জাতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এতে করে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটছে। তবে বিশ্বায়নের ফলে কিছু অপসংস্কৃতিরও বিস্তার লক্ষ করা যায়। তবে তা নির্ভর করে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগসমূহ আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর।

গ উদ্দীপকে 'X' দেশের অর্থনীতি হলো উন্নত এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি হলো উন্নয়নশীল। নিচে উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির তুলনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলো-

যেসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং দীর্ঘমেয়াদে এ উন্নয়ন অব্যাহত আছে সেসব দেশকে উন্নত দেশ বলে। আর যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নত দেশের জনসংখ্যার প্রায় সকলেই শিক্ষিত। সেখানে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। আর উন্নয়নশীল দেশে সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারণত উন্নত দেশের অর্থনীতিতে অধিক উৎপাদন লক্ষ করা যায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, উন্নয়নশীল দেশে প্রায় সব সময় বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি লেগেই থাকে। অন্যদিকে উন্নত দেশে বাণিজ্য ঘাটতি লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকে 'X' দেশেও উন্নত দেশের মতো জনগণের অধিক মাথাপিছু আয়, উন্নত জীবনযাত্রার মান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত শিল্পনির্ভর অর্থনীতি বিরাজ করছে। আর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলোই ফুটে উঠেছে।

ঘ বাংলাদেশ হলো একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটিকে 'X' দেশের অর্থাৎ উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নতি করা সম্ভব।

একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে এক সময়ে তার অর্থনীতি গতিশীল হবে। তখন সেখানে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ক্রমাগত বাড়বে এবং দেশটি উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উপনীত হবে। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকমাত্রায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাই উন্নয়নশীল দেশকে উন্নত দেশের সমপর্যায়ে নিতে শিল্পের ওপর অধিক নির্ভর করার প্রয়াস চালাতে হবে।

উন্নত দেশে জনসংখ্যার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই শিক্ষিত এবং এখানে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাই বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও কারিগরি জ্ঞানদানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। উন্নত দেশসমূহ অধিক উৎপাদনশীল হয় বলে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা, বেকার সমস্যা একটি দেশের উন্নতির বড় প্রতিবন্ধক।

এসব ছাড়াও বাংলাদেশকে 'X' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূরীকরণ, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে 'X' দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার হ্রাস এবং শিল্প উৎপাদনের গতিধারা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মি. 'গ' বুঝতে পারেন দেশের অর্থনীতির ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হলেও এখনো কাঙ্ক্ষিত জীবনমান থেকে অনেক দূরেই অবস্থান করছে বাংলাদেশের মানুষ।

[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত? ১

খ. বাংলাদেশের পাহাড়ি মৃত্তিকা সম্পর্কে যা জান লেখ। ২

গ. মি. 'গ' এর স্মৃতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারার যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা নানা ক্ষেত্রে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৭৭ জন।

খ বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ যে পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে তাকে পাহাড়ি মৃত্তিকা বলে।

টারশিয়ারি যুগে বেলে পাথর ও কর্দম শিলা হতে পাহাড়ি মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে। দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের কঠিন শিলার চূর্ণ মিশ্রিত এ মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। এজন্য এখানকার লোকদের প্রধান উপজীবিকা পশুপালন, পশু শিকারের মতো ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. 'গ' এর স্মৃতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারার যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে নিচে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত দেশের মতো উন্নত নয়। আবার অনুন্নত দেশের মতো স্থবিরও নয়। এদেশে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় ক্রমশ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। মূলধন গঠনের হারও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমছে এবং তারা শিল্পক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হচ্ছে। GDP-তে শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার হার ক্রমশ বাড়ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমছে এবং বেদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। এদেশে প্রায় তিন দশক ধরে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং সমস্যা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে।

মি. 'গ' এর স্মৃতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির এসব ঋণাত্মক গতিধারা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনো যে এদেশ তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে তা তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের বিষয়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা নানা ক্ষেত্রে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করছে। বিষয়টি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

বাংলাদেশ এখনো বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তবে বাংলাদেশের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, মেধা, প্রজ্ঞা ও তথ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এদেশের জমি খুবই উর্বর। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি ঘটাতে পারে।

কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আসবে। পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার হওয়ার কারণে পাটের উৎপাদন ও বহুবিধ ব্যবহার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া দেশে এখন তৈরি পোশাকের ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে, তা ধরে রাখতে হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি সম্ভাবনা উজ্জ্বল করার সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এইগুলো কাজে লাগাতে পারলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জনগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলে দেশের ভেতরে ও বাইরে কাজে লাগিয়ে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ যে মন্তব্য করেছেন তার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। দেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে প্রশমিত হচ্ছে এবং সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সাক্ষরতা, শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ছে। এই অনুকূল উপাদানগুলো আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন নতুন উন্নয়ন সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির নয় বরং পরিবর্তনশীল।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ দেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। কর্কটক্রান্তি রেখা দেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে। গ্রীষ্মকালে এ ভূখণ্ডের সর্বত্র বেশি তাপ থাকে। শীতকালে উত্তাপ কম থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের ফলে এ ভূখণ্ড বৃষ্টিপাতহীন ও শুষ্ক থাকে। মৃদু সমভাবাপন্ন মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবেই এখানে কৃষিকাজ ভালো হয়। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১]*

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো কী? ২

গ. সূর্যকিরণের তারতম্যের কারণে এ ভূখণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপ বেশি এবং শীতকালে তাপ হ্রাস পাওয়ার কারণ কী? ৩

ঘ. কোন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের ফলে ও কী কারণে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এ ধরনের মৌসুমি জলবায়ু এদেশের কৃষিকাজকে কীভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী এবং খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদানসমূহ দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু বাহ্যিক সম্পদ লক্ষ করা যায় তা সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশও ঠিক একইরূপে প্রকৃতি প্রদত্ত নানাবিধ উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলো হলো- ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, বনভূমি, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ ইত্যাদি।

গ সূর্য কিরণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে তাপ বেশি হয় এবং শীতকালে তাপ হ্রাস পায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর গোলার্ধের ক্রান্তীয় অঞ্চলে। এপ্রিল মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই এ সময় বাংলাদেশের মতো উত্তর গোলার্ধের অধিকাংশ দেশেই তাপমাত্রা বেশি হয়। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৭° সে.। আবার ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে শীতকাল হয়। কারণ এ সময় সূর্য উত্তর গোলার্ধে তির্যকভাবে কিরণ দেয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর গোলার্ধে হওয়ায় এ সময় এখানকার তাপমাত্রা খুবই কম থাকে এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা হয় ৭° সে.। কাজেই এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত যে সূর্যরশ্মির তারতম্যের কারণেই বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়।

ঘ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের কারণে বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা এদেশের কৃষিকাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশে গ্রীষ্মের শুরু থেকে প্রচুর তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিশেষ করে জুন মাসের দিকে সূর্য উত্তর গোলার্ধের অধিক নিকটে থাকায় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হয়। এ সময় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ নিম্নচাপ পূরণ করার জন্য বঙ্গোপসাগর হতে সৃষ্ট জলীয়-বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু উত্তর দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। ফলে জুন-অক্টোবরে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় সিলেটের উত্তর-পূর্ব অংশে।

বাংলাদেশের এ ধরনের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও দক্ষিণ-পূর্বের আর্দ্র মৌসুমি বায়ু এদেশের কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাটির রুক্ষতা ও শুষ্ক আবহাওয়া, সেচের অসুবিধা ইত্যাদি এসব অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদন ব্যহত করে। কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে এ অঞ্চলগুলোতে প্রাকৃতিক সেচের ব্যবস্থা হয়। এছাড়াও সমগ্র দেশের আর্দ্রতা ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এ মৌসুমি বায়ু ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ অতীতকালে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল গ্রামপ্রধান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের কৃষিখাত ছিল সমৃদ্ধ। কিছু কিছু শিল্পপণ্য ছিল যা বহির্বিশ্বের বাজারে সমাদৃত হয়েছিল। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অতীতকাল বলতে কোন সময়কে বোঝায়? ১

খ. অতীতকালে বাংলাদেশের কৃষিখাত কী কী কারণে সমৃদ্ধ ছিল? ২

গ. অতীতকালে বাংলাদেশের কোন কোন পণ্য বহির্বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং কেন? ৩

ঘ. অতীতকালে এদেশকে 'সোনার বাংলা' বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অতীতকাল বলতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শেষভাগ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়।

খ অতীতকাল থেকেই বাংলাদেশের কৃষিখাত বেশ সমৃদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হলো জমির উর্বরা শক্তি।

আদিকাল হতেই মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। ধান ছিল প্রধান ফসল। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদি যেমন— আম, মহুয়া, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বাংলায় উৎপাদিত চাল দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে রপ্তানি করা হতো। বাঁশ আর কাঠ ছিল বাঙালির উপার্জনের বড় উপায়। দেশের অসংখ্য নদ-নদী আর খাল বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। এসব কারণেই কৃষিখাত সমৃদ্ধ ছিল।

https://teachingbd24.com

গ বাংলাদেশের উৎপাদিত সুতিবস্ত্র, চিনি, লবণ, গুড়, মশলা প্রভৃতি পণ্য বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করে এবং অতীতকালে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সারা বিশ্বে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

প্রাচীনকালে দেশে উৎপাদিত সুতিবস্ত্র, চিনি, লবণ, গুড়, মশলা ইত্যাদি স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করা হতো। তবে এ সময়ে বিশ্ব বাজারে সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য ছিল বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজা ও ধনী পরিবারে এ বস্ত্রের যথেষ্ট কদর ছিল। এটি আভিজাত্য প্রদর্শনের একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হতো। এ ছাড়া এ অঞ্চলে পাটের তৈরি কাপড়ের শিল্পও বেশ জনপ্রিয়।

বাংলার ঐতিহ্য, জনগণের মূল্যবোধ ও রুচি, কারিগরি কর্মকুশলতা ইত্যাদির বলে এদেশে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের এমন এক শ্রেণির কারিগরি ও প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না। এ বস্ত্র এতটাই সূক্ষ্ম ও মসৃণ ছিল যে একটি আংটির ভিতর দিয়ে কয়েকশ গজ অনায়াসে প্রবেশ করানো যেত।

ঘ অতীতকালে বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও তা সমৃদ্ধ ছিল। কৃষিকাজের উপযোগী জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদ-নদী ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলটিতে একটি কৃষি-কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে।

অতীতকালে জনসংখ্যা ছিল কম, জনগণের চাহিদাও ছিল কম। তাই কৃষিতে উৎপাদিত ফসল জনসাধারণের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। কয়েকটি শিল্পজাত দ্রব্য যেমন– সুতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চিনি, লবণ, গুড়, মশলা ইত্যাদি স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিও করা হতো।

তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রপ্তানি দ্রব্য ছিল এদেশের সুদক্ষ কারু-শিল্পি কর্তৃক তৈরিকৃত সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র। তখন এর সমকক্ষ বস্ত্র পৃথিবীর অন্য কোথাও উৎপাদিত হতো না। এ পোশাক রাজা ও ধনী পরিবারের আভিজাত্য প্রদর্শনের একটি উপকরণ ছিল।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এদেশের অর্থনীতি ছিল মোটামুটি সচ্ছল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ। এসব বিবেচনায় তৎকালীন বাংলাদেশকে যথার্থই 'সোনার বাংলা' বলা হতো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ প্রায় ৩০ বছর আগে মি. জসিম লেখাপড়া শেষ করে কানাডা চলে যান। তৎসময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নেতিবাচক। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ আজ অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। মি. জসিম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দেশেই অবস্থান করবেন এবং অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করবেন।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামো— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশ কি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী, খনিজ, বনজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়।

খ অর্থনৈতিক অবকাঠামোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়। বিভিন্ন খাত-উপখাতের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থনীতির কাঠামোর এরূপ খাতসমূহের মধ্যে আছে কৃষিখাত, শিল্পখাত, সেবাখাত, বিভিন্ন ধরনের মালিকানা-ভিত্তিক খাত, শহুরে ও গ্রামীণ খাত ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কাঠামো যত বেশি মজবুত হবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি ত্বরান্বিত হবে।

গ হ্যাঁ, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল। একটি দেশের অর্থনীতি যখন পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান, কৃষি ও শিল্পের অগ্রসরতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হলে এসব দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়। কারণ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্র্যের হার কমছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের মি. জসিম প্রায় ৩০ বছর আগে লেখাপড়া শেষ করে কানাডায় চলে যান। ৩০ বছর পর দেশে ফিরে এসে দেখেন বাংলাদেশের অর্থনীতি আর আগের মতো নেই। বাংলাদেশ এখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বেশ এগিয়ে গেছে। এসব সূচকের উন্নয়নের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

ঘ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

বাংলাদেশ উদীয়মান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এক সম্ভাবনাময় বিষয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, জ্বালানি তেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংকট ইত্যাদি বিষয় যখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চরম অনিশ্চয়তা ও মন্দার সৃষ্টি করছে, তখনও বাংলাদেশের অর্থনীতি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক এবং প্রবাসী শ্রমিকরা পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্দীপকের মি. জসিম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব রাখেন। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত ও শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৪.৭৯ শতাংশ এবং ৩২.৪৮ শতাংশ প্রাক্কলিত হয়েছে। সাক্ষরতার হার (৭+) বেড়ে হয়েছে ৬৩.৬ শতাংশ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দারিদ্র্যের হার ৬৫ ভাগ থাকলেও বর্তমানে তা ২৩.৫ ভাগে নেমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা খাত ও ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধির উন্নয়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এগুলো অনেক বড় অর্জন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বেড়েছে। আর অচিরেই বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ বাদল ও থমাস দুই বন্ধু ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। থমাস তার বন্ধু বাদলের কাছে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বাদল জানায় যে, এক সময় বাংলাদেশকে অনুন্নত দেশ বলা হতো। কিন্তু এখন তার দেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে এখন আর স্থবিরতা নেই বরং অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গতিশীলতা রয়েছে। বাদল আরও জানায় বিশ্বায়নের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত হতে পারে।

[আলহেরা একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা দৈর্ঘ্য কত? ১

খ. অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলতে কী বুঝ? ২

https://teachingbd24.com

গ. বাদলের বক্তব্য থেকে তার বন্ধু থমাস বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে কী ধারণা লাভ করেছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বায়নের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানার দৈর্ঘ্য ৪,১৪৪ কি. মি.।

খ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলা হয়।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কতকগুলো অর্থনৈতিক উপাদানের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এসব উপাদান হলো— রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ ও আকাশ পথ, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তি, বাঁধ ও সেতু নির্মাণ, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায়, যেসব কাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক সেসব অবকাঠামোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

গ উদ্দীপকে বাদলের বক্তব্য থেকে তার বন্ধু থমাস বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

বাদল তার বন্ধু থমাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়। বাদলের বর্ণিত ধারণা থেকে বাংলাদেশের পূর্বের ও বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি একসময় অনুন্নত ছিল। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক বেড়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ১৯৮২ সালের পর থেকে বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার কাজ শুরু হয়। ১৯৯০'র দশকে বিশ্বায়ন তথা মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ২০০০ সালের পর থেকে অদ্যাবধি বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লেগেছে। অন্যদিকে, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়েছে এবং দারিদ্র্যের হার কমেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান ক্রমাগত হারে বেড়েই চলেছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমলেও মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেবাখাতের বিস্তার হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে কোনো স্থবিরতা নেই এবং অর্থনীতি ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ- এমনই ছিল বাদলের বর্ণনা।

ঘ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থবিরতা, মন্দা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে মানবসম্পদ রপ্তানিতে শ্লথ গতি এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির জন্য বেশকিছু ক্ষেত্রে হতাশা সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এমন পরিস্থিতি দেশের জন্য অনেক সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ, পাট ও চামড়া শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা, পলিযুক্ত উর্বর কৃষি জমি, পর্যটন সুবিধা, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সামাজিক সূচকে এদেশের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিতে এদেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশ, পরিবেশগত উন্নয়ন প্রভৃতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের মাপকাঠিতে বাংলাদেশ যথেষ্ট ভালো অবস্থানে রয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণের ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষিখাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উৎপাদন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে; খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এর ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছে। দেশে দেশে অনুসৃত উন্মুক্ত ও উদারীকরণ অর্থনীতির এমন ধারা অনেক আগে থেকেই বিশ্বায়ন নামে পরিচিত। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে শুরু করে এবং পুরোপুরি মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ১১০টি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের আয়তন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্রম-উন্নয়ন, কৃষি, অকৃষি ও সেবাখাতের উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে একটি বিকাশমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন ▶৩২ বাংলাদেশের জিডিপিতে খাতওয়ারী অবদান (শতকরা) :

খাতসমূহ	১৯৮৫-৮৬	১৯৯৫-৯৬	২০০১-০২	২০১২-১৩
কৃষি	৩১.১৫	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৬.৭৮
শিল্প	১৭.৩১	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০০
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৪.২৮

[আলহেরা একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. গ্রামীণ খাত বলতে কী বোঝায়? ১

খ. ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটেনি কেন? ২

গ. ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের অবদান চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের তুলনামূলক অবদানের কোন তারতম্য খুঁজে পাও কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে তাদের শিল্প স্থাপনে অনীহা এবং দমননীতি প্রয়োগের কারণে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন ঘটেনি।

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন না করে তাদের উৎপাদিত শিল্প পণ্য এদেশের মানুষকে ক্রয় করতে বাধ্য করত। তাদের দেশের বস্ত্রশিল্প পণ্য মোটা কাপড়ের বাজার প্রসারের জন্য তারা বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড়ের উৎপাদনকারী তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।

গ প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের GDP-তে ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান নিচে দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

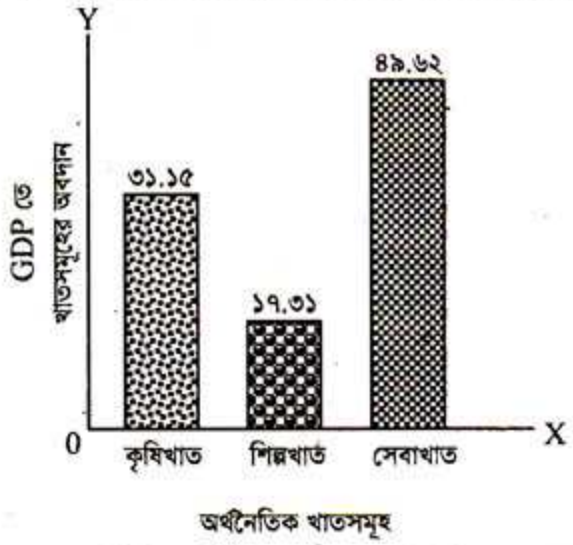

চিত্র : ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের GDP-তে অবদানের দণ্ডচিত্র

https://teachingbd24.com

ঘ ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের তুলনামূলক অবদানের মধ্যে তারতম্য খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো-

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল নয়। বর্তমানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের বিকাশ ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে GDP তে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ২৫.৬৮%। কিন্তু ২০০১-০২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা কমে যথাক্রমে ২৫.০৩% এবং ১৬.৭৮% হয়। অন্যদিকে, এদেশের জিডিপিতে ক্রমান্বয়ে শিল্পখাতের অবদান বাড়তে থাকে। যেমন ১৯৯৫-৯৬, ২০০১-০২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ২৪.৮৭%, ২৬.২০% এবং ২৯.০০% ছিল। একই চিত্র সেবাখাতেও লক্ষ্য করা যায়। যদিও ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১-০২ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান কিছুটা কম ছিল। তবে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান বেড়ে ৫৪.২৮% হয়।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৯৫-৬৬ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের যে অবদান ছিল ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা অনেক কমে এসেছে। আবার, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্প ও সেবাখাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ একটা সময় অনেকেই বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' কিংবা উন্নয়নের গিনিপিগ বলে কটূক্তি করেছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে এক অমিত সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। GDP-তে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। মানবসম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রা প্রচলন করেন? ১

খ. মুসলিম যুগ বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ।

খ মুসলিম যুগ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত। কেননা এ সময়ে বাংলার অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছে।

মুসলিম যুগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয় ও মহাজনি ব্যবসার বিকাশ ঘটে। এ যুগে বাংলা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় এখানে বস্ত্র; বিশেষ করে মসলিন বস্ত্র, চিনি, লৌহ, বারুদ, কামান, লবণ কাগজ ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। বিদেশি পর্যটকদের লেখায় এ সময়ের বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির চিত্র ফুটে ওঠে। এসব কারণে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম যুগ স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ব্যাখ্যা করা হলো-

অতীতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক না হলেও সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৭.১১ ও ৭.২৮ শতাংশ। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৬৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারার কথা বলতে গিয়ে এর সঞ্চয়, বিনিয়োগ, রপ্তানি, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিবর্তনের কথাও এসে যায়। বাংলাদেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট দেশজ সঞ্চয় ও মোট জাতীয় সঞ্চয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৩.৬১ ও ২৮.০৭ শতাংশ। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপির ৩১.৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার যা এক দশক আগে ছিল ৪৬৫ মার্কিন ডলার। এছাড়া অতীতের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে তার অবদান কমে এসেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০.৫৪ শতাংশ। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতির দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হচ্ছে।

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য যেসব বিষয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন উচ্চহারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন। বর্তমানে এদেশের জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের উপরে; ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির এ হার বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য এদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্যের হার হ্রাস করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য বাংলাদেশ দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা দিতে হলে অবশ্যই এর মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ তার মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, সুচিকিৎসা এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এজন্য বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান, যথোপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পিপিপি-এর অধীনে ভারী শিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য উপরিল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। শিল্পে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতের অবস্থা দুর্বল। দেশের মানুষের আয় কম, সঞ্চয় কম ও বিনিয়োগ কম। তবে বর্তমানে প্রায় সকল খাতের উন্নয়ন হয়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে, রেমিটেন্স বেড়েছে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশের মধ্য ভাগ দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে? ১

খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন দিকটি নির্দেশিত হয়েছে? ৩

ঘ. বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ? তোমার মতামত দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

খ বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

দেশটির তিন দিকেই ভারতের অবস্থান। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের সাথেও কিছুটা সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভারত ও মায়ামনারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪,১৪৪ কি.মি এবং ২৮০ কি.মি। বঙ্গোপসাগরের সাথে ৭১৬ কি. মি. এর উপকূল রেখা রয়েছে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতির দিকটি নির্দেশিত হয়েছে।

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন– সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর হলেও সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও এদেশে স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এদেশের মানুষের আয় কম বলে সঞ্চয়ের হারও কম। আর সঞ্চয় কম হলে বিনিয়োগও কম হয় বলে এদেশে খুব বেশি বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। তবে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশে উন্নয়নের ভিত রচিত হয়েছে। ধীরে হলেও জনগণের জীবনযাত্রার মান, মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে। উদ্দীপকে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের এই ধারণাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ– কথাটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নত বলা যায় না। কারণ এখানে স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব, অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আবার এদেশকে অনুন্নত দেশ বলা যায় না। কেননা এদেশের অর্থনীতি স্থবিরও নয়, বরং তা ক্রম উন্নয়নশীল।

বাংলাদেশ যে উন্নয়নশীল দেশ তা নিচের আলোচনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বাড়ছে। কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অবদান বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার হার ক্রমশ বাড়ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বৈদেশিক সাহায্য কমছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে।

এদেশে প্রায় তিন দশক ধরে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই দেশে উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। সমস্যা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে। অত্যন্ত ধীরে হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়।

প্রশ্ন ▶৩৫ জনাব ফয়সাল ছেলেমেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তাদেরকে নিয়ে বিদেশে বেড়াতে যান। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন যে সেখানকার জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি এবং জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত। তাদের অর্থনীতি শিল্পনির্ভর। প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮.৫%। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পর্যাপ্ত, বাণিজ্যিক ঘাটতি নেই এবং তথ্য প্রযুক্তিতে খুবই উন্নত। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার? ১

খ. মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লেখিত দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বিশ্বায়নের যুগে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উদ্দীপকের উক্ত দেশের অর্থনীতির পর্যায়ে উন্নীত হবে? সপক্ষে যুক্তিসহ মত দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

খ মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বাংলার ইতিহাসে ১২০০ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম যুগ তথা মধ্যযুগ স্থায়ী ছিল। এ সময় বাংলা ছিল খাদ্য ও শিল্পে পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন পর্যটক, বণিক ও বিখ্যাত পরিব্রাজকদের আনাগোনা হতো এখানে। তাদের লেখায় তৎকালীন অর্থনীতির প্রাচুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। তখন খুব সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত এ যুগে। এ জন্য মুসলিম যুগ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটি একটি উন্নত দেশ। অপরদিকে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। নিচের উদ্দীপকের দেশটির সাথে বাংলাদেশের তথা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হলো–

উন্নত দেশ বলতে সেসব দেশকে বোঝায় যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশ বলতে সেসব দেশকে বোঝায় যেসব দেশে কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং ক্রমশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের জনাব ফয়সালের সপরিবারে বেড়াতে যাওয়া দেশটির প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮.৫% অর্থাৎ দেশটি একটি উন্নত দেশ। উক্ত দেশের সাথে উন্নয়নশীল বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– প্রথমত, উন্নত দেশগুলোর জাতীয় ও মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে মাথাপিছু আয় গড়ে ৩০,০০০ ডলারের বেশি। অপরদিকে, বাংলাদেশের মানুষের গড় মাথাপিছু আয় ১৭৫২ ডলার। তবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার কারণে দেশের জাতীয় আয় ও জনগণের মাথাপিছু আয় ধীরে হলেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মাথাপিছু আয় বেশি বলে উন্নত দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও খুবই উন্নত। অপরদিকে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত দেশের তুলনায় নিম্নমানের হয়ে থাকে। উন্নত দেশের জনসাধরণের মতো জীবনধারণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। তৃতীয়ত, উন্নত দেশগুলো সাধারণত শিল্পনির্ভর অর্থনীতির হয়ে থাকে। অপরদিকের বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো কৃষিনির্ভর। তবে অন্যান্য সব উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও শিল্পায়নের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং ক্রমাগত নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। চতুর্থত, উন্নত দেশগুলো খুব কম দ্রব্য আমদানি করে, কিন্তু অধিক পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাই উন্নত দেশের বাণিজ্যিক ও লেনদেনের ভারসাম্য বজায় থাকে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমদানির তুলনায় রপ্তানি কম বলে বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রায় সব সময়ই প্রতিকূলে থাকে।

এ ছাড়া প্রবৃদ্ধির হার ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

ঘ হ্যাঁ, বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্দীপকের দেশটির মতো একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বায়ন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্ভূত এমন একটি আন্তর্জাতিক অবস্থা যাতে পৃথিবীর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা দৈশিক গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তদেশীয় পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর ফলে সারা বিশ্ব একটি পরিব্যাপ্ত সমাজে পরিণত হয়েছে এবং অভিন্ন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ যুগপৎ অংশগ্রহণ করছে। এর ফলে অনুন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে নিজেদেরকে একটি উন্নত রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে উন্নীত করা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বিশ্বায়ন হলো পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। এ পদ্ধতির চালিকাশক্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, আর এর প্রধান সহায়ক শক্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে উন্নতি করছে।

https://teachingbd24.com

বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প ব্যয়ে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অধিকমাত্রায় রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসছে। ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে দেশের মুদ্রাবাজারে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। এর প্রভাবে অনেকগুলো সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের উদার বাণিজ্যনীতি, সরকারি বিধি-নিষেধ শিথিলকরণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে, যা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম, সর্বত্র ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সকল প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন, কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্দীপকের জনাব ফয়সালের বেড়াতে যাওয়া দেশ তথা উন্নত দেশের অর্থনীতির পর্যায়ে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ অতীত বাংলা ছিল ধন-সম্পদে ভরপুর। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণে এদেশ পরিণত হয় একটি অনুন্নত রাষ্ট্রে। পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ আমাদের জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে চলছে। *[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো কাকে বলে? ১

খ. কেন মুসলিম যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাকিস্তান শাসনামলের অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটি সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে অর্থনৈতিক কাঠামো বলে।

খ মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলার ইতিহাসে ১২০০ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম যুগ তথা মধ্যযুগ স্থায়ী ছিল। এ সময় বাংলা ছিল খাদ্য ও শিল্পে পরিপূর্ণ এবং বিভিন্ন পর্যটক, বণিক ও বিখ্যাত পরিব্রাজকদের আনাগোনা হতো এখানে। তাদের লেখায় তৎকালীন অর্থনীতির প্রাচুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। তখন খুব সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত। ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত এ যুগে। এজন্য মুসলিম যুগ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ উদ্দীপকে রুবেল তার বিদেশি বন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের অর্থনীতির কথা শুনিয়েছে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল তা হলো:

১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ টাকা ও ৩৩০ টাকা সেখানে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে তা ৩২৭ টাকা ও ৪৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান অর্জন করত। অথচ মোট আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর শতকরা ৭০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তান ভোগ করত। পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি বিনিয়োগ কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতে বেসরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৮০ ভাগ চলে গিয়েছিল। বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ৩০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হতো। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রেও একই রকম বৈষম্য বজায় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক আয়ের ২০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন ব্যয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথাক্রমে মোট ব্যয়ের মাত্র ৩১ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত মোট রাজস্ব আয়ের মাত্র ১২ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংক, বিমা কোম্পানিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার হতো।

ঘ বাংলাদেশ স্থবির রাষ্ট্র নয়, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে— রুবেলের এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

আয়তনে ছোট হলেও উদ্বৃত্ত জনশক্তি, পলিযুক্ত উর্বর কৃষিজমি, হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি, তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সামাজিক সূচকে অগ্রগতি এ দেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্তমানে জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ায় জন্মহার হ্রাস পেয়েছে। তৈরি পোশাকের যে ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে তা ধরে রাখতে হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে জাহাজ রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। রপ্তানিকৃত জনশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে পারলে তাদের আয় বহুগুণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। তথ্য সেবা সহজ হওয়ায় মানুষ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় নিম্নরূপ—

বছর	মাথাপিছু আয় ($)
২০০৫-০৬	৫৪৩
২০০৭-০৮	৬৮৬
২০১৩-১৪	১১৮৪
২০১৭-১৮	১৭৫১

[চট্টগ্রাম কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. অবকাঠামো কাকে বলে? ১

খ. মূলধনের স্বল্পতাই কী অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন কর। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর মাথাপিছু আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে? ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য, সেগুলোকে বলা হয় অবকাঠামো।

Teachingbd24.com

খ হ্যাঁ, মূলধনের স্বল্পতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।

মূলধন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। স্বল্প উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার খুবই কম। কারণ জনগণের মাথাপিছু আয় কম। মূলধনের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যায় না। ব্যাংক ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত হয় না। ফলে পুঁজি গঠনের অভাবে ব্যাপক বিনিয়োগ হয় না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। এসব কারণে বলা যায়, মূলধনের স্বল্পতাই অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।

গ উদ্দীপকে বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় একটি সূচির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করা হলো:

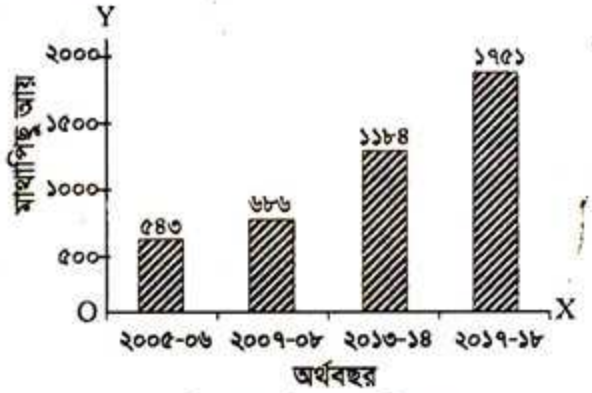

চিত্র: স্তম্ভচিত্র (মাথাপিছু আয়)

চিত্রে, X-অক্ষে অর্থবছর এবং Y-অক্ষে মাথাপিছু আয় পরিমাপ করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ ডলার। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৬৮৬ ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় হয় ১১৮৪ ডলার এবং পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় হয় ১৭৫১ ডলার।

ঘ হ্যাঁ, মাথাপিছু আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ উদ্দীয়মান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এক সম্ভাবনাময় বিষয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, জ্বালানি তেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও সংকট ইত্যাদি বিষয় যখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চরম অনিশ্চয়তা ও মন্দার সৃষ্টি করছে, তখনো বাংলাদেশের অর্থনীতি মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিকেরা পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এতে করে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকে বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় সূচিটি লক্ষ করলে দেখা যায়, মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ ডলার, পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৭৫১ ডলার। অর্থাৎ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাত ও শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৪.২৩ শতাংশ ও ৩৩.৬৬ শতাংশ প্রাক্কলিত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষ জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৭২.৩০ শতাংশ। স্বাধীনতা উত্তরকালে দারিদ্র্যের হার ৬৫ ভাগ থাকলেও বর্তমানে তা ২৩.৫ ভাগে নেমে এসেছে। এছাড়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্যসেবা খাত ও ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি বাংলাদেশকে প্রথমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছে। এখন ধীরে ধীরে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে রূপরেখা প্রণয়ন করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও খাদ্য সুরক্ষা, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ পরিবেশ সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিগত আট বছরের ব্যবধানে বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার ৭২.৩০%, মাথাপিছু আয় ১৭৫১ ডলার এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮৬% এ উন্নিত হয় এবং হত দরিদ্রের হার ১১.৩%-এ নেমে আসে। পদ্মাসেতুসহ চলমান মেগাপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতি আরো গতিশীল হবে। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. অর্থনৈতিক মন্দা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে মনে কর? কেন? ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অর্থনীতিতে যখন বেকারত্ব, মুদ্রাসংকোচন, উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তাকে অর্থনৈতিক মন্দা বলে।

খ একটি দেশের অর্থনীতি যখন পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান, কৃষি ও শিল্পের অগ্রসরতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হলে এসব দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়। কারণ পরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করলেও একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ এখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বেশ এগিয়ে গেছে। এসব সূচকের উন্নয়নের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা হলো।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, আয়বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে গুণগত পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে।

অতীতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও বিভিন্ন কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৫১%, ৭.২% ও ৭.২৪%। বর্তমানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৮৬%। এছাড়া বিগত আট বছরের ব্যবধানে দেশের মানুষের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের সাক্ষরতার হার ৭২.৩০%। অর্থাৎ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক দশক আগেও যেখানে মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৪৬৫ মার্কিন ডলার, বর্তমানে সে আয় বেড়ে হয়েছে ১৭৫১ ডলার। এতে করে দেশে দরিদ্র মানুষের পরিমাণ হাস পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে হতদরিদ্রের হার ১১.৩%-এ নেমে এসেছে। সুতরাং বলা যায় বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়। দেশের অর্থনীতিতে এখন কোনো স্থবিরতা নেই বরং অর্থনীতির প্রায় সবক্ষেত্রেই গতিশীলতা এসেছে।

https://teachingbd24.com

ঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের সংকল্পে 'রূপকল্প-২০৪১' এর ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে ২০৪১ সালকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনে সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপ যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব নেয়ার পরই 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করে। এ ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল- দারিদ্র্য কমিয়ে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং একই সঙ্গে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৮ সাল নাগাদই এমডিজির অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, শিক্ষা ও স্যানিটেশনে দ্রুত সফলতা এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৭২.৩০ শতাংশ। সরকার সাক্ষরতার হার শতভাগ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া বর্তমানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫১ ডলার। যা 'রূপকল্প-২০২১' এর হাত ধরে অর্জিত হয়েছে। এসব পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। যা 'রূপকল্প-২০৪১' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ২২ বছরের মধ্যে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া। এ পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গঠন ও সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগে গতিশীলতা আনয়ন। এজন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতের অবকাঠামোগত সমস্যা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮৬ শতাংশ। এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার ধরে রেখে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে চারটি বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এগুলো হলো- জিডিপিসহ মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সর্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

উপরে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়ন করে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব এবং এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপই যথেষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ সম্প্রতি এক সেমিনারে বক্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। GDP-তে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান কমেছে। মানবসম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কাকে বলে? ১

খ. কী কী শিল্পের জন্য মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বক্তাদের ধারণা অনুযায়ী, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌছাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার? ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না, সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

খ মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলো হলো: কার্পাস বস্ত্র শিল্প, মসলিন বস্ত্র শিল্প, নৌ-শিল্প, চিনিশিল্প, লৌহ শিল্প, কামান শিল্প, বারুদ শিল্প, ভোজ্য তেল শিল্প, অলংকার শিল্প ইত্যাদি। এ সময়ে দেশে রেশম শিল্পও গড়ে ওঠে। তখনকার বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প ছিল মসলিন বস্ত্র শিল্প। বাংলার মসলিন তখন সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

অতীতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬.০৬%, ৬.৫১%, ৭.২% ও ৭.২৪% যা প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নয়ন নির্দেশ করে। আবার দেশের সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাণিজ্যে পরিবর্তনের গতিধারা লক্ষ করা যায়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে ২৬.০৬% ও ৩০.৩০% এবং বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩০.২৭ শতাংশ যা পূর্বে তুলনায় অনেক বেশি। বিগত এক দশকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছে। এখন এ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় হলো ১৭৫২ মার্কিন ডলার। এক দশক আগে এ আয় ছিল ৪৬৫ মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে, বিগত ৪-৫ বছরের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে তার অবদান কমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষিখাতের অবদান ধরা হয় শতকরা ১৪.৭৯ ভাগ। দেশে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত ক্রমেই উন্নত হওয়ায় এমনটি দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৩২.৪৮% ও ৫২.৭৩%। সুতরাং বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়।

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে বক্তরা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এমনটি হতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার নিচে তা আলোচনা করা হলো:

প্রথমত, বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন। বর্তমানে এদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে; ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির এ হার বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ উদ্দেশে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

চতুর্থত, সাম্প্রতিককালে নানা কারণে দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। একে ঠিকমতো রুখতে না পারলে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

Teachingbd24.com

পঞ্চমত, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান, যথোপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পিপিপি-এর অধীনে ভারী শিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶৪০ সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে বাংলাদেশি ছাত্র সৌরভ। বিদেশি বন্ধু জ্যাকসন এর সাথে আলাপকালে সে জানায়, আমাদের কৃষি ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, নিম্ন জীবনযাত্রার মান আর মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশ তোমাদের দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে জনগণ ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ সমস্যাগুলো সমাধান করে বর্তমানে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. গ্রামীণ খাত কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি অর্থনৈতিক অবকাঠামো — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সৌরভের দেওয়া তথ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো কীভাবে সমাধান করে বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে বলে তুমি মনে কর? ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ অর্থনৈতিক অবকাঠামোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়। বিভিন্ন খাত-উপখাতের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থনীতির কাঠামোর এরূপ খাতসমূহের মধ্যে আছে কৃষিখাত, শিল্পখাত, সেবাখাত, বিভিন্ন ধরনের মালিকানাভিত্তিক খাত, শহুরে ও গ্রামীণ খাত ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কাঠামো যত মজবুত হবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত ত্বরান্বিত হবে।

গ উদ্দীপকে সৌরভের দেয়া তথ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেগুলো হলো- অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান ও মুদ্রাস্ফীতি।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে অষ্টম স্থানের অধিকারী। দেশটির আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন লোক বাস করে। চরম বেকারত্ব, কৃষিখাতের প্রাধান্য, শিল্পের ক্রমোন্নতি, অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিচে উদ্দীপকের সৌরভের দেয়া তথ্যমতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো-

অধিক জনসংখ্যা: বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর একটি। দেশের ছোট আয়তন ও স্বল্প সম্পদের তুলনায় বিশাল আকারের জনসংখ্যা সম্পদের উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তবে জনসংখ্যার বর্তমান আয়তন বেশি হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দিন দিন কমে আসছে। ২০০৪ সায়ে যে হার ছিল ১.৪২%, বর্তমানে তা ১.৩৭% এ নেমে এসেছে।

অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: বাংলাদেশের অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যথাসময়ে শিল্পজাত পণ্য পৌছানো সম্ভব হয় না।

মাথাপিছু স্বল্প আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান: বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, জাতীয় আয় সে হারে বাড়ছে না। ফলে মাথাপিছু আয় খুবই কম। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৭৫২ মার্কিন ডলার; যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। মাথাপিছু নিম্ন আয়ের জন্য সঞ্চয় কম হয়। এর ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মাত্রা কম বলে জনগণের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন হয়।

মুদ্রাস্ফীতি: এদেশের বর্ধিত জনসংখ্যা এবং মুদ্রা সরবরাহের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দ্রব্যসেবার দাম বেড়ে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.৩৫%। মুদ্রাস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নপর্যায়ে চলে যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের নানান নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সুপরিকল্পনা ও আন্তরিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাধান করে এ দেশের উন্নয়ন হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের সৌরভ তার বিদেশি বন্ধুর সাথে আলাপকালে বাংলাদেশের অর্থনীতি পিছিয়ে থাকার কিছু কারণ উল্লেখ করে। তবে বর্তমানে দেশের জনগণ ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। স্বাধীনতার পরে প্রায় এক দশক যাবৎ বাংলাদেশে নমনীয় মাত্রার মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু ছিল। সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে এদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। বাজার অর্থনীতির নীতিমালা অনুসরণ করে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে এদেশের বাজার বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের আয়তন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্রম-উন্নয়ন, কৃষি, অকৃষি ও সেবাখাতের উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ধীরে হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.২৪%, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.১১%। বিগত পাঁচ বছরে মাথাপিছু জিডিপি দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এতে করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। উন্নত হচ্ছে জীবনযাত্রার মান। ১৯৯১ সালে দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭%, যা ২০১৬ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫%। এ ছাড়াও অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অধিক জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে বোঝা থেকে সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্য উল্লেখ করার মতো যা শিল্পায়নের গতিধারা আমূল বদলে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের সৌরভের উল্লিখিত বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে প্রশমিত হচ্ছে এবং সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। এই অনুকূল উপাদানগুলো আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন ▶৪১ আরাফের শিক্ষক অর্থনীতর ক্লাসে বললেন, "স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় এগিয়ে গেছে। যেমন- GDP বৃদ্ধির হার বেড়েছে। সঞ্চয় বিনিয়োগ বেড়ে একটি সম্মানজনক অবস্থার কাছাকাছি পৌছেছে।" তিনি বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়েও আলোচনা করেন। এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে আরাফ জানতে পারল যে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বে ও ২০০৯ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে ৬ শতাংশের উপরে।

[স্কলারসহোম, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ১]

https://teachingbd24.com

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। ২
গ. বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা সম্পর্কে আরাফের ধারণার একটি চিত্র উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী এবং খনিজ, প্রাণিজ, বনজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো–

অনুন্নত কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, উন্নয়নশীল শিল্পখাত, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, স্বল্প মাথাপিছু আয়, মূলধন ও বিনিয়োগের স্বল্পতা, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার, অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

গ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে এ পরিবর্তনের সূচকগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করা হলো–

প্রথমত, কয়েক বছর ধরে চলমান বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল সন্তোষজনক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী গত তিন অর্থবছরে (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭) বাংলাদেশে গড়ে ৬ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ বাধা কমানো, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি) গ্রহণ করায় শিল্পের পরিবেশ বিনিয়োগ অনুকূল হয়েছে। ফলে শিল্পোন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তাই দেখা যায়, ২০০০-০১ অর্থবছরে যেখানে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল প্রায় ২৬ শতাংশ, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩২.৪৮ শতাংশে।

তৃতীয়ত, এদেশে বর্তমানে প্রযুক্তিগত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এক্ষেত্রে সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারার পরিবর্তনের সূচকগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করায় উন্নয়নের গতি দ্রুততর হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোক বাংলাদেশের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার মতামত হলো–

বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হ্রাসের বিপরীতে তার প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৫১% ও ৭.০৫%। অর্থাৎ, বৈশ্বিক মন্দা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে কাবু করতে পারেনি। সেই সাথে মাথাপিছু আয়, সাক্ষরতার হার, শিক্ষার হার ও নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ছে। এই অনুকূল উপাদানগুলো আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন নতুন উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন বাংলাদেশের রপ্তানি আয়কে ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করবে বলে মনে করা হয়। সাথে সাথে অন্য কয়েকটি শিল্প যেমন চামড়া ও পাট শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মাছ ও ফলমূল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করবে। তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষিখাতে গত তিন বছর প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। কৃষিখাতে এ কার্যক্রমসমূহ ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে এ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হবে।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। এ দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও অপার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে সংযুক্ত হবে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আসবে। সেই সাথে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে লোক পাঠানোর কারণে এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের সাফল্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ এক সেমিনারে প্রকাশ হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। GDP-তে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান কমেছে। মানব সম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কাকে বলে? ১
খ. মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বক্তাদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং যাদের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না, এককথায় সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।

খ মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। মূলত এসব শিল্পের কারণেই মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলো হলো: কার্পাস বস্ত্র শিল্প, মসলিন বস্ত্র শিল্প, নৌ-শিল্প, চিনিশিল্প, লৌহ শিল্প, কামান শিল্প, বারুদ শিল্প, ভোজ্য তেল শিল্প, অলংকার শিল্প ইত্যাদি। এ সময়ে দেশে রেশম শিল্পও গড়ে ওঠে। তখনকার বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প ছিল মসলিন বস্ত্র শিল্প। বাংলার মসলিন তখন সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

অতীতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬.০৬%, ৬.৫১%, ৭.২% ও ৭.২৪% যা প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নয়ন নির্দেশ করে। আবার দেশের সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্তনের গতিধারা লক্ষ করা যায়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে ২৬.০৬% ও ৩০.৩০% এবং বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩০.২৭ শতাংশ যা পূর্বে তুলনায় অনেক বেশি। বিগত এক দশকে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছে। এখন এ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় হলো ১৭৫২ মার্কিন ডলার। এক দশক আগে এ আয় ছিল ৪৬৫ মার্কিন ডলার। অপরদিকে, বিগত ৪-৫ বছরের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে

https://teachingbd24.com

তার অবদান কমে এসেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষিখাতের অবদান ধরা হয় শতকরা ১৪.৭৯ ভাগ। দেশে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত ক্রমেই উন্নত হওয়ায় এমনটি দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৩২.৪৮% ও ৫২.৭৩%। সুতরাং বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়; যা উদ্দীপকের বক্তাদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে বক্তারা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এমনটি হতে হলে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার নিচে তা আলোচনা করা হলো:

প্রথমত, বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন। বর্তমানে এদেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে; ভবিষ্যতেও প্রবৃদ্ধির এ হার বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে চলমান পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

চতুর্থত, সাম্প্রতিককালে নানা কারণে দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। একে ঠিকমতো রুখতে না পারলে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে। তাই অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

পঞ্চমত, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান, যথোপযুক্ত শিল্পনীতি প্রণয়ন, দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, পিপিপি-এর অধীনে ভারী শিল্প স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সরকারের লড়াই অব্যাহত রয়েছে। দেশটি কৃষিপ্রধান হলেও তা অনুন্নত, শিল্পে অনগ্রসর, বিপুল জনসংখ্যা, কিন্তু শিক্ষার হার কম, খাদ্য ঘাটতি, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে দেশে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু সরকার আর্থ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় দেশটি দ্রুতই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হবে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. গ্রামীণ খাত কী? ১

খ. বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন দেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩

ঘ. দেশটির অর্থনীতি সম্ভাবনাময়। তুমি কি এই ধারণার সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

খ বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করছে।

বিশ্বায়নের ফলে স্বল্প ব্যয়ে কাঁচামাল আমদানির দরুন সামগ্রিক উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বে পুঁজি ও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ থাকায় দেশীয় শিল্প ও সেবা খাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটছে। ফলে স্বল্প উন্নত অনেক দেশেই বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নকামী স্বাধীন দেশ। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এ দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং উন্নতির মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হলেও অদ্যাবধি বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। নানামুখী সমস্যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিটাকে আজও শ্লথ করে রেখেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এ খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। সনাতন কৃষিব্যবস্থার কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং বিভিন্ন শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশে এখনও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। আবার, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম বলে দেশে বেকারের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে; যা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম একটি কারণ। এছাড়া অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার কারণে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সরকার বর্তমানে কিছু বাস্তবমুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময়' এই ধারণার সাথে আমি একমত। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৯৩ সালে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এতে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুসারে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নানা ধরনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা (ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সকল প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন) গ্রহণ করায় জনগণ বিশ্বায়নের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ।

https://teachingbd24.com

অর্থনীতি

অধ্যায়-১: বাংলাদেশের অর্থনীতি

১. প্রাচীনকালে দক্ষিণবঙ্গ কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)
ক পুন্ড্র ও বরেন্দ্র খ রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি
গ সমতট ও হরিকেল ঘ বঙ্গাল **গ**

২. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ সাতটি **গ**

৩. কোন শতক থেকে বাঙালি ছিল একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর? (অনুধাবন)
ক প্রথম শতক থেকে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত
খ পঞ্চম শতক থেকে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত
গ অষ্টম শতক থেকে আদিপর্বের শুরু পর্যন্ত
ঘ অষ্টম শতক থেকে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত **ঘ**

৪. বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোনটি? (জ্ঞান)
ক আদি ও হিন্দু যুগ খ মুসলিম যুগ
গ ইংরেজ যুগ ঘ পাকিস্তান যুগ **খ**

৫. ফরাসি পরিব্রাজক কে? (জ্ঞান)
ক হিউয়েন সাঙ খ বার্নিয়ার
গ সুলেমান ঘ ইবনে বতুতা **খ**

৬. "বাংলা এক বিশাল দেশ। এখানে প্রচুর চাল জন্মে।" কোন পর্যটকের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক আফ্রিকার ইবনে বতুতা
খ চীনা পর্যটক মা-হোয়ান
গ আরব বণিক সুলেমান
ঘ ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার **ক**

৭. বাংলা কোন সনে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক ১১৭৬ খ ১২৭৬
গ ১৪৭৬ ঘ ১৭৭৬ **ক**

৮. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলায় কত লোকের মৃত্যু হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক দুই-তৃতীয়াংশ খ এক-তৃতীয়াংশ
গ এক-চতুর্থাংশ ঘ এক-পঞ্চমাংশ **খ**

৯. বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কোন ভৌগোলিক রেখা অতিক্রম করেছে? (জ্ঞান)
ক কর্কটক্রান্তি রেখা খ মকরক্রান্তি রেখা
গ বিষুবরেখা ঘ মূল মধ্যরেখা **ক**

১০. মানুষের জীবন ও জীবিকা কোন পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? (জ্ঞান)
ক সামাজিক পরিবেশ খ প্রাকৃতিক পরিবেশ
গ গ্রামীণ পরিবেশ ঘ শহুরে পরিবেশ **খ**

১১. উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়াল গড় কোন মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত? (অনুধাবন)
ক পুরাতন পলল মৃত্তিকা খ নতুন পলল মৃত্তিকা
গ পাহাড়ি মৃত্তিকা ঘ প্লাবন মৃত্তিকা **ক**

১২. বাংলাদেশে শীতলতম মাস কোনটি? (জ্ঞান)
ক নভেম্বর খ ডিসেম্বর
গ জানুয়ারি ঘ ফেব্রুয়ারি **গ**

১৩. কোন মৃত্তিকায় ম্যানগ্রোভ (Mangrove) বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে? (জ্ঞান)
ক কোশ মৃত্তিকায় খ পাহাড়ি মৃত্তিকায়
গ প্লাবন মৃত্তিকায় ঘ বিলুয়া মৃত্তিকায় **ঘ**

১৪. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ টাইডাল বনভূমি কোন দেশে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশে খ আফ্রিকায়
গ ভারতে ঘ চীনে **ক**

১৫. কাচ, তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
ক চুনাপাথর খ চীনামাটি
গ গন্ধক ঘ সিলিকা বালু **ঘ**

১৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি **খ**

১৭. কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একক বৃহত্তম খাত? (জ্ঞান)
ক কৃষি খ শিল্প
গ সেবা ঘ শস্য ও শাকসবজি **ক**

১৮. কোনটি বৈদেশিক খাতের উল্লেখযোগ্য বিষয়? (অনুধাবন)
ক মুদ্রার রিজার্ভ খ রেমিটেন্স
গ রপ্তানি আয় ঘ আমদানি ব্যয় **খ**

১৯. কোনটি রপ্তানির মাধ্যমে সরকার রেমিটেন্স পেয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক জনশক্তি খ চিংড়ি
গ তৈরি পোশাক ঘ নিটওয়্যার **ক**

২০. কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ? (জ্ঞান)
ক মূলধন
খ বিনিয়োগ
গ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ঘ সুষম বাণিজ্য **গ**

২১. কোনটির কারণে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না? (অনুধাবন)
ক স্বল্প মাথাপিছু আয় খ মূলধনের স্বল্পতা
গ প্রযুক্তির অভাব ঘ শিক্ষার অভাব **খ**

২২. কীসের ফলে দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে? (জ্ঞান)
ক কৃষি উন্নয়নের ফলে
খ দ্রুত শিল্পায়নের ফলে
গ GDP প্রবৃদ্ধির ফলে
ঘ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে **খ**

২৩. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে কত তম দেশ? (জ্ঞান)
ক ৭ম খ ৮ম গ ৯ম ঘ ১০ম **খ**

Teachingbd.com

২৪. Black Gold কী? (জ্ঞান)
ক কয়লা খ কালো সোনা
গ খনিজ পদার্থ ঘ গ্যাস **গ**

২৫. আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ কোন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে শুরু করে? (জ্ঞান)
ক মুক্তবাজার খ মোবাইল
গ বিশ্বায়ন ঘ ইন্টারনেট **গ**

২৬. বিশ্ব বাণিজ্য অঙ্গনে কোন দেশ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহত্তম বাজার? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ড খ যুক্তরাষ্ট্র
গ জার্মানি ঘ সৌদি আরব **খ**

২৭. 'কাজলা' কোন ফসলের উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ? (জ্ঞান)
ক তেলবীজ খ ধান
গ টমেটো ঘ বেগুন **ঘ**

২৮. মসলিন কাপড়ের বৈশিষ্ট্য ছিল — (অনুধাবন)
i. লম্বায় উনিশ হাত
ii. চওড়ায় দুই
iii. মিহি কার্পাস দিয়ে তৈরি হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৯. বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলা সফর করে লক্ষ করেছেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বাংলার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা
ii. খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব সস্তা
iii. জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যন্ত কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩০. বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য বিল আছে
ii. এ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য জলাভূমি আছে
iii. উপনদী ও শাখা নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত এর মাটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩১. বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো বিভক্ত—
i. অঞ্চলভিত্তিক
ii. মালিকানাভিত্তিক
iii. উৎপাদনভিত্তিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩২. ২০১০ সালে ঘোষিত শিল্পনীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল— (অনুধাবন)
i. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
ii. দারিদ্র্য দূরীকরণ
iii. নারীর ক্ষমতায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৩. ২০১০ সালের শিল্পনীতির উদ্দেশ্য ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ii. নারীদের ক্ষমতায়ন
iii. দারিদ্র্য দূরীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম গ্রন্থাগারে বই পড়ে একটি যুগ সম্পর্কে জানতে পারলো, যে যুগকে প্রাচীন বাংলায় 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হতো। সে আরও জানতে পারলো, সেই যুগে ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল এবং আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

৩৪. অনুচ্ছেদে 'স্বর্ণযুগ' বলতে কোন যুগকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আদি ও হিন্দু যুগ খ মুসলমান যুগ
গ ব্রিটিশ যুগ ঘ পাকিস্তান যুগ **খ**

৩৫. উক্ত যুগের বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দ্রব্যমূল্য সস্তা ছিল
ii. দারিদ্র্যের হার কম ছিল
iii. দাস-দাসী বেচাকেনা হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
উচ্চ গতির ডাটা আদান-প্রদান ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ১৩টি জেলা শহরে মোট ২৩টি ডিজিটাল ডাটা নেটওয়ার্ক বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় ইন্টারনেট সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৩৬. উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে— (প্রয়োগ)
i. অর্থনীতির গতিশীলতা
ii. অর্থনৈতিক মন্দা
iii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii **গ**

৩৭. ইন্টারনেট সেবার প্রসারের কারণে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানুষের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে
ii. মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে
iii. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-২: বাংলাদেশের কৃষি

প্রশ্ন ▶১ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। পূর্বে সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হলেও বর্তমানে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কৃষি উৎপাদনেও বৈচিত্র্য এসেছে। যার জন্য পূর্বের তুলনায় কৃষকদের বেশি পরিমাণে মূলধন প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে কৃষক প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে না। অতি সম্প্রতি সরকার কৃষি ঋণ ও উপকরণ বিতরণ অধিকতর সহজলভ্য করেছে। যার ইতিবাচক প্রভাব কৃষি উৎপাদনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ২; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কৃষিজোত কাকে বলে? ১

খ. মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণেই কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে কৃষকের সমস্যাসমূহ উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. কৃষির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কৃষি ঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ যথেষ্ট কি? তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষক যে আয়তনের জমির উপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে, তাকে কৃষিজোত বলে।

খ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণিকে মধ্যস্বত্বভোগী বলা হয়।
এ সকল ব্যবসায়ীরা তৃণমূল কৃষকদের কাছ থেকে নাম মাত্র মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করে বাজারে উচ্চ মূল্যে চূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও কৃষক সম্প্রদায় ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। এতে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ কৃষকগণ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ সংগ্রহে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যাগুলো উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করা হলো—
যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা সরকারি ঋণদানের বিধি ও নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৃষিঋণ প্রদান করে থাকে, তাদেরকে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জন্য উপযুক্ত জামানত প্রদান করতে হয়।
কিন্তু এদেশের বেশির ভাগ কৃষক ভূমিহীন ও প্রান্তিক হওয়ায় উপর্যুক্ত জামানত দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না। এছাড়া আমাদের দেশে কিছু বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) কর্তৃক স্বল্পসুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই শহরভিত্তিক। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্যের নিমিত্তে গড়ে উঠলেও এর অধিকাংশ সুবিধা গ্রামের ধনী কৃষক ও মহাজনরাই ভোগ করে থাকে। ফলে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
উদ্দীপক অনুসারে, বর্তমানে এদেশের কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এজন্য কৃষকদের পূর্বের তুলনায় অধিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। তারা কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি (ট্রাক্টর, সেচ পাম্প) ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। কিন্তু উপর্যুক্ত সমস্যাগুলোর কারণে তারা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঘ বাংলাদেশে দরিদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহে সমস্যা লাঘবের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত এসব কর্মসূচি মূল্যায়ন করা হলো—
বাংলাদেশ সরকার কৃষিতে উৎপাদন বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে মাঝারি সুদের হারে কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিআরডিবি এবং সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে। আবার ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর হয়রানি ও শোষণ বন্ধ করার জন্য সরকার একটি জাতীয় ঋণ সালিশ বোর্ড গঠন করেছে। অন্যদিকে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে, আমদানি বিকল্প শস্য চাষে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদে বিকল্প ঋণ প্রদান করছে এবং ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করছে।
বাংলাদেশ সরকার কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও উপকরণ সহায়ক কার্ড বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার BADC কর্তৃক ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের কাছে স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন- রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, সেচযন্ত্র, কীটনাশক, উন্নতমানের সার ইত্যাদি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।
সুতরাং বলা যায়, কৃষকদের সমস্যা লাঘব ও কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি আপাতত যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন ▶২ মি. 'ক' একদিন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সেখানে একটি খবরের প্রতি তার দৃষ্টি আটকে যায়। খবরে বলা হয়, বগুড়ার মহাস্থানগড় বাজারের সবজির দামের সঙ্গে ঢাকার কাওরান বাজারের সবজির দামে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। খবরে আরও জানতে পারেন, অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য, কৃষকদের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে দামের এই পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান সরকার এইসব সমস্যা সমাধানে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছে।
[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ২]

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ কৃষি উন্নয়নের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কি? উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খামারে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয়, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণকে কৃষি উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
কৃষি জমির স্থায়ী উন্নয়ন, নলকূপ বসানো, ট্রাক্টর ক্রয়, ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরোনো ঋণ পরিশোধে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষি জমির উৎপাদন বাড়াতে চাইলে প্রথমে কৃষি জমির স্থায়ী উন্নয়ন আবশ্যক। কারণ, কৃষি জমি যদি উন্নত চাষাবাদের উপযোগী না হয় অর্থাৎ কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু হয় তবে ফসল উৎপাদন কখনো কাঙ্ক্ষিত হবে না। এক্ষেত্রে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষককে দীর্ঘমেয়াদি বা বৃহৎ উৎস হতে ঋণ সংগ্রহ করতে হয়। স্বল্পমেয়াদি বা মধ্যম মেয়াদি ঋণ দ্বারা উপর্যুক্ত সমস্যার সমাধান কষ্টসাধ্য। তাই দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণকে কৃষি উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ হলো অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য এবং কৃষকের সচেতনতার অভাব। নিচে এ সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো—
অনুন্নত পরিবহনব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে এনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না। বাড়িতে বা স্থানীয় হাটবাজারে কম দামে পণ্য বিক্রি করে। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।

Teachingbd24.com

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। কৃষক যে দাম পায় এবং সর্বশেষ ভোক্তা যে দাম দেয় তার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্য। ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এজন্য একই পণ্য কোনো বাজারে চড়া দামে এবং কোনো বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। এতে কম দামে বাজারে বিক্রয়কারী কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া আমাদের কৃষকেরা কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। ফলে ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারের গতি প্রকৃতির সাথে তারা একেবারেই অপরিচিত। তাই তারা কৃষিপণ্যের তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে।

ঘ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট নয়। উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকে সরকার বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন বা বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু রাস্তাঘাট নির্মাণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। যা কৃষকের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়। এছাড়া সরকার আরও যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

সরকার কৃষককে স্বল্পসুদে ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণদান সংস্থা গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করতে পারে যাতে কৃষকের প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। আবার সরকার কৃষিপণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও শস্য সংরক্ষণের সময় শস্যের যেন ক্ষতি না হয়, এজন্য সরকার গুদামঘর নির্মাণ এবং শস্য গুদামে মজুত রাখার বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। এছাড়া সরকার কৃষিপণ্যের মান অনুসারে এদের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে। সর্বোপরি, কৃষকদেরকে লাভবান করার জন্য সরকার কৃষিপণ্যের সর্বনিম্নমূল্য ধার্য করে যাতে সেটি কার্যকর হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে পারে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি সঠিকভাবে গৃহীত হলে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং কৃষকেরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য লাভ করবে।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত প্রান্তিক পর্যায়ের। তাদের নিজস্ব জমি নেই বললেই চলে। রহিম উদ্দিন এ রকমই একজন কৃষক। তবে আজিজ উদ্দিন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। তার কৃষি খামারের আয়তন অনেক বড়। তিনি পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বাজারজাত করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কৃষিঋণ কী? ১

খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিম উদ্দিনের কৃষি খামার কোন ধরনের?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চাষ পদ্ধতি, মূলধনের পরিমাণ, আয় উপার্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি— এসব দৃষ্টিকোণ হতে রহিম উদ্দিন ও আজিজ উদ্দিনের কৃষি খামারের পার্থক্য তুলে ধরো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষিঋণ বলা হয়।

খ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিজাতীয় উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.১% লোক কৃষি কাজে নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে GDPতে সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৪.৭৯ ভাগ। তাছাড়া, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষি হতে আসে। আবার, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী (মাছ, মাংস, পশুর চামড়া ইত্যাদি) রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়, যা একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ রহিম উদ্দিনের কৃষি খামার হলো জীবননির্বাহী কৃষি খামার।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কৃষি খামার দুই প্রকার। যথা— জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার। যে কৃষি খামারে বা জমিতে জীবন নির্বাহের জন্য চাষাবাদ করা হয়, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে। সাধারণত এ ধরনের খামারে ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত ও পরিদর্শন ব্যবস্থা অদক্ষ হয়ে থাকে। তাই উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণও কম হয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক রহিম উদ্দিনের মতো প্রান্তিক কৃষক। রহিম উদ্দিনের কৃষি কাজে তেমন উদ্বৃত্ত থাকে না, কারণ তার কৃষি কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ব্যয় নির্বাহ করা। রহিম উদ্দিনের নিজের কোনো জমি নেই বললেই চলে। অর্থাৎ তার খামারের আয়তন ক্ষুদ্র এবং মূলধনের পরিমাণও কম। কাজেই বলা যায়, রহিম উদ্দিনের খামার হলো জীবননির্বাহী খামার।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিম উদ্দিনের খামারটি জীবন নির্বাহী খামার এবং আজিজ উদ্দিনের খামারটি বাণিজ্যিক খামার। নিম্নে চাষ পদ্ধতি, মূলধনের পরিমাণ, আয় উপার্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত খামারদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো—

১. **চাষ পদ্ধতি:** জীবননির্বাহী খামারে সনাতন পদ্ধতিতে এবং বাণিজ্যিক খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

২. **মূলধনের পরিমাণ:** রহিম উদ্দিন প্রান্তিক কৃষক হওয়ায় তার চাষাবাদে কম মূলধন ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, আজিজ উদ্দিন তুলনামূলক বেশি মূলধন ব্যবহার করে থাকেন।

৩. **আয় উপার্জন:** জীবননির্বাহী খামার ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা কম। যার ফলশ্রুতিতে আয়ও অনেক কম। পক্ষান্তরে, বাণিজ্যিক খামারের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন। এজন্য এ ধরনের খামারে আয়ও বেশি।

৪. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** জীবননির্বাহী খামারে মূলত পরিবারের সদস্যরাই কাজ করে থাকে। অর্থাৎ নতুন কোনো লোকের কর্মসংস্থান হয় না। কিন্তু, বাণিজ্যিক খামারের আয়তন বড় হওয়ায় এখানে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶৪ মি. ফজলে ইলাহী অর্থনীতি বিষয়ের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। বাংলাদেশের কৃষিতে আইসিটি (ICT)-এর গুরুত্বের ওপর তিনি শ্রেণিকক্ষে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, কৃষি জমির গুণাগুণ, রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে জানা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং কৃষিবিজ্ঞানী ও গবেষকদের সাথে যোগাযোগ ক্ষেত্রে ICT গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য সরকার উপজেলা পর্যায়ে 'কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র' স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি SMS-সহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. 'বাংলাদেশের কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ICT-এর মাধ্যমে কৃষকরা কী কী সুবিধা পায়? মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. কৃষিক্ষেত্রে ICT-এর সুবিধাদি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি যথেষ্ট?— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শস্য বহুমুখীকরণ বলতে একই জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে কেবল একটি শস্যের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

খ বাংলাদেশের কৃষকরা নানাবিধ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণদানকারী সংস্থার সংখ্যা কম। তাছাড়া, এসব ঋণদানকারী সংস্থার ঋণ প্রদানের ক্ষমতাও কম। আবার, ঋণদান পদ্ধতিও জটিল, শর্তসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ বলে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত কৃষকের পক্ষে তা অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই, দরিদ্র ও অশিক্ষিত কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

গ বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির সুফল বাংলাদেশের কৃষি খাতেও পড়েছে। ফলে ICT-এর বিভিন্ন সুবিধাসমূহ কৃষকরা পাচ্ছে।

আমরা জানি, কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা বিতরণই

https://teachingbd24.com

হলো তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (ICT)। ICT-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষকরা নানা ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন—

১. আবহাওয়ার পূর্বাভাস।
২. কৃষি জমির গুণাগুণ যাচাই এবং সেই অনুসারে ফসল চাষের পরামর্শ।
৩. পশু-পাখির বিভিন্ন রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
৪. শস্য পরিচর্যা পদ্ধতি, শস্য ও উদ্ভিদের রোগ সম্পর্কে জানা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকের সাথে যোগাযোগ রাখা ও বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

ঘ ICT-কে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। নিচে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ মূল্যায়ন করা হলো—

মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন কৃষি উপকরণের নির্ধারিত দামের তথ্য ICT-এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এতে কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।

কৃষকদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার উপজেলা পর্যায়ে 'কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র' স্থাপন করেছে। এতে কৃষকরা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সেবা পেয়ে থাকে। তাছাড়া সরকার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাতের অন্য শস্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ICT-এর ব্যবহার করে কৃষি SMS, অনলাইন কৃষি সার্ভিস ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের কৃষকরা কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে এবং এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে ICT এর সুবিধাদি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ যথেষ্ট।

প্রশ্ন ▶৫ 'X' দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারা নিম্নরূপ:

বছর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
১৯৮০-৮১	২০০
১৯৯০-৯১	১৫০
২০০০-০১	১৭০
২০১০-১১	২২০

'X' দেশে সম্প্রতি সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিতে পারমাণবিক শক্তি, বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ করো। ১
খ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে অবস্থিত। এদেশ ২০°৩৪ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

খ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর একরকম নয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে পৃথিবীর দেশগুলোকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ভাগ করা হয়। উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। এসব দেশে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদির পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। সেসব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন স্তরের তা জানতে আমাদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো জানা প্রয়োজন। যেমন– কৃষি খাতের প্রাধান্য, অপ্রসারিত শিল্পখাত, জনসংখ্যাধিক্য, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কোনোক্রমেই উন্নত দেশের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবে উল্লিখিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়।

গ উদ্দীপকে 'X' দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের চার অর্থবছরের গতিধারা উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে প্রদত্ত তথ্যগুলো একটি দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

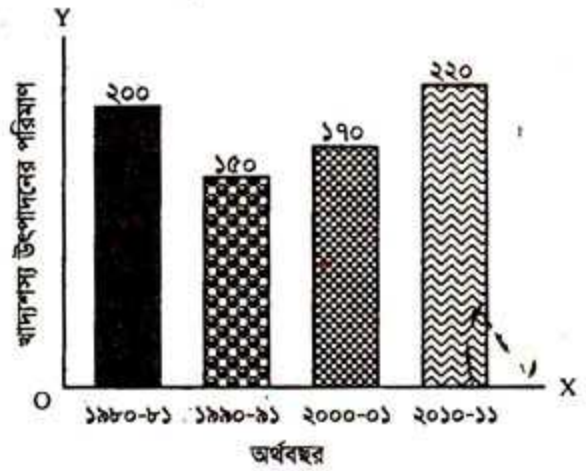

চিত্র: খাদ্যশস্যের স্তম্ভচিত্র

খাদ্যশস্যের স্তম্ভচিত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে উৎপাদন ছিল ২০০ মে. টন। কিন্তু ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে তা কমে ১৫০ মে. টন হয়। আবার ২০০০-২০০১ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০ মে. টন হয়। তবে ২০১০-১১ অর্থবছরে উৎপাদন ২২০ মে. টন হয়। যা অধিক উৎপাদন নির্দেশ করছে।

ঘ বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে কৃষিতে পারমাণবিক শক্তি, বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হলো।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবারড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি; কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ; ইউনিয়ন পর্যায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন; কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে একটি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন; কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)-এর উপকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদিসহ নানান উন্নয়নমূলক কাজ এর মাধ্যমে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে 'X' দেশটিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল। এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ২২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন হয়েছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট।

প্রশ্ন ▶৬ রফিকুল ইসলাম একজন গরিব কৃষক। তিনি বুবেলের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে তার জমিতে টমেটো চাষ করেন। টমেটোর ফলন খুব ভালো হয়েছে। প্রতি কেজি টমেটো উৎপাদন করতে তার খরচ হয় ১৫ টাকা। কিন্তু বুবেলের নিকট তিনি টমেটো প্রতি কেজি ১৬ টাকা দরে বিক্রি করতে বাধ্য হন। বুবেল সে টমেটো বাজারে প্রতি কেজি ২৫ টাকা ধরে বিক্রি করেন। রফিকুল ইসলামের মতো কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে সরকার গ্রামাঞ্চলে ক্রয়কেন্দ্র ও কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং কৃষকদের বিনা সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে কৃষির উপখাতসমূহ কী? ১
খ. 'বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রফিকুল ইসলামের সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. রফিকুল ইসলামের মতো কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে কৃষির উপখাতসমূহ হলো শস্য ও শাকসবজি, পশু সম্পদ, বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ।

খ পরিবেশ দূষণের ফল হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির দরুন সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রের ওপর। জলবায়ুর পরিবর্তন মানবজীবন এবং সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কৃষি উৎপাদনের ওপর তার প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস, বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি, বৃক্ষরাজি, মৎস্য উৎপাদন ও প্রজননক্ষমতা ধ্বংস হচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তৈরি হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা।

গ রফিকুল ইসলামের সমস্যাটি হলো কৃষিপণ্যের বিপণনের সমস্যা। নিচে এই সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথমত, টমেটো পচনশীল পণ্য হওয়ায় তা সংরক্ষণের সমস্যা রয়েছে। রফিকুল ইসলাম যখন টমেটো সংগ্রহ করেন তখন তার দাম কম থাকে। তাই ওই সময় টমেটো বিক্রি না করে যদি কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা যেত, তবে যখন টমেটোর দাম বাড়ত তখন বিক্রি করতে পারলে ন্যায্যমূল্য পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাংলাদেশে পচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের তেমন কোনো কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হয়নি। তাছাড়া এ ধরনের পচনশীল পণ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে সংরক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারে কৃষকের অবস্থান খুবই দুর্বল। এদেশের কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজারে পণ্য বিক্রেতা কৃষকের সংখ্যা অগণিত। অন্যদিকে, ক্রেতা হিসেবে আছে অল্পসংখ্যক ফড়িয়া ও বেপারি। তদুপরি, নগদ অর্থের তীব্র প্রয়োজনে কৃষক অবিলম্বে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরিণতিতে রফিকুল ইসলামের মতো গরিব কৃষক কখনো তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না।

তৃতীয়ত, আমাদের দেশে কৃষিপণ্যের বাজারে কৃষক তার পণ্য প্রকৃত ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করতে পারে না। প্রকৃত ক্রেতা ও কৃষক বা উৎপাদনকারীর মাঝে একদল দালাল শ্রেণির লোক থাকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে কৃষিপণ্য খামার থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। ফড়িয়া, দালাল, মজুতদার, বেপারি, মহাজন ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের আর্থিক সংকটের সুযোগে হাতিয়ে নেয় মোটা অঙ্কের মুনাফা। মুনাফার প্রায় সবটুকুই এ সকল দালালের হাতে চলে যায়। ফলে কৃষক তার পণ্যের মূল্যের একটি অংশ পায় মাত্র। আবার অনেক সময় এরা কৃষকদেরকে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করে।

ঘ কৃষিপণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। কেননা, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের নিম্নমান, কৃষকদের দারিদ্র্য, বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, পণ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি সমস্যা কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে আছে। কৃষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধমেই কৃষিপণ্যের বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করে কৃষির দ্রুত উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব। নিচে বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সরকারি পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করা হলো—

বাফার স্টক: বাফার স্টকের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের দামের উর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি রোধ করা যায়। যখন কৃষিতে বাম্পার ফলন হয় তখন সরকার কৃষিপণ্য ক্রয় করে তা সংরক্ষণ করলে কৃষিপণ্যের দামের নিম্নগতি রোধ হয়। আবার, যখন কৃষি উৎপাদন কম হয় তখন বাফার স্টকের পণ্য বাজারে ছাড়লে পণ্যের দামের উর্ধ্বগতি রোধ পায়। এভাবে সরকার রফিকুল ইসলামের মতো কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

গুদামঘর নির্মাণ: কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রামে গুদামঘর থাকা দরকার। কিন্তু গুদামঘর নির্মাণ করা কৃষকদের জন্য কঠিন। তাই সরকারি উদ্যোগে গুদামঘর নির্মাণ করা হয়েছে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ: কিছু কৃষিশস্য সহজেই পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- টমেটো, আলু, পেঁয়াজ; কাঁচা মরিচ, পান, আদা ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগে এসব ফসল সংরক্ষণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ঋণদান: কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণে তাদের নিজস্ব মূলধন নেই। তাই কৃষকরা ঋণ করে বা বাকিতে বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। কৃষকরা মূলধনের অভাবের কারণে সঠিক সময়ে ও প্রয়োজনমাফিক ফসল উৎপাদন করতে পারে না। তাই তারা গ্রাম্য মহাজনদের কাছে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এসব কৃষকের জন্য সরকারি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে। যাতে স্বল্প সময়ে, স্বল্প সুদে, সহজ শর্তে কৃষকরা ঋণ পেতে পারে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব দুলাল তার বাবার আমল থেকেই কৃষিকাজে জড়িত। পুরনো পদ্ধতিতে চাষ করেন বলে উৎপাদন কম হয়। তার কৃষিজোতগুলো ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত, ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। তাছাড়াও রয়েছে উপকরণাদির অভাব ও শস্য বহুমুখীকরণের অভাব। জনাব দুলাল এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি সাহায্য কামনা করেন। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১

খ. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে কি খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব দুলাল কৃষিতে উন্নতি করতে পারছেন না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করা দুলাল সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই জমি বা কৃষিজোতে বিভিন্ন মৌসুমে এক ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

খ কৃষিতে শস্য বহুমুখীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; যা জনবহুল দেশে ব্যাপক খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শস্য বহুমুখীকরণের মধ্য দিয়ে বিগত দুই দশক যাবৎ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে ঘটেছে নীরব বিপ্লব। অর্থাৎ একই জমিতে বার বার একই ফসল চাষ না করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন দুটিই বৃদ্ধি পায়। এরূপ চাষাবাদ করাই হলো শস্য বহুমুখীকরণ। সুতরাং বলা যায়, শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব দুলাল সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ, ক্ষুদ্র কৃষিজোত, কৃষি উপকরণ এবং শস্য বহুমুখীকরণের অভাব প্রভৃতি সমস্যার কারণে কৃষিতে উন্নতি করতে পারছেন না।

বাংলাদেশের অনেক কৃষক চাষাবাদের ক্ষেত্রে এখনো সনাতন কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও আমাদের কৃষকরা লাঙল ও জোয়ালের সাহায্যে চাষাবাদ করে। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো খুবই সীমিত। তদুপরি, আমাদের দেশের গরিব কৃষকদের পক্ষে এসব ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করাও কঠিন। আবার বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষিজোত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কোনো কোনো জমি এত ছোট যে, এসব জমিতে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় না। ভালো ফসল ফলাতে হলে ভালো সার ও উৎকৃষ্ট বীজের প্রয়োজন হয়। আর যা কি না প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তাছাড়া শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই শস্য বহুমুখীকরণ সম্পর্কে ধারণা নেই।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব দুলালও বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ, তিনি উৎপাদন ক্ষেত্রে সনাতন চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আবার, তার কৃষিজোতগুলো ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত বলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে পারছেন না। এছাড়াও কৃষি উপকরণের অভাব এবং শস্য বহুমুখীকরণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তার উৎপাদন বাড়ছে না। তাই তিনি কৃষিতে উন্নতি করতে পারছেন না।

https://teachingbd24.com

ঘ আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করা জনাব দুলালের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তার কৃষিজোতগুলো ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত।

কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে তাকে কৃষিজোত বলে। এরকম জোত ক্ষুদ্র, মাঝারি কিংবা বড় হতে পারে। আবার, কৃষকের কৃষিজোতগুলো একত্রে না থেকে মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকেরই কৃষিজোতগুলো উপবিভক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত।

বাংলাদেশের মোট কৃষিজোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৪৯ ভাগই হলো ক্ষুদ্রায়তনের জোত। জোতগুলো অতি ক্ষুদ্রায়তনের হয় বলে সেখানে প্রয়োজনমাফিক বিনিয়োগ করা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। উদ্দীপকের জনাব দুলাল বহুদিন ধরে কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তিনি পুরাতন চাষ পদ্ধতিতে চাষ করেন বলে উৎপাদনও কম হয়। তাছাড়া তার কৃষি জোতগুলো ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত। তাই সেখানে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রায়তনের কৃষিজোতের আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, এখানকার বেশিরভাগ কৃষিজোতই পরিমিত আয়তনের নয়। এরূপ জোতে শ্রম ও মূলধন পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় না। এখানে কৃষিকাজ অদক্ষভাবে পরিচালনা করা হয় বলে উদ্দীপকের দুলালের মত কৃষকরা প্রাপ্ত ফসল দ্বারা সন্তোষজনক জীবন নির্বাহ করতে পারে না এবং কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতেও সক্ষম হয় না।

প্রশ্ন ▶৮ কৃষকের সন্তান বাবুল। স্থানীয় কলেজ থেকে বিএ পাস করেছেন। চাকরি না খুঁজে কৃষিকাজেই নিয়োজিত হলেন। বাবার কাছ থেকে এক একর জমি নিয়ে তাতে মাল্টা চাষ করলেন। এজন্য তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন। তাছাড়া কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিলেন। ফলন খুব ভালো হলো। কিন্তু অধিক পরিবহন ব্যয়, দালাল-ফড়িয়া ইত্যাদি সমস্যার কারণে মাল্টার উপযুক্ত মূল্য পেলেন না। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১

খ. কৃষি পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাবুল মাল্টা বিক্রি করতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারের করণীয়সমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ কৃষি প্রজনন সম্বন্ধীয় কাজ হওয়ায় তা প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশের কৃষকরা চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ভালো ফসল হয়, কিন্তু যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে ভালো ফসল হয় না। ফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেকটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

গ বাবুল মাল্টা বিক্রি করতে গিয়ে কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যার সম্মুখীন হন।

কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ নমুনাকরণ, পরিবহন, ঝুঁকি গ্রহণ, মানোন্নয়ন প্রভৃতি কার্যাবলিকে বোঝায়। বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত নয়। ফলে কৃষক তাদের উৎপাদিত দ্রব্য তথা ফসল বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। কৃষিজাত পণ্য বিপণনের একটি প্রধান সমস্যা হলো অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে এনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না। বাড়িতে বা গ্রামের হাট-বাজারে কম দামে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রি করে। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না। আমাদের দেশে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে। কৃষিপণ্যের বাজারে কৃষক তার পণ্য প্রকৃত ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করতে পারে না। কারণ, প্রকৃত ক্রেতা ও কৃষকের মাঝে থাকে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা। মুনাফার প্রায় সবটুকুই এই সমস্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। ফলে কৃষক তার পণ্যের মূল্যের একটি অংশ পায় মাত্র।

উদ্দীপকের বাবুল ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মাল্টা চাষ শুরু করলেন। তার মাল্টার ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু তিনি অধিক পরিবহন ব্যয়ের জন্য মাল্টা অন্যত্র নিয়ে বিক্রি করতে পারেন না। এজন্য তাকে দালাল-ফড়িয়াদের কাছে কম দামে মাল্টা বিক্রি করতে হয়। কাজেই বলা যায়, কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যার কারণেই বাবুল মাল্টার ন্যায্য দাম পান না।

ঘ বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। সেগুলো কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাধান করা সম্ভব নয়। যা সরকারের হস্তক্ষেপেই সম্ভব। কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারের করণীয় দিকগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো— অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য তাই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিপুল মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় এবং তা থেকে সরাসরি কোনো মুনাফা অর্জন করা যায় না বলে এ কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ তেমন দেখা যায় না। একমাত্র সরকারেরই সক্রিয় ও অব্যাহত অংশগ্রহণের ফলে তার উন্নয়ন সম্ভব হয়।

২. কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে সারাদেশে সরকারি উদ্যোগে 'কৃষক বিপণন দল', 'কৃষক ক্লাব' গঠনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বাজার উন্নয়ন এবং লিংকেজ তৈরির জন্য ঢাকাতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণকাজ (গাবতলীতে) সম্পন্ন হয়েছে।

৩. কৃষিপণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধন করতে হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমবায় সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে এদের কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব।

৪. বিভিন্ন বাজারে কৃষকদের নিকট থেকে যাতে আড়তদারি, পাল্লাদারি, টোল, চাঁদা প্রভৃতির অজুহাতে অর্থ আদায় করতে না পারে, সেজন্য আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলো সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

৫. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ, কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং ফসল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৯ সাদিপুর নিবাসী করিম মিয়া পৈতৃকসূত্রে এক বিঘা কৃষি জমির মালিক। বিগত বছরগুলোতে টমেটোর দাম ভালো থাকায় এই বছর গ্রামের মহাজনের নিকট হতে চড়াসুদে ঋণ নিয়ে সবটুকু জমিতে টমেটো আবাদ করেন। কিন্তু অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে উৎপাদিত টমেটো সময়মতো শহরের বাজারে নিতে পারেননি। টমেটো পচনশীল দ্রব্য হওয়ায় বাধ্য হয়ে কম দামে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। করিম মিয়া তার ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. কৃষি কেন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত করিম মিয়ার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. করিম মিয়ার উৎপাদিত দ্রব্যটি বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য— আলোচনা করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যবহার করে থাকে তাকে কৃষি খামার বলে।

https://teachingbd24.com

খ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও সার্বিকভাবে কৃষিকাজ ত্রুটিপূর্ণ ও প্রকৃতিনির্ভর। বাংলাদেশের কৃষির অন্য একটি মৌলিক সমস্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীলতা। আমাদের দেশের সেচব্যবস্থা অনুন্নত বিধায় মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর কৃষি খুব বেশি নির্ভরশীল। সময়মতো ও পরিমিত বৃষ্টির অভাবে প্রায়ই কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়।

যেকোনো কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সেচব্যবস্থার প্রচলন হয়নি। ফলে কৃষি মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল।

গ করিম মিয়ার উৎপাদিত পণ্যটি হলো কৃষিজাত দ্রব্য। বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বিপণন বা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। নিচে করিম মিয়ার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো—

কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা: করিম মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। করিম মিয়ার মতো কৃষকরা ফসল কাটার সাথে সাথেই কম মূল্যে বিক্রয় করে অথবা ফসল জমিতে রেখেই বিক্রয় করে ফেলে। অর্থাৎ কৃষকরা তাদের দারিদ্র্যের কারণে ফসলের দাম বৃদ্ধি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না।

অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: আমাদের দেশে পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত নয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে করিম মিয়ার মতো কৃষকরা পণ্যসামগ্রী নিয়ে দূর-দূরান্তের বাজারে যেতে পারে না। ফলে, স্থানীয় বাজারেই স্বল্প মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হয়।

মধ্যস্বত্বভোগীদের উপস্থিতি: কৃষিপণ্য খামার থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। ফড়িয়া, দালাল, মজুতদার, বেপারি, মহাজন ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের আর্থিক সংকটের সুযোগে হাতিয়ে নেয় মোটা অঙ্কের মুনাফা। এরা অনেক সময় কৃষকদেরকে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে।

গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাব: বাংলাদেশের কৃষকরা উপযুক্ত গুদাম এর অভাবে ভবিষ্যতে বেশি দাম পাওয়ার জন্য পণ্য সংরক্ষণ করতে পারে না। গুদামের অভাবে প্রায় সব কৃষকই শস্য কাটার সময় পণ্য বিক্রয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষিজাতপণ্যের দাম অনেক কমে যায়।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'X' ও 'Y' দু'টি দেশ। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'X' দেশটির আবহাওয়া অনুকূল হলেও 'Y' দেশটি সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। নিচের ছকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উভয় দেশের জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতের অবদান তুলে ধরা হলো—

কৃষি উপ-খাতের নাম	'X' দেশ (%)	'Y' দেশ (%)
১. শস্য ও শাকসবজি	১২.০০	৮.৫০
২. পশু সম্পদ	৮.০০	৪.০০
৩. বনজ সম্পদ	৪.০০	২.৫০
৪. মৎস্য সম্পদ	৫.০০	৩.০০

[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কি কল্যাণকর? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের ক্ষেত্রে জিডিপিতে কৃষি উপ-খাতসমূহের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি 'Y' দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতগুলোতে উল্লিখিত অবদানের ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে তাকে কৃষিজোত বলে।

খ একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্য চাষ করলে একটি দেশের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্যের চাহিদা পূরণ হয়।

ধান, গম, ভুট্টা, আলু, সবজি ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে উৎপাদন করলে সামগ্রিকভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ে। বিভিন্ন শস্য চাষের ফলে সারাবছর ধরে কৃষিকাজ চলে বলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়ে। কোনো কারণে একটি শস্যের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য শস্য দ্বারা তা অনেকটাই পূরণ করে নেওয়া যায় বলে কৃষিতে ঝুঁকির মাত্রা কমে। সুতরাং বলা যায়, একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা কল্যাণকর।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'X' দেশের জিডিপিতে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান নিচে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

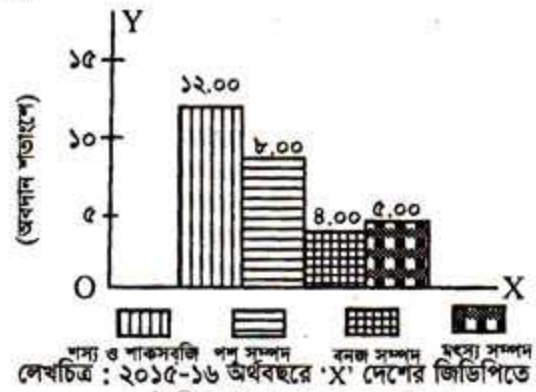

লেখচিত্র : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'X' দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতগুলোর শতকরা অবদান

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'X' দেশটির আবহাওয়া অনুকূল হলেও 'Y' দেশটি সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এ কারণে দেশটির জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের অবদান 'Y' দেশটির তুলনায় অনেক কম হয়। 'Y' দেশের এরূপ অবস্থার জন্য মূলত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দায়ী।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র উপকূলবর্তী 'Y' দেশটিতে প্রায় প্রতিবছরই ঝড়, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেবে। এর ফলে একদিকে কৃষিকাজ দারুণভাবে ব্যাহত হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদনযোগ্য ফসলের এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হবে। বর্ষাকালে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করবে। ফলে নদীর পাশের অনেক জায়গার মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়বে ও চাষবাসের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়বে। গড় বৃষ্টিপাত বাড়ায় জলাবদ্ধতা বাড়বে এবং অল্প অল্প করে জমি চাষের আওতার বাইরে চলে যাবে। এসবের ফলে কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত হলে শস্য ও শাক-সবজির উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অনেক কমে যাবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে 'Y' দেশটির প্রাণিজগতের স্বাভাবিক প্রজনন ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। ফলে পশু সম্পদের অব্যাহত বৃদ্ধি বিঘ্নিত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দেশটির উদ্ভিদ ও বনাঞ্চলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ক্ষুণ্ন করবে; যার ফলে বনজ সম্পদ আহরণের পরিমাণ কমে যাবে। সর্বোপরি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি 'Y' দেশের বড় বড় নদীতে উজান থেকে পানি প্রবাহ কমে গেলে অনেক নদী-নালা শুকিয়ে যাবে; ফলে মাছ চাষ ব্যাহত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও প্রকোপ বৃদ্ধি করলে অশান্ত সমুদ্র জেলেদের জীবিকার ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে।

সুতরাং বলা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি 'Y' দেশটির জিডিপিতে কৃষির উপখাতগুলোর উল্লিখিত অবদানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ রাজারামপুর গ্রামে বর্গাচাষি আনু মিঞা অন্যের ৫ বিঘা জমি চাষ করেন। আবাদ মৌসুমে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচের ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রাম্য মহাজনের নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে আনু মিঞা স্থানীয় ব্যাংকে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেন, কিন্তু ঋণদান পদ্ধতির নানা জটিলতার কারণে ঋণ গ্রহণ করতে পারেননি। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জীবননির্বাহী খামার কাকে বলে? ১

খ. 'প্রকৃতিনির্ভর কৃষি' বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের একটি বড় সমস্যা— ব্যাখ্যা করো। ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের আনু মিঞা যে উৎস থেকে আবাদ মৌসুমে ঋণ গ্রহণ করেছে, তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আনু মিঞার মতো কৃষকদের সমস্যা লাঘবের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি কি যথেষ্ট? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খামারে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

খ বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। এখানে বৃষ্টিপাত নিয়মিত, পর্যাপ্ত ও সময়মতো হলে কৃষিকাজ সফলতার সাথে পরিচালনা করা যায়; অন্যথায় কৃষি উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায় সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, নদীতে লোনা পানির প্রবেশ ইত্যাদি সমস্যাও দেখা দিচ্ছে, যা কৃষি উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশে প্রকৃতিনির্ভরতা কৃষি উন্নয়নের একটি বড় সমস্যা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনু মিঞা যে উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তা কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে পরিচিত।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার, ধনী কৃষক, দালাল, বেপারি ও প্রতিবেশীরা হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বিভিন্ন উৎস। ঋণের এ উৎসগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ-উৎসগুলোর মতো নিয়মতান্ত্রিক এবং সরকারি বিধি-বিধানের অধীন নয়। এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন-কানুন ও শর্তের বাইরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজস্ব নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়। ঋণের এসব উৎস এককথায় অসংগঠিত, অনিশ্চিত এবং শোষণমূলক। আনু মিঞাদের মতো কৃষক এরকম উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে প্রায়ই প্রতারিত হন; এমনকি কখনো কখনো নিঃস্বও হয়ে পড়েন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাজারামপুর গ্রামের বর্গাচাষি আনু মিঞা অন্যের ৫ বিঘা জমি চাষ করেন। তিনি একজন দরিদ্র কৃষক হওয়ায় প্রয়োজনীয় কৃষি-উপকরণসমূহ ক্রয় এবং কৃষিকাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ইতিপূর্বে স্বল্প সুদের হারে প্রয়োজনমাফিক ঋণ প্রাপ্তির জন্য তিনি স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখায় যান। কিন্তু সেখানে ব্যাংক ঋণ প্রদান পদ্ধতি জটিল, সময়ক্ষেপণকারী ও হয়রানিমূলক হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়েই কৃষিকাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য আবাদ মৌসুমে গ্রাম্য মহাজনের শরণাপন্ন হন। তার কাছ থেকে অত্যন্ত কঠিন শর্তে ও চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। যা কৃষি ঋণের অপাতিষ্ঠানিক উৎস।

ঘ বাংলাদেশে আনু মিঞাদের মতো দরিদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ সমস্যা লাঘবের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত ঋণ-কর্মসূচি নিচে মূল্যায়ন করা হলো:

ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো ঋণগ্রহণকারী কৃষকদেরকে যাতে অযথা হয়রানি কিংবা শোষণ করতে না পারে সেজন্য সরকার একটি জাতীয় ঋণ সালিশ বোর্ড গঠন করেছে। এ বোর্ড ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে আপোশ-মীমাংসা করে।

কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে মাঝারি সুদের হারে কৃষকদেরকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে সরকার ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিআরডিবি, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এবং বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করছে। সরকার কৃষিঋণ বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

তাছাড়া, সকল ব্যাংকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিঋণের পরিবেশ ও আওতা বাড়ানো এবং পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেছে।

সুতরাং বলা যায়, আনু মিঞাদের মতো কৃষকদের সমস্যা লাঘবের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি আপাতত যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২ রাজু শিক্ষিত চাষি। পূর্বে তার জমি থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন হতো না। কিন্তু বর্তমানে রাজু ওই জমিতে সারা বছরই বিভিন্ন শস্য ও সবজি উৎপাদন করেন। এ ছাড়া তিনি উন্নত যন্ত্রপাতি, বীজ এবং তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছেন। তাই আরো ১ বিঘা জমি ভাড়া নিয়ে ফসল, শস্য ও সবজি চাষের পরিধি বাড়াবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষি কী? ১

খ. কৃষির উপখাতগুলো কী কী? ২

গ. রাজুর একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষাবাদ কোন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্দেশ করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজুর গৃহীত পদ্ধতিসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফসল, বনায়ন, পশুপাখি, মাছ চাষ করতে মাটির জৈবিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে কৃষি বলা হয়।

খ বাংলাদেশের কৃষিখাত চারটি উপখাতে বিভক্ত। যথা: ১. শস্য ও শাকসবজি খাত; ২. পশু সম্পদ; ৩. বনজ সম্পদ এবং ৪. মৎস্য সম্পদ।

বিভিন্ন প্রকার শস্য ও শাকসবজি নিয়ে কৃষির শস্য ও শাকসবজি উপখাতটি গঠিত। এটি কৃষির বৃহত্তম উপখাত। গৃহে ও খামারে পালিত নানা জাতীয় পশু-পাখি নিয়েই বাংলাদেশ পশু সম্পদ উপখাতটি গঠিত। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি এই উপখাতের অন্তর্ভুক্ত। বাঁশ, কাঠ, বেত, মোম, মধু, রাবার, শণ ইত্যাদি নিয়ে বনজ সম্পদ উপখাত এবং নদ-নদী, খাল-বিল, সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য নিয়ে মৎস্য সম্পদ উপখাত গঠিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজুর একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

একটি খামার বা একই জমিতে বছরে একটি শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন করার পদ্ধতিকে বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ। এ পদ্ধতিতে বছরের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া, মাটির গুণগত অবস্থা, সেচ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ফসল চাষাবাদ করা হয়। এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাজু একই জমিতে সারা বছর বিভিন্ন শস্য ও সবজি উৎপাদন করে। অর্থাৎ সে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শুধু একটি ফসল উৎপাদন না করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল বা শস্য চাষাবাদ করে। যা শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। কাজেই বলা যায়, রাজুর একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন শস্য বহুমুখীকরণকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজুর গৃহীত পদ্ধতিগুলো উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কৃষি উৎপাদনে শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে (ঋতুভেদে) বিভিন্ন শস্য ও সবজি চাষাবাদ করলে মাটির উপাদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও মাটির গুণাগুণ ঠিক থাকে। এতে উৎপাদন বেশি হয়। এর ফলশ্রুতিতে কৃষকের মুনাফা বেশি তথা দেশের GDP বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষিত রাজু তার নির্দিষ্ট জমিতে একাধিক শস্য ও সবজি উৎপাদন করে এবং তার উৎপাদনে উন্নত যন্ত্রপাতি, বীজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে উৎপাদন অনেক বেশি হয়েছে। তাই সে আরো ১ বিঘা জমি ভাড়া নিয়ে ফসল উৎপাদনের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবার উন্নত কৃষি প্রযুক্তি যেমন ট্রাক্টর, সেচ পাম্প, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করলেও উৎপাদন বাড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক, কৃষক রাজুর মতো উন্নত বীজ, জৈব সার, ICT ও শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে। এর ফলে সাধারণ কৃষক ছাড়াও অনেক শিক্ষিত বেকার কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এতে সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি এবং খাদ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। কাজেই বলা যায়, রাজুর গৃহীত পদ্ধতিগুলোর কল্যাণে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ 'সিডর'-এর কারণে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরাসহ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয় এবং জলাবদ্ধতাসহ লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। তাই বিশেষজ্ঞগণ লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। যার সাহায্যে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ উন্মুক্ত হয়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কৃষিপণ্য বিপণন কী? ১
খ. কৃষি ঋণের উৎসগুলো কী কী? ২
গ. অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও কৃষি প্রযুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিদ্যমান সংকট উত্তরণে তোমার সুপারিশ প্রদান করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিপণ্যের বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়।

খ কৃষি ঋণের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস এবং ২. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।
কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো হলো—১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব; ২. গ্রাম্য মহাজন; ৩. গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার; ৪. ফড়িয়া ও বেপারি; ৫. গ্রাম্য সম্পদশালী ব্যক্তি। আর প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো হলো— ১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক; ২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক; ৩. বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক; ৪. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড; ৫. ভূমি বন্ধকি ব্যাংক; ৬. গ্রামীণ ব্যাংক; ৭. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো।
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় প্লাবিত নিম্নাঞ্চলে লবণাক্ততার হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উত্তরাঞ্চলে খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে।
উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এর কারণে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরাসহ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয় এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ওই অঞ্চলে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনে বাংলাদেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ঘ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট উত্তরণের উপায়সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।
কৃষি প্রযুক্তি ও ICT ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহনীয় বীজ উদ্ভাবন করতে হবে। এর ফলে লবণাক্ত পানির দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে লম্বা জাতের ধান চাষাবাদ করতে হবে। আবার, খরায় উদ্ভিদের দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। কিছু জাতের উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে বিষাক্ততার মাত্রা কমিয়ে খরা সহনশীল করে তোলে। এ সকল জাতের উদ্ভিদ খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদ করা যেতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে সৃষ্ট জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলোতে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে পানিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বাতাসে কার্বন ও কার্বনজাত বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের বৃদ্ধি। তাই এই সকল ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য সরকারকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। কারণ, গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করে। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে বিদ্যমান পরিবেশ দূষণজনিত সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আব্দুর রহিম ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। পৈতৃক ২ বিঘা জমি, বাবার ঋণ এবং মা ও কয়েকজন ভাইবোন নিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। কৃষিকাজে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য প্রায়ই তাকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। বোনের বিয়ের জন্য তাকে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. জীবননির্বাহী খামার বলতে কী বোঝ? ১
খ. কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সমস্যা লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে আব্দুর রহিম যে ঋণগুলো নিয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আব্দুর রহিমের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে যেসব কৃষি ঋণ সাধারণত গ্রহণ করে— সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খামারে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

খ বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান, যার মধ্যে দুটি প্রধান সমস্যা নিম্নরূপ:

১. **পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব:** বাংলাদেশে নিম্নমানের বীজ, শস্যোৎপাদনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্যরোগ, পণ্য সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিম্ন হয়। তাছাড়া, পণ্যের সুষ্ঠু শ্রেণিবিভাগ, মান নির্ধারণ ও শনাক্তকরণের অভাবেও কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।
২. **মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ:** এদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, আড়তদার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী অবস্থান করে। এরা কৃষকদের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে কম দামে পণ্য ক্রয় করে। এজন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদনের উপযুক্ত দাম পায় না।

গ দরিদ্র কৃষক আব্দুর রহিম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে ঋণ নিয়েছে। নিচে উদ্দীপকের ভিত্তিতে তার নেয়া ঋণগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **পৈতৃক ঋণ:** আব্দুর রহিমের বাবা একসময় জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়; কিন্তু পরে আর্থিক দুরবস্থার কারণে জীবদ্দশায় আর পরিশোধ করে যেতে পারেনি। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে জমিজমার মালিক হওয়ার সাথে সাথে তার ওপর পিতার নেয়া ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্বও বর্তায়। জীবনের শুরুতে তাই ঋণ না নেয়া সত্ত্বেও সে ঋণজালে আবদ্ধ হয়।
২. **কৃষি উপকরণসমূহ ক্রয়ের জন্য ঋণ:** আব্দুর রহিম একজন দরিদ্র কৃষক। সে তার সীমিত জমিতে যা উৎপাদন করে তা দিয়ে কোনো রকমে পরিবারের ভরণপোষণ করে; ফসলের মৌসুম শেষে কৃষিকাজে বিনিয়োগ করার মতো কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ তার হাতে থাকে না। তাই কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কেনার নিমিত্তে তাকে ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়।
৩. **সামাজিকতা পালনের জন্য ঋণ:** কৃষিকাজের জন্য ঋণ নেয়া ছাড়াও আব্দুর রহিমকে অন্য কাজের জন্য ঋণ নিতে হয়। আর তা হলো— বোনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন। বোনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব; এর জন্য কিছু খরচ করতেই হয়। হাতে নগদ টাকা না থাকায় বোনের বিয়ের ব্যয় মেটানোর জন্যও আব্দুর রহিমকে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়।

এভাবে দেখা যায়, কৃষক আব্দুর রহিম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়েছে।

ঘ আব্দুর রহিমের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে। নিচে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **স্বল্পমেয়াদি ঋণ:** স্বল্পমেয়াদি ঋণ সাধারণত ছয় মাস থেকে এক বছরের জন্য প্রয়োজন হয়। জমির খাজনা পরিশোধ, বীজ ও সার ক্রয় প্রভৃতির জন্য কৃষকের এ ধরনের ঋণের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও গরু, ছাগল পালন, মুরগি ও মাছের খামার ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের জন্য কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে। কখনো কখনো কৃষক গৃহীত

https://teachingbd24.com

কৃষিঋণ কৃষিকাজে ব্যয় করার পরিবর্তে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে। সাধারণত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য এ ধরনের ঋণ ব্যয় করা হয়। অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়া যায় না বলে কৃষককে এ ঋণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের দিকে হাত বাড়াতে হয়। ফলে এ ঋণের সুদের হারও খুব বেশি হয়। কখনো কখনো কৃষক ভোগ ব্যয় নির্বাহের জন্যও স্বল্প মেয়াদে ঋণ নেয়।

২. **মধ্যম মেয়াদি ঋণ:** এ ধরনের ঋণ এক বছর থেকে পাঁচ বছরের জন্য প্রয়োজন হয়। কৃষি-যন্ত্রপাতি যেমন— শ্যালো পাম্প মেশিন, স্প্রেয়ার, পাওয়ার টিলার, গরু-মহিষ ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য কৃষক মধ্যমমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। মধ্যম মেয়াদি ঋণের অর্থ ব্যয় করে তা থেকে প্রতিদান পেতে সময় লাগে। এ জন্য কৃষককে এ ঋণের বোঝা কয়েক বছর ধরেই টানতে হয়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি ঋণ:** দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সাধারণত পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। সাধারণত অবস্থাপন্ন কৃষকরাই এ ধরনের ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কৃষিজমির স্থায়ী উন্নতি বিধান— যেমন, জমি ভরাটকরণ, জমি সমতলকরণ, জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনে কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে।

এভাবে আব্দুর রহিমের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শিমুল সিলেট থেকে রংপুরে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। সে দেখে গতবছর যে সমস্ত জমিতে তামাক আবাদ হয়েছিল, সেখানকার অনেক জমিতে এবার ধান ও ভুট্টা আবাদ হয়েছে। বিষয়টি তাকে খুব আনন্দ দেয়। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. চিংড়িকে সাদা সোনা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শস্য বহুমুখীকরণের প্রভাব আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিমুলের আনন্দ লাভের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কৃষকের অধীনে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমিকে কৃষি খামার বলে।

খ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলোর নিম্নভূমিতে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। পূর্বে চিংড়ি চাষ কেবল জেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তা অনেকের কাছেই আত্মকর্মসংস্থান, অর্থোপার্জন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি সুন্দর উপায় বলে বিবেচিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি খাদ্যপণ্য হিসেবে বেচা-কেনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি হিমায়িত খাদ্য হিসেবে রপ্তানি করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই চিংড়ি থেকে অর্থাগম হয়। চিংড়ি সাদা; তার মাধ্যমে এ অর্থাগম হয় বলে চিংড়িকে সাদা সোনা বলা হয়।

গ প্রদত্ত উদ্দীপকে তামাক চাষের পরিবর্তে ধান ও ভুট্টা আবাদের মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে শস্য বহুমুখীকরণের প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো—

১. বিভিন্ন শস্য জমি থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান আহরণ করে। তাই শস্য বহুমুখীকরণ করলে জমিস্থিত উপাদানের সদ্ব্যবহার ঘটে, যা জমির সামগ্রিক উর্বরতা অক্ষুণ্ন রাখে। কাজেই পরিকল্পিতভাবে একাধিক শস্য উৎপাদন করে জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করা যাবে।

২. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হলে কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

৩. এ ধরনের চাষাবাদের ফলে কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে কৃষক অন্য ফসল দ্বারা তা অনেকটাই পূরণ করতে পারবে। ফলে কৃষিতে ঝুঁকির মাত্রা কমবে।

৪. এ ধরনের ফসল উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করলে কৃষকরা সারা বছর ধরে কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকতে পারবে। ফলে তাদের শ্রম ও সময়ের অপচয় হবে না।

৫. একের পর এক শস্য উৎপাদিত হলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়বে।

সুতরাং বলা যায়, শস্য বহুমুখীকরণে কৃষিক্ষেত্রে অনেক অনুকূল প্রভাব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, শিমুল সিলেটে থাকলেও প্রতি বছর রংপুরে তার দাদার বাড়িতে বেড়াতে যায়। এ বছর সেখানে যাওয়ার সময় সে লক্ষ করে রাস্তার ধারের যে জমিগুলোতে গত বছর তামাকের চাষ হয়েছিল, এ বছর সেখানে ধান ও ভুট্টার চাষ হয়েছে। চাষের পরিবর্তনের এ বিষয়টি তাকে যথেষ্ট আনন্দিত করে তোলে। শিমুলের এ আনন্দ লাভের কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রথমত, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে কৃষিজমির পরিমাণ কম হওয়ায় সরকারের এ উদ্যোগ খুব একটা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এ অবস্থায় কৃষিজমিগুলোতে তামাক চাষের পরিবর্তে ধান ও ভুট্টার চাষ করলে খাদ্যোৎপাদনের জন্য কৃষিজমির বাড়তি চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ হবে। তখন অধিক ধান ও ভুট্টা চাষ হলে খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সম্ভাবনায় শিক্ষিত ছেলে শিমুল আনন্দিত।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সম্পূরক খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি আবশ্যক। ভুট্টা একটি সম্পূরক জাতীয় খাদ্য। তাই তামাক চাষের পরিবর্তে ভুট্টা চাষ হলে তা দেশে সম্পূরক খাদ্যের যোগান বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। এমনটি ভেবে শিমুল আনন্দিত।

তৃতীয়ত, আজকাল পৃথিবীব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান চলছে, যাতে বাংলাদেশও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তামাক একটি মাদক জাতীয় পণ্য। তামাক পাতা দিয়ে তৈরি বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, পান-মসলা প্রভৃতি নিয়মিত সেবন করলে মানুষ প্রাণঘাতী ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। তাই তামাক চাষের পরিবর্তে ধান ও ভুট্টা চাষ শিমুলকে আনন্দিত করে।

সুতরাং, উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন কারণেই শিমুল তামাক চাষের পরিবর্তে ধান ও ভুট্টা চাষ করায় আনন্দ বোধ করে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের কৃষি অনেকটাই প্রকৃতিনির্ভর। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, পানির স্তরের নিম্নমুখিতা, নদী-নালায় নাব্যতার অভাব ইত্যাদি কারণে এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প, বনায়ন প্রকল্পের ন্যায় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কাকে বলে? ১

খ. কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কম পায় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কৃষিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিবেশ দূষণে বিরূপ প্রভাব থেকে কৃষিকে রক্ষার জন্য উদ্দীপকের উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো কি যথেষ্ট? মতামতসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি খামারে একটিমাত্র শস্যের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে একাধিক শস্য উৎপাদন করাকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

খ কৃষকের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের আনুষ্ঠানিকতা বা জটিলতার কারণে কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কম পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল, সময়সাপেক্ষ ও হয়রানিমূলক। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প; সেগুলো শহরভিত্তিক হওয়ায় কৃষকরা সেখানে যেতে চায় না। দরিদ্র কৃষকরা যেহেতু জামানত দিতে পারে না, তাই প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণও পায় না। এসব কারণে আমাদের দরিদ্র কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কম পায়।

Teachingbd24.com

গ সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের জলবায়ু বিরূপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এর দরুন কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। দেশে এখন প্রায়ই অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি লেগেই আছে। এর ফলে কৃষি-উৎপাদন যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে ওঠায় ওই সব শস্যের চাষ ব্যাহত হচ্ছে যেগুলোর জন্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা প্রয়োজন। অন্যদিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ ব্যাহত হওয়ায় কৃষিকাজ ঠিকমতো পরিচালনা করা যাচ্ছে না। ফলে কৃষি উৎপাদন কমছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা আমাদের জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাতে আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে অনেক নদী শুকিয়ে গেছে; অন্যগুলোতে পানি প্রবাহ কমেছে। এর ফলে দেশের বিল ও হাওরগুলোতে পানির অভাব দেখা দিয়েছে এবং সেগুলো বছরের বেশিরভাগ সময় শুষ্ক থাকছে। এজন্য কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকটি পাঠ করে জানা যায়, পরিবেশ দূষণের কারণে কৃষি উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সেগুলো যথেষ্ট নয়। এজন্য নিম্নোক্ত আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত ও সচেতন করে তোলা।
- গবাদি পশুপালনের মধ্য দিয়ে অধিক গোবর সার সৃষ্টি ও তা ব্যবহার করতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা।
- গোবর সার, গো-মূত্র, ছাই ইত্যাদি দ্বারা জৈব কীটনাশক উৎপাদন।
- আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।
- গ্রামাঞ্চলে ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলোর পুনরুদ্ধার ও খনন।
- জলাবদ্ধতা দূর ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা।
- আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্যে উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল, লবণাক্ত মাটিতে চাষ করা যায় ও রোগ বালাই প্রতিরোধক এমন শস্যের জাত উদ্ভাবন এবং ভাসমান পদ্ধতিতে কচুরিপানার ওপর চাষ।
- ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, যেমন— বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ GDP-তে কৃষির উপখাতের অবদানের হার (%)

কৃষির উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
শস্য ও শাকসবজি	১০.০০	১১.০০	১১.৫০
মৎস্য সম্পদ	৩.০০	৪.০০	৬.০০

রফিক স্যার ছাত্রদের বললেন, উপরের টেবিলের দিকে তাকাও। এই তথ্য অনুযায়ী, আমাদের জাতীয় আয়ে কৃষির উপ-খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কারণ সরকার বর্তমানে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান, ঋণ বিতরণ সহজীকরণ, কৃষিজ উপকরণ সরবরাহসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। *[রা.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. উৎপাদনের উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে কৃষি খামারকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে GDP-তে শস্য ও মৎস্য খাতের অবদান দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে কৃষি খামারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

খ বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য তাই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য।

কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও রেলপথের সম্প্রসারণ করা দরকার। প্রতিটি জেলা শহরের সাথে গ্রাম অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হলে যোগান বৃদ্ধির দরুন দাম হ্রাস পাবে না। দ্রুত পচনশীল পণ্য পরিবহনের জন্য দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা করা হলে পণ্য পচে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তাই বলা যায়, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।

গ উদ্দীপকের আলোকে GDP-তে শস্য ও মৎস্য খাতের অবদান নিম্নে দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

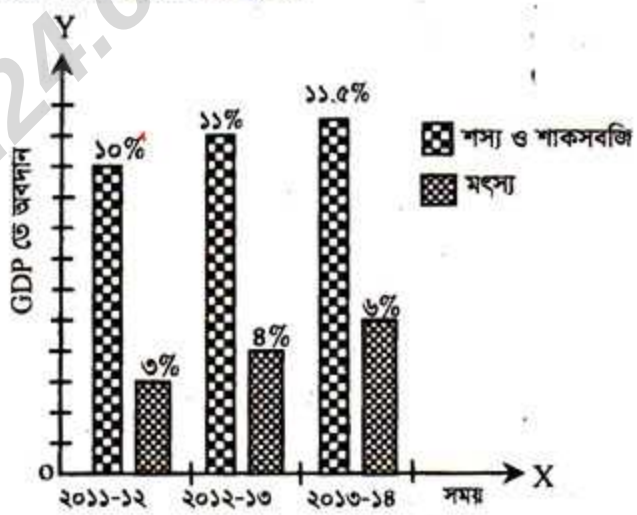

চিত্র: GDP-তে কৃষি উপখাতের অবদান

দণ্ডচিত্র হতে বোঝা যায়, কৃষির বিভিন্ন উপখাতে বিগত তিন বছরে প্রবৃদ্ধির হার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিতে বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে শস্য ও শাকসবজির অবদান বেশি হলেও সমন্বিত প্রবৃদ্ধিতে দেখা যায়, শস্য ও শাকসবজি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার খুব সামান্য এবং মৎস্য সম্পদ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে শস্য ও শাকসবজি কৃষির বৃহত্তম উপখাত।

ঘ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উদ্দীপকের আলোকে নিচে মূল্যায়ন করা হলো।

প্রথমত, বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র এবং তারা অনেকটা আত্মপোষণমূলক আয়স্তরে অবস্থান করে বিধায় কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষিঋণের গুরুত্ব অনেক বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষি উপকরণ বিতরণ যেমন- কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, উপকরণ সহজলভ্যকরণ, উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণসহ নানারূপ কর্মসূচি কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানসম্মত বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। অধিক হারে মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

https://teachingbd24.com

তৃতীয়ত, কৃষি তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিল। কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান, ঋণ বিতরণ সহজীকরণ, কৃষিজ উপকরণ দিয়ে কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব। এর সাথে আরো প্রয়োজন সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বীজ উৎপাদন ফসলের চারা বিতরণ, ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা।
কাজেই বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৮ দবির মিয়া একজন কৃষক। তিনি তাঁর কৃষি খামারে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উৎপাদন করেন এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। ফড়িয়াদের নিকট বিক্রি করেন বলে তিনি তার উৎপাদিত পণ্যের আশানুরূপ দাম পান না। দবিরের মামা ঢাকায় একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন। সবজি বিক্রির কথা বলতেই তিনি দবিরকে জানান ঢাকার সবজির বাজার দর গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি।
[চ.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১
খ. বাংলাদেশের কৃষি কি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দবির মিয়া কেন উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান না? ৩
ঘ. দবির মিয়ার মতো কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, কৌশল এবং যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, প্রতিকূল পরিবেশে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়, তাকে কৃষি প্রযুক্তি বলে।

খ কৃষি প্রজনন সম্বন্ধীয় কাজ হওয়ায় তা প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।
পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশের কৃষকরা চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ভালো ফসল হয়, কিন্তু যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে ভালো ফসল হয় না। ফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেকটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

গ দবির মিয়া তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণ গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাব, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার তথ্যের অভাব, সরকারি নীতি নির্ধারণের অভাব।
প্রথমত, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার সুসংগঠিত নয়। এক বাজারের সাথে আরেক বাজারের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। একেক বাজারে দ্রব্যের বিভিন্ন রকম দাম পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে দবির মিয়া ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।
দ্বিতীয়ত, যখন ফসল সংগ্রহ করা হয় তখন সাধারণত পণ্যের দাম কম থাকে। তাই ওই সময় ফসল বিক্রি না করে যদি গুদামে সংরক্ষণ করা যায়, যখন দ্রব্যের দাম বাড়বে তখন বিক্রি করতে পারলে ন্যায্যমূল্য পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের তেমন গুদামঘর তৈরি হয়নি। তাছাড়া অধিকাংশ ফসল পচনশীল, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশে দবির মিয়ার মতো কৃষকরা তাদের ফসলের গুণগত মান অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে না। আবার, কিছু পণ্য আছে যা শ্রেণিবিন্যাস করা জটিল। তাই গুণগত মানের দিক থেকে ভালো পণ্যও নিম্নমানের পণ্যের দামে বিক্রি করতে হয়।
চতুর্থত, বাংলাদেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা খুবই নিম্ন মানের। তাই দূরবর্তী স্থানে পণ্য বিক্রি করা ব্যয়বহুল, কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ। এজন্য দবির মিয়া তার উৎপাদিত শাকসবজি স্থানীয়ভাবে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

ঘ দবির মিয়ার মতো কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
প্রথমত, কৃষিপণ্যের মূল্য নিশ্চিত করতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জরুরি। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে কৃষকরা তাদের শস্য স্থানীয় বাজারে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এজন্য প্রয়োজন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। যা ব্যক্তি উদ্যোগে সম্ভব নয়, দরকার সরকারি উদ্যোগ।
দ্বিতীয়ত, কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে ফসল উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশ মূল্যই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। বিভিন্ন দালাল, মজুতদার, আড়তদার কৃষিপণ্য বাজার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা নানাভাবে বিভিন্ন অজুহাতে কৃষকদের ঠকায়। এ সকল সমস্যা দূরীকরণে কৃষিপণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরি।
তৃতীয়ত, বাফার স্টকের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ঊর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি রোধ করা যায়। যখন কৃষিতে বাম্পার ফলন হয় তখন সরকার কৃষিপণ্য ক্রয় করে, সংরক্ষণ করে। ফলে কৃষিপণ্যের দামের নিম্নগতি রোধ হয়। আবার যখন কৃষি উৎপাদন কম হয়, তখন বাফার স্টকের পণ্য বাজারে ছাড়লে পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ পায়।
চতুর্থত, যখন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন দাম দ্রুত কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও উঠাতে পারে না। এই সময় সরকার কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে।
পঞ্চমত, কিছু কৃষিশস্য সহজেই পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, পান, আদা ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগে যদি এ সকল ফসল সংরক্ষণ করা যায় তবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে।
উপর্যুক্ত ব্যবস্থাসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে দবির মিয়ার মতো বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জাফর কৃষিকাজ করেন। এ বছর তিনি চড়া সুদে ঋণ নিয়ে আলু উৎপাদন করলেন। ফলনও খুব ভালো হলো। কিন্তু বাজারে আলুর দাম অত্যন্ত কম। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাবে জেলা শহরের বাজারে নিতে পারেননি। এমতাবস্থায় স্থানীয় আড়তদারদের কাছে সস্তা দামে বিক্রি করতে হয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ উঠানোই কঠিন হয়ে পড়েছে।
[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষি খামার কাকে বলে? ১
খ. চিংড়িকে সাদা সোনা বলা হয় কেন? ২
গ. জাফর আলুর ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকা আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যবহার করে থাকে কৃষি খামার বলে।

খ সৃজনশীল ১৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ সুজন সাহেব একজন কৃষক। তিনি তার জমিতে এ বছর শুধু আলু চাষ করেছেন। আলুর ফলন খুবই ভালো হয়েছে। কিন্তু তার মন খুবই খারাপ। কারণ আলুর দাম এতই কম যে তার খরচ উঠবে না। কিছুদিন পর আলু বিক্রি করতে পারলে তার লাভ হবে বলে তিনি মনে করছেন। তিনি বেগুন চাষ না করে আলু চাষ করার জন্য আফসোস করছেন। কারণ এ বছর বেগুনের দাম বেশি।
[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. GDP-তে কৃষির কোন উপখাতের অবদান বেশি? ১
খ. কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজন সাহেবের মন খারাপ হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুজন সাহেব কীভাবে লাভবান হতে পারতেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

https://teachingbd24.com

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক GDP-তে কৃষির শস্য ও শাকসবজি উপখাতের অবদান বেশি।

খ কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার হাতে পৌঁছায় সে প্রক্রিয়াকে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ বলে।

উৎপাদিত দ্রব্য চূড়ান্ত ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সকল ধাপ অতিক্রম করতে হয় তাহলো– ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ, শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, প্যাকেটকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিজ্ঞাপন, ঝুঁকি বহন, তথ্য সংগ্রহকরণ, বণ্টন, বিক্রয় ইত্যাদি। আর এ সকল কাজকে সম্মিলিতভাবে কৃষিপণ্যের বিপণন বলে।

গ সৃজনশীল ১৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ রহমান সাহেব 'X' দেশে বাস করেন। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান এবং পরিবেশ দূষণের কারণে দেশটিতে ঘূর্ণিঝড়, ঘন ঘন বন্যা, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের নিম্নমুখিতা পরিলক্ষিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দেশটির কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার উন্নত বীজ, জৈবপ্রযুক্তি, কৃষি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. উৎপাদন পদ্ধতি এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষেত্রে জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রহমান সাহেবের দেশটির কৃষি উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' দেশটির কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি কৃষি ফার্মের অধীনে যে পরিমাণ চাষযোগ্য জমি থাকে তাকে কৃষিজোত বলে।

খ উৎপাদন পদ্ধতি এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষেত্রে জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার একই নয়।

কারণ জীবননির্বাহী খামারের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়, কিন্তু বাণিজ্যিক খামারে মুনাফার উদ্দেশ্যে আধুনিক ও লাভজনক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। আবার, কৃষিপণ্য পচনশীল হওয়ায় বাণিজ্যিক খামারে ঝুঁকি বেশি, জীবননির্বাহী খামারে ঝুঁকি কম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রহমান সাহেবের 'X' দেশটির অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। তবে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান এবং পরিবেশ দূষণের কারণে দেশটির কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। নিচে কৃষি উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমূহ ব্যাখ্যা করা হলো—

'X' দেশটি ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে ঘূর্ণিঝড়, ঘন ঘন বন্যা, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এতে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যেমন– ঘূর্ণিঝড়ে ঘরবাড়ি, ফসল, গাছপালা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বন্যায় ফসল পানিতে ডুবে গিয়ে নষ্ট হয়। আবার, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় সেচব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেয়, যা কৃষি উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

'X' দেশটির কৃষি উন্নয়ন মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধক। কৃষি উন্নয়ন পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের কারণে কৃষি উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষ নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলছে। এতে দেশটি বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই প্রয়োজনের সময় বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। আবার, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় নদী ভাঙন ও নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। যা কৃষি সেচব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেয় এবং কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ফসল উৎপাদনে ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং, রহমান সাহেবের 'X' দেশটিতে উপর্যুক্ত সমস্যা কৃষি উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটির কৃষি উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে এগুলো মূল্যায়ন করা হলো—,

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে সরকার কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের বীজ ও সার সরবরাহ করছে। তাছাড়া এসব উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সার কৃষি উৎপাদনে ব্যবহার করায় কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

'X' দেশটির কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার কৃষি উৎপাদনে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করেছে। এতে কৃষকরা সরকারের পক্ষ থেকে জৈবপ্রযুক্তি ও উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা ব্যবহারে উৎসাহী ও দক্ষ হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি করেছে। সরকার বিভিন্ন এনজিও এবং উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে কৃষকদেরকে কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করছে। এতে কৃষক আগে থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য পেয়ে থাকে। যা কৃষিক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করে। তাছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে মহাজনের দৌরাত্ম্য হ্রাস, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপণন সহজতর হয়, যা কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, 'X' দেশটির কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২২ আমেরিকা প্রবাসী দুই বন্ধু মুঈন ও রুহান দুটি ভিন্ন দেশের নাগরিক। মুঈনের দেশটি সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। নিচের ছকে (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরে উভয়ের দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের অবদান তুলে ধরা হলো:

কৃষি উপখাতের নাম	রুহানের দেশ (শতকরা)	মুঈনের দেশ (শতকরা)
১. শস্য ও শাকসবজি	১২.০০	৮.৫০
২. পশু সম্পদ	৮.০০	৪.০০
৩. বনজ সম্পদ	৪.০০	২.৫০
৪. মৎস্য সম্পদ	৫.০০	৩.০০

[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. জীবননির্বাহী কৃষি খামার ও বাণিজ্যিক কৃষি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য কী একই? – ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রুহানের দেশের ক্ষেত্রে জিডিপিতে কৃষি উপ-খাতসমূহের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মুঈনের দেশের জিডিপিতে কৃষি উপ-খাতগুলোর উল্লিখিত অবদানের ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক খামারে একটিমাত্র ফসলের পরিবর্তে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ।

খ জীবননির্বাহী কৃষি ও বাণিজ্যিক কৃষি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য এক নয়। কারণ জীবননির্বাহী কৃষি খামারে কৃষক নিজ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন করে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক কৃষি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন।

তাই জীবননির্বাহী কৃষি খামার ও বাণিজ্যিক কৃষি খামারের মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় পার্থক্য লক্ষ করা যায় তথা উক্ত দুটি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

https://teachingbd24.com

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে রুহানের দেশের ক্ষেত্রে জিডিপিতে কৃষি উপখাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

কৃষি উপখাতের নাম	রুহানের দেশে GDP-তে অবদান (শতকরা)
শস্য ও শাকসবজি	১২.০০
পশু সম্পদ	৮.০০
বনজ সম্পদ	৪.০০
মৎস্য সম্পদ	৫.০০

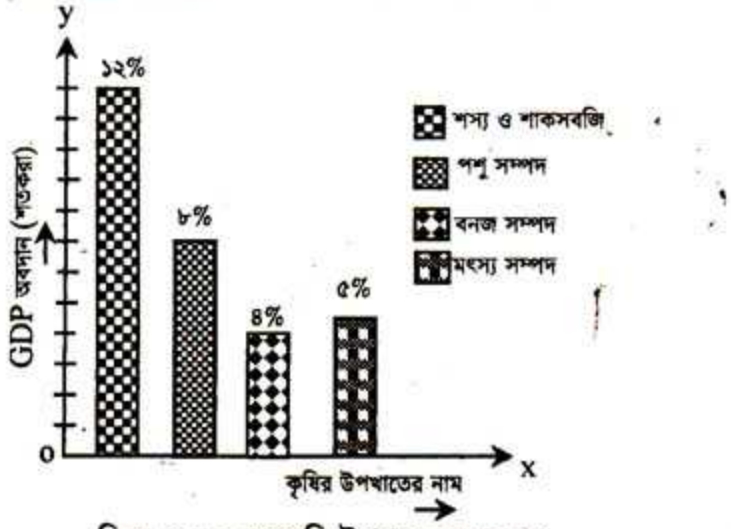

চিত্র: GDP-তে কৃষি উপখাতের অবদান

ঘ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কোন দেশে জিডিপিতে কৃষির অবদানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মুঈনের দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের উল্লিখিত অবদান ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা উল্লেখ করা হলো—

IPCC-এর সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী বর্তমান শতকেই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশের নিচু ও উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবে। এতে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তন বা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে নদ-নদীর পানির পরিমাণ কমে গেলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাবে। ফলে মুঈনের দেশের জিডিপিতে মৎস্য সম্পদের অবদান হ্রাস পাবে। আবার, কম বৃষ্টিপাতের কারণে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

IPCC-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে ধান উৎপাদন ১০% হ্রাস পাবে। শুষ্ক মৌসুমে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিসহ পশু সম্পদের উৎপাদন ব্যাপক মাত্রায় হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুবৈচিত্র্যে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। মুঈনের দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দেশটির কৃষি উপখাতের উৎপাদন হ্রাস পাবে। এতে GDP-তে কৃষি উপখাতগুলোর অবদান কমবে।

সুতরাং, বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি মুঈনের দেশের জিডিপিতে উল্লিখিত কৃষি উপখাতগুলোর অবদানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাবুল লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে এসে একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লিচু বাগান তৈরি করল। লিচু গাছ ছোট, ফলন অধিক এবং সুস্বাদু। লিচু বাগান পরিচর্যা এবং বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বাবুল তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেয়। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষির প্রধান উপখাত কয়টি? ১

খ. কৃষি খামার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বাবুল লিচু চাষের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাবুলের বাগান পরিচর্যা ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কৃষিখাতে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে— তোমার মতামত দাও। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষির প্রধান উপখাত চারটি।

খ একটি কৃষি ফার্মের অধীনে চাষযোগ্য জমির পরিমাণকে কৃষি জোত বলে। আর কৃষি জোতের যে অংশটুকু ফসল ফলানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে কৃষি খামার বলে। এ রকম জোত বড়, মাঝারি কিংবা ক্ষুদ্র হতে পারে। কৃষি খামারের নির্দিষ্ট নাম ও আয়তন আছে। যেমন– মৎস্য খামার, পশুপালন খামার ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বাবুল লিচু চাষের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে তা হলো জৈবপ্রযুক্তি। নিচে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, জলবায়ুর পরিবর্তন, উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রভৃতির কারণে দেশসমূহে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং এর ফলে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধী খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব রয়েছে। উচ্চ ফলন বীজ উদ্ভাবনে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রতিটি চাষের মাধ্যমে ৩০-৪০% ফলন অধিক বাড়ানো যায়।

জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে জিংকসমৃদ্ধ ধান, লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এভাবে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূরীকরণ এবং মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। জৈবপ্রযুক্তি পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ কোষ, টিস্যু কালচার, রোগ-পতঙ্গবিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন, DNA পরিবর্তন ইত্যাদি করা হয়। DNA পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাদের পরিবর্তন, রোগ প্রতিরোধী শস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে লিচু চাষের ক্ষেত্রে বাবুল কর্তৃক ব্যবহৃত জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকে বাবুল তার লিচু বাগান পরিচর্যা ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক কৃষি সম্পদের কাম্য ব্যবহার, কৃষির তথ্য প্রাপ্তি, কৃষি বিপণন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। যা অধিক পরিমাণে কৃষিপণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে।

মৌসুমভিত্তিক ফলের ধারণা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা যায়। মৌসুমভিত্তিক ফল যেমন- লিচু, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির পাকার ও বাজারজাতকরণের সময় সম্পর্কে কৃষকরা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সহজে জানতে পারে। যার ফলে সময় ও ফসল দুটোই কম নষ্ট হয়, যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কৃষি উৎপাদন সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী বীজ, সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে সময়মতো সব ধরনের তথ্য পেতে আইসিটির ব্যবহার আবশ্যক। এসব তথ্য সময়মতো পেলে উৎপাদন বৃদ্ধিও সর্বোচ্চ করা যায়। আবার, কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি, কৃষির উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক উদ্ভাবিত হচ্ছে। আর আইসিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক এ সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে, যা কৃষকের অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে।

বাজার থেকে কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজেই ক্রয় করা যায়। কিন্তু সেসব উপকরণ কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা সহজেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে জানা যায়। উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি জানা থাকলে কৃষক সহজেই তার উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে পারে, যা কৃষিখাতে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জলিল একজন দরিদ্র ও অল্প শিক্ষিত কৃষক। তিনি তার উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। ফসলের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে অজ্ঞতা, বাজার সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্য, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণের অভাবের কারণে তিনি ফসলের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হন। এছাড়া তিনি কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি, উফশী বীজ এবং প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞ। যদিও তার বন্ধু মাহতাব তাকে জানান কৃষিতে ব্যবহৃত এই উফশী বীজ ICT জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষিজোত কী? ১

https://teachingbd24.com

খ. একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কি কল্যাণকর? ২

গ. কৃষক জলিল তার উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে কেন লাভবান হতে পারছেন না? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি কৃষি ফার্মের অধীনে যে পরিমাণ চাষযোগ্য জমি থাকে তাকে কৃষিজোত বলে।

খ সৃজনশীল ১০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ কৃষক জলিল তার উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে লাভবান হতে না পারার কারণ হলো শিক্ষার অভাব, দরিদ্রতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

১. নিম্নমানের বীজ, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিম্ন হয়। তাছাড়া, পণ্যের সুষ্ঠু শ্রেণিবিভাগ, মান নির্ধারণ ও শনাক্তকরণের অভাবেও কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।

২. কৃষিপণ্যের দামের তথ্য রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেক কৃষক এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে এনে বেশি দামে বিক্রয় করতে পারছে না। বাড়িতে বা স্থানীয় বাজারেই কম দামে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য বিক্রি করে তার উপযুক্ত দাম থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য গুদামজাত করার সুযোগ নেই। এজন্য কৃষকরা ফসলের মৌসুমেই কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে পণ্য গুদামজাত ও সংরক্ষণ করে যে দাম পাওয়া যেত তা তারা পায় না।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষক জলিল কৃষিজাত পণ্যের বিপণনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাই তিনি তার উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে লাভবান হতে পারছেন না।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কৃষিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা মূলত কৃষিপ্রযুক্তি তথা উফশী বীজ উদ্ভাবন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

বন্যা, লবণাক্ততা, খরাপ্রবণ এলাকায় ধানের আবাদ সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে লবণাক্ততাসহিষ্ণু বিনা-৮, ব্রি-ধান-৪৭, ব্রি-৫৩ ও ব্রি-৫৪ জাতের ধানের বীজের আবাদ শুরু হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য অধিক পানিসহিষ্ণু ব্রি-৫১ এবং ব্রি-৫২ জাতের উন্নত বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিনা-৭ নামক ধান চাষের মাধ্যমে মজাপীড়িত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে মজা দূর করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, সোনালিকা, দোয়েল নামের উন্নত জাতের গম; মুগ, কান্তি, মুরাবিক নামের উন্নত জাতের ডাল এবং হিরা, মেরিন, ওরিগো নামের উন্নত জাতের আলু চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষিতে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রসারের ফলে সাধারণ কৃষি সমস্যা সমাধান, ফসলের রোগের আক্রমণ, কীটনাশক প্রয়োগ ও উদ্ভাবনী কৃষিপ্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষক অবগত হতে পেরেছে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি উপকরণ ব্যবহার বিধি, কৃষি উপকরণ সংরক্ষণ এবং মাটির গুণাগুণ ও রোগবালাই ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির মাধ্যমে জানা যায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈবপ্রযুক্তির সুফলস্বরূপ বায়োফার্মিং শস্য উৎপাদন করা যায় এবং এরূপ শস্য প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ ছাড়াও সংরক্ষণ করা যায়। এ শস্যের দাম কম, তাই দরিদ্র দেশের জনগণ এতে উপকৃত হয়। জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে জিংকসমৃদ্ধ ধান, লবণাক্ততাসহিষ্ণু এবং স্বল্প সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে কৃষিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেটি কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজের উদ্ভাবন ও ব্যবহার, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার এবং পরমার্শ ও জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাপক সফলতা এনে দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৫

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষিপণ্য বিপণন কাকে বলে? ১

খ. কৃষিতে ICT গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত 'ক' খামারের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উভয় খামারের উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও উপকরণের দক্ষ ব্যবহার বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিপণ্যের বিপণন হলো কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা।

খ কৃষকের জীবনযাত্রার মান ও কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষিতে ICT এর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, জুতসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে ICT-এর বিকল্প নেই তথ্যপ্রযুক্তির এই অপার সম্ভাবনা বাংলাদেশের কৃষিকেও করেছে সমৃদ্ধ যেমন- আবহাওয়ার পূর্বাভাস, উন্নত বীজ উদ্ভাবন, কৃষিকাজের সঠিক মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও গুদামজাতকরণে ICT গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'ক' খামারটি হলো জীবননির্বাহী খামার।

জীবন নির্বাহের জন্য কৃষক সনাতনী পদ্ধতিতে যে ভূমি খণ্ডে ফসল উৎপাদন করে, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে। এ ধরনের খামারে কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। এজন্য জীবননির্বাহী খামারে উৎপাদন দক্ষতা কম, মূলধন বিনিয়োগ কম, ঝুঁকির পরিমাণ কম এবং বহুবিধ ফসল উৎপাদিত হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' খামারটির কৃষি পণ্যের উৎপাদন অধিক মাত্রায় প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, এ ধরনের খামারে ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন ব্যবস্থা অসংগঠিত ও অদক্ষ হয়ে থাকে। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' খামারটি হলো জীবননির্বাহী খামার

ঘ উদ্দীপকের 'ক' খামার হলো জীবননির্বাহী খামার এবং 'খ' খামার হলো বাণিজ্যিক খামার। বাংলাদেশে জীবননির্বাহী খামার বেশি পরিলক্ষিত হলেও উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও উপকরণের দক্ষ ব্যবহার বাণিজ্যিক খামারে বেশি দেখা যায়।

সাধারণত মুনাফার উদ্দেশ্যে যে খামারে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে। জীবননির্বাহী খামারে ক্ষুদ্রায়তনে কৃষিপণ্য উৎপাদন পরিচালিত হলেও বাণিজ্যিক খামারে তা বৃহদায়তনে পরিচালিত হয়। এজন্য বাণিজ্যিক খামারে উপকরণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশে দু'ধরনের কৃষি খামার লক্ষ করা যায়। যথা- ১. জীবননির্বাহী খামার এবং ২. বাণিজ্যিক খামার। যা যথাক্রমে উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' খামার দ্বারা দেখানো হয়েছে। বাণিজ্যিক খামারে অধিক মূলধন বিনিয়োগ হয় বলে এখানে ঝুঁকির পরিমাণও বেশি। তবে বাণিজ্যিক খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও প্রকৃতির ওপর কম নির্ভরশীল হওয়ায় উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদনও বেশি হয়।

আবার, জীবননির্বাহী খামারের তুলনায় বাণিজ্যিক খামারে উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা অধিক পরিকল্পিত এবং অধিক দক্ষ পরিদর্শন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জীবননির্বাহী খামারের চেয়ে বাণিজ্যিক খামার তুলনামূলক বেশি কাম্য।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ প্রথম কৃষিতে দিন বদলের হাওয়া লেগেছে। ৮০ দশকে বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক অপেক্ষা কম জনসংখ্যার মধ্যেও খাদ্য সংকট ছিল। কিন্তু বর্তমানে কৃষি উপকরণ— ঋণ ও বীজ সহায়তা প্রদান, জিন ও এনজাইম প্রযুক্তির ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধী বীজ, B-carotene এবং জিংক সমৃদ্ধ ধান, স্বল্প সময়ের উচ্চ ফলনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ফলে কৃষিজমি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে দেশ। অবশ্য এক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং সুষম সার ব্যবহারের নিয়মাবলি কৃষক ঘরে বসেও অবগত হতে পারছে— এ এক দারুণ সাফল্য।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বন (Forest) কাকে বলে? ১

খ. মাশরুম কি ঔষধি সবজি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কী ধরনের গুরুত্ব তুমি খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কৃষির উন্নয়নের কী কী প্রভাব দৃশ্যমান হয়েছে, এসবের ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণভাবে যে বিশাল এলাকা গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং যেখানে বন্য পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীব প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে তাকে বন বলে।

খ মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি।

মাশরুম হলো এক প্রকার ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ। এটি প্রচুর ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার। যা শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠনে বিশেষ কার্যকর। আবার উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগে যারা আক্রান্ত তাদের জন্য মাশরুম অত্যাবশ্যক। মাশরুমে ইরিটাডেনিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা রক্তের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। এজন্য এটি হৃদরোগীদের জন্য আদর্শ খাবার। এ ছাড়াও মাশরুমে ট্রাইটারপিন থাকার কারণে এটি বিশ্বে এইডস প্রতিরোধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে কৃষিখাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি।

বর্তমানকালে ফলপ্রসূ উপায়ে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। কেননা এর সাহায্যে কৃষকরা ঘরে বসেই বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং উদ্ভাবিত কলাকৌশল ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন- কৃষিকাজে আবহাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো বীজ বপন, চারা তৈরি ও রোপণ, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আগাম আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য জানা প্রয়োজন। তাছাড়া, কৃষিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কৃষকদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা ও সমাধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ইত্যাদি সম্পর্কেও অভিহিত হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার যথেষ্ট ফলদায়ক।

আজকাল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে উন্নততর বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উদ্ভাবিত হচ্ছে। আবার, নতুন উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহার করতে গিয়ে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এসব ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তাই আইসিটির ব্যবহার করা আবশ্যক। সুতরাং বলা যায়, কৃষিখাতকে অধিক উৎপাদনক্ষম করতে আইসিটি ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক।

ঘ উদ্দীপকে কৃষি উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তি এবং আইসিটির ব্যবহারের নানাবিধ সুফল দৃশ্যমান হচ্ছে।

জৈব প্রযুক্তি হলো এরূপ একটি প্রযুক্তি, যা কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে জীব কোষের কোনো উপাদান, কাঠামোকে পরিমিত পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নতুন সৃষ্টিকে নির্দেশ করে। কৃষিতে এ প্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভিদের জিন শনাক্ত করার পর এর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত জিনের পরিবর্তে কাঙ্ক্ষিত জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হলে অধিক ফসল লাভ করা যায়। বর্তমানে লবণাক্তসহিষ্ণু ধান, শীতসহিষ্ণু পাট উদ্ভাবন, সোনালি ধান থেকে ক্ষতিকর উপাদান বাদ দিয়ে B-carotene-সমৃদ্ধ ধান উৎপাদন, উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, বন্যা, খরা প্রতিরোধী শস্য উৎপাদন প্রভৃতিতে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। এর ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তদ্রূপ স্বল্প সময়ের শস্যের উফশী ফসল চাষের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূরীকরণ এবং মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখনও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতি বছরই আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি খাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে কৃষি সমস্যার সমাধান, ফসলে রোগের আক্রমণ, কীটনাশক প্রয়োগ, সারের সঠিক ব্যবহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। উদ্দীপকে উপরিউক্ত উপাদানগুলোর প্রভাবে ফসলের ধরন পরিবর্তন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। একই জমিতে একই ফল চাষ না করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া কৃষিতে এমন এক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে যা জীব কোষের কোনো উপাদান, কাঠামোতে পরিমিত পরিবর্তন এর মাধ্যমে নতুন সৃষ্টিকে নির্দেশ করে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষিঋণ কী? ১

খ. মাশরুম চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন কোন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্দেশ করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষি উন্নয়নে উক্ত প্রযুক্তির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষকের কৃষিকাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয়, তাকে কৃষিঋণ বলে।

খ মাশরুম চাষ ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই লাভজনক। কারণ মাশরুম চাষে কম পুঁজি, কম শ্রম দরকার হয়। তাই এ দিক থেকে মাশরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাশরুম চাষের জন্য ফসলি জমির প্রয়োজন হয় না এবং স্বল্প জায়গায় স্বল্প পুঁজিতে মাশরুম চাষ করা যায়, কিন্তু মুনাফা খুব বেশি হয়। আবার, ঘরে বসেই বেকার যুবক-যুবতীরা মাশরুম চাষ করতে পারে। কারণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- খর, কাঠের গুড়া, পঁচাপাতা, আখের ছোবড়া ইত্যাদি খুবই সস্তা ও সহজলভ্য। তাই মাশরুম চাষে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। বিশ্বব্যাপী মাশরুমের চাহিদা বেশি হওয়ায় মাশরুম রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

একটি খামার বা একই জমিতে বছরে একটি শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন করার পদ্ধতিকে বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ। এ পদ্ধতিতে বছরের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া, মাটির গুণগত অবস্থা, সেচ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ফসল চাষাবাদ করা হয়। এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একই জমিতে সারা বছর বিভিন্ন শস্য ও সবজি উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শুধু একটি ফসল উৎপাদন না করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল বা শস্য চাষাবাদ করা হয়। যা শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। কাজেই বলা যায়, একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন শস্য বহুমুখীকরণকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি হলো জৈব প্রযুক্তি। কৃষির উন্নয়নে এই প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নীতি অনুসরণ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরকে ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণকর এবং ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য ও

Teachingbd24.com

সেবা তৈরির বিশেষ পদ্ধতিকে জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলে। এই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জীবকোষের DNA এর কাঠামোগত পরিবর্তন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যা জৈব প্রযুক্তিকে নির্দেশ করে। এই জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বেশি মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাত তৈরি করা হয়েছে।
আবার, বাংলাদেশের বন্যা, লবণাক্ততা, খরাপ্রবণ এলাকায় জৈব প্রযুক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধান যেমন- বিনা-৮, ব্রি-৫৩, ব্রি-৫৪ ইত্যাদি ধান চাষ শুরু হয়েছে। এতে দেশের ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া জৈব প্রযুক্তির সুফলস্বরূপ বায়োফার্মিং শস্য উৎপাদন করা যায় এবং এরূপ শস্য প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ ছাড়াও সংরক্ষণ করা যায়। এ শস্যের দাম কম, তাই দরিদ্র দেশের জনগণ এতে উপকৃত হয়। জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিংকসমৃদ্ধ ধান, লবণাক্ততাসহিষ্ণু এবং স্বল্প সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তাই বলা যায়, কৃষির সার্বিক উন্নয়নে জৈব প্রযুক্তি যথেষ্ঠ গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, খরাসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চাল, দ্বীপদেশসমূহ পানিতে তলিয়ে যাবে। খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে। এ সমস্যা সমাধানে জৈব আবর্জনার দূষণ রোধ, পরিবেশ বান্ধব বর্জ্যের পুনঃব্যবহারের উদ্যোগ, বিরূপ পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় ফসলি বীজ উদ্ভাবন ও চাষাবাদ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রদানে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. নার্সারি স্থাপন বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখে কি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের কোনো প্রভাব পড়ে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে উত্তোলনের উপায় উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিপণ্যের বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌছানো হয়।

খ স্ব-কর্মসংস্থান ও সামাজিক বনায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে নার্সারি স্থাপন বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
কৃষি খাতে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে নার্সারি স্থাপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষিরা বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফলসহ বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের চারা উৎপাদন, রোপন ও পরিচর্যার মাধ্যমে সফলভাবে নার্সারি স্থাপনে অংশগ্রহণ করছে। এতে একদিকে যেমন আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে তা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে বেকারের সংখ্যা কমছে। তাই বলা যায়, নার্সারি স্থাপন বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক (বিরূপ) প্রভাব পড়বে।
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় প্লাবিত নিম্নাঞ্চলে লবণাক্ততার হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উত্তরাঞ্চলে খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির (বৈশ্বিক উষ্ণতার) কারণে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য বিজ্ঞানীরা অভিমত পোষণ করেন, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলসহ দ্বীপদেশগুলো সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী ব-দেশ হওয়ায় এদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়বে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা বা সংকট উত্তরণের উপায়সমূহ নিচে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বাতাসে কার্বন ও কার্বনজাত বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের বৃদ্ধি। তাই এই সকল ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য সরকারকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। কারণ, গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে জৈব আবর্জনার দূষণ রোধ, পরিবেশবান্ধব বর্জ্যের পুনঃব্যবহারের উদ্যোগ, বিরূপ পরিবেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় ফসলি বীজ উদ্ভাবন ও চাষাবাদ এবং SMS এর মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আশা করা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের মাত্রা বা তীব্রতা হ্রাস পাবে।
কৃষি প্রযুক্তি ও ICT ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহনীয় বীজ উদ্ভাবন করতে হবে। এর ফলে লবণাক্ত পানির দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে লম্বা জাতের ধান চাষাবাদ করতে হবে। খরায় উদ্ভিদের দেহে প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। কিছু জাতের উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে বিষাক্ততার মাত্রা কমিয়ে খরা সহনশীল করে তোলে। এ সকল জাতের উদ্ভিদ খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদ করা যেতে পারে।
তাই বলা যায়, উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৯ গণি মিয়া একজন কৃষক। অভাবের সংসারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য জমি ছাড়া কোনো সম্পদ নেই। তাই কৃষিকাজ করার সময় ধানের বীজ, কীটনাশক ও সার ক্রয়ের জন্য স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চহারে সুদে টাকা ধার নিতে হয়। *[তিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষিঋণ কী? ১
খ. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে — ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কৃষিঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ কী কী? ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎস কৃষিঋণের জন্য পর্যাপ্ত? ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে কৃষিঋণ বলে।

খ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে স্বল্পমূল্যে না বিক্রি করে তা শহরে নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে।
সাধারণত আমাদের দেশে অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কারণে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য কম মূল্যে স্থানীয় বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। এর ফলে সাধারণ কৃষক কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়। তাই যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।

https://teachingbd24.com

গ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, ব্যবসায়ী, দোকানদার, ফড়িয়া ও বেপারি এবং গ্রাম্য বিত্তশালী ব্যক্তি প্রভৃতি হলো কৃষিঋণের অন্যতম অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

কৃষিঋণ দানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উৎস সরকারি বিধি ও নিয়মের বহির্ভূতভাবে পরিচালিত হয়, সেসব উৎসকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। বাংলাদেশে কৃষিঋণের একটি অন্যতম অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হলো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। সাধারণত এই উৎস হতে সংগৃহীত হতে ঋণের সুদ দিতে হয় না। তবে দরিদ্র কৃষকদের কৃষিঋণের উল্লেখযোগ্য উৎস হলো গ্রাম্য মহাজন। এই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কৃষক উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গণি মিয়া স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ নিয়ে থাকে। অর্থাৎ গণি মিয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। এছাড়া কৃষিঋণের অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো গ্রাম্য ব্যবসায়ী, দোকানদার, বিত্তশালী ব্যক্তি, ফড়িয়া ও বেপারি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস কৃষিঋণের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ প্রাপ্তির জটিলতা কম হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, এই উৎস হতে সংগৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে উচ্চসুদ প্রদান করতে হয়। এজন্য দরিদ্র কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সরকারের উচিত বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের পরিধি বৃদ্ধি করা এবং ঋণ প্রাপ্তির জটিলতা হ্রাস করা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, গণি মিয়া ধানের বীজ, কীটনাশক ও সার ক্রয়ের জন্য স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এই উৎস হতে এত উচ্চসুদে অনেক কৃষক ঋণ পেতে ব্যর্থ হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন কম হয়। আবার, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতেও বর্তমানে অনেক কৃষক ঋণ নিয়ে থাকে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের পরিধি বৃদ্ধি পেলে এবং ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি সহজলভ্য করা হলে কৃষক তারা প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পারবে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ভূমি বন্ধকী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণদান করে। তাই পরিশেষে বলা যায়, শুধু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস কৃষি ঋণের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

প্রশ্ন ▶৩০ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর বিরূপ প্রভাব বেশি পড়ছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. বাংলাদেশের কৃষি কি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে কীভাবে বাধাগ্রস্ত করছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উপায়সমূহ নির্দেশ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষকের অধীনে নির্দিষ্ট স্থানে যে পরিমাণ কৃষি উৎপাদনে আবাদযোগ্য জমি থাকে, তাকে কৃষিজোত বলে।

খ কৃষি প্রজনন সম্বন্ধীয় কাজ হওয়ায় তা প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশের কৃষকরা চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ভালো ফসল হয়, কিন্তু যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে ভালো ফসল হয় না। ফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেকটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

গ তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় প্লাবিত নিম্নাঞ্চলে লবণাক্ততার হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উত্তরাঞ্চলে খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এতে উক্ত অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরাঞ্চলে খরার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতেও ফসল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

ঘ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

কৃষিপ্রযুক্তি ও ICT ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহনীয় বীজ উদ্ভাবন করতে হবে। এর ফলে লবণাক্ত পানির দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে লম্বা জাতের ধান চাষাবাদ করতে হবে।

আবার, খরায় উদ্ভিদের দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। কিছু জাতের উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে বিষাক্ততার মাত্রা কমিয়ে খরা সহনশীল করে তোলে। এ সকল জাতের উদ্ভিদ খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদ করা যেতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে সৃষ্ট জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলোতে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে পানিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বাতাসে কার্বন ও কার্বনজাত বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের বৃদ্ধি। তাই এই সকল ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য সরকারকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। কারণ, গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করে। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে বিদ্যমান পরিবেশ দূষণজনিত সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৩১ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশের অধিবাসী মুঈন। (২০১৫-২০১৬) অর্থ বছরের জিডিপিতে তার দেশের বিভিন্ন কৃষি উপখাতের অবদান নিচের ছকে দেয়া হলো: *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

কৃষি উপখাতের নাম	অবদান (শতকরা)
১। শস্য ও শাকসবজি	৮.৫
২। পশু সম্পদ	১.৬
৩। বনজ সম্পদ	১.৭
৪। মৎস্য সম্পদ	৩.৬

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১

খ. কৃষি খামার ও কৃষিজোত কেন একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, কৃষি উপখাতের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থান কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মুঈনের দেশের কৃষি উপখাতের অবদানকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? যথাযথ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই জমি বা কৃষিজোতে বিভিন্ন মৌসুমে একটিমাত্র ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

https://teachingbd24.com

খ কৃষি খামার ও কৃষিজোত ধারণা দুটির অর্থ খুব কাছাকাছি হলে ও বেশ কিছু পার্থক্য থাকার কারণে এরা একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না।
যে জমিতে কৃষিকাজ করা হয় তাকে কৃষি খামার বলে। অন্যদিকে কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে তাকে কৃষিজোত বলে। তাছাড়া, কৃষি কাজের জন্য কৃষকের অধীনে একটি অখণ্ড কৃষি জমিই হলো কৃষিজোত। এগুলো মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, একাধিক কৃষিজোত নিয়ে কৃষি খামার গঠিত হয়।

গ নিচে উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, কৃষি উপখাতের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

কৃষি উপখাতের নাম	অবদান (শতকরা)
১। শস্য ও শাকসবাজি	৮.৫
২। পশু সম্পদ	১.৬
৩। বনজ সম্পদ	১.৭
৪। মৎস্য সম্পদ	৩.৬

চিত্র: জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান

উপরের চিত্রে, X-অক্ষ বরাবর কৃষি উপখাতের নাম এবং Y অক্ষ বরাবর খাতভিত্তিক শতকরা অবদান দেখানো হয়েছে।

ঘ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কোনো দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মুঈনের দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের উল্লিখিত অবদান ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা উল্লেখ করা হলো— IPCC-এর সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী বর্তমান শতকেই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশের নিচু ও উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবে। এতে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হবে।
জলবায়ুর পরিবর্তন বা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে নদ-নদীর পানির পরিমাণ কমে গেলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাবে। ফলে মুঈনের দেশের জিডিপিতে মৎস্য সম্পদের অবদান হ্রাস পাবে। আবার, কম বৃষ্টিপাতের কারণে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে।
IPCC-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে ধান উৎপাদন ১০% হ্রাস পাবে। শুষ্ক মৌসুমে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিসহ পশু সম্পদের উৎপাদন ব্যাপক মাত্রায় হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুবৈচিত্র্যে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। মুঈনের দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দেশটির কৃষি উপখাতের উৎপাদন হ্রাস পাবে। এতে GDP-তে কৃষি উপখাতগুলোর অবদান কমবে।
সুতরাং, বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি মুঈনের দেশের জিডিপিতে উল্লিখিত কৃষি উপখাতগুলোর অবদানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মুন্সীগঞ্জ জেলার মোহন মিয়া গত বছর শীতকালীন শস্য হিসেবে তার মোট জমির অর্ধেক অংশে আলু চাষ করেন। বাকি অর্ধেকের কিছু অংশ গম এবং কিছু অংশে গাজর চাষ করেন। আলুর বাজার দাম বেশি থাকায় চলতি বছর তিনি সকল জমিতে শুধু আলু চাষ করেন। তবে তার গ্রামের রাস্তা কাঁচা হওয়ায় উপাদিত আলু কম দামে গ্রামের জনৈক ফড়িয়ার কাছে বিক্রি করেন। এমনকি তার গ্রামে কোনো হিমাগার না থাকায় সংরক্ষণ ও করতে পারে নি। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জীবননির্বাহী খামার কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের কৃষিতে মাশরুম চাষ কেন অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, যথাযথ যুক্তিসহ মোহন মিয়ার গত বছর ও চলতি বছরের চাষাবাদের পদ্ধতি নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, মোহন মিয়ার উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরণের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে? উক্ত সমস্যা সমাধানে তোমার মতে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খামারে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

খ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর ফলে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে। মাশরুম চাষের জন্য কোন আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষিতে মাশরুম চাষ অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।
মাশরুম স্বল্প জায়গায় এবং স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে চাষ করা যায়, কিন্তু মুনাফা হয় খুবই বেশি। মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন- খড়, কাঠে গুড়া, পচাপাতা, আখের ছোবড়া ইত্যাদি খুবই সস্তা এবং সহজলভ্য। ফলে বেকার যুবক-যুবতীরা ঘরে বসে মাশরুম চাষ করে দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে করে দেশের বেকার সমস্যা দূর হবে। তাই বলা যায় মাশরুম চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের মোহন মিয়ার গতবছরের চাষাবাদ ছিল জীবননির্বাহী খামার পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং চলতি বছরের চাষাবাদ হচ্ছে বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতিতে চাষাবাদ।
জীবননির্বাহী খামার বলতে বোঝায় ক্ষুদ্র আয়তনের ভূমি যেখানে উত্তম চাষাবাদের মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদিত হয় তা দ্বারা কৃষক কোনো রকমে পারিবারিক ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জীবননির্বাহে সক্ষম হয়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক খামারে অধিক শ্রম, পুঁজি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষ ধরণের ফসল উৎপাদন করা হয় এবং উক্ত ফসলের অধিক উৎপাদন ও উদ্বৃত্তের দ্বারা সঠিক মুনাফার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের খামারে উৎপাদন কার্য পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাত করণে দক্ষ শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়।
উদ্দীপকের মোহন মিয়া মুন্সীগঞ্জ জেলার একজন কৃষক। তিনি গত বছর শীতকালীন শস্য হিসেবে তার যে মোট জমি আছে তার অর্ধেক পরিমাণ জমিতে আলুর চাষ করেন এবং বাকি অর্ধেকের কিছু অংশে গম ও কিছু অংশে গাজর চাষ করেন। তার চাষ পদ্ধতিটি খেয়াল করে দেখা যাচ্ছে যে তিনি কোন বিশেষ ফসল উৎপাদন না করে পারিবারিক নিত্য প্রয়োজনে যেসব ফসল দরকার হয় শুধুমাত্র তাই উৎপাদন করেছেন, যা জীবননির্বাহী খামার পদ্ধতির চাষাবাদকে নির্দেশ করে। এর ফলে তিনি গত বছর পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর পর খুব কমই উদ্বৃত্ত ফসল পেয়েছেন। এ কারণে আলুর দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি আলু বিক্রয় হতে খুব বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন নি। কিন্তু এ বছর তিনি জমিতে শুধুমাত্র আলু চাষই করেছেন। যা বিশেষ একটি ফসল উৎপাদন করে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য নির্দেশ করছে। তাই বলা যায় মহোন মিয়ার চলতি বছরের চাষাবাদের পদ্ধতিটি ছিল বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতির চাষাবাদ, যার মাধ্যমে আলু উৎপাদন করে তিনি বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার চিন্তা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মোহন মিয়ার উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে বিপণনজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।
কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম প্রাপ্তির ওপর কৃষকের তথা কৃষির উন্নতি নির্ভর করে। আর পণ্যের উপযুক্ত দাম প্রাপ্তি নির্ভর করে বিপণন ব্যবস্থার ওপর। যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তাদের নিকট পৌঁছায় তাকে বিপণন বলে। বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।
উদ্দীপকের মোহন মিয়া গ্রামের রাস্তাঘাটের দুরবস্থার কারণে তার উৎপাদিত আলু ফড়িয়াদের কাছে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাই কৃষিপণ্যের মূল্য নিশ্চিত করতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জরুরি। যা ব্যক্তি উদ্যোগে সম্ভব নয়, দরকার সরকারি উদ্যোগ। কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে ফসল উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশ মূল্যই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। বিভিন্ন দালাল, মজুতদার,

https://teachingbd24.com

আড়তদার কৃষিপণ্য বাজার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা নানাভাবে বিভিন্ন অজুহাতে কৃষকদের ঠকায়। এ সকল সমস্যা দূরীকরণে কৃষিপণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরি।

বাফার স্টকের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি রোধ করা যায়। যখন কৃষিতে বাম্পার ফলন হয় তখন সরকার কৃষিপণ্য ক্রয় করে, সংরক্ষণ করে। ফলে কৃষিপণ্যের দামের নিম্নগতি রোধ হয়। আবার যখন কৃষি উৎপাদন কম হয়, তখন বাফার স্টকের পণ্য বাজারে ছাড়লে পণ্যের দামের উর্ধ্বগতি রোধ পায়। যখন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন দাম দ্রুত কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও উঠাতে পারে না। এই সময় সৃকার কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে। কিছু কৃষিশস্য সহজেই পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, পান, আদা ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগে যদি এ সকল ফসল সংরক্ষণ করা যায় তবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে। উপরের ব্যবস্থাসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে মোহন মিয়ার মত কৃষকদের বিপণনজনিত সমস্যা দূর হবে। এতে করে তারা ন্যায্যমূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে না বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ নিচের ছকে ২০০৭-০৮ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের অবদান তুলে ধরা হলো-

কৃষি উপ-খাতের নাম	২০০৭-০৮ (শতকরা)	২০১৫-১৬ (শতকরা)
১. শস্য ও শাক-সবজি	১০.৮৮	৮.৩৩
২. পশুসম্পদ	২.১৯	১.৬৬
৩. বনজ সম্পদ	১.৮২	১.৭৭
৪. মৎস্য সম্পদ	৩.৭৯	৩.৫৬

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝায়? ১

খ. জীবননির্বাহী কৃষি খামার ও বাণিজ্যিক কৃষি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য কি একই? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জিডিপি'তে কৃষি উপ-খাতসমূহের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি জিডিপিতে কৃষি উপ-খাতগুলোর উল্লিখিত অবদানের ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খামারে একটিমাত্র ফসলের পরিবর্তে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ।

খ জীবননির্বাহী কৃষি ও বাণিজ্যিক কৃষি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য এক নয়।

সাধারণত জীবননির্বাহী কৃষি খামারে কৃষক নিজ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন করে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক কৃষি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। তাই জীবননির্বাহী কৃষি খামার ও বাণিজ্যিক কৃষি খামারের মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় পার্থক্য লক্ষ করা যায় তথা উক্ত দুটি খামারের উৎপাদনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে ২০০৭-০৮ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

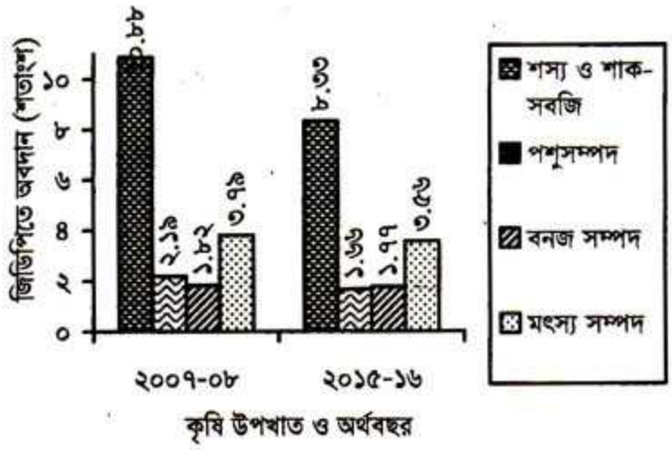

চিত্রে X-অক্ষে কৃষি উপখাত ও অর্থবছর এবং Y-অক্ষে জিডিপিতে শতকরা অবদান দেখানো হয়েছে। আয়তাকার স্তম্ভচিত্র দ্বারা যথাক্রমে ২০০৭-০৮ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতগুলোর শতকরা অবদান প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কোন দেশে জিডিপিতে কৃষির অবদানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের উল্লিখিত অবদান ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা উল্লেখ করা হলো—

IPCC-এর সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী বর্তমান শতকেই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশের নিচু ও উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবে। এতে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতি হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তন বা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে নদ-নদীর পানির পরিমাণ কমে গেলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাবে। ফলে এ দেশের জিডিপিতে মৎস্য সম্পদের অবদান হ্রাস পাবে। আবার, কম বৃষ্টিপাতের কারণে বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

IPCC-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে ধান উৎপাদন ১০% হ্রাস পাবে। শুষ্ক মৌসুমে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিসহ পশু সম্পদের উৎপাদন ব্যাপক মাত্রায় হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুবৈচিত্র্যে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দেশটির কৃষি উপখাতের উৎপাদন হ্রাস পাবে। এতে GDP-তে কৃষি উপখাতগুলোর অবদান কমবে। সুতরাং, বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি জিডিপিতে উল্লিখিত কৃষি উপখাতগুলোর অবদানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ প্রায় ৩১ বছর আগে চালু হওয়া মুহুরী সেচ প্রকল্পের সেচখালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় অবকাঠামোগুলো অচল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং যথাযথ সংস্কারের অভাবে প্রকল্পের সেচ এলাকা ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। ADB-এর আর্থিক সহযোগিতায় বর্তমান সরকার ৪৬৭১০.১৬ লক্ষ টাকায় IMIP for MIP নামে ২০১৪ সালে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে যা ২০২০ সালে শেষ হবে। এর ফলে ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভি পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে প্রি-পেড মিটারিং সিস্টেমে সেচ ব্যবস্থা চালু হবে। কৃষক কম খরচে তার চাহিদামাফিক পানি পাবে। প্রায় ১৭০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে এবং প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা পাবে। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১

খ. পরিবেশ দূষণের জন্য মানবসৃষ্ট কারণই দায়ী—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মুহুরী সেচ প্রকল্পটির কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর IMIP for MIP বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অনেকটা এগিয়ে যাবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে কেবল একটি শস্যের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলা হয়।

খ মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস ও তার কাজকর্ম পরিচালনা করে তাই হলো পরিবেশ। ভূ-প্রকৃতি, মাটি, গাছপালা, নদ-নদী, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি হলো পরিবেশের উপাদান। পরিবেশের এসব উপাদানের ওপর নেতিবাচক পরিবর্তনকে বলা হয় পরিবেশ দূষণ।

মানবসৃষ্ট কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে মাটি ক্ষয়ের দরুন মাটি দূষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহার মাটিকে ক্রমেই শক্ত ও অনুর্বর করে তুলছে। যথেচ্ছা কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিকাজের জন্য উপকারী অনেক অণুজীবের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক উত্তোলনের ফলে পানিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি নিষ্কাশনের প্রাকৃতিক উপায়গুলো বিঘ্নিত হওয়ায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে। উজানে নদীগুলোর পানি কমে যাওয়ায় সেগুলো শুষ্ক হয়ে উঠেছে এবং নাব্যতা হারাচ্ছে। এসব কারণে আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার হচ্ছে। তাই বলা যায়, পরিবেশ দূষণের জন্য মানবসৃষ্ট কারণই দায়ী।

Teachingbd24.com

গ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার বড় ফেনী নদীর ওপর নির্মিত মুহুরী সেচ প্রকল্পটি নির্মাণের পর থেকে তার কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৭১৫৯.১২ লাখ টাকা ব্যয়ে উদ্দীপকে উল্লিখিত মুহুরী সেচ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। যার লক্ষ্য ছিল ফেনী জেলার সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার (কিয়দংশ) এবং চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার কিয়দংশে ২৭১২৫ হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করাসহ নদীভাঙন রোধ ও সোনাগাজী উপজেলাসহ কয়েকটি উপজেলাকে জোয়ারের নোনা পানি থেকে রক্ষা করা। এ অঞ্চলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য। কিন্তু মুহুরী সেচ প্রকল্পটি রেগুলেটরটি নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় খাল সংস্কার ও খাল খনন না করা। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ না করার কারণে এবং দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক মৌসুমে নদীতে বড় বড় মোটর বসিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সেচ দিয়ে পানি উত্তোলন করে চাষাবাদ করার কারণে মুহুরী ও ফেনী নদীর নাব্যতা কমে গিয়েছে। এর ফলে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এ ছাড়াও প্রকল্পের সেচখালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ঠিকমতো পানি সরবরাহ হচ্ছে না। যা মুহুরী সেচ প্রকল্পটির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

ঘ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার বড় ফেনী নদীর ওপর নির্মিত মেগা সেচ প্রকল্পটি মুহুরী সেচ প্রকল্প (MIP) নামে পরিচিত। এখানে MIP হলো- Muhuri Irrigation Project-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ প্রকল্পটির যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের খাদ্য উৎপাদন অনেকটাই বাড়ানো যাবে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের মুহুরী সেচ প্রকল্পটি নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করতে বা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় খাল খনন ও সংস্কার না করা। এছাড়া সঠিক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাযথ সংস্কারের অভাবে অবকাঠামোগুলো অচল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় প্রকল্প এলাকার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার ২০১৪ সালে মুহুরী সেচ প্রকল্পটির উন্নয়ন এবং সংস্কারের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর সহায়তায় IMIP for MIP (Irrigation Management Improvement Project for Muhuri Irrigation Project) নামক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী এর ব্যয় ধরা হয় ৪৬,৭১০.১৬ লক্ষ টাকা এবং প্রজেক্টটির কাজ শেষ হবে ২০২০ সালে। এই কাজ শেষ হলে প্রজেক্টটি তার নির্মাণকালীন উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হয়। নতুন করে সংস্কারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভি পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে সেচ ব্যবস্থা চালু হবে। এর ফলে কৃষক তার প্রয়োজনমাফিক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কম খরচে চাষাবাদ করতে পারবে। IMIP for MIP বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১৭০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে এবং প্রায় ৪০,০০০ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা পাবে। এতে করে উক্ত এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, IMIP for MIP বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ নওগাঁর কৃষক আব্দুল আহাদ ২০১৪ সালে তিন বিঘা জমিতে ফসল ফলান এবং দরিদ্রতার কারণে ফসল ওঠার সাথে সাথেই নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রি করে দেন। বিক্রি না করেও উপায় নেই। কারণ ফসল সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ভালো দামে বিক্রির জন্য দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। পরিমাপেও ক্রেতারা কৃষকদের সাথে প্রতারণা করে। এসব চিন্তা করে ফসল উৎপাদনে আব্দুল আহাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। তবুও তিনি জীবনের তাগিদে কৃষিকাজ করেন।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারের প্রকৃতি কী? ১

খ. কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কী বোঝ? ২

গ. আব্দুল আহাদ তার পণ্য বিপণনে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. কৃষিপণ্য বিপণনে আরও যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অধিকাংশ খামার জীবননির্বাহী প্রকৃতির।

খ কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার হাতে পৌঁছায় সে প্রক্রিয়াকে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ বলে।

উৎপাদিত দ্রব্য চূড়ান্ত ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সকল ধাপ অতিক্রম করতে হয় তা হলো– ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ, শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, প্যাকেটকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিজ্ঞাপন, ঝুঁকি বহন, তথ্য সংগ্রহকরণ, বণ্টন, বিক্রয় ইত্যাদি। আর এ সকল কাজকে সম্মিলিতভাবে কৃষিপণ্যের বিপণন বলে।

গ আব্দুল আহাদ তার পণ্য বিপণনে সংরক্ষণের অসুবিধা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বজনিত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য গুদামজাত বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা খুবই সীমিত এবং বেশিরভাগ মৌসুমি ফসল পাঁচনশীল হওয়া কৃষকেরা কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়। আবার এদেশের অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ও শহরের সাথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা না থাকায় কৃষিপণ্য দূরবর্তী শহরে বেশি দামে বিক্রি করা যায় না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এক দল মুনাফাখোর ব্যবসায়ী কম দামে স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে বেশি দামে শহরে বিক্রি করে। এদেরকে বলা হয় মধ্যস্বত্বভোগী। এ সকল ব্যবসায়ীর প্রতারণার কারণে কৃষকেরা ন্যায্য দাম পায় না ও অধিক উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

উদ্দীপকে কৃষক আব্দুল আহাদের ক্ষেত্রেও আলোচিত সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয়। তার জমিতে ২০১৪ সালে বাম্পার ফলন হলেও সংরক্ষণ ও পরিবহন সমস্যার কারণে কম দামেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কিছু অসাধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এসব পণ্য ন্যায্যমূল্যের চেয়ে কম মূলে কিনে শহরে বিক্রি করে। কাজেই বলা যায়, আব্দুল আহাদের ক্ষেত্রে কৃষি বিপণনের সংরক্ষণজনিত অসুবিধা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব ইত্যাদি সমস্যা লক্ষ করা যায়।

ঘ কৃষিপণ্য বিপণনে আব্দুল আহাদের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাগুলো ছাড়াও আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দুর্বলতার কারণে তথা মূলধন স্বল্পতার কারণে নিম্নমানের বীজ ও সার ব্যবহার, প্রাচীন পদ্ধতিতে ফসল কর্তন, সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। যা কৃষিপণ্যের গুণগত মান কমিয়ে দেয়। তাছাড়া পণ্যের সুষ্ঠু শ্রেণিবিভাগ, মান নির্ধারণ ও শনাক্তকরণের অভাবেও কৃষকেরা উপযুক্ত দাম পায় না। আবার অধিকাংশ কৃষকেরই শহরের সাথে যোগাযোগ না থাকায় কৃষি পণ্যের বাজার মূল্য ও চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। ফলে তারা উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করতে পারে না।

এদেশের কৃষিপণ্যের বাজার খুবই অস্থিতিশীল প্রকৃতির। অর্থাৎ কৃষিপণ্যের দাম খুবই উঠানামা করে। ফসলের মৌসুমে একেবারে কমে গেলেও কৃষক ওই দামে বিক্রি করে থাকে। আবার যখন মৌসুম শেষে পণ্যের দাম বেড়ে যায় তখন তাদের কাছে কোন উদ্বৃত্ত পণ্য থাকে না। এজন্যও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবহার নানা সমস্যা বিদ্যমান। তাই ফলন ভালো হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র কৃষকের অবস্থা দরিদ্রই থেকে যায়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৬ রহিম পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ২ বিঘা জমি, বাবার ঋণ এবং মা ও কয়েকজন ভাই-বোন নিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। কৃষি কাজে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য প্রায়ই তাকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। বোনের বিয়ের জন্য তাকে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১

খ. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে কি খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রহিমের মতো কৃষকেরা চাষাবাদের ক্ষেত্রে যে ঋণ গ্রহণ করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খামারে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

খ কৃষিতে শস্য বহুমুখীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে না।

শস্য বহুমুখীকরণের মধ্য দিয়ে বিগত দুই দশক যাবৎ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে ঘটেছে নীরব বিপ্লব। অর্থাৎ একই জমিতে বার বার একই ফসল চাষ না করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন দুটিই বৃদ্ধি পায়। এরূপ চাষাবাদ করাই হলো শস্য বহুমুখীকরণ। সুতরাং বলা যায়, শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব।

গ কৃষকেরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে ঋণ গ্রহণ করে। নিচে উদ্দীপকের ভিত্তিতে রহিমের গ্রহণকৃত নেয়া ঋণগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **পৈতৃক ঋণ:** রহিমের বাবা একসময় জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়; কিন্তু পরে আর্থিক দুরবস্থার কারণে জীবদ্দশায় আর পরিশোধ করে যেতে পারেনি। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে জমিজমার মালিক হওয়ার সাথে সাথে তার ওপর পিতার নেয়া ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্বও বর্তায়। জীবনের শুরুতে তাই ঋণ না নেয়া সত্ত্বেও সে ঋণজালে আবদ্ধ হয়।

২. **কৃষি উপকরণসমূহ ক্রয়ের জন্য ঋণ:** রহিম একজন দরিদ্র কৃষক। সে তার সীমিত জমিতে যা উৎপাদন করে তা দিয়ে কোনো রকমে পরিবারের ভরণপোষণ করে; ফসলের মৌসুম শেষে কৃষিকাজে বিনিয়োগ করার মতো কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ তার হাতে থাকে না। তাই কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কেনার নিমিত্তে তাকে ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়।

৩. **সামাজিকতা পালনের জন্য ঋণ:** কৃষিকাজের জন্য ঋণ নেয়া ছাড়াও রহিমকে অন্য কাজের জন্য ঋণ নিতে হয়। আর তা হলো- বোনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন। বোনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব; এর জন্য কিছু খরচ করতেই হয়। হাতে নগদ টাকা না থাকায় বোনের বিয়ের ব্যয় মেটানোর জন্যও রহিমকে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়।

এভাবে দেখা যায়, কৃষক রহিম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়েছে।

ঘ রহিমের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে। নিচে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **স্বল্পমেয়াদি ঋণ:** স্বল্পমেয়াদি ঋণ সাধারণত ছয় মাস থেকে এক বছরের জন্য প্রয়োজন হয়। জমির খাজনা পরিশোধ, বীজ ও সার ক্রয় প্রভৃতির জন্য কৃষকের এ ধরনের ঋণের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও গরু, ছাগল পালন, মুরগি ও মাছের খামার ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের জন্য কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে। কখনো কখনো কৃষক গৃহীত কৃষিঋণ কৃষিকাজে ব্যয় করার পরিবর্তে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে। সাধারণত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য এ ধরনের ঋণ ব্যয় করা হয়। অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়া যায় না বলে কৃষককে এ ঋণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের দিকে হাত বাড়াতে হয়। ফলে এ ঋণের সুদের হারও খুব বেশি হয়। কখনো কখনো কৃষক ভোগ ব্যয় নির্বাহের জন্যও স্বল্প মেয়াদে ঋণ নেয়।

২. **মধ্যমমেয়াদি ঋণ:** এ ধরনের ঋণ এক বছর থেকে পাঁচ বছরের জন্য প্রয়োজন হয়। কৃষি-যন্ত্রপাতি যেমন- শ্যালো পাম্প মেশিন, স্প্রেয়ার, পাওয়ার টিলার, গরু-মহিষ ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য কৃষক মধ্যমমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। মধ্যম মেয়াদি ঋণের অর্থ ব্যয় করে তা থেকে প্রতিদান পেতে সময় লাগে। এজন্য কৃষককে এ ঋণের বোঝা কয়েক বছর ধরেই টানতে হয়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি ঋণ:** দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সাধারণত পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। সাধারণত অবস্থাপন্ন কৃষকরাই এ ধরনের ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কৃষিজমির স্থায়ী উন্নতি বিধান— যেমন, জমি ভরাটকরণ, জমি সমতলকরণ, জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনে কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে।

এভাবে রহিমের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৩৭ সজিব খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারে যশোরের চূড়ামনকাঠি বাজারের সবজির দাম এবং ঢাকার কারওয়ান বাজারের সবজির দাম আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আরো জানতে পারে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য, কৃষকদের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি কারণে দামের এই পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান সরকার এইসব সমস্যা দূরীকরণে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছেন।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ আলোচনা কর। ৩

ঘ. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি যথেষ্ট? উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে তাকে কৃষিজোত বলে।

খ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণে সহায়তা কার্ড অন্যতম। সাধারণত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এই তিন শ্রেণির কৃষিক সরকারি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড পেয়ে থাকেন। কয়েকটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের জন্য এই সহায়তা কার্ড বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়। এগুলো হলো-

১. কৃষকদেরকে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

২. ভর্তুকিসহ বিনামূল্যে সরকার ঘোষিত সকল প্রকার কৃষি উপকরণ সহায়তা নিশ্চিত করা।

৩. সর্বোপরি দেশে কৃষি উপকরণ বৃদ্ধি করা।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাসমূহ হলো অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য এবং কৃষকের সচেতনতার অভাব। নিচে এ সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো—

অনুন্নত পরিবহনব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে এনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না। বাড়িতে বা স্থানীয় হাটবাজারে কম দামে পণ্য বিক্রি করে। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। কৃষক যে দাম পায় এবং সর্বশেষ ভোক্তা যে দাম দেয়

Teachingbd24.com

তার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে তা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্য। ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এজন্য একই পণ্য কোনো বাজারে চড়া দামে এবং কোনো বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। এতে কম দামে বাজারে বিক্রয়কারী কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া আমাদের কৃষকেরা কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। ফলে ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারের গতি প্রকৃতির সাথে তারা একেবারেই অপরিচিত। তাই তারা কৃষিপণ্যের তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে।

ঘ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট নয়। উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকে সরকার বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন বা বাজারজাতকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু রাস্তাঘাট নির্মাণ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। যা কৃষকের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়। এছাড়া সরকার আরও যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

সরকার কৃষককে স্বল্পসুদে ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণদান সংস্থা গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করতে পারে যাতে কৃষকের প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। আবার সরকার কৃষিপণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও শস্য সংরক্ষণের সময় শস্যের যেন ক্ষতি না হয়, এজন্য সরকার গুদামঘর নির্মাণ এবং শস্য গুদামে মজুত রাখার বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। এছাড়া সরকার কৃষিপণ্যের মান অনুসারে এদের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে। সর্বোপরি, কৃষকদেরকে লাভবান করার জন্য সরকার কৃষিপণ্যের সর্বনিম্নমূল্য ধার্য করে যাতে সেটি কার্যকর হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে পারে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি সঠিকভাবে গৃহীত হলে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং কৃষকেরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য লাভ করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। সে একটি ছোট কৃষি খামারের মালিক। তাই সে তার জমিতে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষনের উদ্দেশ্যেই চাষাবাদ করে। এতে তার সংসার চললেও কোনো বাণিজ্যিক লাভ হয় না। কৃষি খামারকে লাভজনক করতে হলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কৃষিজাত গঠন। ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিক কৃষি জোতের মাধ্যমে বাণিজ্যিক খামার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক খামার গড়ে তোলার জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন যা পর্যাপ্ত নয়।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষির উপখাতগুলো কী কী? ১

খ. মাশরুম চাষের উপকারিতা কী? ২

গ. গনি মিয়া কেন জীবননির্বাহী খামারের ভিত্তিতে উৎপাদন করে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গনি মিয়া কেন বাণিজ্যিক ভিত্তিক চাষপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষির উপখাতগুলোহলো শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ।

খ মাশরুম চাষের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

মাশরুম চাষে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে শুধু বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে মাশরুম উৎপাদন করা হয়। তাই মাশরুম চাষ নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব ফসল। ঘরে ঘরে মাশরুম চাষ করে, অত্যন্ত পুষ্টিকর এই সবজি নিয়মিত খেয়ে দেশে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব। মাশরুম খেয়ে পুষ্টিহীনতা দূর হলে রোগব্যাধিজনিত ব্যয় সাশ্রয়সহ সমাজের সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গ উদ্দেশ্যের দিক থেকে গনি মিয়া জীবননির্বাহী খামারে কৃষিকাজ করেন। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

গনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম অথচ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। এ অবস্থায় কম পরিমাণ জমিতে মামুলিভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে তিনি যা উৎপাদন করেন তা দিয়ে কোনো রকমে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।

যে কৃষিকাজের দ্বারা কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে পরিবারের কোনো রকমে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে তাই হলো জীবন নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ। এখানে জমির পরিমাণ এতই কম থাকে যে কৃষিকাজের দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণের পর সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে যা দিয়ে কৃষক মামুলিভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে যায়। কেবল পরিবারের ভোগের উদ্দেশ্যেই কৃষিকাজ পরিচালনা, কৃষিকাজে শুধু পরিবারের সদস্যদেরকেই নিয়োগ, মালিকের স্বয়ং চাষাবাদ, পরিবারের প্রয়োজন মেটায় এমন পণ্যসমূহ উৎপাদন ইত্যাদি হলো এ কৃষিকাজের বৈশিষ্ট্য। এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায়, গনি মিয়া মূলত নিজেকে ও পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই জীবননির্বাহী খামারে কৃষি কাজ করেন।

ঘ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী তা প্রধানত নির্ভর করে এদেশের কৃষিজমির প্রকৃতি ও বণ্টন, উপকরণ বিন্যাস, কৃষি খাতের উন্নয়নের স্তর প্রভৃতি বিষয়ের ওপর। এজন্য বাংলাদেশের বাণিজ্যিক খামারভিত্তিক চাষ পদ্ধতির দিকটি পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমত, বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক পরিবার তাদের বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্যের জন্য চাষাধীন ক্ষুদ্র জোতের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই বহুধাকরণ চাষপদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত জীবননির্বাহী খামার তাদের জীবন প্রবাহের সাথে গ্রথিত হয়ে আছে। এজন্য তারা বাণিজ্যিক খামারভিত্তিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে পুঁজির স্বল্পতা রয়েছে বাণিজ্যিক খামারে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ ও কৃষি আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জীবননির্বাহী খামারে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হয়। এজন্য এদেশের কৃষকরা বাণিজ্যিক খামারভিত্তিক চাষ করে না।

তৃতীয়ত, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হলে খামার একটি ন্যূনতম আয়তন বিশিষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারের আয়তন এতই ছোট যে, সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না।

চতুর্থত, এমনিতেই জীবননির্বাহী ক্ষুদ্র খামারগুলো মূলধন বাজার থেকে সহজে ঋণ পায় না। ফলে অনেক সময় মূলধনের অভাবে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য এদেশের কৃষকরা বাণিজ্যিকভিত্তিক খামারের কথা চিন্তাও করে না। আবার ক্ষুদ্রায়তন খামারে মুনাফার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিকার্য পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই।

উপরিউক্ত কারণে গনি মিয়ার জীবননির্বাহী খামার বাণিজ্যিক খামারভিত্তিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ রহমত আলী এবং সামাদ মিয়া উভয়ই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তবে পার্থক্য হলো এই যে, রহমত আলীর খামারের আয়তন এমন যেখানে চাষাবাদের মাধ্যমে কোনো রকমভাবে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে। অন্যদিকে, সামাদ মিয়ার খামারের আয়তন এমন যেখানে প্রতি বছর পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারে।

[ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. কৃষির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহমত আলীর কৃষি খামারের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উৎপাদন দক্ষতা বিবেচনায় এনে রহমত আলী ও সামাদ মিয়া উভয়ের খামারের মধ্যে কোন খামারকে গুরুত্ব দেয়া উচিত— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Agriculture।

https://teachingbd24.com

খ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিজাতীয় উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.১% লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে GDP-তে খাতের অবদান ছিল ১৪.১০ শতাংশ। তাছাড়া, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষি হতে আসে। আবার, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বিভিন্ন কৃষিসামগ্রী (মাছ, মাংস, পশুর চামড়া ইত্যাদি) রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়, যা একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ রহমত আলীর কৃষি খামার হলো জীবননির্বাহী কৃষি খামার।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কৃষিখামার দুই প্রকার। যথা— জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার। যে কৃষি খামারে বা জমিতে জীবননির্বাহের জন্য চাষাবাদ করা হয়, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে। সাধারণত এ ধরনের খামারে ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত ও পরিদর্শন ব্যবস্থা অদক্ষ হয়ে থাকে। তাই উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণও কম হয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক রহমত আলীর মতো প্রান্তিক কৃষক। রহমত আলীর কৃষি কাজে তেমন উদ্বৃত্ত থাকে না, কারণ তার কৃষি কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ব্যয় নির্বাহ করা। রহমত আলীর নিজের কোনো জমি নেই বললেই চলে। অর্থাৎ তার খামারের আয়তন ক্ষুদ্র এবং মূলধনের পরিমাণও কম। কাজেই বলা যায়, রহমত আলীর খামার হলো জীবননির্বাহী খামার।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত আলীর খামারটি হলো জীবননির্বাহী খামার এবং সামাদ মিয়ার খামারটি হলো বাণিজ্যিক খামার। উৎপাদন দক্ষতা বিবেচনায় এনে সামাদ মিয়ার খামারকে অর্থাৎ বাণিজ্যিক খামারকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেশি জমি নিয়ে চাষাবাদ করা হয়। ফলে সেখানে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায়। অন্যদিকে, আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ করলে ক্ষুদ্র জমিতেই তা করা যায়। এক্ষেত্রে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির সুবিধা ভোগ করা যায় না। বাণিজ্যিক ভিত্তিক কৃষিকাজে পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাড়া করা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়। এর ফলে এ ধরনের কৃষিকাজে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা লাঘব হয়। আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজে কৃষক নিজে ও তার পরিবারের সদস্যরাই নিয়োজিত হয়। সেখানে বাইরের শ্রমিককে নিয়োজিত না করায় বেকার সমস্যা লাঘবে তা তেমন কাজে লাগে না।

অধিক উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ পরিচালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে যা জিডিপি বাড়াতে সহায়ক হয়। কিন্তু আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ কেবল পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য করা হয়। এখানে এমন কোন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না যা মোট উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কৃষিকাজে অধিক উৎপাদনের দরুন আয় হয়। অধিক আয় সঞ্চয় বাড়ায়, ফলে মূলধন গঠিত হয়। গঠিত মূলধন কৃষি উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। কিন্তু আত্মপোষণমূলক কৃষিকাজের দ্বারা প্রাপ্ত আয় কৃষক পরিবারের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যায়। এখানে উদ্বৃত্ত তেমন থাকে না; ফলে বিনিয়োগ দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক খামারকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶৪০ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এ অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ধারা নিম্নরূপ:

খাতসমূহ	১৯৯০-৯১ (শতকরা হার)	২০০০-০১ (শতকরা হার)	২০১৩-১৪ (শতকরা হার)
কৃষি	২৯.২৩	২৫.০৩	১৬.৫০
শিল্প	২১.০৪	২৬.২০	২৯.৫৫
সেবা	৪৯.৭৩	৪৮.৭৭	৫৩.৯৫

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. বাণিজ্যিক খামার কাকে বলে? ১

খ. "বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহ অবদান দণ্ডচিত্রে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কমে যাচ্ছে।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৃহৎ আকারে পরিচালিত খামারকে বাণিজ্যিক খামার বলে।

খ উন্নয়নশীল দেশ হলে যে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয় বাংলাদেশ তার তিনটিই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে বাংলাদেশকে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়।

শর্ত অনুযায়ী একটি দেশকে উন্নয়নশীল হতে হলে সেই দেশকে প্রথমত মাথাপিছু আয় ১ হাজার ২৪২ ডলার হতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার। দ্বিতীয়ত, মানব সম্পদের উন্নয়ন অর্থাৎ দেশের ৬৬ ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের ৭০ ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে। আর তৃতীয়ত, অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর না হওয়ার মাত্রা ৩০ ভাগ হতে হবে, যা বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অর্জন করেছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-

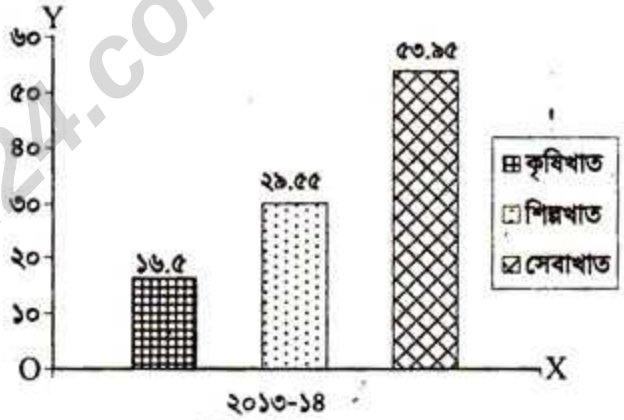

খাতভিত্তিক অবদান (শতকরা)

উপরের চিত্রে X-অক্ষে অর্থবছর ও অর্থনৈতিক খাত এবং Y-অক্ষে খাতভিত্তিক শতকরা অবদান দেখানো হয়েছে। দণ্ডচিত্র তিনটি ২০১৩-১৪ অথবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের শতকরা অবদান নির্দেশ করছে। চিত্র অনুযায়ী কৃষিখাতে অবদান ১৬.৫০%, শিল্পখাতে ২৯.৫৫% এবং সেবাখাতে অবদান ৫৩.৯৫%।

ঘ উদ্দীপকের সূচিটি লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এখানকার অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এদেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ কমে আসছে।

উদ্দীপকের সূচিটিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ২৯.২৩%। পরবর্তীতে ২০০০-০১ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এসে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫.০৩% ও ১৬.৫০%। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান হ্রাস পেয়েছে। মূলত দেশে শিল্প ও সেবা খাতের ক্রমোন্নতিই এমনটি হওয়ার জন্য দায়ী। ১৯৯০-৯১ সালে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২১.০৪%, যা ২০১৩-১৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৯.৫৫%। অপরদিকে উক্ত সময়ের সেবাখাতের অবদান ৪৯.৭৩% থেকে বেড়ে ৫৩.৯৫% হয়েছে। এই দুই খাতের উন্নতিই কৃষি খাতের উৎপাদন হ্রাসের কারণ। কৃষিপেশায় নিয়োজিত শ্রমিকেরা আর এখন কৃষিকাজ করতে চায় না। গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারে কৃষিখাজে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকেরা বেশি বেশি করে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসাতে কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় কমে

https://teachingbd24.com

গেছে। মৌসুমি শ্রমিকেরা যারা আগে কৃষি মৌসুমে কৃষকদেরকে সাহায্য করত, তারা এখন বিভিন্ন শিল্প বা সেবাখাতের কলকারখানায় কাজ করে। নিশ্চিত এবং কষ্টসাশ্রয়ী কাজ ছেড়ে তারা আর কৃষি কাজে শ্রম দিতে চায় না বলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কৃষিজমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, যা কৃষি উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম প্রধান একটি কারণ।

উপর্যুক্ত কারণে দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়াতে দেশের জিডিপিতে কৃষির শতকরা অবদান ক্রমশ কমে এসেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দেশের মোট বার্ষিক কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন কমলেও সে তুলনায় দেশের জাতীয় উৎপাদন আরও বেশি বাড়ছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ জসিম পৈতৃকভাবেই কৃষি কাজের সাথে জড়িত। তার জমিতে উৎপাদিত ফসল দিয়ে পারিবারিক ভরণপোষণ করতেই শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে কামাল তার জমিতে ফসল উৎপাদন করে শুধু বাজারে বিক্রি করবে এই উদ্দেশ্যে। *[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বায়োটেকনোলজি কাকে বলে? ১

খ. কৃষিঋণ কীভাবে কৃষকদের উপকার করে? ২

গ. কামালের ফসল উৎপাদন কোন ধরনের খামারের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জসিম ও কামালের খামারের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অণুজীবের পরিমিত রূপান্তর ও মান উন্নীতকরণে যে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়, তাকে বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তি বলে।

খ কৃষিঋণ বিভিন্নভাবে কৃষকদের উপকার করে।

এদেশে কৃষি মূলত ভরণ-পোষণ পর্যায়ে পরিচালিত হয়। নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর পর কৃষকদের নিকট কৃষিপণ্য স্বল্পতাই উদ্বৃত্ত থাকে। এজন্য কৃষকদের আয় অনেক কম হয়। দরিদ্র বলে উৎপাদনের প্রয়োজনে তারা নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। এজন্য তাদের ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষি ঋণের সাহায্যে কৃষকেরা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়, পানি সেচের ব্যবস্থা, গুদামঘর নির্মাণ, পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সহজে এবং নির্ভাবনায় করতে পারে। এতে করে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করে কৃষকেরা উপকৃত হতে পারে।

গ উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে উদ্দীপকের কামালের সফল উৎপাদন বাণিজ্যিক খামারের অন্তর্ভুক্ত।

এদেশের বেশিরভাগ খামারই জীবন নির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। তবে কিছু কিছু খামার আছে যেগুলো মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়। সেই খামারগুলোই হচ্ছে বাণিজ্যিক খামার।

উদ্দীপকের কামাল বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তার খামারে কৃষিকাজ পরিচালনা করে। তাই বলা যায়, কামালের খামারটি একটি বাণিজ্যিক খামার। সাধারণত ৭.৫০ বা তদূর্ধ্ব একর বিশিষ্ট খামারগুলো বাণিজ্যিক খামারের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য খামার পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, পণ্য বাজারজাতকরণসহ সকল কার্যক্রম একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সম্পাদিত হয়। এসকল খামারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষ দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদন কাজে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকে বলে এ ধরনের খামারে ঝুঁকির পরিমাণও বেশি থাকে। তাই এ ধরনের খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দক্ষ পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশের মোট খামারের প্রায় ২.৫২% হলো বাণিজ্যিক খামার, যা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘ উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জসিম ও কামালের খামারের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

উৎপাদনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জসিমের খামারটি হলো জীবননির্বাহী খামার এবং কামালের খামারটি বাণিজ্যিক খামার। পারিবারিক ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে যে খামার পরিচালিত হয় তা হচ্ছে জীবননির্বাহী খামার। অপরদিকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৃহৎ আকারে পরিচালিত খামারকে বলা হয় বাণিজ্যিক খামার। এ দু'ধরনের খামারের মধ্যে কিছু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, জীবনধারণের জন্য পরিচালিত খামারে পারিবারিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করা হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক খামারে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষিকার্য পরিচালিত হয় সুতরাং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই এরূপ খামারের মূল লক্ষ্য। পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এর উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত, জীবননির্বাহী খামারে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় বলে খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে, বাণিজ্যিক খামারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহৃত হয় বলে অধিক মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। তৃতীয়ত, জীবননির্বাহী খামারের আয়তন ছোট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত থাকে। অপরদিকে বাণিজ্যিক খামার বৃহদায়তন হয়। সাধারণত একেকটি খামার প্রায় ৭.৫০ একর বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। চতুর্থত, জীবনধারণ নির্বাহী খামারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো নেই। এটি মূলত পারিবারিকভাবে পরিচালিত হয়। অপরদিকে বাণিজ্যিক খামারের পরিচালনা একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পরিচালিত হয়। পঞ্চমত, জীবননির্বাহী খামারে পারিবারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক খামারে মূলত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জসিম ও কামালের খামারের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার কৃষকরা কয়েক বছর আগেও তাদের জমি থেকে পর্যাপ্ত ফসল পেত। কিন্তু বর্তমানে একটি বিশেষ কারণে তাদের ফসলের উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পরে তার কৃষি কর্মকর্তার কাছে জানতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঐ বিশেষ কারণে ফসলের উৎপাদন কমার সাথে সাথে পরিবেশগত ঝুঁকিও বাড়ছে। *[মদন মোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষিপ্রযুক্তি কী? ১

খ. যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপকূলীয় এলাকার কৃষকরা যে কারণে ফসল কম পাচ্ছে তার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে কী করণীয় আছে বলে তুমি মনে কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, কৌশল ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, প্রতিকূল পরিবেশে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়, তাকে কৃষিপ্রযুক্তি বলে।

খ বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য তাই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য।

কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও রেলপথের সম্প্রসারণ করা দরকার। প্রতিটি জেলা শহরের সাথে গ্রাম অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হলে যোগান বৃদ্ধির দরুন দাম হ্রাস পাবে না। দ্রুত পচনশীল পণ্য পরিবহনের জন্য দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা করা হলে পণ্য পচে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তাই বলা যায়, যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়ন হলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের উপকূলীয় এলাকার কৃষকেরা জমিতে অতিরিক্ত লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে ফসল কম পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও উৎপাদন আশানুরূপ নয়। এর অন্যতম কারণ হলো এখানকার কৃষি পরিবেশ দূষণের শিকার। ঘন ঘন সংঘটিত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে এখানকার কৃষি পরিবেশ আশঙ্কাজনকভাবে দূষিত হচ্ছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যপটে দেখা যাচ্ছে, যে উপকূলীয় কৃষকেরা আগে জমি থেকে পর্যাপ্ত ফসল পেত বর্তমানে একটি বিশেষ কারণে তারাই ফসল কম পাচ্ছে। উক্ত বিশেষ কারণটি হচ্ছে জমির লবণাক্ততা সৃষ্টি, যা বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কার্বনডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় প্লাবিত নিম্নাঞ্চলে লবণাক্ততার হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, উত্তরাঞ্চলে খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। যা কৃষি উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

ঘ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট উত্তরণের উপায়সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

কৃষি প্রযুক্তি ও ICT ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহনীয় বীজ উদ্ভাবন করতে হবে। এর ফলে লবণাক্ত পানির দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে লম্বা জাতের ধান চাষাবাদ করতে হবে।

আবার, খরায় উদ্ভিদের দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। কিছু জাতের উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে বিষাক্ততার মাত্রা কমিয়ে খরা সহনশীল করে তোলে। এ সকল জাতের উদ্ভিদ খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদ করা যেতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে সৃষ্ট জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলোতে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে পানিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বাতাসে কার্বন ও কার্বনজাত বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের বৃদ্ধি। তাই এই সকল ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য সরকারকে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। কারণ, গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে বিদ্যমান পরিবেশ দূষণজনিত সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ গণি মিয়া উত্তরাঞ্চলের একজন কৃষক। সে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করে। গতকাল সে তার উৎপাদিত শাকসবজি নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। খুব সস্তায় সে তার শাকসবজি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কারণ এ বছর খুব বেশি শাকসবজি উৎপাদিত হয়েছে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. আবহাওয়ার উপর শাকসবজি উৎপাদন কীভাবে নির্ভর করে? ২

গ. গণি মিয়ার শাকসবজির ন্যায্য দাম না পাওয়ার কারণগুলো কী কী? ৩

ঘ. গণি মিয়ার মতো অন্য কৃষকরা যাতে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য না হয় তার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে, তাকে কৃষিজোত বলে।

খ শাকসবজি হলো কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। এ উপখাতটির উৎপাদন আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর একটি দেশ। এদেশের কৃষির একটি মৌলিক সমস্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীলতা। আমদের দেশের সেচব্যবস্থা অনুন্নত বিধায় মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয়। তাই যে বছর প্রাকৃতিক আবহাওয়া আমাদের অনুকূলে থাকে সে বছর ফলন ভালো হয়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। সে হিসেবে কৃষির বৃহৎ উপখাত শাকসবজির উৎপাদনেও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে শাকসবজির উৎপাদন বেশি হয়। আর যদি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি দেখা দেয় তবে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

গ গণি মিয়া তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণ গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাব, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার তথ্যের অভাব এবং সরকারি নীতি নির্ধারণের অভাব।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার সুসংগঠিত নয়। এক বাজারের সাথে আরেক বাজারের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। একেক বাজারের দ্রব্যের বিভিন্ন রকম দাম পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে কৃষক ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া যখন ফসল সংগ্রহ করা হয় তখন পণ্যের দাম কম থাকে। তাই ওই সময় ফসল বিক্রি না করে যদি গুদামে সংরক্ষণ করা যায়, যখন দাম বাড়বে তখন বিক্রি করতে পারলে ন্যায্যমূল্য পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের তেমন গুদামঘর তৈরি হয়নি। তাছাড়া অধিকাংশ ফসল পচনশীল, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। আবার, বাংলাদেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাও খুবই নিম্নমানের। তাই দূরবর্তী স্থানে পণ্য বিক্রি করা ব্যয়বহুল, কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ।

উদ্দীপকে গণি মিয়া একজন কৃষক। সে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করে এবং স্থানীয় বাজারে খুব সস্তায় তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থায় উপরিউক্ত সমস্যাগুলো থাকায় গণি মিয়া তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পায় না।

ঘ গণি মিয়ার মতো কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কৃষিপণ্যের মূল্য নিশ্চিত করতে উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা খুবই জরুরি। যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে কৃষকরা তাদের শস্য স্থানীয় বাজারে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে ফসল উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশ মূল্যই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। বিভিন্ন দালাল, মজুতদার, আড়তদার কৃষিপণ্য বাজার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এ সকল সমস্যা দূরীকরণে কৃষিপণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। আবার, যখন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন দাম দ্রুত কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও উঠাতে পারে না। এই সময় সরকার কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে।

আবার, কিছু শস্যপণ্য সহজেই পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: আলু, পেঁয়াজ, আদা, কাঁচামরিচ, পান ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগে যদি এ সকল ফসল সংরক্ষণ করা যায় তবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে। এ প্রেক্ষিতে যখন কৃষিতে বাম্পার ফলন হয় তখন সরকার কৃষিপণ্য ক্রয় করে, সংরক্ষণ করলে দামের নিম্নগতি রোধ হয়। আবার যখন উৎপাদন কম হয় তখন বাজারে স্টকের মাধ্যমে পণ্য বাজারে ছাড়লে দামের উর্ধ্বগতি রোধ হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সরকারের উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়িত হলে গণি মিয়ার মতো কৃষকরা কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হবে না, বরং তারা ফসলের ন্যায্যমূল্য পাবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৪ আনোয়ার হোসেন একজন ক্ষুদ্র চাষি। তার পুঁজি যেমন কম তেমনি জমির পরিমাণও কম। সে মূলত পরিবারের সদস্যদের জীবন নির্বাহের জন্য চাষাবাদ করে থাকে। এতে তার বাড়তি অর্থ উপার্জনের কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের কৃষকেরা যদি সমবায় খামারের ভিত্তিতে চাষাবাদ করে তাহলে কৃষির উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি কৃষকেরাও লাভবান হয়। তবে এক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যে সমবায়ভিত্তিক মানসিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষি খামার কাকে বলে? ১

খ. জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. আনোয়ার হোসেন কেন জীবন নির্বাহী খামারের ভিত্তিতে চাষাবাদ করে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষকদেরকে কীভাবে সমবায় খামার পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা যায়— আলোচনা কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যবহার করে তাকে কৃষি খামার বলে।

খ চাষ পদ্ধতি, মূলধনের পরিমাণ, আয় উপার্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন নির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন–

১. জীবননির্বাহী খামারে সনাতন পদ্ধতিতে এবং বাণিজ্যিক খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

২. জীবননির্বাহী খামারে মূলধন কম ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক খামারের মূলধন বেশি থাকে।

৩. জীবন নির্বাহী খামারে মূলত পরিবারের সদস্যরাই কাজ করে থাকে, তাই নতুন কোনো লোকের কর্ম সংস্থান হয় না। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক খামারে বৃহৎ পরিসরে চাষাবাদ করা হয় বলে এখানে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দেশের দিক থেকে আনোয়ার হোসেন জীবননির্বাহী খামারে কৃষিকাজ করেন। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

আনোয়ার হোসেন একজন দরিদ্র কৃষক। তার জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম অথচ পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। এ অবস্থায় কম পরিমাণ জমিতে মামুলিভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে তিনি যা উৎপাদন করেন তা দিয়ে কোনো রকমে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।

যে কৃষিকাজের দ্বারা কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে পরিবারের কোনো রকমে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে তাই হলো জীবননির্বাহের জন্য কৃষিকাজ। এখানে জমির পরিমাণ এতই কম থাকে যে কৃষিকাজের দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণের পর সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে যা দিয়ে কৃষক মামুলিভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে যায়। কেবল পরিবারের ভোগের উদ্দেশেই কৃষিকাজ পরিচালনা, কৃষিকাজে শুধু পরিবারের সদস্যদেরকেই নিয়োগ, মালিকের স্বয়ং চাষাবাদ, পরিবারের প্রয়োজন মেটায় এমন পণ্যসমূহ উৎপাদন ইত্যাদি হলো এ কৃষিকাজের বৈশিষ্ট্য। এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায়, আনোয়ার হোসেন মূলত নিজেকে ও পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই জীবননির্বাহী খামারে কৃষি কাজ করেন।

ঘ নিম্নে বর্ণিত উপায়ে উদ্দীপকের কৃষকদেরকে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

একই এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকরা পারস্পরিক কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় সমমর্যাদার ভিত্তিতে নিজেদের জমি, শ্রম ও মূলধন একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ করলে তাকে সমবায় খামার বলে। এক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল জমি ও প্রদত্ত যাবতীয় উপকরণ অনুপাতে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সাধারণত বৃহদায়তনে উৎপাদনের উদ্দেশে ক্ষুদ্রায়তনের খামারগুলো একত্রিত করে এ ধরনের খামার গঠন করা হয়। এ ধরনের খামারের প্রত্যেকের জমির মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকে।

উদ্দীপকের আনোয়ার হোসেন একজন ক্ষুদ্র চাষি। তার জমির পরিমাণ খুবই কম। এই কম জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলের অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এর ফলে তার আর্থিক অবস্থার ও কোনো পরিবর্তন হয় না। আনোয়ার হোসেনের মতো কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজের কোনো বিকল্প নেই এবং সমবায় পদ্ধতির সুবিধাগুলো সম্পর্কে প্রথমে তাদেরকে সম্যক ধারণা দিতে হবে। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজে করলে তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলোকে একত্র করে একটি বৃহৎ কৃষিজোত গঠন করে সেখানে সকলের ছোট ছোট পুঁজি একত্র করে বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন কাজ চালাতে সক্ষম হবে। এছাড়া কৃষিতে উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে তখন তারা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে উৎপাদিত ফসল দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রয় করার মাধ্যমে অতিরিক্ত কিছু অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজ ব্যতীত উদ্দীপকের ক্ষুদ্র কৃষকদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের ভিত্তিতে উদ্দীপকের আনোয়ার হোসেনের মতো কৃষকদের সমবায় খামার পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ শামীম শিক্ষিত চাষি। পূর্বে তার জমি থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন হতো না। কিন্তু বর্তমানে শামীম ঐ জমিতে সারা বছরই বিভিন্ন শস্য ও সবজি উৎপাদন করেন। এছাড়া তিনি উন্নত যন্ত্রপাতি, বীজ এবং তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছেন। তাই আরো ১ বিঘা জমি ভাড়া নিয়ে ফসল, শস্য ও সবজি চাষের পরিধি বাড়াবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. কৃষির উপখাতগুলো কী কী? ২

গ. শামীমের একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষাবাদ কোন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে শামীমের পদ্ধতিসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যবহার করে তাকে কৃষি খামার বলে।

খ কৃষির উপখাতগুলো হলো– শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ।

বাংলাদেশের কৃষিখাত শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ এ তিনটি প্রধান উপখাত নিয়ে গঠিত। কিন্তু সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদকেও একটি উপখাত হিসেবে গণ্য করা হয়। শস্য ও শাক সবজি বাংলাদেশের কৃষির সর্ববৃহৎ খাত। এ খাতের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদিত হয়। গৃহে পালিত নানাজাতীয় পশু-পাখি নিয়ে গঠিত হয় প্রাণিসম্পদ উপখাত। বাংলাদেশের কৃষির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হলো বনজ সম্পদ খাত। কাঠ, বাঁশ, বেত, মোম, মধু, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, গোলপাতা, শন ইত্যাদি এ উপখাত থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় বাংলাদেশে সরকার একে একটি পৃথক খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শামীমের একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

একটি খামার বা একই জমিতে বছরে একটি শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন করার পদ্ধতিকে বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ। এ পদ্ধতিতে বছরের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া, মাটির গুণগত অবস্থা, সেচ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ফসল চাষাবাদ করা হয়। এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শামীম একই জমিতে সারা বছর বিভিন্ন শস্য ও সবজি উৎপাদন করে। অর্থাৎ, সে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শুধু একটি ফসল উৎপাদন না করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল বা শস্য চাষাবাদ করে, যা শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। কাজেই বলা যায়, শামীমের একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন শস্য বহুমুখীকরণকে নির্দেশ করে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শামীমের গৃহীত পদ্ধতিগুলো উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কৃষি উৎপাদনে শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে (ঋতুভেদে) বিভিন্ন শস্য ও সবজি চাষাবাদ করলে মাটির উপাদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও মাটির গুণাগুণ ঠিক থাকে। এতে উৎপাদন বেশি হয়। এর ফলশ্রুতিতে কৃষকের মুনাফা বেশি তথা দেশের GDP বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, শিক্ষিত শামীম তার নির্দিষ্ট জমিতে একাধিক শস্য ও সবজি উৎপাদন করে এবং তার উৎপাদনে উন্নত যন্ত্রপাতি, বীজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে উৎপাদন অনেক বেশি হয়েছে। তাই সে আরো ১ বিঘা জমি ভাড়া নিয়ে ফসল উৎপাদনের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবার উন্নত কৃষি প্রযুক্তি যেমন ট্রাক্টর, সেচ পাম্প, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করলেও উৎপাদন বাড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক, কৃষক শামীমের মতো উন্নত বীজ, জৈব সার, ICT ও শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে। এর ফলে সাধারণ কৃষক ছাড়াও অনেক শিক্ষিত বেকার কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এতে সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি এবং খাদ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। কাজেই বলা যায়, রাজুর গৃহীত পদ্ধতিগুলোর কল্যাণে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ রহিমা একজন নারী উদ্যোক্তা। আগে তিনি নিজে ঘরে বসে হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তার স্বামীও তাকে সহযোগিতা করেন। তিনি অধিক উৎপাদনের জন্য ১০ জন মহিলা শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠানটির মূলধন প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও ব্যাপৃত। *[স্কলারসহোম, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কাকে বলে? ১

খ. দেশের উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন কেন? ২

গ. রহিমার প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের শিল্প নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে, সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

খ দেশের উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা হলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূলতা ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

কোনো দেশ যেসব দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানি করে সেসব দ্রব্য আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় নিজ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করে তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। এ ধরনের শিল্প স্থাপনের ফলে দেশীয় শিল্প বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তাই, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন।

গ কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ও মূলধন মূল্যের ভিত্তিতে রহিমার প্রতিষ্ঠানটি কুটিরশিল্পকে নির্দেশ করে।

'শিল্পনীতি-২০১৬'-অনুসারে, যে শিল্পে স্বল্প মূলধন (১০ লক্ষ টাকার নিচে) এবং পারিবারিক সদস্যসহ সর্বাধিক ১৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে, তাকে কুটিরশিল্প বলে। সাধারণত পারিবারিক মালিকানায় গৃহের ভেতরে বা পাশে (ছোট পরিসরে এ শিল্প স্থাপিত হয়। যেমন— তাঁত শিল্প, বাঁশ শিল্প, কাঠ ও বেত শিল্প ইত্যাদি হলো কুটিরশিল্প।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রহিমা একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি নিজ ঘরে বসে হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য বাজারে বিক্রি করেন। এ কাজে তার স্বামীও তাকে সহযোগিতা করে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ১০ জন এবং মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। কাজেই বলা যায়, রহিমার প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্যসমূহ কুটির শিল্পকে নির্দেশ করে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমার প্রতিষ্ঠান তথা কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের অধিকাংশ মানুষ মূলধনের অভাবে কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এছাড়া দেশের মূলধন গঠনের হারও কম। মূলধন গঠনের হার কম হওয়ায় এক্ষেত্রে কুটির শিল্প স্থাপন করা যায়। আর কুটিরশিল্পে স্বল্প পুঁজি ও ঘরোয়া পরিবেশে উৎপাদন করা যায়। তাই, কুটিরশিল্প স্থাপিত হলে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান ঘটবে। সর্বোপরি, দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে। তাছাড়া, বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই বিশাল নারী সমাজের অধিকাংশই ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক কারণে ঘরের বাইরে কাজ করতে পারে না। তাই এই নারী সমাজ কুটিরশিল্পের মাধ্যমে দেশের মোট উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে।

আবার, কুটিরশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে দেশীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

উপর্যুক্ত দিকগুলো ছাড়াও কুটিরশিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, রহিমার প্রতিষ্ঠান তথা কুটিরশিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ কুড়িগ্রামের আনোয়ার একজন শিক্ষিত বেকার। সে কৃষির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের জমিতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করে। তার উৎপাদিত সবজি গ্রামের ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করে শহরের ভোক্তাদের চাহিদা মেটায়। কিন্তু আনোয়ার সবজি চাষ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল, অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আনোয়ারের উৎপাদিত পণ্য যে প্রক্রিয়ায় ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কৃষকের অধীনে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমিকে কৃষি খামার বলে।

খ একই জমি বা কৃষিজোতে বিভিন্ন মৌসুমে এক ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

একই জমিতে বার বার একই ফসল না চাষ করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন দুটিই বৃদ্ধি পায়। এরূপ চাষাবাদ করাই হলো শস্য বহুমুখীকরণ। শস্য বহুমুখীকরণের মধ্য দিয়ে বিগত দুই দশক যাবৎ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনোয়ারের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি দ্বারা কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীর কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, গুদামজাতকরণ, মালিকানা বদল, পরিবহন, বণ্টন, বিক্রয় ইত্যাদি কর্মস্তরের মাধ্যমে কৃষি বিপণন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষকরা উপযুক্ত দামে

Teachingbd24.com

তাদের পণ্যসমূহ বিক্রি করে আয় ও সঞ্চয় বাড়াতে পারবে। তখন এ খাতে বিনিয়োগ বাড়বে, কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত হলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়বে।
কাজেই বলা যায়, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে আনোয়ার তার উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের নিকট সহজেই পৌঁছে দিতে পারছে।

ঘ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। কৃষি পণ্যের বিপণনের সমস্যাগুলো হলো—

১. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কাঁচা রাস্তা ও অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য দূরের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে নিয়ে গিয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না। ফলে তারা স্থানীয় বাজারেই কম দামে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে ফেলে।
২. এদেশের বেশিরভাগ কৃষক অজ্ঞ ও নিরক্ষর। তারা কৃষিপণ্যের চাহিদা, যোগান, মান, দাম ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না। এজন্যও তারা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।
৩. এদেশের কৃষি বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে দালাল, ফড়িয়া, বেপারি আড়তদার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী অবস্থান করে। এরা কৃষকদের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে কম দামে তাদের পণ্য ক্রয় করে। এজন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদনের উপযুক্ত দাম পায় না।
৪. বাংলাদেশে নিম্নমানের বীজ, শস্যোৎপাদনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, প্রাচীন পদ্ধতিতে ফসল কর্তন, সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিম্ন হয়। তাছাড়া পণ্যের সুষ্ঠু শ্রেণিবিভাগ, মান নির্ধারণ এবং নমুনাকরণেরও অভাব রয়েছে। এজন্য কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। সে জন্যই এখানকার কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না এবং তাদের আয় ও সঞ্চয় বাড়ে না। ফলে তারা কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ বাংলাদেশের মোট দেশজ উপাদন (GDP) এ কৃষি খাতসমূহের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার নিম্নরূপ:

খাতসমূহ	অবদান (শতকরা হার)		
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
শস্য ও শাকসবজি	৭.৫৭	৩.৮৫	১.৭৫
বনজ সম্পদ	৫.৩৪	৫.৫৬	৫.৯৬
মৎস্য সম্পদ	৪.৬০	৬.৬৯	৫.৩২

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৪]

ক. মাশরুম চাষ কী? ১
খ. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সালে কৃষি খাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষির উপখাতসমূহের তুলনামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাশরুম নামক এক ধরনের খাওয়ার উপযোগী সাদা, ডিম্বাকার ছত্রাকের চাষকে বলা হয় মাশরুম চাষ। এটি কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত।

খ একই জমি বা কৃষিজোতে বিভিন্ন মৌসুমে এক ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।
একই জমিতে বার বার একই ফসল না চাষ করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন দুটিই বৃদ্ধি পায়। এরূপ চাষাবাদ করাই হলো শস্য বহুমুখীকরণ। শস্য বহুমুখীকরণের মধ্য দিয়ে বিগত দুই দশক যাবৎ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকের আলোকে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-১২ সালে কৃষিখাতসমূহের অবদান দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

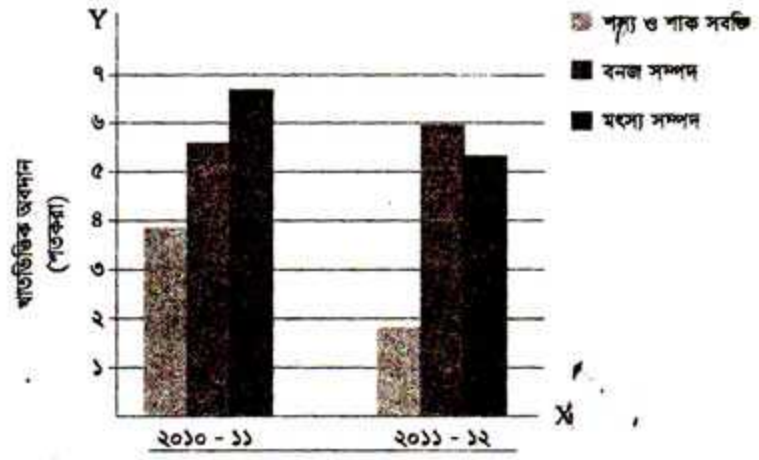

উদ্দীপকের চিত্রে X অক্ষে সাল এবং Y অক্ষের কৃষি খাতসমূহের শতকরা অবদান দেখানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষির উপখাতসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—
বাংলাদেশের কৃষিখাত তিনটি প্রধান উপখাত নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো— শস্য ও শাক সবজি, প্রাণিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাত কিন্তু সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদকে একটি উপখাত হিসেবে গণ্য করা যায়।
শস্য ও শাকসবজি, বিভিন্ন প্রকার শস্য ও শাকসবজি নিয়ে এ উপখাত গঠিত। এটি কৃষির বৃহত্তম উপখাত। শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষি জমির ৯০% জমিতেই খাদ্যশস্যের চাষ হয়, এর মধ্যে প্রায় ৮০% জমিই ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে খাদ্য ও শাক সবজির উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। উদ্দীপকের সূচি অনুযায়ী, ২০০৯-১০ অর্থবছরে GDP-এর অবদান ছিল ৭.৫৭%, ২০১০-১১ তে ছিল ৩.৮৫% এবং ২০১১-১২ সালে এসে তা ১.৭৫% এ দাঁড়িয়েছে। বনজ সম্পদ; কাঠ, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ, বেত, মোম, মধু, গোলপাতা, শন ইত্যাদি নিয়ে এ উপখাত গঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট ভূ-খণ্ডের ১১% হলো বনভূমি। ২০০৯-১০ সালে GDP তে এ খাতের অবদান ছিল ৫.৩৪%, ২০১০-১১ তে ৫.৫৬% এবং ২০১১-১২ তে ছিল ৫.৯৬। মৎস্য সম্পদ; বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হচ্ছে মৎস্য সম্পদ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য নিয়ে এ উপখাত গঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশের GDP-তে এ খাতটিকে একটি পৃথক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০০৯-১০ সালে GDP-তে এ খাতের অবদান ছিল ৪.৬০%, ২০১০-১১ তে ৬.৬৯% ও ২০১১-১২ সালে ছিল ৫.৩২%।
উদ্দীপকের সূচিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, GDP-তে শস্য ও শাকসবজির অবদান ব্যাপক হাঁরে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে, বনজ ও মৎস্য সম্পদের অবদান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ বিজয় ৭ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। পৈতৃক ২ বিঘা জমি, বাবার ঋণ এবং মা ও কয়েকজন ভাইবোন নিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। কৃষিকাজে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য প্রায় তাকে কৃষিঋণ গ্রহণ করতে হয়। বোনের বিয়ের জন্য তাকে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়। এছাড়াও পরিবার চালানোর জন্য তাকে প্রায় ঋণ নিতে হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় লেগেই আছে।

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষির পণ্য বিপণনে দুটি প্রধান সমস্যা লিখ। ১
খ. জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামার কি একই? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিজয় যে ঋণগুলো নিয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিজয়ের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে যেসব কৃষিঋণ সাধারণত গ্রহণ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দাও। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষির পণ্য বিপণনে প্রধান দুটি সমস্যা হলো—
১. পণ্যের নিম্নমান এবং শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের সমস্যা।
২. অনুন্নত পরিবহন খাত।

https://teachingbd24.com

খ হ্যাঁ, বাণিজ্যিক খামার ও জীবননির্বাহী খামার দুটি ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে।

বাণিজ্যিক খামার বলতে বৃহৎ আয়তনের ভূমি যেখানে অধিক শ্রম, পুঁজি, প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, অধিক উদ্বৃত্ত এবং অধিক মুনাফার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের খামারে উৎপাদন কার্য পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণে দক্ষ শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। অন্যদিকে জীবননির্বাহী খামার বলতে ক্ষুদ্র আয়তনের ভূমি যেখানে উত্তম চাষাবাদের মাধ্যমে যে ফসল উৎপাদিত হয় তা দ্বারা কৃষক কোনো রকমে জীবন নির্বাহে সক্ষম। এ ধরনের খামারে ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত এবং পরিচালনা অদক্ষ হওয়ায় উদ্বৃত্ত কম সৃষ্টি হয়।

গ দরিদ্র কৃষক বিজয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে ঋণ নিয়েছে। নিচে উদ্দীপকের ভিত্তিতে তার নেয়া ঋণগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **পৈতৃক ঋণ:** বিজয়ের বাবা একসময় জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়; কিন্তু পরে আর্থিক দুরবস্থার কারণে জীবদ্দশায় আর পরিশোধ করে যেতে পারেনি। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে জমিজমার মালিক হওয়ার সাথে সাথে তার ওপর পিতার নেয়া ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্বও বর্তায়। জীবনের শুরুতে তাই ঋণ না নেয়া সত্ত্বেও সে ঋণজালে আবদ্ধ হয়।

২. **কৃষি উপকরণসমূহ ক্রয়ের জন্য ঋণ:** বিজয় একজন দরিদ্র কৃষক। সে তার সীমিত জমিতে যা উৎপাদন করে তা দিয়ে কোনো রকমে পরিবারের ভরণপোষণ করে; ফসলের মৌসুম শেষে কৃষিকাজে বিনিয়োগ করার মতো কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ তার হাতে থাকে না। তাই কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কেনার নিমিত্তে তাকে ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়।

৩. **সামাজিকতা পালনের জন্য ঋণ:** কৃষিকাজের জন্য ঋণ নেয়া ছাড়াও বিজয়কে অন্য কাজের জন্য ঋণ নিতে হয়। আর তা হলো— বোনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন। বোনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব; এর জন্য কিছু খরচ করতেই হয়। হাতে নগদ টাকা না থাকায় বোনের বিয়ের ব্যয় মেটানোর জন্যও বিজয়কে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়।

এভাবে দেখা যায়, কৃষক বিজয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঋণ নিয়েছে।

ঘ বিজয়ের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে। নিচে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **স্বল্পমেয়াদি ঋণ:** স্বল্পমেয়াদি ঋণ সাধারণত ছয় মাস থেকে এক বছরের জন্য প্রয়োজন হয়। জমির খাজনা পরিশোধ, বীজ ও সার ক্রয় প্রভৃতির জন্য কৃষকের এ ধরনের ঋণের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও গরু, ছাগল পালন, মুরগি ও মাছের খামার ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের জন্য কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে। কখনো কখনো কৃষক গৃহীত কৃষিঋণ কৃষিকাজে ব্যয় করার পরিবর্তে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে। সাধারণত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য এ ধরনের ঋণ ব্যয় করা হয়। অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়া যায় না বলে কৃষককে এ ঋণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের দিকে হাত বাড়াতে হয়। ফলে এ ঋণের সুদের হারও খুব বেশি হয়। কখনো কখনো কৃষক ভোগ ব্যয় নির্বাহের জন্যও স্বল্প মেয়াদে ঋণ নেয়।

২. **মধ্যম মেয়াদি ঋণ:** এ ধরনের ঋণ এক বছর থেকে পাঁচ বছরের জন্য প্রয়োজন হয়। কৃষি-যন্ত্রপাতি যেমন— শ্যালো পাম্প মেশিন, স্প্রেয়ার, পাওয়ার টিলার, গরু-মহিষ ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য কৃষক মধ্যমমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। মধ্যম মেয়াদি ঋণের অর্থ ব্যয় করে তা থেকে প্রতিদান পেতে সময় লাগে। এ জন্য কৃষককে এ ঋণের বোঝা কয়েক বছর ধরেই টানতে হয়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদি ঋণ:** দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সাধারণত পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। সাধারণত অবস্থাপন্ন কৃষকরাই এ ধরনের ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কৃষিজমির স্থায়ী উন্নতি বিধান— যেমন, জমি ভরাটকরণ, জমি সমতলকরণ, জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনে কৃষক এ ঋণ গ্রহণ করে।

এভাবে বিজয়ের মতো কৃষকরা সময়ের ভিত্তিতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫০ প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংকট উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ফলে বন্যা, খরাতেও উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। ছোট গাছে অধিক ফলন ও সুস্বাদু ফল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

[পুলিশ লাইনস স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৩]

ক. জীবননির্বাহী খামার কাকে বলে? ১

খ. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ২

গ. উদ্দীপক কৃষিতে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষিতের সংকট উত্তরণে আর কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খামারে পাবিরারিক শ্রম ব্যবহার করে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কষিপণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে জীবননির্বাহী খামার বলা হয়।

খ শস্য বহুমখীকরণ হচ্ছে একটি শস্য উৎপাদনের পরিবর্তে অন্য একটি শস্য উৎপাদন করা অথবা একটি প্রচলিত শস্য উৎপাদন বজায় রেখে নতুন শস্য উৎপাদন করা।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে জোর দেয়। ফলে অপ্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমতে থাকে। মানুষের খাদ্যের চাহিদা ও পুষ্টির স্বার্থে এই অপ্রধান খাদ্যশস্যগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়। এ খরচ কমানোর উদ্দেশে সরকার ১৯৯০ সালে শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে কৃষিতে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে তা হলো জৈব প্রযুক্তি। নিচে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—

সম্পদ সীমিত কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত দেশসমূহে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব অনেক। যেমন— বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, জলবায়ুর পরিবর্তন, উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রভৃতির কারণে দেশসমূহে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং এর ফলে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধী খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব রয়েছে। উচ্চ ফলন বীজ উদ্ভাবনে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রতিটি চাষের মাধ্যমে ৩০-৪০% ফলন অধিক বাড়ানো যায়। হিরা, আলোড়ন, সোনার বাংলা প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল ধানের উদাহরণ।

জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিংকসমৃদ্ধ ধান, লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এভাবে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূরীকরণ এবং মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। জৈব প্রযুক্তি পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ কোষ, টিস্যু কালচার, রোগ-পতঙ্গবিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন DNA পরিবর্তন ইত্যাদি করা হয়। DNA পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাদের পরিবর্তন, রোগ প্রতিরোধী শস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ কৃষিতে সংকট উত্তরণের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

পরিবেশ দূষণের দরুন কৃষিতে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা সমাধান করার জন্য পারমাণবিক ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষিতে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, শস্যরোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণরোধ সার ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বীজ সংরক্ষণ, অধিক উৎপাদন ইত্যাদি কাজে কৃষি পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধী ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন ও গবাদিপশু প্রজনন, অধিক উৎপাদনক্ষম প্রজাতির উদ্ভিদ উৎপাদন ও গবাদিপশুর প্রজনন কাজে বায়োটেকনলজি পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তি, উন্নত কৃষি উপকরণসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের নিয়মকানুন-রোগ বালাই দমন, কৃষি উৎপাদন সর্বাধিক করার কৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইসিটি-এর ব্যবহার হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, উপরে উল্লিখিত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে কৃষিতে সংকট উত্তরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৫১ দিদার তার কৃষি খামারে নানা ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করে এবং খামারের কাছে এক আড়তদারের নিকট কম দামে বিক্রি করে দেয়। পরে সে জানতে পারে বাজারে শাকসবজির দাম অনেক বেশি।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষি খামার কাকে বলে? ১

খ. মাশরুমের গুণাগুণ লেখ। ২

গ. দিদার কেন তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না? ৩

ঘ. দিদারের মতো কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যহার করে থাকে তাকে কৃষি খামার বলে।

খ ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ মাশরুমের অনেক গুণাগুণ রয়েছে।

মাশরুমে আমিষ, শর্করা এবং চর্বি জাতীয় উপাদান রয়েছে। বিভিন্ন রোগব্যাধি নিরাময়ে মাশরুম এক মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। তবে এতে চর্বি ও শর্করা কম থাকায় এটি জায়াবেটিস রোগীর আদর্শ খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। মাশরুম চাষের জন্য ফসলি জমির প্রয়োজন হয় না। তাই কম মূলধন, সস্তা শ্রম এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর চাহিদা থাকায় ঘরে বসেই বেকার যুবক-যুবতীরা মাশরুম চাষ করে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

গ দিদার তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণ গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাব, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার তথ্যের অভাব, সরকারি নীতি নির্ধারণের অভাব।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার সুসংগঠিত নয়। এক বাজারের সাথে আরেক বাজারের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। একেক বাজারে দ্রব্যের বিভিন্ন রকম দাম পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে দিদার ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। যখন ফসল সংগ্রহ করা হয় তখন সাধারণত পণ্যের দাম কম থাকে। তাই ঐ সময় ফসল বিক্রি না করে যদি গুদামে সংরক্ষণ করা যায় এবং যখন দ্রব্যের দাম বাড়বে তখন বিক্রি করতে পারলে ন্যায্যমূল্য পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষিপণ্যে সংরক্ষণের তেমন গুদামঘর তৈরি হয়নি। তাছাড়া অধিকাংশ ফসল পচনশীল, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তাই দিদার স্বল্প মূল্যে ফসল বিক্রি করেছেন। বাংলাদেশে দিদারের মতো কৃষকরা তাদের ফসলের গুণগত মান অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে না। আবার কিছু পণ্য আছে যা শ্রেণিবিন্যাস করা জটিল। তাই গুণগত মানের দিক থেকে ভালো পণ্যও নিম্নমানের পণ্যের দামে বিক্রি করতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা খুবই নিম্ন মানের। তাই দূরবর্তী স্থানে পণ্য বিক্রি করা ব্যয়বহুল, কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ। এ জন্য দিদার তার উৎপাদিত শাকসবজি স্থানীয়ভাবে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

ঘ দিদারের মতো কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কৃষিপণ্যের মূল্য নিশ্চিত করতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই জরুরি। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে কৃষকরা তাদের শস্য স্থানীয় বাজারে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ জন্য প্রয়োজন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। যা ব্যক্তি উদ্যোগে সম্ভব নয়, দরকার সরকারি উদ্যোগ। অন্যদিকে, কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে ফসল উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশ মূল্যই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। বিভিন্ন দালাল, মজুদদার, আড়ৎদার কৃষিপণ্য বাজার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা নানাভাবে বিভিন্ন অজুহাতে কৃষকদের ঠকায়। এ সকল সমস্যা দূরীকরণে কৃষিপণ্য বিপণনে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। বাফার স্টকের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ঊর্ধ্বগতি এবং নিম্নগতি রোধ করা যায়। যখন কৃষিতে বাম্পার ফলন হয় তখন সরকার কৃষিপণ্য ক্রয় করে, সংরক্ষণ করে। ফলে কৃষিপণ্যের দামের নিম্নগতি রোধ হয়। আবার যখন কৃষি উৎপাদন কম হয়, তখন বাফার স্টকের পণ্য বাজারে ছাড়লে পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ পায়। আবার, যখন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন দাম দ্রুত কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচও উঠাতে পারে না। এই সময় সরকার কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করতে পারে। কিছু কৃষিশস্য সহজেই পচে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, পান, আদা ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগে যদি এ সকল ফসল সংরক্ষণ করা যায় তবে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা পাবে।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়ন হলে দিদারের মতে বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রশ্ন ▶৫২ বর্তমানে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কৃষি উৎপাদনেও বৈচিত্র্য এসেছে। যার জন্য পূর্বের তুলনায় কৃষকদের বেশি পরিমাণে মূলধন প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে কৃষক প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে পর্যাপ্ত কৃষিঋণ সংগ্রহ করতে পারে না। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কৃষিঋণ ও উপকরণ বিতরণ অধিকতর সহজলভ্য করেছে। যার ইতিবাচক প্রভাব কৃষি উৎপাদনে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ২]

ক. কৃষিজোত কাকে বলে? ১

খ. মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণেই কৃষক ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না, ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে কৃষকদের সমস্যাসমূহ উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. কৃষির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ যথেষ্ট কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৫২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষক যে আয়তনের জমির উপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে, তাকে কৃষিজোত বলে।

খ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণিকে মধ্যস্বত্বভোগী বলা হয়।

এ সকল ব্যবসায়ীরা তৃণমূল কৃষকদের কাছ থেকে নাম মাত্র মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করে বাজারে উচ্চ মূল্যে চূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও কৃষক সম্প্রদায় ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। এতে ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ কৃষকগণ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ সংগ্রহে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যাগুলো উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করা হলো।

যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা সরকারি ঋণদানের বিধি ও নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৃষিঋণ প্রদান করে থাকে, তাদেরকে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জন্য উপযুক্ত জামানত প্রদান করতে হয়।

কিন্তু এদেশের বেশির ভাগ কৃষক ভূমিহীন ও প্রান্তিক হওয়ায় উপর্যুক্ত জামানত দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না। এছাড়া আমাদের দেশে কিছু বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) কর্তৃক স্বল্পসুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই শহরভিত্তিক। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্যের নিমিত্তে গড়ে উঠলেও এর অধিকাংশ সুবিধা গ্রামের ধনী কৃষক ও মহাজনরাই ভোগ করে থাকে। ফলে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উদ্দীপক অনুসারে, বর্তমানে এদেশের কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এজন্য কৃষকদের পূর্বের তুলনায় অধিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। তারা কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি (ট্রাক্টর, সেচ পাম্প) ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। কিন্তু উপর্যুক্ত সমস্যাগুলোর কারণে তারা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

ঘ বাংলাদেশে দরিদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহে সমস্যা লাঘবের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত এসব কর্মসূচি মূল্যায়ন করা হলো—

বাংলাদেশ সরকার কৃষিতে উৎপাদন বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে মাঝারি সুদের হারে কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিআরডিবি এবং সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে। আবার ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর হয়রানি ও শোষণ বন্ধ করার জন্য সরকার একটি জাতীয় ঋণ সালিশ বোর্ড গঠন করেছে। অন্যদিকে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে, আমদানি বিকল্প শস্য চাষে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদে বিকল্প ঋণ প্রদান করছে এবং ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা প্রদান করছে।

বাংলাদেশ সরকার কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও উপকরণ সহায়ক কার্ড বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার BADC কর্তৃক ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের কাছে স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন- রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, সেচযন্ত্র, কীটনাশক, উন্নতমানের সার ইত্যাদি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, কৃষকদের সমস্যা লাঘব ও কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি আপাতত যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা খুব একটা উন্নত নয়। ফলে কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য পায় না। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের মান যেন উচ্চ থাকে সরকার এরূপ নীতি অনুসরণ করলে ফসলের ভালো দাম পাওয়া যায় এবং দেশীয় কৃষিপণ্যের ব্র্যান্ডিং তৈরি হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. কৃষিতে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ কি জরুরি? উদ্দীপকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যবহার করে তাকে কৃষি খামার বলে।

খ বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নীতি প্রয়োগ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরকে ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য ও সেবা তৈরি সম্ভব বলে কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন।

মানুষের কল্যাণে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের জিনে বিভিন্ন উপাদান তথা DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) এবং RNA (Ribonucleic Acid) সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে মৌলিক উদ্ভিদ বা প্রাণীর আকার, আকৃতি বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন সাধন করাকে জৈব বা জীব প্রযুক্তি (Biotechnology) বলে। প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষের জিনে DNA এবং RNA বিভিন্ন ক্ষার উপাদান থাকে। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে এই DNA এবং RNA-এর সজ্জা বা বিন্যাসকে পরিবর্তন করে প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়। যেমন— টক বরই গাছকে DNA-এর বিন্যাস পরিবর্তন করে মিষ্টি বরই গাছে পরিবর্তন করা যায়। আবার এর মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত জিনকে সরিয়ে বা প্রতিস্থাপন করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপনণের সমস্যাসমূহ হলো অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য এবং কৃষকের সচেতনতার অভাব। নিচে এ সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো।

অনুন্নত পরিবহনব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে এনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না। বাড়িতে বা স্থানীয় হাটবাজারে কম দামে পণ্য বিক্রি করে। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না। কৃষিপণ্য বিপণন প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। কৃষক যে দাম পায় এবং সর্বশেষ ভোক্তা যে দাম দেয় তার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্য। ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এজন্য একই পণ্য কোনো বাজারে চড়া দামে এবং কোনো বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। এতে কম দামে বাজারে বিক্রয়কারী কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া আমাদের কৃষকরা কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। ফলে ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারের গতি প্রকৃতির সাথে তারা একেবারেই অপরিচিত। তাই তারা কৃষিপণ্যের তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে।

ঘ বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণনব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। সেগুলো কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাধান করা সম্ভব নয়। যা সরকারের হস্তক্ষেপেই সম্ভব।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো— অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য তাই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিপুল মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় এবং তা থেকে সরাসরি কোনো মুনাফা অর্জন করা যায় না বলে এ কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ তেমন দেখা যায় না। একমাত্র সরকারেরই সক্রিয় ও অব্যাহত অংশগ্রহণের ফলে তার উন্নয়ন সম্ভব হয়।

কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে সারা দেশে সরকারি উদ্যোগে 'কৃষক বিপণন দল', 'কৃষক ক্লাব' গঠনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বাজার উন্নয়ন এবং লিংকেজ তৈরির জন্য ঢাকাতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণকাজ (গাবতলীতে) সম্পন্ন হয়েছে। কৃষিপণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধন করতে হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমবায় সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে এদের কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব। বিভিন্ন বাজারে কৃষকদের নিকট থেকে যাতে আড়তদারি, পাল্লাদারি, টোল, চাঁদা প্রভৃতির অজুহাতে অর্থ আদায় করতে না পারে, সে জন্য আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলো সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং ফসল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ জামাল একজন ক্ষুদ্র কৃষক। সে লক্ষ করে তার বাবা কৃষি ঋণ নিতে গিয়ে যে ধরনের ঝামেলা ও হয়রানির শিকার হতো তাকে সেসবের সম্মুখীন হতে হয় না। কৃষিঋণের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এখন ঋণ নিতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কৃষি ঋণ কী? ১

খ. কৃষক কেন ঋণ গ্রহণ করে? ২

গ. জামালের মতো কৃষকদেরকে ঋণদানের কার্যক্রমের বিবরণ দাও। ৩

ঘ. কৃষিঋণদানের ক্ষেত্রে সরকারের ঋণদানের কার্যক্রমগুলোর সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষকের কৃষিকাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয়, তাকে কৃষি ঋণ বলে।

খ কৃষক নিম্নোক্ত কারণে ঋণ গ্রহণ করে:

i. কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয়;
ii. কৃষিকাজ পরিচালনা;
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা;
vi. গবাদিপশুর মড়কে মৃত পশুর জায়গায় অন্য পশু ক্রয়;
v. পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ;
vi. উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ;
vii. গুদামঘর নির্মাণ।

https://teachingbd24.com

গ বাংলাদেশে জামালের মতো ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদান একান্ত প্রয়োজন। তারা যাতে নির্বিঘ্নে ও প্রয়োজনমতো ঋণ পায় সেজন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এদেশে ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে ঋণ দেওয়ার সরকারি কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
২. নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বিআরডিবি ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. কে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে।
৩. কৃষিঋণ বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে বর্ধিত কলেবরে কৃষিঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও তাতে নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করেছে।
৪. পল্লি এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করছে।
৫. প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেছে।
৬. কৃষকদেরকে মাত্র ১০.০০ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছে।

ঘ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার কৃষি ঋণদান কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে কৃষকরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে। কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে সরকারি ঋণদানের কার্যক্রমগুলোর সুবিধা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের ব্যবস্থা করায় ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে আর অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে তারা ঋণনির্ভর উৎপাদন পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজতর করায় এখন কৃষকদেরকে ঋণ পাওয়ার জন্য অযথা ঝামেলা ও হয়রানির শিকার হতে হয় না।

তৃতীয়ত, কৃষি ঋণদানে সকল ব্যাংক কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের ফলে কৃষিঋণের পরিমাণ ও আওতা বাড়ছে।

চতুর্থত, পল্লি এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে কৃষকদের পক্ষে ঋণ নেয়া সহজ হয়েছে।

পঞ্চমত, দশ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খুলে কৃষকরা সঞ্চয় ও অর্থ রেমিট্যান্সের সুবিধা ভোগ করছে।

ষষ্ঠত, জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করায় সম্পদ ও ভূমিহীন কৃষকরাও ঋণ সুবিধা পাচ্ছে। এ ছাড়া গ্রাম্য মহাজন ও সুদখোরদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

সর্বোপরি, সরকারের কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের ফলে কৃষকরা সঞ্চয়মুখী হবে, কৃষি খাতে বিনিয়োগ এবং তার সাথে উৎপাদন বাড়বে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

প্রশ্ন ▶৫৫ গণি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। জমিতে যে ফসল উৎপাদন হয় তা দিয়ে কোনোভাবে ভোগ্য ব্যয় নির্বাহ করেন। তার প্রতিবেশী কৃষক গফুর মিয়া মুনাফার উদ্দেশে কৃষিকাজ পরিচালনা করেন। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জিডিপিতে কৃষির অবদান কত? ১
খ. কৃষি খামার ও কৃষিজোত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দেশ্যর দিক থেকে গণি মিয়া কী ধরনের কৃষিকাজ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গণি মিয়ার তুলনায় গফুর মিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখতে সক্ষম'— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিডিপিতে কৃষির অবদান স্থিরমূল্যে ১৪.২৩% বা ১,৩৯৬,৬১৬ মিলিয়ন টাকা এবং বর্তমান মূল্যে ১৩.৮২% বা ২,৯৪২,৩৪৭ মিলিয়ন টাকা।

খ একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জমি ব্যবহার করে তাকে কৃষি খামার বলে। অপরদিকে, কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে তাকে কৃষি জোত বলে।

একজন কৃষক যে জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করে তা একই স্থানে বা মাঠের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হতে পারে। এরকম সব জমিকে একত্র করে সে তার উৎপাদন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। কী কী শস্য, কী পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককে কৃষিখামার বলা হয়। অন্যদিকে, কৃষিকাজের জন্য কৃষের অধীনে একটি অখণ্ড কৃষি জমিই হলো কৃষিজোত। এ হিসেবে একজন কৃষকের এক বা একাধিক কৃষিজোত থাকতে পারে। এরকম জোত বড়, মাঝারি কিবা ক্ষুদ্রাকৃতির হতে পারে এবং জোতগুলো একত্রে না থেকে মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।

গ উদ্দেশ্যের দিক থেকে গণি মিয়া আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ করেন, যা জীবননির্বাহী খামারের অন্তর্ভুক্ত। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

গণি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। এ অবস্থায় তিনি কম পরিমাণ জমিতে মামুলিভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে যে উৎপাদন করেন তা দিয়ে কোনোরকমে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। কৃষিকাজে বিনিয়োগের জন্য তার সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে। গণি মিয়ার আত্মপোষণমূলক কৃষিকাজ মূলত নিজেকে ও পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই করা হয়। এখানে যৎসামান্য যা কিছু উৎপাদিত হয় তা পরিবারের ভোগের উদ্দেশেই পরিচালিত হয়। বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করার মতো সামর্থ্য ও জমি না থাকায় গণি মিয়া তার কৃষিকাজে কেবল পরিবারের সদস্যদের নিয়োজিতকরণ এবং যেসব কৃষিজাত দ্রব্য পরিবারের কাজে লাগে কেবল সেগুলোই উৎপাদন করা।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দেশের দিক থেকে গণি মিয়া আত্মপোষণমূলক কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। এতে তার পরিবারের ভোগ চরিতার্থ হলেও তা অন্যের তেমন কোনো কাজে লাগে না।

ঘ গফুর মিয়া বাণিজ্যিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তথা মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় কৃষিকাজ করেন। এ জন্য গণি মিয়ার তুলনায় গফুর মিয়ার কৃষিকাজ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখতে সক্ষম। নিম্নে উদ্দীপকটির আলোকে তা মূল্যায়ন করা হলো:

প্রথমত, বাণিজ্যিকভিত্তিতে বেশি জমি নিয়ে চাষাবাদ করা হয়। ফলে সেখানে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায়। অন্যদিকে, আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ করলে ক্ষুদ্র জমিতেই তা করা যায়। এক্ষেত্রে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির সুবিধা ভোগ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যভিত্তিক কৃষিকাজে পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাড়া করা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয়। এর ফলে এ ধরনের কৃষিকাজে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা লাঘব হয়। আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজে কৃষক নিজে ও তার পরিবারের সদস্যরাই নিয়োজিত হয়। সেখানে বাইরের শ্রমিককে নিয়োজিত না করায় বেকার সমস্যা লাঘবে তা তেমন কাজে লাগে না।

তৃতীয়ত, অধিক উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশে কৃষিকাজ পরিচালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে যা জিডিপি বাড়াতে সহায়ক হয়। কিন্তু আত্মপোষণের জন্য কৃষিকাজ কেবল পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য করা হয়। এখানে এমন কোনো উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না, যা মোট উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

চতুর্থত, বাণিজ্যিক উদ্দেশে পরিচালিত কৃষিকাজে অধিক উৎপাদনের দরুন আয় হয়। অধিক আয় সঞ্চয় বাড়ায়, ফলে মূলধন গঠিত হয়। গঠিত মূলধন কৃষি উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। কিন্তু আত্মপোষণমূলক কৃষিকাজের দ্বারা প্রাপ্ত আয় কৃষক পরিবারের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যায়। এখানে উদ্বৃত্ত তেমন থাকে না; ফলে বিনিয়োগ দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, গণি মিয়ার তুলনায় গফুর মিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখতে সক্ষম।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-২: বাংলাদেশের কৃষি

৩৮. কৃষিকাজ কাকে বলে? (অনুধাবন)
ক উদ্ভিদ ও জলীয় সম্পদ উৎপাদন করা
খ উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করা
গ উদ্ভিদ ও খনিজ সম্পদ উৎপাদন করা
ঘ প্রাণিজ ও জলীয় সম্পদ উৎপাদন করা **খ**

৩৯. 'পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন শিল্প হলো কৃষি'– কে বলেছেন? (জ্ঞান)
ক আর. এল. কোহেন খ জি. ও. ব্রায়েন
গ এ. আর. খান ঘ এম.এম আকাশ **ক**

৪০. যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক কৃষি কাঠামো খ কৃষিজোত
গ কৃষি খামার ঘ কৃষির উপখাত **ক**

৪১. কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য? (জ্ঞান)
ক কৃষি খ শিল্প
গ খনি ঘ মৎস্য **ক**

৪২. 'উফশী' কী? (অনুধাবন)
ক উচ্চ ফলনশীল ধান খ উন্নত জাতের গম
গ উন্নত জাতের পাট ঘ উন্নত জাতের ভুট্টা **ক**

৪৩. ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত? (জ্ঞান)
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **ঘ**

৪৪. গ্লুকোজ উৎপাদনে কোন খাদ্যশস্যটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক ধান খ গম গ যব ঘ ভুট্টা **ঘ**

৪৫. বার্লি তৈরির কাঁচামাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক চাল খ গম গ ভুট্টা ঘ যব **ঘ**

৪৬. রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্যে কোন জেলায় 'সেরিকালচার বোর্ড' স্থান করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক খুলনায় খ দিনাজপুর
গ ঢাকায় ঘ রাজশাহীতে **ঘ**

৪৭. মোট আবাদযোগ্য জমির কতভাগ বর্গাদারি প্রথায় চাষ করা হয়? (জ্ঞান)
ক প্রায় ১৫% খ প্রায় ২০%
গ প্রায় ২৫% ঘ প্রায় ৩০% **গ**

৪৮. বাংলাদেশে কোন ধরনের কৃষিজোতের আধিক্য রয়েছে? (জ্ঞান)
ক বৃহদায়তন খ মাঝারি আয়তনের
গ ক্ষুদ্রায়তন
ঘ বৃহদায়তন ও মাঝারি আয়তনের **গ**

৪৯. বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে? (জ্ঞান)
ক বহুমুখী খামার খ জীবন নির্বাহী খামার
গ সমবায় খামার ঘ যৌথ খামার **খ**

৫০. কোন খামারকে আত্মপোষণ খামার বলা হয়? (জ্ঞান)
ক বাণিজ্যিক খামার খ জীবন নির্বাহী খামার
গ বিশেষায়িত খামার ঘ বহুমুখী খামার **খ**

৫১. বাংলাদেশে কোন ধরনের কৃষিজোতের আধিক্য রয়েছে? (অনুধাবন)
ক বৃহদায়তন খ মাঝারি আয়তনের
গ ক্ষুদ্রায়তন ঘ বৃহদায়তন আয়তনের **গ**

৫২. শিহাব শিক্ষাজীবন শেষে ব্যবসার জন্যে হাঁস-মুরগির খামার ও মৎস্য চাষ শুরু করল। এ কাজে কৃষির কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? (প্রয়োগ)
ক আত্মপোষণ খ গতানুগতিক
গ বাণিজ্যিক ঘ বহুমুখী **গ**

৫৩. কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত কী? (অনুধাবন)
ক ভূমি উন্নয়ন
খ কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন
গ কৃষক উন্নয়ন ঘ বাজার উন্নয়ন **খ**

৫৪. বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি কোনটি? (জ্ঞান)
ক মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব
খ উদার বাণিজ্যনীতি
গ প্রচারণা ঘ শান্তি ও নিরাপত্তা **ক**

৫৫. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বের কারণে কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়? (অনুধাবন)
ক সরকার খ সমিতি
গ ব্যবসায়ীরা ঘ ভোক্তাগণ **ঘ**

৫৬. কোনটি সরকারের কৃষিপণ্য বিপণনের মুদ্রায়িত খাত? (জ্ঞান)
ক OMS খ VGF গ GR ঘ কাবিখা **ক**

৫৭. কোন সালে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ আবিষ্কৃত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৫০ খ ১৯৬০
গ ১৯৭০ ঘ ১৯৮০ **খ**

৫৮. খাকি কেম্বেল ও জিনডিং কী? (জ্ঞান)
ক উন্নত জাতের হাঁস খ উন্নত জাতের মুরগি
গ উন্নত জাতের খাদ্যশস্য
ঘ উন্নত জাতের ভেড়া **ক**

৫৯. ব্রয়লার ও লেয়ার কী? (জ্ঞান)
ক উন্নত জাতের হাঁস খ উন্নত জাতের মুরগি
গ উন্নত জাতের খাদ্যশস্য
ঘ উন্নত জাতের ভেড়া **খ**

৬০. White gold' বলা হয় নিচের কোনটিকে? (জ্ঞান)
ক পাট খ তামাক গ চিংড়ি ঘ ইলিশ **গ**

৬১. মাশরুমের বীজকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক স্পন খ স্ট্রি
গ পোনা ঘ অঙ্কুর **ক**

Teachingbd.com

৬২. বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে চাষাবাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কোনটির ? (অনুধাবন)
ক সারের ব্যবহার খ কীটনাশকের ব্যবহার
গ পানিসেচ ব্যবস্থা
ঘ উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার **গ**

৬৩. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? (জ্ঞান)
ক অধিক বৃষ্টিপাত খ অধিক লবণাক্ততা
গ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘ বায়ুচাপ বৃদ্ধি **গ**

৬৪. বাংলাদেশের কোন জেলায় তীব্র খরা হয়? (জ্ঞান)
ক টাঙ্গাইল খ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ পাবনা ঘ বরিশাল **খ**

৬৫. কৃষি তথ্য সার্ভিস সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? (জ্ঞান)
ক কৃষি গবেষণা মন্ত্রণালয়
খ খাদ্য মন্ত্রণালয়
গ কৃষি মন্ত্রণালয় ঘ তথ্য মন্ত্রণালয় **গ**

৬৬. বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. ভূমিহীন কৃষক
ii. প্রাচীন চাষ পদ্ধতি
iii. বর্গাদারি প্রথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৭. মাশরুম চাষে পরিবেশের সুবিধা হলো— (অনুধাবন)
i. মাশরুম চাষ পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখে
ii. মাশরুম চাষে কীটনাশক ব্যবহার হয় না
iii. অল্প শ্রমে মাশরুম চাষ সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৮. শস্য বহুমুখীকরণের গুরুত্ব হলো— (অনুধাবন)
i. উৎপাদন ঝুঁকি হ্রাস
ii. ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ হ্রাস
iii. সুষম খাদ্যের সংস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৯. পরিবেশ দূষণের কারণ হলো— (অনুধাবন)
i. প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার
ii. পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি
iii. বন উজাড় হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭০. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হলো— (অনুধাবন)
i. অতি শৈত্য বা অতি গরম
ii. গ্রীষ্মকালে উচ্চ তাপমাত্রা
iii. জলাবদ্ধতা বা বন্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭১. প্রাচীন জৈব প্রযুক্তি হলো — (অনুধাবন)
i. জমিতে ডাল-পালা পুঁতে পোকা-মাকড় দমন
ii. জৈব সার তৈরি করা
iii. জমিতে ব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে পোকা দমন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭২. উফশী প্রযুক্তি—(অনুধাবন)
i. শিল্পে ব্যবহৃত এক নতুন প্রযুক্তি
ii. কৃষিতে ব্যবহার বীজভিত্তিক প্রযুক্তি
iii. কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii **খ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভূপৃষ্ঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে নিজের চাহিদা মেটাবার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ দ্রব্য উৎপন্ন করে।

৭৩. মানুষের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক কৃষি খ ব্যবসা
গ চাকরি ঘ কোনটি নয় **ক**

৭৪. মানুষের উক্ত কর্মকাণ্ডে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জলবায়ু ii. ভূপ্রকৃতি
iii. মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মানিক একজন সফল কৃষক। তিনি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে তার এক বিঘা জমিতে জমিতে ঋতুভেদে আলু, ঢেঁড়শ, করলা, কলা প্রভৃতি ফসল চাষ করেন।

৭৫. মানিকের উক্ত জমিতে কী ধরনের চাষাবাদ প্রয়োগ করেছেন? (প্রয়োগ)
ক বিভিন্ন ফসল খ শস্য বহুমুখীকরণ
গ সবজির চাষ ঘ উফসী চাষ **খ**

৭৬. উক্ত চাষ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উৎপাদন খরচ কমানো
ii. মাটির পুষ্টির চাহিদা ঠিক রাখা
iii. আগাছার উপদ্রব কমানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৩: বাংলাদেশের শিল্প

প্রশ্ন ▶১ বাংলাদেশের শিল্প সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে গিয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক নাসির মামুন বলেন, পাট, চামড়া ও তৈরি পোশাক ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প। ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, মূলধনের স্বল্পতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ইত্যাদি বাংলাদেশের শিল্পের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। সম্প্রতি সরকার দেশের দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নীতি গ্রহণ করেছে।

[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কুটির শিল্প কাকে বলে? ১

খ. পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্পের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পের যেসব সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা সমাধানে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারে— তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন ও সহজলভ্য কাঁচামাল এবং ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির দ্বারা যে শিল্প উৎপাদন পরিচালিত হয় তাকে কুটির শিল্প বলে।

খ সম্প্রতি উন্নতজাতের পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উদ্ভাবন, পাটের বিকল্প পণ্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের ফলে নতুন করে পাট শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

পাটের বিকল্প ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর চাহিদা কমে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আবার নতুন করে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে পাট দ্বারা বিভিন্ন উন্নত ও রুচিশীল পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- পাটের তৈরি ব্যাগ, জুতা, মাদুর ইত্যাদি। তাছাড়া, এসব পণ্য পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। তাই বলা যায়, পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্পের মধ্যে পাট, চামড়া ও তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো—

পাট শিল্প বাংলাদেশের বৃহদায়তন ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃত। পাটজাত পণ্য থেকে বৈশ্বিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশই রয়েছে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে। ২০১৭ সালে এদেশে ৯১.৯২ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে। পাটপণ্য রপ্তানি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭৯ কোটি ডলার আয় করে। আবার, চামড়া শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি না হলেও এদেশ চামড়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব অনুসারে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ১২৩ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫ থেকে ৮২ শতাংশের বেশি এ খাত থেকে অর্জিত হয়। বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়। আর যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে প্রধান আমদানিকারক দেশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত (নিটওয়্যারসহ) হতে রপ্তানি আয় হয় ১৩৭৫ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলার।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পের যেসব সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) ভূমিকা মূল্যায়ণ করা হলো—

সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে (যেমন– ম্যাস ট্রানজিট) ফ্লাইওভার, বাসটার্মিনাল, বিমানবন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্রবন্দর, রেলওয়ে ইত্যাদি) এবং সেবা খাতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের দ্রুত উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে যা এককভাবে সরকার বা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদন করা দুরূহ। কারণ, কাঙ্ক্ষিত মূলধনের সম্পূর্ণ সংস্থান শুধুমাত্র সরকারি আয় দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়। আবার, বৈদেশিক ঋণ শর্তযুক্ত ও প্রভার বেশি হওয়ায় তা দেশের উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারের PPP উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। পিপিপি-র মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো খাতের শক্তিশালী বিকাশ সাধনের ফলে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি সেবা খাতের উন্নয়ন ঘটে। এসব খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পিপিপি-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে দেশে বেকারত্বের হার হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে শক্তিশালী বেসরকারি খাতের সৃষ্টি হয়।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶২ মি. 'X' কোরবানির ঈদে ঢাকা থেকে তার দাদার বাড়িতে এসেছে। তার দাদা একটি বড় গরু কোরবানি দিল। ঈদের দিন তার আনন্দ ধরে না। সে দেখে এক জায়গায় অনেক গরু-ছাগল কোরবানি হলো। কোরবানির পর চামড়ার বিশাল মজুদ গড়ে উঠল। অথচ দেশে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের তেমন ব্যবস্থা নেই, দক্ষ শ্রমিক নেই, উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য নেই, শিল্পপতি পর্যাপ্ত ঋণ পায় না। তাই চামড়া শিল্পের বিকাশ কম এবং স্বল্পমূল্যে চামড়াসমূহ বিক্রি হচ্ছে। অবশ্য সরকার চামড়া শিল্পের বিকাশে প্রশিক্ষণ, বাজার সম্প্রসারণ, শিল্প নগরী স্থাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলে আস্তে আস্তে চামড়া শিল্পের উন্নয়ন ঘটছে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চামড়া শিল্পের সমস্যাসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের দ্রুত উন্নয়নে সরকারের আর কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প হলো কারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্যে এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।

খ কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য হলো পরিচালনা পদ্ধতি ও মূলধন সংগ্রহ।

কুটিরশিল্প পারিবারিক মালিকানায় পরিচালিত হয়। যেখানে ক্ষুদ্রশিল্প পারিবারিক মালিকানা ছাড়াও অংশীদারি অথবা সমবায়ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হয়। কুটিরশিল্পে পুঁজি পারিবারিক উৎস থেকে আসলেও ক্ষুদ্রশিল্পে তা মালিক ছাড়াও বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা থেকে সংগৃহীত হতে পারে। কুটিরশিল্পে হালকা যন্ত্রপাতি ও দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পে আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি ও দেশি-বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে চামড়া শিল্পের সমস্যা বলতে প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের অপর্যাপ্ততা, ঋণের অভাবকে বোঝানো হয়েছে। নিচে উক্ত সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো—

১. চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যানারি শিল্প সারা দেশে সমভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে চামড়া প্রায়ই তার গুণগতমান হারায়।

https://teachingbd24.com

২. বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ হওয়ায় চামড়া শিল্পে প্রায়ই অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ফলে চামড়ার গুণগতমান নষ্ট হয়।
৩. চামড়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য অনেক সময় পাওয়া যায় না। এতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণ না করতে পারায় অতি দ্রুত চামড়া নষ্ট হয়।
৪. চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায় না। কোরবানির সময় ব্যবসায়ীদের অনেক টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রায়ই সরকার এক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় কম ঋণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

উপরের সমস্যাসমূহের জন্য চামড়া শিল্পের বিস্তৃতি ব্যাহত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানে শ্রমিকের প্রশিক্ষণ, বাজার সম্প্রসারণ, শিল্প নগরী স্থাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এছাড়াও সরকার এ শিল্পের উন্নয়নে আরও যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

১. চামড়া শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে এবং সেই ঋণ সহজ শর্তযুক্ত হলে এ শিল্পের বিকাশ ঘটবে।
২. চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করলে এ শিল্পের সমস্যার সমাধান হবে।
৩. প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে এ শিল্প আলোর মুখ দেখতে পারবে।
৪. বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অধিক প্রয়োজন।
৫. দেশের বাইরে যেন চামড়া পাচার হতে না পারে সে দিকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।
৬. বিদেশে বাজার সৃষ্টি করার জন্য দেশীয় বিনিয়োগকারীদের ও সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।
৭. দেশে আরও বেশি ট্যানারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।
৮. চামড়া শিল্পের বিকাশের জন্য সঠিক চামড়া নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প রপ্তানি আয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶৩ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাট ও পাটজাত পণ্যের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। কিন্তু একই শতাব্দীর শেষার্ধে পলিথিন, নাইলন ও প্লাস্টিক সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়ে যায় এবং পাটের বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ায় পাট ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। ১ জানুয়ারি, ২০০২ থেকে ঢাকা শহরে এবং মার্চ, ২০০২ থেকে সারাদেশে সরকার পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে পাটের তৈরি ব্যাগের ব্যাপক ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে, সম্প্রতি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করায় পাটশিল্প বিকাশের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২; ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৩]

ক. আমদানি বিকল্প শিল্প কী? ১
খ. 'কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুটিরশিল্পের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে পাটের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়ার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'পাট শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার নতুনভাবে উন্মোচিত হয়েছে।' যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমদানি দ্রব্য অন্য দেশ থেকে আমদানি না করে, নিজ দেশে উৎপাদনের জন্য যে শিল্প গড়ে তোলা হয়, তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

খ স্বল্প পুঁজি ও পারিবারিক পরিবেশে কুটিরশিল্প স্থাপন করা যায় বলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ শিল্পের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

যে শিল্পে স্বল্প মূলধন এবং পারিবারিক সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে, তাকে কুটিরশিল্প বলে। পুঁজি কম হওয়ায় ঘরোয়া পরিবেশে বা অল্প জায়গা (যেমন- ১টি ঘর) নিয়ে যে কেউ এই শিল্প স্থাপন করতে পারে। তাই শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যেকোনো লোকই সামান্য প্রশিক্ষণ ও পুঁজির ব্যবস্থা করে খুব সহজেই কুটির শিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

গ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কার হওয়ায় বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাটের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিশ্ব বিখ্যাত ছিল। আর এ পাট ও পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে পাটজাত পণ্যের বিকল্প পণ্য যেমন- পলিথিন, নাইলন, প্লাস্টিক ইত্যাদির ব্যবহার বেড়ে যায়। যার ফলে পাটের বৈশ্বিক চাহিদা ব্যাপক হ্রাস পায় এতে এদেশের পাট শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও অব্যবস্থাপনার ফলে সোনালি আঁশ খ্যাত পাট হুমকির সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন পাট কল বন্ধ হয়ে যায়।

উপরের কারণগুলো ছাড়াও পাট ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়ার অন্যান্য কারণগুলো হলো— পাট চাষে সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার, পাট ও পাটজাত পণ্যের গুণগত মান সময়োপযোগী না হওয়া, বিজ্ঞাপন বা প্রচারের স্বল্পতা, ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় চাষীদের পাট চাষে অনীহা ইত্যাদি।

ঘ সম্প্রতি উন্নতজাতের পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উদ্ভাবন, পাটের বিকল্প পণ্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের ফলে নতুন করে পাট শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

পাটের বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ায় পাট শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু বর্তমানে আবার নতুন করে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, পাট ও পাটজাত দ্রব্য পরিবেশবান্ধব উপাদান অন্যদিকে, পলিথিন, নাইলন ও প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহার পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বর্তমান সরকার ১৭টি পণ্যের মোড়কে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছেন। ফলে উন্নত জাতের পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এতে মুনাফা লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে অনেক কৃষক এখন পাট চাষে উৎসাহী হচ্ছে। তাছাড়া ২০০২ সালের মার্চ থেকে বাংলাদেশ সরকার সারাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে এবং পাটের তৈরি ব্যাগ ব্যবহারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে সারাদেশে পাটের তৈরি ব্যাগের ব্যবহার বেড়ে যায়। আবার, সাম্প্রতিক সময়ে পাট দ্বারা বিভিন্ন উন্নত ও রুচিশীল পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- পাটের তৈরি ব্যাগ, জুতা, মাদুর ইত্যাদি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এ সকল পণ্য পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সম্প্রতি পাট শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার নতুনভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪ শিল্পায়নের ভিত্তি মজবুত করা এবং অর্থনীতির অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে 'X' দেশের সরকার সম্প্রতি এক নতুন নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির আওতায় সরকার বিদ্যুৎ খাতে ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পে বেসরকারি উদ্যোক্তা মনটেক্স গ্রুপ সরকারের সাথে আছে। অর্থনীতিবিদ জনাব অনীকের মতে, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে সরকারের এ ধরনের প্রকল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]

ক. বৃহৎ শিল্প কী? ১
খ. 'আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পটি কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনীতিবিদ জনাব অনীকের মতের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বহু সংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে বৃহৎ শিল্প বলে।

খ আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে। এসব বিদেশি

https://teachingbd24.com

দ্রব্যের দাম অধিক বলে তা আমদানি করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যদি এসব দেশ নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে ঐসব দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করে, তবে সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার অনেক সাশ্রয় হবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পকটি হলো এমন এক ধরনের প্রকল্প সেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ ধরনের প্রকল্পের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো–

বাংলাদেশে বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পের প্রসার ও আধুনিকায়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে উচ্চ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এর জন্য অবশ্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার। কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের এ বিনিয়োগের অর্থ সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। এ কাজে বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। উন্নয়ন বিষয়ক এ ধারণার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন বাজেটে বেসরকারি খাতের পুঁজি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ধারণার সৃষ্টি করা হয়। এ ব্যবস্থার আওতায় দেশের বড় বড় ও ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানা, উদ্যোগ ও পুঁজি বিনিয়োগ করা শুরু হয়। অর্থনীতির চাকাকে সচল ও বেগবান করতে হলে বিনিয়োগের একটি বড় ধাক্কা (Big Push) দেয়া প্রয়োজন। দেশের অর্থনীতিতে এ বৃহৎ ধাক্কা সৃষ্টির জন্য এ পিপিপি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পটি হলো সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে সরকারের এ ধরনের প্রকল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। কথাটি যথার্থ– নিচে তার এ মতের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হলো:

১. দেশে শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান পিপিপির মাধ্যমে সম্ভব। কেননা কেবল সরকারি বা বেসরকারি পুঁজি ও শর্তযুক্ত বিদেশি ঋণ দ্বারা বৃহদাকার শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার সম্ভব নয়।
২. শিল্পায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জ্বালানি সরবরাহ, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ দেশে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর করতে যথেষ্ট সহায়ক। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিপুল পুঁজির যোগান পিপিপির দ্বারাই সম্ভব।
৩. পিপিপির মাধ্যমে সামাজিক অবকাঠামোও শক্তিশালী করা সম্ভব। যৌথ উদ্যোগের এ কৌশল দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক বিমা প্রভৃতি সেবাখাতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণেও যথেষ্ট সহায়ক হবে।
৪. পিপিপির মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ ও শিল্পায়ন হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
৫. পিপিপির উদ্যোগে দেশে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সেখানে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।
৬. স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিপির উদ্যোগ ছাড়া কেবল সরকারি বা বেসরকারি প্রচেষ্টা এককভাবে সফল নাও হতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে অর্থনীতিবিদ জনাব অনীকের মতের যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৫ 'Y' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি বেশির ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। পূর্বে সকল মোটরসাইকেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। কিন্তু সম্প্রতি দেশীয় কোম্পানি 'সিলেক্স' গ্রুপ দেশে ভালো মানের মোটরসাইকেল উৎপাদন করছে। ফলে মোটরসাইকেলের আমদানি অনেক কমে গেছে। অর্থনীতিবিদ জনাব জাহিদের মতে, মোটর সাইকেলের মতো টিভি, ফ্রিজ এবং চামড়া শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কুটির শিল্প কী? ১
খ. 'পাট শিল্প তার গৌরব হারিয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনীতিবিদ জনাব জাহিদের মতের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাকে কুটির শিল্প বলে।

খ সাম্প্রতিককালে দেশে ও বিদেশে পাটের বিকল্প হিসেবে কেনাফ, মেশতা, সিসাল প্রভৃতি কৃত্রিম আঁশের প্রচলন হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট কমে গেছে।

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এখন ভারত, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। কাঁচাপাটের অনিয়মিত যোগান, যন্ত্রাংশের অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি কারণে পাট শিল্পের দুর্দিন চলছে। কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি থেকে আয় পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে। এসব কারণেই বলা হচ্ছে, পাট শিল্প তার গৌরব হারিয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি হলো আমদানি বিকল্প শিল্প। অতিমাত্রায় আমদানি নির্ভরতা ও বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু কিছু দ্রব্য আমদানি না করে সুবিধামতো সেসব দ্রব্যের শিল্প দেশে স্থাপন করা হলে তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

কোন কোন দ্রব্যের আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা যুক্তিসংগত তা নির্ধারণের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো— শিল্পের জন্য নিজস্ব কাঁচামাল, প্রযুক্তি, প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি ও অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রাপ্তি। এসব শিল্পের দ্রব্যাদি কমপক্ষে আমদানি দ্রব্যের নিকট-বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আমদানি বিকল্প শিল্প দ্রব্যের মান বিদেশি দ্রব্যের তুলনায় কম হতে পারে, আবার বেশিও হতে পারে। সে জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পগুলোকে বিদেশি পণ্যের অসম প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার জন্য সরকার এ শিল্পে ভর্তুকি ও কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করে।

আমদানি বিকল্প শিল্পের কতকগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ শিল্পে কেবল আমদানিকৃত দ্রব্যের মতো বা তার নিকট বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ শিল্পের দ্রব্য কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করা হয়। এ শিল্পে যতদূর সম্ভব দেশীয় কাঁচামাল, নিজস্ব প্রযুক্তি, শ্রমঘন উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। এ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, অর্জন নয়।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, বাংলাদেশে উল্লিখিত শিল্পগুলো স্থাপনের কথা বলে অর্থনীতিবিদ জনাব জাহিদ প্রকারান্তরে, এদেশে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের পক্ষেই তার মত দিয়েছেন। তার মতের যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হলো–

১. বাংলাদেশের অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করা দরকার। আমদানি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের প্রয়োজন আছে।
২. বাংলাদেশ শিল্পায়নের প্রয়োজনে সাধারণত মূলধনী দ্রব্য বেশি আমদানি করে। তাই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ করা হলে দেশের ভেতরে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।
৩. আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশের আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং অন্য কাজে তা ব্যবহার করা যাবে।
৪. আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও পুঁজি দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে শিল্পপণ্যের দিক থেকে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।
৫. আমদানি-বিকল্প শিল্পায়নের ফলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং সমগ্র শিল্প খাতের প্রসার ঘটে। এদেশে অধিক সংখ্যায় আমদানি বিকল্প স্থাপন হলে এসব সুবিধা ভোগ করা যাবে।
৬. বাংলাদেশসহ যেসব দেশে জনসংখ্যা বেশি সেখানে জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী, অনেক প্রকারের পণ্য আমদানি করতে হয়। এ অবস্থায় দেশে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা হলে এসব শিল্পপণ্যের বাজারের নিশ্চয়তা থাকবে। যার ফলে শিল্পায়ন অনেকটাই প্রসারিত হবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকে অর্থনীতিবিদ জনাব জাহিদ এদেশে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের পক্ষে যে মত প্রকাশ করেছেন তা যথার্থ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬ আমেরিকা প্রবাসী জনাব জামান একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ানো তার শখ। ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে যেখানেই গিয়েছেন সর্বত্রই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য ও কুটিরশিল্পের নিপুণ সামগ্রী দেখে নিজ দেশ নিয়ে আনন্দিত হয়েছেন। তার মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর স্থবির নয়। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দেশে সুষম উন্নয়ন ঘটায়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করেছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর স্থবির নয়— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাইটেক শিল্প বলতে, জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর, উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক; পরিবেশবান্ধব এবং আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়ননির্ভর শিল্পকে বোঝায়।

খ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গ্রামাঞ্চলে প্রসার লাভ করলে সুষম উন্নয়ন সম্ভব। কারণ বৃহৎ শিল্প শুধু শহরকেন্দ্রিক স্থাপনের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের প্রধান বৃহৎ শিল্পগুলো হলো— পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি। এসব শিল্প সাধারণত শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামের সাধারণ পরিবারের লোকজনের এসব শিল্পে কাজ করার সুযোগ খুবই কম থাকে। এ দিক থেকে চিন্তা করলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কারখানাগুলো গ্রামাঞ্চলে ও শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয়ে থাকে। যা অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়ে থাকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সুষম উন্নয়ন ঘটায়।

গ তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলোতে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ২২ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত। এই শিল্পে প্রায় ৮০ শতাংশই হলো অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা কর্মী। মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই শিল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫ থেকে ৮২ শতাংশেরও বেশি বস্ত্রপণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৮,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশি তৈরি পোশাক শিল্পের প্রধান আমদানিকারক দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় ছিল প্রায় ৩২০৪.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ২৯.০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৩৪,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয়েছে। যেখানে তৈরি পোশাক খাতের (নিটওয়্যারসহ) রপ্তানি আয় ছিল ২,৮১৪ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার।

উদ্দীপকের আমেরিকা প্রবাসী জনাব জামান একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। ওই দেশগুলোতে তিনি নিজদেশের পণ্য দেখে খুশি হন। কারণ তিনি চিন্তা করেন বাংলাদেশ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে এখন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর স্থবির নয়; বরং গতিশীল।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ তাল মিলিয়ে চলছে। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠিত করেছে। আশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে এদেশের অর্থনীতি বাজার অর্থনীতির দিকে ধীরে ধীরে ধাবিত হতে শুরু করেছে। বাজার অর্থনীতির নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মূল বিষয় ছিল বিরাষ্ট্রীয়করণ অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে সংকুচিত করা, ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা এবং বাণিজ্য উদারীকরণ করা। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের প্রায় ১১০টি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪%, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.০৫%। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৩০.২৭% শতাংশ, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপির ২৯.৬৫ শতাংশ। এ ছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫,৯৪৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর স্থবির নয় বরং অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে প্রশমিত হচ্ছে এবং সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ ছিল। এককালে বাংলাদেশের পাটকে 'স্বর্ণসূত্র' বলা হতো। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী পাটের বিকল্প আবিষ্কার ও কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের চাহিদা ও মূল্য দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। সরকার পাটের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে জাতীয় 'পাটনীতি-২০১১' প্রণয়ন করে। সরকার কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুসহ নতুন পাটকল স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বর্তমানে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কুটির শিল্প কী? ১

খ. কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের পাট শিল্পের সমস্যাবলি চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. তোমার কি মনে হয় পাট শিল্প তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাকে কুটির শিল্প বলে।

খ সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার যৌথ প্রয়াসের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি সহায়তা করে।

PPP-এর পূর্ণ রূপ হলো— Public Private Partnership. অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের স্বল্পতা থাকায় কোনো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেকোনো প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমানে PPP-এর অধীনে বেশ কিছু প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। যেমন: বিদ্যুৎ উৎপাদন, উড়াল সড়ক, রেলওয়ে ইত্যাদি। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে PPP অনেক সহায়তা করে।

গ একসময় পাটকে 'স্বর্ণসূত্র' বলা হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের পাট শিল্পে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

পাটকে বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল বলা হলেও বর্তমানে এই শিল্পটি প্রায় ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। পাট শিল্পের এই করুণ অবস্থার জন্য অনেক কারণ দায়ী। নিম্নে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হলো—

পূর্বে বিশ্বব্যাপী পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় হঠাৎ করেই কমে যায় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দাম। চাষি থেকে শুরু করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরাও বড় ধরনের লোকসানের শিকার হয়েছে। বন্ধ হয়ে যায় একাধিক জুট মিল। চাষিরাও জীবিকার তাগিদে অন্য ফসল চাষে মনোনিবেশ করে। এতে ধ্বংস হয়ে যায় দেশের সম্ভাবনাময় এই রপ্তানি শিল্প। তাছাড়া চালের

https://teachingbd24.com

মূল্য বৃদ্ধি, চাষিদের পাট চাষে অনীহা, সরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা, মজুদকরণের সমস্যা, বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি প্রভৃতি সমস্যার কারণে বাংলাদেশের এই সম্ভাবনাময় খাতটি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশ এক সময় বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ হলেও পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী পাটের বিকল্প আবিষ্কার ও কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন এর চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। ফলে এ শিল্পটি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

ঘ সরকার কর্তৃক গৃহীত 'পাটনীতি-২০১১' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পাট শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।

একসময় পাটই ছিল বাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল, যাকে 'স্বর্ণসূত্র' বলা হতো। এ খাত হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বিভিন্ন সমস্যার কারণে এ সম্ভাবনাময় খাতটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও পদক্ষেপ দ্বারা এর হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ইতোমধ্যে সরকার 'পাটনীতি-২০১১' গ্রহণ করে এ খাতকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। এছাড়াও কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা যেতে পারে, যাতে তারা পাট চাষ করে লাভবান হতে পারে। কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধ করতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, উন্নত চাষাবাদ প্রক্রিয়া সম্মন্ধে প্রশিক্ষণ, পাট ও পাটজাত পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে এ খাতকে আরো প্রসারিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন স্থানে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, উৎসবে পাটজাত পণ্যের মেলার আয়োজন করলে এই পণ্য ব্যবহারে দেশের মানুষ আগ্রহী হবে। এতে পাটের চাহিদা তথা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলগুলোকে পুনরায় চালু করতে পারলে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তা কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, পাটের সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনতে সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'পাটনীতি-২০১১' প্রণয়ন, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার মতো নানাবিধি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণই হলো তার আভাস।

পরিশেষে বলা যায় যে, সরকারের সদিচ্ছা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পাট শিল্পের বর্তমান উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে ও প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶৮ মি. জনসন ইংল্যান্ডের একজন সফল ব্যবসায়ী। তার দেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন তৈরি পোশাক ও চামড়াজাত পণ্য বেশ জনপ্রিয় হওয়ায় এসবের প্রায় সবকিছুই তিনি বাংলাদেশ থেকে ক্রয় করেন। ২০১৪ সালে জনসন বাংলাদেশে এসে এক সপ্তাহ অবস্থানকালে বেশকিছু তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন এবং এ শিল্পের বেশ কিছু সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি মনে করেন, কারিগরি উন্নয়ন, উৎপন্ন পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, পোশাকের আইটেম বৃদ্ধি করতে পারলে এদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ২০১৫ সালে মি. জনসন আবার বাংলাদেশে এসে হাজারীবাগে বেশ কিছু চামড়াজাত পণ্য তৈরি কারখানা পরিদর্শন করেন এবং এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও তার কাছে খুব উজ্জ্বল মনে হয়। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে একটি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে? ২

গ. মি. জনসন কর্তৃক ২০১৪ সালে পরিদর্শনকৃত শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যেসব পরামর্শগুলো দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. জনসন ২০১৫ সালে যে শিল্প পরিদর্শন করেন, ঐ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, তার সাথে তুমি কি একমত?— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাইটেক শিল্প বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর, উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব, আইটি গবেষণা ও উন্নয়ন নির্ভর (R & D) শিল্পকে বোঝায়।

খ দেশে শিল্পায়ন ঘটলে দেশটি এমন কতগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা অতীতে আমদানি করতে হতো।

দেশে বড় বড় কল-কারখানার প্রসার ঘটলে নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে, যার ফলে সেক্ষেত্রে বিদেশি নির্ভরতা কমে। দেশে শিল্প বিকশিত হলে প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম দেশেই উৎপাদন করা যায়; বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই বলা যায়, শিল্পায়নের মাধ্যমে একটি দেশ বিভিন্ন উপায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করে।

গ উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী মি. জনসন ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বেশ কিছু তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন এবং এ শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি এ শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু কার্যকরী পরামর্শ প্রদান করেন, যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. কারিগরি উন্নয়ন: তৈরি পোশাকের উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তি ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি: আমদানিকারক দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মান উন্নত করতে হবে। তাহলে বিশ্ব বাজারে আমাদের এ শিল্পের অবস্থান আরো সংহত ও দৃঢ় হবে।

৩. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান: আমাদের পোশাক শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকই গ্রাম থেকে আগত অশিক্ষিত ও অদক্ষ মহিলা। পোশাক শিল্পের উন্নতি ঘটাতে হলে এসব অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

৪. পোশাকের আইটেম বৃদ্ধি: প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আইটেম বাড়াতে হবে। তাহলে কোটা না থাকা অনেক আইটেমের পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে।

মি. জনসনের পরামর্শগুলোর দিকে সরকার নজর দিলে পাট শিল্পের বর্তমান সমস্যার উত্তোরণ ঘটবে।

ঘ ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী মি. জনসন ২০১৫ সালে বাংলাদেশের হাজারীবাগে বেশকিছু চামড়াজাত পণ্য তৈরির কারখানা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি এ শিল্প তথা চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আমি তার সে ধারণার সাথে একমত পোষণ করি। নিচে আমার যুক্তিসমূহ প্রদান করা হলো—

১. এদেশে প্রতিদিন বহুসংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া জবাই করা হয়। তাছাড়া কোরবানির সময় প্রচুর চামড়া পাওয়া যায়। তাই, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান কাঁচামাল তথা কাঁচা চামড়ার পর্যাপ্ত যোগান রয়েছে।

২. এদেশে যে কাঁচা চামড়া পাওয়া যায় তা উন্নতমানের। এরূপ চামড়া দ্বারা পাকা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্যের উন্নতমানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩. জনবহুল দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি এবং স্বল্প মজুরিতেই শ্রমিক পাওয়া যায়। এজন্য চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন খরচ কম পড়ে।

৪. দেশের ভেতরে ও বাইরে চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। তাই বিদেশের বাজারে উন্নতমানের পাকা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

সুতরাং, উপরিউক্ত যুক্তিগুলোর আলোকে মি. জনসনের সাথে একমত হয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের চামড়া শিল্প ভবিষ্যতে একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রশ্ন ▶৯ নাবিলা একজন নারী উদ্যোক্তা। আগে তিনি নিজে ঘরে বসে হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তার স্বামীও তাকে সহযোগিতা করেন। তিনি অধিক উৎপাদনের জন্য ১০ জন মহিলা শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠানটির মূলধন প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও ব্যাপৃত হয়েছে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

https://teachingbd24.com

ক. শিল্প কী? ১
খ. দেশের উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. নাবিলার প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের শিল্প নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাবিলার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারখানায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রাথমিক দ্রব্যকে (কাঁচামাল) মাধ্যমিক দ্রব্যে এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকেই শিল্প বলে।

খ দেশের উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা হলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূলতা ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।
কোনো দেশ যেসব দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানি করে সেসব দ্রব্য আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় নিজ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করে তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। এ ধরনের শিল্প স্থাপনের ফলে দেশীয় শিল্প বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তাই, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন।

গ কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ও মূলধন মূল্যের ভিত্তিতে নাবিলার প্রতিষ্ঠানটি কুটিরশিল্পকে নির্দেশ করে।
'শিল্পনীতি-২০১৬'-অনুসারে, যে শিল্পে স্বল্প মূলধন (১০ লক্ষ টাকার নিচে) এবং পারিবারিক সদস্যসহ সর্বাধিক ১৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে, তাকে কুটিরশিল্প বলে। সাধারণত পারিবারিক মালিকানায় গৃহের ভেতরে বা পাশে (ছোট পরিসরে এ শিল্প স্থাপিত হয়। যেমন— তাঁত শিল্প, বাঁশ শিল্প, কাঠ ও বেত শিল্প ইত্যাদি হলো কুটিরশিল্প।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, নাবিলা একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি নিজ ঘরে বসে হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য বাজারে বিক্রি করেন। এ কাজে তার স্বামীও তাকে সহযোগিতা করে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ১০ জন এবং মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। কাজেই বলা যায়, নাবিলার প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্যসমূহ কুটির শিল্পকে নির্দেশ করে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাবিলার প্রতিষ্ঠান তথা কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের অধিকাংশ মানুষ মূলধনের অভাবে কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এছাড়া দেশের মূলধন গঠনের হারও কম। মূলধন গঠনের হার কম হওয়ায় এক্ষেত্রে কুটির শিল্প স্থাপন করা যায়। আর কুটিরশিল্পে স্বল্প পুঁজি ও ঘরোয়া পরিবেশে উৎপাদন করা যায়। তাই, কুটিরশিল্প স্থাপিত হলে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান ঘটবে। সর্বোপরি, দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে। তাছাড়া, বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই বিশাল নারী সমাজের অধিকাংশই ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক কারণে ঘরের বাইরে কাজ করতে পারে না। তাই এই নারী সমাজ কুটিরশিল্পের মাধ্যমে দেশের মোট উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে।
আবার, কুটিরশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে দেশীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।
উপর্যুক্ত দিকগুলো ছাড়াও কুটিরশিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, নাবিলার প্রতিষ্ঠান তথা কুটিরশিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ১০ দিনু বাঁশের কুলা, ঢাকি তৈরি ও বিক্রি করে। তার বউ সোহাগী তার এই কাজে সাহায্য করে। দিনুর পুঁজি কম থাকায় সে ব্যাংকে ঋণের জন্য যায়। কিন্তু জামানত দিতে না পারায় ব্যাংক তাকে ঋণ দেয় না। ফলে তাকে অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হয়। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১
খ. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে PPP এর ভূমিকা কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাসমূহ কী কী? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের উন্নয়নের জন্য তুমি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করো? ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে, সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

খ পিপিপির আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
পিপিপির মাধ্যমে বিপুল পুঁজির সমাবেশ ঘটে এবং সৃষ্টি হয় বহুমুখী ও সম্প্রসারিত প্রতিষ্ঠান। এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে একটি দেশে সংগত কারণেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্বের হার হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কুটিরশিল্প বলে পরিচিতি। বাংলাদেশে এ ধরনের শিল্পের প্রাধান্য রয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ শিল্পের সমস্যা অনেক। এ শিল্পের সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:
১. বাংলাদেশের কুটিরশিল্পীরা অসচ্ছল ও দরিদ্র। তারা প্রয়োজন মাফিক পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়;
২. বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে জামানতের অভাবে ঋণ পাওয়া যায় না;
৩. এ দেশের অধিকাংশ কুটিরশিল্পে অনুন্নত ও সেকেলে উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ফলে উৎপাদন মানসম্মত হয় না এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও কম হয়;
৪. কুটিরশিল্পের জন্য যেসব কাঁচামাল দরকার হয় তার যোগান অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তার দাম বেশি হয়; যার ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়;
৫. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ জায়গায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না; আর পাওয়া গেলেও তা হয় অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত। ফলে কুটিরশিল্পগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হয়;
৬. বাংলাদেশে কুটিরশিল্পের সমরূপ অনেকদ্রব্য আমদানি করা হয়। এসব দ্রব্যের মান উন্নত ও দাম কম হওয়ায় দেশীয় কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পায়;
তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি হলো কুটিরশিল্প। বাংলাদেশের এ শিল্পটি বিভিন্ন সসম্যায় জর্জরিত। ফলে এ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই এ শিল্পের সমস্যা দূর তথা এর উন্নয়ন আবশ্যক। এদেশের কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা যায়—
১. বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত হবে;
২. কুটিরশিল্পে বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য সহজ শর্তে ও কম সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে;
৩. বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের নিয়মিত যোগান নিশ্চিত করতে হবে;
৪. বিভিন্ন প্রকার কুটিরশিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিল্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার;
৫. আধুনিক উৎপাদন কৌশল, উন্নত যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কারিগর এসবের সমন্বয়ে কুটিরশিল্পের পণ্যের মান উন্নত করতে হবে। তাহলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।
৬. কুটিরশিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য নীতি গ্রহণ করতে হবে।
৭. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কুটিরশিল্প-কারখানাগুলো যাতে নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে সে জন্য দেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হলে এদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলির সমাধান সম্ভব হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ মি. রফিক একটি কারখানা পরিচালনা করেন। সেই কারখানাটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এ শিল্পের নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগ এই শিল্প থেকে অর্জিত হয়। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্ব বাজারে এ শিল্পটি স্থান করে নিয়েছে। *[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ক্ষুদ্র শিল্প কী? ১

খ. চামড়া শিল্প অনুন্নতির কারণ কী? ২

গ. মি. রফিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি বাংলাদেশের অধিক সম্ভাবনাময়ী শিল্প— ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২৫-৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

খ বাংলাদেশে চামড়া শিল্পে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা থাকার কারণে এদেশে এ শিল্পটির বিকাশ আশানুরূপ নয়।

বাংলাদেশে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অধিকাংশই আমদানি করতে হয়। এতে আমাদের চামড়া শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। আবার কাঁচা চামড়া গুদামজাতকরণের জন্য প্রচুর চামড়ার আড়ত থাকা দরকার যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কোরবানির সময় চামড়া ক্রয় ও গুদামজাত করার জন্য চামড়া ক্রয়কারী সংস্থাগুলোর প্রচুর ঋণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। আর এসবই চামড়া শিল্পের অনুন্নতির কারণ।

গ মি. রফিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ১৯৭৬ সালে মাত্র তিনটি কারখানায় তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প তার সাফল্যের চার দশকের অধিক সময় অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে পোশাক শিল্পের কারখানা ও কর্মচারীর সংখ্যা যেমন অভাবনীয় বেড়েছে, তেমনি আয়ও বেড়েছে কয়েক হাজার গুণ। বর্তমানে এ শিল্পের প্রায় ৫,০০০ কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ লক্ষের অধিক। এসব শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগই হলো দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত এবং দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। তাদের ১৪-১৫ ঘণ্টার সস্তা শ্রমই মূলত এনে দিয়েছে আমাদের পোশাক শিল্পের বর্তমান সাফল্য। ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছর থেকে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ বর্তমানে এ খাত থেকে উপার্জিত হয়। রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশেরও বেশি বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৮,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১১০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়। এ শিল্প প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করায় একে 'সোনালি শিল্প' বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পোশাক শিল্পটি বাংলাদেশের অধিক সম্ভাবনাময়ী শিল্প। কেননা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলস্বরূপ কোটা ব্যবস্থা প্রত্যাহার সত্ত্বেও আমাদের পোশাক শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা হলো।

১. বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে এ শিল্পে প্রচুর সংখ্যক নারী শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ রয়েছে;

২. পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এ শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে;

৩. পোশাক শিল্প উন্নয়নে বিশেষায়িত ঋণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে পাওয়ার সুবিধা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. দেশের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগ (৮২%) পোশাক শিল্প থেকে আসে। এ জন্য এ শিল্পের উন্নয়নে সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৫. সরকারি প্রণোদনার ফলে এ শিল্প বিদ্যমান কয়েকটি বাজার ছাড়াও সম্প্রতি এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াসহ ২৫টি নতুন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে;

৬. পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের মধ্যে সময় ব্যবধান কম। এ জন্য এ দেশের অনেক উদ্যোক্তা পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

৭. বাংলাদেশের শিল্পনীতিতে ব্যক্তিখাতের উন্নয়নে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এ জন্য এখানে পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ লাভের সম্ভাবনা বেশি।

এসব কারণে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইতিবাচক ও উজ্জ্বল বলে মনে করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১২ আনিস উদ্দীন আমার বন্ধু। কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার গুণে দারিদ্র্য দূর করে সে আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ২০০০ সালে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ও পরিবারের সদস্য নিয়ে সে একটি শিল্প গড়ে তোলে। ২০১০ সালে তার পুঁজি বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বেড়ে হয় ১৫ জন। ২০১৫ সালে তার শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুঁজি বেড়ে হয় ১০ কোটি টাকা এবং শ্রমিক বেড়ে হয় ৯০ জন। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কাকে বলে? ১

খ. সরকার সম্প্রতি পলিথিনের ব্যবহার রোধ করতে ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন? ২

গ. আনিস উদ্দীনের ২০০০, ২০১০ এবং ২০১৫ সালের শিল্পগুলো কী ধরনের ছিল? ৩

ঘ. 'পিপিপি (PPP) এর মাধ্যমে আনিস উদ্দীন এর মতো বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হলে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।'— মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে, সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

খ পলিথিনের ব্যবহার পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর। এ বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।

প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাবে বিশ্ববাসী সচেতন হওয়ায় পাটের ব্যবহার বাড়ছে। ১ জানুয়ারি ২০০২ সাল থেকে ঢাকা শহরে পলিথিন ব্যাগ এবং ২০০২ সালের মার্চে সারাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। সরকার পরিবেশবান্ধব পাট উৎপাদনে সকলকে উৎসাহিত করার জন্য সম্প্রতি পলিথিনের ব্যবহার রোধ করতে ব্যবস্থা নিয়েছে।

গ আনিস উদ্দীনের উৎপাদন কার্যক্রমগুলো শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পড়ে। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি হলো কুটিরশিল্প, ২০১০ সালে ক্ষুদ্র শিল্প এবং ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি হলো মাঝারি শিল্প।

২০০০ সালে আনিস উদ্দীন মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প গড়ে তোলেন তা কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে আছে। এ শিল্প পারিবারিক পরিবেশে গড়ে ওঠে। যেমন— হস্তচালিত তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, কাঠশিল্প, অলংকার শিল্প প্রভৃতি।

২০১০ সালে তার পুঁজি বেড়ে ৫০ লক্ষ টাকা ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বেড়ে হয় ১৫ জন। এ বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। এ শিল্পের মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ধাতব শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, কাচ শিল্প প্রভৃতি।

২০১৫ সালে তার প্রতিষ্ঠানে পুঁজি বেড়ে দাঁড়ায় ১০ কোটি টাকায়। আর শ্রমিক দাঁড়ায় ৯০ জনে, যা মাঝারি শিল্পে পরিণত হয়। এভাবে আনিস উদ্দীনের শিল্প প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্প হতে মাঝারি শিল্পে পরিণত হয়।

https://teachingbd24.com

ঘ আনিস উদ্দীন এর মতো উদ্যোক্তাদের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমানে সরকার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) ধারণা সৃষ্টি করেছে।

প্রথমত, দেশের সড়ক যোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি, পর্যটন, আবাসনসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন সরকার কিংবা ব্যক্তির একার পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ করা হলে সহজেই এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়। সেজন্যই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও পিপিপির মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পিপিপির মাধ্যমে দেশের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন করা গেলে অর্থনীতির অপরাপর খাতসমূহও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো গেলে দেশের শিল্পখাত দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে।

তৃতীয়ত, পিপিপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগ ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেসরকারি খাত বহন করে। সেজন্য সরকারকে কোনোরূপ ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। ফলে অর্থনীতিতে সুদের হার স্থিতিশীল থাকে। ঋণ সরবরাহে কোনোরূপ চাপ সৃষ্টি হয় না। মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে সহজেই বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তবে এখন পর্যন্ত দেশে পিপিপির মাধ্যমে এরকম বিপুলায়তন বিনিয়োগে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। পরিকল্পিতভাবে যদি এরকম বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তবে দেশ লাভবান হবে সেটা বলতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাংলাদেশের ওয়ালটন কোম্পানি দেশেই এখন বিশ্বমানের রেফ্রিজারেটর, মোটরসাইকেল, টিভি ইত্যাদি তৈরি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। পূর্বে এসব পণ্য সম্পূর্ণ বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। *[চা.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বৃহদায়তন শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের দুটি প্রধান অবদান উল্লেখ করো। ২

গ. ওয়ালটন কোম্পানি কোন ধরনের শিল্প? অর্থনীতিতে কোম্পানিটির অবদান উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ওয়ালটন কোম্পানির মতো আর কোন ক্ষেত্রে আমাদের শিল্প ভূমিকা রাখতে পারে? ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বেশি সংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এক সাথে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, সেগুলোকে বৃহদায়তন শিল্প বলে।

খ বৈদেশিক বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের দুটি প্রধান অবদান হলো–

১. পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সনাতনি রপ্তানি আয়ের খাতগুলোকে পেছনে ফেলে বর্তমানে রপ্তানি আয়ের বৃহৎ উৎস হিসেবে অবদান রাখছে। দেশে মোট রপ্তানির আয়ের ৭৫% থেকে ৮২% এ শিল্প হতে আসে।

২. পোশাক শিল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ব্যাপক সুযোগ তৈরি করছে। গ্রামের অবহেলিত, অশিক্ষিত মহিলারা কাজের সুযোগ পেয়ে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তাই এটি অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশি অবদান রেখে চলেছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় ওয়ালটন কোম্পানি একটি আমদানি বিকল্প শিল্প। নিচে এ শিল্পের অবদান উল্লেখ করা হলো—

প্রথমত, ওয়ালটন কোম্পানির মতো আমদানি বিকল্প শিল্পে কেবল আমদানিকৃত দ্রব্যের মতো অথবা তার নিকট বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ শিল্পের পণ্য কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির জন্য উৎপন্ন করা হয়। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের অব্যাহত ঘাটতি এবং বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত, আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করা হলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এসব দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে প্রতি বছর ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানি করতে হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পকারখানা স্থাপন করা হলে আমদানি ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

চতুর্থত, বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেশি বলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রায়ই ঘাটতি দেখা দেয়। তাই শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশেই আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটবে এবং লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীভূত হবে।

ঘ উদ্দীপকের ওয়ালটন কোম্পানির মতো আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পও অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। নিচে রপ্তানিমুখী শিল্পের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রথমত, বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। দেশীয় সম্পদের ব্যবহার করে এদেশে শ্রমনিবিড় রপ্তানিমুখী শিল্পোৎপাদন শুরু করলে দেশে বেকার সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও এর রয়েছে শিল্পোৎপাদন উপযোগী প্রচুর কাঁচামাল। কিন্তু মূলধনের অভাবে আমাদের দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বিদেশি সহায়তায় দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হলে আমাদের দেশীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প বিকশিত হলে আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। এতে করে লেনদেন ভারসাম্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে। ফলে দেশের জন্য বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

চতুর্থত, দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প বিকশিত হলে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ফলে দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় জনগণের জন্য জরুরি দ্রব্যসামগ্রী আরো বেশি করে আমদানি করা যায়। ফলে দেশের জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশ ঋণভারে জর্জরিত একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পোৎপাদন করা সম্ভব হলে আমাদের বৈদেশিক ঋণের বোঝা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রহিম সাহেব একজন প্রবাসী। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে গিয়ে দেখেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও চামড়াজাত দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের প্রচুর আগ্রহ। তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে দেশীয় শিল্পের সাম্প্রতিক উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ করেন, যা নিম্নরূপ—

পণ্য	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
তৈরি পোশাক (মিলিয়ন টাকায়)	৪০৭১	৪২৯০	৬০০০	৮৮০০
চামড়া (মিলিয়ন বর্গমিটার)	১০.৫০	১০.৬০	১০.৫০	১৯.০০
চা (মে.টন)	৫৯.৫০	৬০.০০	৬১.০০	৬০.৭৫

রহিম সাহেব তার উদ্যোক্তা বন্ধু সেলিমের কাছে জানতে পারেন, বাংলাদেশে শ্রমিকে অদক্ষতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে দেশে শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। *[রা.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কুটির শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বৃহৎ শিল্প কীভাবে বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চা শিল্পের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ওপর মন্তব্য করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? বুঝিয়ে লেখ। ৪

https://teachingbd24.com

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাকে কুটির শিল্প বলে।

খ দেশের সিংহভাগ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহৎ শিল্প বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে জনাধিক্য অবস্থা বিরাজ করায় অধিকাংশ মানুষ কাজ করতে রাজী থাকলেও কর্মের জন্য সুযোগ অনেক কম। সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্প খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশের বেকার সমস্যা লাঘব করতে হলে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন। কারণ একমাত্র বৃহৎ শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে বাড়তি ও কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চা শিল্পের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ওপর মন্তব্য করা হলো—

পোশাক শিল্প: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ১৯৭৬-৭৭ সালে মাত্র তিনটি কারখানার তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ বর্তমানে এ খাত থেকে উপার্জিত হয়। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশেরও বেশি বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৪০৭১ মিলিয়ন টাকার পোশাক উৎপাদন করা হয়। যা ২০১২ -১৩ অর্থবছরে দ্বীগুণ বেড়ে ৮৮০০ হয়।

চামড়া শিল্প: চামড়া রপ্তানি করে এদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। বাংলাদেশের বার্ষিক মোট রপ্তানি আয়ের ৩% এ খাত থেকে অর্জিত হয়। আমাদের দেশে কোরবানির সময় প্রায় ১৮-২০ লক্ষ গরু, মহিষ এবং ৩৪-৩৫ লক্ষ ছাগল, ভেড়া জবাই করা হয়। বর্তমানে প্রায় ২০০টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, যার মধ্যে ৬৫টিরও বেশি উন্নত ও আধুনিক। এগুলোর বেশির ভাগই ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

চা শিল্প: চা শিল্প এদেশের একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫৮টি চা বাগান ও ১৪৪টি চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আছে। সত্তরের দশকের আগে চা শিল্পের অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে এখন চা রপ্তানি থেকে অতি সামান্য আয় হয়।

২০০৯-১০ অর্থবছরে চা উৎপাদন ছিল মাত্র ৫৯.৫০ মে.টন। যেখানে ২০১২-১৩ অর্থবছরে চা উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৬০.৭৫ মে.টন।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

প্রথমত, চামড়া শিল্পে নিয়োজিত ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানে প্রথমেই দরকার সরকার কর্তৃক সুষ্ঠু চামড়ানীতি প্রণয়ন। এর ফলে চামড়া শিল্পের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয়ত, ট্যানারি শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য কমন ফিনিশিং ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার চালু করা দরকার। এর ফলে ছোট ছোট ট্যানারিগুলো ফিনিশড লেদার তৈরি করতে পারবে।

চতুর্থত, দক্ষ জনশক্তির যোগান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি এর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ ধরনের আরও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত, দেশে চামড়া শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং লেদার টেকনোলজিস্ট তৈরির জন্য লেদার টেকনোলজির সংস্কার ও আধুনিকায়ন করতে হবে।

ষষ্ঠত, বিদেশে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমাদের চামড়াজাত দ্রব্যকে বিদেশের কাছে পরিচিত করতে বিদেশে বাণিজ্য মেলাসহ শিল্পমেলা ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

চামড়া শিল্প বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের প্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় শিল্প। তাই এ শিল্পের সমস্যাবলি সমাধানের জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এবং সেই সাথে এ শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'X' দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশটিতে বাণিজ্য ঘাটতি লেগেই আছে। একদল উচ্চ শিক্ষিত উদ্যোক্তা সে দেশের সরকারকে দেশে উৎপাদিত কাঁচামালের সাহায্যে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের পরামর্শ দিল এবং এমন কিছু পণ্য উৎপাদন করতে অনুরোধ করলো যেগুলো বর্তমানে আমদানি করতে হয়। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটবে। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কুটির শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৃহৎ শিল্পগুলোর নাম লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোক্তাদের পরামর্শ কীভাবে 'X' দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটাতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাকে কুটির শিল্প বলে।

খ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৃহৎ শিল্পগুলো হলো— পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সার শিল্প, চিনি শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি।

বৃহৎ শিল্পের মধ্যে পাট শিল্প সবচেয়ে বড়, যার মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ৭৮টি পাটকল রয়েছে। বস্ত্র, সার, চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, ইস্পাত ও লৌহ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশে উদ্যোক্তা দলের পরামর্শ অনুযায়ী আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন করা হলে নিম্নলিখিত উপায়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে–

প্রথমত, 'X' দেশটি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে থাকে। এসব আমদানিকৃত শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ এ ধরনের পণ্য আমদানি করতেই হয়। ফলে শিল্প দ্রব্য রপ্তানিমুখী দেশগুলো অনেক সময় অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে লেনদেন ভারসাম্য সবসময় দেশের প্রতিকূলে থাকে। এ অবস্থায় যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পজাত পণ্যসমূহ দেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে একদিকে যেমন দেশ শিল্পে উন্নত হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

দ্বিতীয়ত, আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করা হলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে প্রতি বছর ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানি করতে হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পকারখানা স্থাপন করা হলে আমদানি ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

ঘ বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করা দরকার। আমদানি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম ভোগ্য পণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ফলে শিল্পপণ্যের দিক থেকে দেশে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়। আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের বিভিন্ন রকম শিল্প স্থাপন করা যায়। ফলে দেশে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং সমগ্র শিল্প খাতের প্রসার ঘটে।

উদ্দীপকে দেশটির একদল উচ্চ শিক্ষিত উদ্যোক্তা 'X' দেশের সরকারকে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের পরামর্শ দেয়। এতে করে দেশটিতে উৎপাদন বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটবে। এটি সম্ভব আমদানি বিকল্প শিল্পের দ্বারা। আমদানি বিকল্প শিল্পে কেবল আমদানিকৃত দ্রব্যের মতো অথবা তার নিকট বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ শিল্পের পণ্য কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন করা হয়।

Teachingbd24.com

বহুকাল যাবৎ বাংলাদেশে রপ্তানি আয় অপেক্ষা আমদানি ব্যয় বেশি। ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য এদেশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এসব বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'A' কোম্পানি পূর্বে পাট ও পাটজাত পণ্য বাইরে রপ্তানি করতো। কিন্তু বর্তমানে পাটের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, মান নির্ধারণের সমস্যা ইত্যাদি কারণে অর্জিত আয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি না পাওয়ায় কোম্পানিটি পাটের পরিবর্তে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা স্থাপন করে। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পে স্বল্পমূল্যে পর্যাপ্ত শ্রমিক, বিনিয়োগ প্রবণতা, কর্মপরিবেশ, আন্তর্জাতিক বাজার ইত্যাদি কারণে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আমদানি বিকল্প শিল্প বলতে কী বোঝ? ১

খ. কীভাবে কুটিরশিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হতে পৃথক করা যায়? বুঝিয়ে লেখো? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'অর্জিত আয়' কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণসমূহ কী কী? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবর্তিত শিল্প হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন আরও কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশ হতে যেসব শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা হয় সেসব দ্রব্যের শিল্প নিজ দেশের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হলে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

খ কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প এক নয়; বরং আলাদা।

ক্ষুদ্র শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নন-ম্যানুফ্যাকচারিং দুটি খাতে বিভক্ত। 'শিল্পনীতি ২০১০' অনুযায়ী, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা এবং এ শিল্পে ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে। অন্যদিকে, কুটিরশিল্পের স্থায়ী মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম এবং সর্বোচ্চ ১০ জন পরিবারের জনবল দ্বারা পরিচালিত। উল্লেখ্য, সম্পদের মূল্য কিংবা শ্রমিকের সংখ্যার ভিত্তিতে একটি কুটিরশিল্প অতিক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্পটি হলো পাট ও পাটজাত শিল্প। এ শিল্পের 'অর্জিত আয়' কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি না পাওয়ার পেছনে কিছু সমস্যা বিরাজমান রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন খরচ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মূল্য তেমন বৃদ্ধি পায়নি। এর ফলে পাট চাষিদের হতাশাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. দেশের বিভিন্ন পাট বিভিন্ন ধরনের। একই এলাকার বিভিন্ন কৃষকদের পাটের গুণগত মানেও পার্থক্য থাকে এবং পাট চাষিরা পাটকে উপযুক্ত মান অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করতে পারে না। ফলে পাটের গড় মূল্য কৃষক পেয়ে থাকে। এতে কৃষক পাট চাষে উৎসাহী হয় না।

৩. মজুতকরণের সমস্যার কারণে পাটের প্রাথমিক বাজারগুলোতে পাট সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদামঘরের অভাব আছে। তাই পাট চাষিরা কম মূল্যে পাট বেপারি, দালাল ও রপ্তানিকারকের কাছে বিক্রি করে দেয়। পাটের কম মূল্যের জন্য তারা পাট উৎপাদনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

৪. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একদিকে চালের উচ্চমূল্য, অন্যদিকে, পাটের নিম্নমূল্য কৃষকদের পাট চাষের পরিবর্তে ধান চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বাজার ধরে রাখা এবং বাজারকে সম্প্রসারণ করার মতো উদ্যোগের অনুপস্থিতি রয়েছে। যা পাট শিল্পের জন্য বড় ধরনের অন্তরায় এবং পাটের রপ্তানিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'অর্জিত আয়' কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি না পাওয়ার পেছনে উপরিউক্ত কারণগুলোই যথেষ্ট।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তিত শিল্পটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প। যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণের ফলে এ শিল্প হতে আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

উদ্দীপকের বিষয়গুলো ছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে যা তৈরি পোশাকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১. গতানুগতিক ধারায় উৎপাদন না করে ক্রেতার চাহিদা ও পছন্দমতো পোশাক তৈরি করে উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের সাথে আলোচনা করে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। এতে করে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

২. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রদান ও যথাসময়ে মজুরি প্রদান করাসহ বোনাস ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রদান করলে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে অসন্তোষ দূর হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে অধিক উৎপাদনের প্রবণতা সৃষ্টি হবে, যা রপ্তানিকে প্রসারিত করবে।

৩. পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। তাই এ শিল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণের সুবিধা নিশ্চয়তা করা গেলে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহ পাবে এবং নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি হবে, যা রপ্তানিকে ত্বরান্বিত করবে।

৪. কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করতে হবে। সময়মতো বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফলে পোশাক শিল্পে আরও উৎপাদন বাড়বে।

৫. সরকার বিশেষজ্ঞ টিম দিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে এই শিল্পে কীভাবে আরও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারবে অথবা কোথায় কোথায় সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত তৈরি পোশাক শিল্পের এই সুবিধাগুলোকে বাস্তবায়ন করা গেলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, ফলে আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ কামাল সাহেব ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি শিল্প স্থাপন করেন। তার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন শ্রমিককে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়। কামাল সাহেবের বন্ধু জামাল সাহেব উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষায়ন, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেন। তার দেখাদেখি আরও অনেক উদ্যোক্তা ও জাতীয় কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসেন। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. মাঝারি শিল্প কী? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কামাল সাহেবের শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামাল সাহেব এবং অন্যান্য উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা তৈরি করেছে— তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পকারখানায় ২০ জনের অধিক কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাকে মাঝারি শিল্প বলে।

খ কোনো দেশ বিদেশ হতে যে সব দ্রব্য আমদানি করে, সে সব দ্রব্য নতুন করে আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করলে ঐ সমস্ত শিল্পকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলা হয়।

যে সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় সেগুলো যদি দেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমদানি ব্যয় বেঁচে যায়। আবার দেশীয় কাঁচামাল ও শ্রম ব্যবহার করায় উৎপাদন খরচও কম পরে। ফলে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ থাকায় জনগণ দেশীয় পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও বিদেশী পণ্য ভোগ থেকে বিরত থাকে। এভাবে আমদানি বিকল্প শিল্প দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে।

গ উদ্দীপকে কামাল সাহেবের শিল্পটি হলো বৃহৎ শিল্প। নিচে এ শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো—

বৃহৎ শিল্প বলতে বড় ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। অর্থাৎ যে শিল্প-কারখানায় বহুসংখ্যক শ্রমিক, অধিক মূলধন ও প্রচুর কাঁচামাল ব্যবহার করে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের 'শিল্পনীতি-২০১০' অনুসারে যে কারখানায় ২৩০ জনের অধিক

https://teachingbd24.com

শ্রমিক এবং ৩০ কোটি টাকার বেশি পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করা হয়, তাই বৃহৎ শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য উন্নত ও মানসম্পন্ন হয়। এসব শিল্প ভোগ্যপণ্য অপেক্ষা মূলধনী দ্রব্য বেশি উৎপাদন করে। বৃহদায়তন শিল্পের কিছু সুবিধা পরিলক্ষিত হয়। যথা— শ্রম বিভাগের সুবিধা, মূলধন সংগ্রহ সুবিধা, উন্নত উৎপাদন কৌশল ব্যবহারে সুবিধা, উন্নত কলাকৌশল ব্যবহারে সুবিধা, শিল্পের স্থানীয়করণের সুবিধা ইত্যাদি।

ঘ জামাল সাহেব এবং অন্যান্য উদ্যোক্তার পোশাক শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা তৈরি করেছে।

প্রথমত, পোশাক শিল্প দেশে একদল দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলেছে। বিনিয়োগ পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উদ্যোক্তাগণ দেশের শিল্পায়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে দেশে অন্যান্য সহায়ক শিল্প (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ) যেমন— সুতা, কার্টুন, পলিব্যাগ, লেভেল, গামপেট, প্যাকিং প্রভৃতি পণ্যের কারখানার দ্রুত বিকাশ ঘটছে।

তৃতীয়ত, পোশাক শিল্পের জন্য যে বিপুল পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন হয়, তার অতি সামান্য অংশ দেশীয় বাজার থেকে যোগান দেওয়া হয়। এ শিল্পের কাপড়ের চাহিদা পূরণের জন্য দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

চতুর্থত, পোশাক শিল্পের উন্নয়নের সুযোগে দেশে ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ছে। এ শিল্পের ফলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ ঘটছে এবং হোটেল ও পরিবহন ব্যবসার পরিধি বাড়ছে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প সর্বোচ্চ অবদান রাখে। পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যেখানে রপ্তানি আয় ছিল ৬,৪১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ রপ্তানি আয় হয়েছে ২৮,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত বছরে এ রপ্তানি আয় দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব লোকমানের নারায়ণগঞ্জে একটি হোসিয়ারি কারখানা আছে। তার কারখানায় ৭০ জন শ্রমিক কাজ করে। তিনি তার দ্রব্য তৈরির কাজে বিদ্যুৎচালিত সেলাই মেশিন ও কাটিং মেশিন ব্যবহার করেন। তার কারখানার স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। প্রতিবছর তিনি তার ব্যবসা থেকে ভালো মুনাফা করছেন। জনাব লোকমানের মতো আরো অনেক উদ্যোক্তা এ ধরনের শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হতে পারে।

[ব. বো. ’১৬ । প্রশ্ন নং ৩; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া । প্রশ্ন নং ৩]

ক. শিল্প কী? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল কীভাবে দেশকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব লোকমানের কারখানাটি কোন ধরনের শিল্পের আওতাধীন? উক্ত শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প বিকশিত হলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে ত্বরান্বিত হতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই ধরনের বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী ফার্মসমূহের সমন্বিত রূপকে শিল্প বলা হয়।

খ কোনো একটি দেশ যে সকল পণ্যসামগ্রী আমদানি করে, সেগুলো আমদানি না করে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করে দেশটি স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে।

আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের উদ্দেশ্য হলো আমদানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পকে উচ্চ ট্যারিফের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সরকারি ভর্তুকি ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা। উন্নয়নশীল দেশগুলো অতিশয় মাত্রায় আমদানি নির্ভর থাকে মূলধনী দ্রব্য ক্রয়ে। এসব নির্ভরতা একমাত্র কমাতে পারে আমদানি শিল্প। এতে দেশটির মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয় এবং পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। এভাবে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল দেশকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে জনাব লোকমানের কারখানাটি ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাধীন। এই শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো—

বাংলাদেশে 'শিল্পনীতি ২০১০'-এ উল্লেখ রয়েছে, যে শিল্পের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫-৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে, তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। এ শিল্পে দেশে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত কলকব্জা ব্যবহার করা হয় এবং এ শিল্পের মালিকানা একক বা অংশীদারের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে। সাধারণত বেতনভুক্ত শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব লোকমানের কারখানায় ৭০ জন শ্রমিক কাজ করে, বিদ্যুৎচালিত সেলাই মেশিন ও কাটিং ব্যবহার হয় এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। সুতরাং, সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, জনাব লোকমানের কারখানাটি ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাধীন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষুদ্র শিল্প বিকশিত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

বাংলাদেশের মোট কর্মশক্তির এক-তৃতীয়াংশই বেকার। এ বিপুল জনশক্তিকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা হলে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হবে অন্যদিকে তেমন দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের কৃষিতে যে অতিরিক্ত চাপ রয়েছে তা ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও স্থাপনের মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে। উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে, জনাব লোকমান প্রতি বছর তার ব্যবসা থেকে ভালো পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছেন। এতে লোকমান সাহেবের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। একইভাবে দেশের অন্যান্য কর্মক্ষম মেধাবী উদ্যোক্তাগণ তার দেখা দেখি শিল্প গড়ে তুলবে, যা দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় তেমনি এ শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস করা যায়। তাছাড়া পণ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে এ দেশের বিদ্যমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি কমানো যেতে পারে, যা জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

সুতরাং বলতে পারি, জনাব লোকমানের মতো আরও অনেক উদ্যোক্তাকে ক্ষুদ্র শিল্পে যুক্ত করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. রতন শীতের ছুটিতে সপরিবারে সিলেটে চা বাগান দেখতে গেল। সেখানে গিয়ে জানতে পারল যে, বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু চা শিল্পের কিছু সমস্যার কারণে উন্নতি করতে পারছে না। মি. রতন সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন। যেমন— শ্রমিকদের আবাসন সংকট, কম মজুরি, অশিক্ষিত শ্রমিক, শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি। *[ব. বো. ’১৬ । প্রশ্ন নং ৩; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা । প্রশ্ন নং ২]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. ফার্ম কি শিল্প হতে পারে? ২

গ. মি. রতন কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যাগুলো চা শিল্পের উন্নয়নে বাধা দিয়ে থাকে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাগুলো সমাধানে কী করা যায় বলে তুমি মনে করো? ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারখানায় মূলধনজাত দ্রব্য ব্যবহার করে প্রাথমিক দ্রব্যকে (কাঁচামাল) মাধ্যমিক দ্রব্যে এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিতকরণের প্রক্রিয়াই হলো শিল্প।

খ কিছু শর্ত সাপেক্ষে ফার্ম শিল্প হতে পারে।

একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী কোনো নির্দিষ্ট কারখানাই হলো ফার্ম। আবার একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্ম নিয়ে গঠিত হয় শিল্প। তবে কোনো একটি ফার্ম যদি একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ও দাম নির্ধারণ করে এবং ঐ পণ্য উৎপাদনকারী অন্যকোনো ফার্মের বাজারে প্রবেশের সুযোগ না থাকে সেই প্রেক্ষিতে উক্ত ফার্মই শিল্প বলে বিবেচিত হবে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রতন কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যাগুলো চা শিল্পের উন্নয়নে নিম্নোক্তভাবে বাধা দিয়ে থাকে।

১. চা শিল্পের একটি অন্যতম সমস্যা হলো শ্রমিকদের আবাসন সংকট। চা শিল্পের সাথে ২০ হাজারেরও অধিক শ্রমিক জড়িত। চা শিল্পে প্রয়োজনীয় শ্রমিক এ দেশে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় দক্ষ শ্রমিক তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রমিকরা অধিক আবাসন সংকটে ভুগছে। ফলে তারা চা শিল্পের কাজ ছেড়ে অন্য কাজের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠছে।

২. শ্রমিকদের কম মজুরি চা শিল্পের উন্নয়নে বড় একটি বাধা। অন্য যেকোনো শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় চা শিল্পের শ্রমিকরা কম মজুরি পেয়ে থাকে। এ শিল্পে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি, যথাসময়ে মজুরি না পাওয়া, বোনাসের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় শ্রমিকরা দিন দিন কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে, যা চা শিল্পের উন্নয়নে প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি করছে।

৩. চা শিল্প এবং চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও অদক্ষ। পাহাড়ি উপত্যকায় বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায় এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। বংশপরম্পরায় এরা এ শিল্পের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।

তাছাড়া তাদের আয় মাত্রারিরিক্ত কম হওয়ায় তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারেন না।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলোই চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করলে চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাবলি দূর হবে।

১. চা চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একর প্রতি ফলন বাড়াতে হবে। তাহলে চায়ের উৎপাদন খরচ কমবে।

২. চা শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও মূলধন সরবরাহ করতে হবে।

৩. চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বীজ ও সারের যোগান বাড়াতে হবে।

৪. চা চাষ ও তার প্রক্রিয়াজাতকরণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। এ জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. উন্নত প্যাকিং ও আধুনিক পদ্ধতিতে চা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. চায়ের সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে শিল্পাঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা দরকার।

৭. চায়ের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করার জন্য কার্যকর ও সুষ্ঠু চা নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চা শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাবলি দূর হবে এবং চা শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। দেশটিতে বাণিজ্য ঘাটতি বিরাজমান। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকার একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়, যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ দেশীয় শিল্পের বিকাশে সাহায্য করবে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. 'PPP শিল্পোন্নয়নে সহায়ক' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশীয় শিল্পের বিকাশে উদ্দীপেক বর্ণিত শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প হলো কারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্যে এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।

খ PPP-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে যা পরবর্তীতে আরো নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তা একটি দেশের শিল্পোন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

PPP (Public Private Partnership) হলো—চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো একটি প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল। এই PPP-এর মাধ্যমে বিপুল পুঁজির সমাবেশ ঘটে এবং তৈরি হয় বহুমুখী ও সম্প্রসারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান। যা বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের উন্নয়ন ঘটায়। তাই বলা হয়, PPP হলো শিল্পোন্নয়নের সহায়ক।

গ উদ্দীপকে আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

অতিমাত্রায় আমদানি নির্ভরতা ও বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু কিছু দ্রব্য আমদানি না করে সুবিধামতো সেসব দ্রব্যের শিল্প দেশে স্থাপন করা হয়ে থাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। এ ধরনের শিল্পের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক শিল্প স্থাপন করা। এর ফলে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশীয় শিল্পের বিকাশের দ্বার উন্মোচিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো এদেশেও অধিক বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। তাই বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে 'ক' দেশটির সরকার একটি বিশেষ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ দেশীয় শিল্প বিকাশে সাহায্য করে। অর্থাৎ, 'ক' দেশটির বিশেষ শিল্পটি হলো আমদানি বিকল্প শিল্প।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আমদানি বিকল্প শিল্প দেশীয় শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রকৃতপক্ষে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের মূল লক্ষ্যই হলো বাণজ্য ঘাটতি হ্রাসের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন। দেশে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দাতাগোষ্ঠীর অবৈধ ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ফলে দেশে স্বাধীনভাবে দেশীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উন্নয়নে সরকার মনযোগী হতে পারে। যা দেশটির শিল্পোন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে লক্ষ করা যায়, আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের ফলে উক্ত দেশটির দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয় যা দিয়ে দেশীয় শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় মূলধন ও মূলধন সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহার করা যায়।

আবার, আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে শিল্পপণ্যের দিক থেকে দেশটি স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। যা মূলত একটি দেশের শিল্প উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, আমদানি বিকল্প শিল্প দেশীয় শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২১ দেশে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হিসেবে এ শিল্পটি সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করছে। শুল্ক বাঁধা, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা, আর্থিক ঋণ সুবিধা অনুপস্থিত সহ নানাবিধ সমস্যা এ শিল্পের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে। তথাপি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মাইক্রো শিল্প কী? ১

খ. পাটশিল্প তার গৌরব হারিয়েছে — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পটির সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাংলাদেশে উক্ত শিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্প" বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা অথবা ১৬ থেকে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্প কারখানাকে মাইক্রো শিল্প (Micro Industry) বলে।

খ প্রাচীনকাল থেকে এদেশে উৎকৃষ্টমানের পাট উৎপন্ন হয়ে আসছে। এজন্য পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয়। কিন্তু, প্লাস্টিকের ব্যবহার বৃদ্ধি, সরকারি নীতিমালার অভাব, মিল মালিকদের দৌরাত্ম্য, মান নির্ধারণে সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার কারণে পাট তার গৌরব হারিয়েছে। তবে পাটশিল্পে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে পাট শিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পটি তৈরি পোশাক শিল্প। এই শিল্পের সমস্যার সমাধানের উপায় নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পটি যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হওয়ায় এ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে সস্তা শ্রম ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন—স্বল্প মজুরিতে প্রাপ্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত ট্রেনিং প্রদান করা হলে তাদের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এতে বিদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, তৈরি পোশাক শিল্প দ্বারা বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হলেও, এ শিল্পে নানাবিধ সমস্যা যেমন শুল্ক বাধা, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা ও আর্থিক ঋণের অপর্যাপ্ততা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সকল সমস্যা সমাধানে সরকার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে প্রতিটি ফার্মে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করতে পারে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সুদের হার নির্ধারণ করা হলে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা হবে। আবার, প্রয়োজনীয় শুল্কের হার পরিবর্তন করে তৈরি পোশাক শিল্পে উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করা যায়।

তাই বলা যায়, উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হবে আশা করা যায়।

ঘ দ্রুত বিকাশমান শিল্প হিসেবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। নিচে বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে কতিপয় সাহসী উদ্যোক্তার হাত ধরে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এদেশে পোশাক তৈরির প্রায় ৫০০০ কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছে। এই শিল্প হতে মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১% অর্জিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দেশীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করছে। তাছাড়া, সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করছে। যেমন- তৈরি পোশাক শিল্পে সরকারি প্রনোদনা উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ঠ অবদান রাখছে।

আবার, বাংলাদেশে সস্তায় পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া এবং তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমনির্ভর হওয়ায় এই শিল্পটি বেশ সম্ভাবনাময়। তাছাড়া নারীদের অংশগ্রহণ, বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিশ্চয়তা এবং সরকারের উদার শিল্পনীতি বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত তৈরি পোশাক শিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্প।

প্রশ্ন ▶ ২২ আমেরিকা প্রবাসী জনাব 'ক' একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ানো তার শখ। ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে যেখানেই গিয়েছেন সর্বত্রই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য ও কুটির শিল্পের নিপুণ সামগ্রী দেখে নিজ দেশ নিয়ে আনন্দিত। তার মতে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের সুষম উন্নয়ন ঘটায় —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী ভূমিকা পালন করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাইটেক শিল্প বলতে, জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর, উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক; পরিবেশবান্ধব এবং আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়ননির্ভর শিল্পকে বোঝায়।

খ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রামাঞ্চলে প্রসার লাভ করলে সুষম উন্নয়ন সম্ভব। কারণ বৃহৎ শিল্প শুধু শহরকেন্দ্রিক স্থাপনের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের প্রধান বৃহৎ শিল্পগুলো হলো— পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি। এসব শিল্প সাধারণত শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামের সাধারণ পরিবারের লোকজনের এসব শিল্পে কাজ করার সুযোগ খুবই কম থাকে। এ দিক থেকে চিন্তা করলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কারখানাগুলো গ্রামাঞ্চলে ও শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয়ে থাকে। যা অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়ে থাকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সুষম উন্নয়ন ঘটায়।

গ তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলোতে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ২২ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত। এই শিল্পে প্রায় ৮০ শতাংশই হলো অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা কর্মী। মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই শিল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫ থেকে ৮২ শতাংশেরও বেশি বস্ত্রপণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৮,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশি তৈরি পোশাক শিল্পের প্রধান আমদানিকারক দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় ছিল প্রায় ৩২০৪.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ২৯.০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৩৪,৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয়েছে। যেখানে তৈরি পোশাক খাতের (নিটওয়্যারসহ) রপ্তানি আয় ছিল ২,৮১৪ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার।

উদ্দীপকের আমেরিকা প্রবাসী জনাব 'ক' একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। ওই দেশগুলোতে তিনি নিজদেশের পণ্য দেখে খুশি হন। কারণ তিনি চিন্তা করেন বাংলাদেশ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে এখন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ সৃজনশীল ২১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব আমজাদ 'ক' দেশের নাগরিক। এই দেশটির রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেশি হয়। ফলে দেশটির বাণিজ্য ঘাটতি বেশি। তাই দেশটির সরকার এমন একটি শিল্প স্থাপন করলেন যা বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে সাহায্য করবে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. ভোগ্য শিল্প কী? ১

খ. কিভাবে কুটির শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হতে পৃথক করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শিল্পের উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শিল্পটি বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে কোন ভূমিকা পালন করছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্প সরাসরি মানুষের ভোগ উপযোগী দ্রব্য উৎপাদন করে, তাকে ভোগ্য শিল্প বলা হয়।

খ কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য হলো পরিচালনা পদ্ধতি ও মূলধন সংগ্রহ।

কুটিরশিল্প পারিবারিক মালিকানায় পরিচালিত হয়। যেখানে ক্ষুদ্রশিল্প পারিবারিক মালিকানা ছাড়াও অংশীদারি অথবা সমবায়ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হয়। কুটিরশিল্পে পুঁজি পারিবারিক উৎস থেকে আসলেও ক্ষুদ্রশিল্পে তা মালিক ছাড়াও বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা থেকে সংগৃহীত হতে পারে। কুটিরশিল্পে হালকা যন্ত্রপাতি ও দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পে আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি ও দেশি-বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। কাজেই বলা যায়, উপরে উল্লিখিত পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কুটির শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হতে পৃথক করা যায়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমদানি শিল্পটি 'ক' দেশের বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ফলে শিল্পপণ্যের দিক থেকে দেশে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়। আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের বিভিন্ন রকম শিল্প স্থাপন করা যায়। ফলে দেশে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং সমগ্র শিল্প খাতের প্রসার ঘটে। এতে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে একটি দেশের বাণিজ্য ঘাটতি দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'ক' দেশটি কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে থাকে। এসব আমদানিকৃত শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ এ ধরনের পণ্য আমদানি করতেই হয়। ফলে শিল্পদ্রব্য রপ্তানিমুখী দেশগুলো অনেক সময় অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে লেনদেন ভারসাম্য সবসময় দেশের প্রতিকূলে থাকে। এ অবস্থায় যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পজাত পণ্যসমূহ দেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে একদিকে যেমন দেশ শিল্পে উন্নত হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করা হলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই বলা যায়, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে আমদানি বিকল্প শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ একসময় বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসতো কৃষিজাত পণ্য (পাট, চা) রপ্তানির মাধ্যমে। কিন্তু এ সকল পণ্যের মূল্যসংযোজন কম হতো অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত শ্রমিকের যোগান অধিক, কম মজুরি, শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ ও আবাসন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা অপ্রতুল। এরূপ বাস্তবতায় গড়ে ওঠে গার্মেন্টস শিল্প। বর্তমানে শুল্কবাধা ও প্রতিবন্ধকতা, কাজের প্রতিকূল পরিবেশ, কারিগরি দক্ষতার অভাব, অবাধ বাণিজ্যের প্রতিকূল প্রভাব, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে অধিকাংশ আইটেমে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম স্থান। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ প্রায় নব্বই শতাংশই এ খাত হতে আসছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মোট পণ্য রপ্তানি আয় ছিল ৮,৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫-১৬ বছরে দাঁড়ায় ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. অগ্রাধিকার শিল্প কী? ১

খ. 'স্কয়ার ফার্মাসিটিক্যালস' শিল্প নয় ফার্ম— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের সনাতনী রপ্তানি ব্যবস্থার কী কী দুর্বল দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানির ধারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য কী যথেষ্ট মনে কর— মতামত ব্যক্ত কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অগ্রাধিকার শিল্প' বলতে যে সমস্ত উদীয়মান শিল্পকে বোঝায় সেগুলো শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

খ যে কারখানায় অনুসৃত উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে সংগৃহীত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাকে ফার্ম বলে। এরকম একেকটি কারখানা হলো একেকটি ফার্ম। একটি দেশে একটি দ্রব্য উৎপাদনে অনেক ফার্ম নিয়োজিত থাকতে পারে। অন্যদিকে, শিল্প হলো কোনো দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টি।

তাই 'স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস' এ একটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় বলে এ শিল্প ফার্ম বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সনাতনী রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো হলো পাট ও চা। এ শিল্পের অর্জিত আয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি না পাওয়ার পেছনে কিছু সমস্যা বিরাজমান রয়েছে যা নিম্নরূপ-

বাংলাদেশে একসময় রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল পাট ও চা। তখন এদেশের পাটশিল্প সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ ও স্কচ কোম্পানির হাতে ছিল। দরিদ্র পাট চাষিরা সংঘবদ্ধ ছিল না। তাই তারা ন্যায্য দাম পেত না। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাটের দাম হঠাৎ কমে যায়। কিন্তু পাট কোম্পানির লাভ অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। আবার, ১৯২১-১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই পাটকলে শ্রমিকদের ধর্মঘট চলতে থাকে। তাছাড়া এদেশের পাট ও চা শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিক অশিক্ষিত ও অদক্ষ। তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। বংশ পরম্পরায় এরা এ ধরনের শিল্পের শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ফলে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি, যথাসময়ে মজুরি না পাওয়া, বোনাসের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে শ্রমিকরা দিন দিন কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এ ছাড়াও এ ধরনের শিল্পে শ্রমিকদের আবাস সংকট, তাদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল প্রভৃতি সমস্যা বিদ্যমান থাকায় তারা অন্য কাজের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠছে, যা পাট ও চা শিল্পের উন্নয়নে অন্যতম দুর্বল দিক।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকায় বর্তমানে পাট ও চা শিল্প তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। তবে এ শিল্পগুলোর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকায় যদি বিদ্যমান সমস্যাগুলোর আশু সমাধান সম্ভব হয় তবে দেশের অর্থনীতিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘ উদ্দীপকের পরবর্তী শিল্পটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প, যা দেশের সনাতনী রপ্তানি আয়ের খাতগুলোকে পিছনে ফেলে বর্তমানে সর্ববৃহৎ খাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অতি সম্ভাবনাময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রুত বিকশিত শিল্প। ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়। ১৯৮০ সালে পোশাক শিল্পে সরকার পাঁচ বছরের জন্য শুল্কমুক্তি প্রদানপূর্বক ঋণ প্রদান করলে ১৯৮৫-৮৬ সাল নাগাদ দেশের আনাচে-কানাচে ছোটবড় অসংখ্য পোশাকশিল্প গড়ে ওঠে। এ শিল্প শ্রমনিবিড় শিল্প। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮২ ভাগ এ খাত থেকেই আসে। ফলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হিসেবে এই শিল্প বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করেছে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক ১৯৭৬-৭৭ সালে ৩টি কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে প্রায় ৫০০০ কারখানার তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এসব কারখানায় প্রায় ৫০ লক্ষ দরিদ্র শ্রমিক কর্মরত। যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ হলো দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত নারী। বর্তমানে প্রতি বছর তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রায় ২৪,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হচ্ছে। তবে তৈরি পোশাক শিল্পের তৈরি মাত্র ১০-১২টি আইটেম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই আইটেমের সংখ্যা বাড়ানো হলে রপ্তানি আয় আরো বাড়বে। আবার কর্মপরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা গেলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে এবং মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নত হবে। এছাড়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রণোদনা, উদার শিল্পনীতি, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ, সহজলভ্য ঋণ প্রদান, শুল্ক বাধা হ্রাস, অবাধ বাণিজ্য সুবিধা প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে এ শিল্পের আরো প্রসার ঘটানো যাবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তৈরি পোশাকের মতো আরো অনেক প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রয়েছে যেগুলো অনেক সম্ভাবনাময় শিল্প। সরকার এসব শিল্পের প্রতি যত্নবান হলে সেগুলো অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মালেশিয়ার একটি কারখানায় বাংলাদেশি শ্রমিক রফিক খুব অল্প বেতনে কাজ করে। কারণ দেশে কলকারখানা নেই, চাকরি নেই। এ ছাড়াও দেশে বিদ্যমান কলকারখানাগুলো রুগ্ন, কাঁচামালের অভাব, পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে যা নতুন শিলপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্তরায়। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কুটির শিল্প কী? ১

খ. কী কী বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পৃথক? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলো নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে কিভাবে অন্তরায়— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা ছাড়াও বাংলাদেশের শিল্পে আরও যেসব সমস্যা রয়েছে—তা বিশ্লেষণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৃহের মধ্যে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাকে কুটির শিল্প বলে।

খ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে পৃথক করা যায়। যেমন-

১. ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি এবং প্রতিষ্ঠানে ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে। অন্যদিকে, যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠানে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে, তা মাঝারি শিল্প বলে পরিচিত।

২. সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে যেসব প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, সেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা এবং প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ২৫ জন শ্রমিক কাজ করে। অন্যদিকে যেসব প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা হয় এবং ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে সেগুলোকে মাঝারি শিল্প বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নকে নানাভাবে ব্যাহত করে। নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো–

শিল্প হলো অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। কারণ দ্রুত এবং টেকসই শিল্পায়ন ব্যতীত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বাধার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে এখনো অনুন্নত কারখানাব্যবস্থাপনা ও পুরনো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পকারখানাগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। যা দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। অনুন্নত উৎপাদনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার দরুন কারখানাগুলো উৎপাদনের প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মালিকেরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে এবং নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এজন্য নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। তাছাড়া দেশে শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব একটি বড় সমস্যা। কাঁচামাল ছাড়া শিল্পপণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। সময়মতো কাঁচামাল পাওয়া না গেলে তা উৎপাদনকে ব্যাহত করে। অনেক পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ও বেশি হয়ে থাকে। আবার শিল্পের কাঁচামাল দেশে পাওয়া গেলেও অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা এবং অবকাঠামোর জন্য সেসব কাঁচামাল পরিবহন ব্যয় অনেক বেশি পড়ে। তাছাড়া রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা এবং পরিবহন খাতে নৈরাজ্যের জন্য শিল্পপণ্য পরিবহন বিঘ্নিত হয়। যা নতুন উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শুরুতেই নিরুৎসাহিত করে তোলে। এছাড়াও উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানুষের অভাব বাংলাদেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে বড় অন্তরায়। কারণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত জটিল যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য যে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তার যোগান আমাদের দেশে অত্যন্ত কম। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে উৎপাদন পর্যাপ্ত হয় না এবং উৎপাদিত পণ্যের মানও ভালো হয় না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলো নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাভাবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশে শিল্পের কতকগুলো সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ছাড়াও এদেশে শিল্পের আরও কিছু সমস্যা রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত। উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিকদের চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে ঋণদান প্রক্রিয়া জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। উপযুক্ত তদারকির অভাবে বেসরকারি অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ঋণের যথাযথ ব্যবহার হয় না। তাছাড়া শিল্পঋণ নিয়মিত পরিশোধের অভাবে ঋণদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ঋণ সম্পর্কিত এসব সমস্যার ফলে এদেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

বাংলাদেশে শক্তি সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কয়লা ও তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎশক্তির যোগান পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া এখানে লোডশেডিং ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের মানুষের সঞ্চয় কম বলে পুঁজি গঠনের হারও কম। শেয়ারবাজার থেকেও প্রয়োজনমাফিক শিল্প পুঁজি সংগ্রহ সম্ভব নয়। দেশে সম্পদশালী উদ্যোক্তা শ্রেণিরও অভাব রয়েছে। এসব কারণে এদেশের কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে যে পুঁজির প্রয়োজন পড়ে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তাছাড়া কলকারখানা নির্মাণ করতে গিয়ে অনুমোদন সংগ্রহ, ব্যাংক ঋণপ্রাপ্তি, বিভিন্ন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু সরকারি অফিস-আদালতে লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে শিল্পোদ্যোক্তারা হয়রানি, অপমান, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদির শিকার হন। ফলে তারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরও নানা কারণে এদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ 'X' দেশের অর্থনীতিতে শিল্পটি 'Life Line' হিসেবে পরিচিত। শিল্পটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কোটা আরোপ, তীব্র প্রতিযোগিতা ও কাঁচামালের অভাব সত্ত্বেও শিল্পটি 'X' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[হলিক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. কেন আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকের শিল্পটি যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়। তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি 'X' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ত্বরান্বিত করে। তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব এবং আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়ননির্ভর শিল্প হলো হাইটেক শিল্প।

খ দেশের উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা হলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূলতা ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

মূলত, কোনো দেশ যেসমস্ত দ্রব্য আমদানি করে সেসমস্ত দ্রব্য আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় নিজ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করলে তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। এ ধরনের শিল্প স্থাপনের ফলে দেশীয় শিল্প বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তাই, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের শিল্পটি বলতে পোশাক শিল্পকেই বুঝানো হয়েছে। 'X' দেশে পোশাক নানা সমস্যার সম্মুখীন।

'X' দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত কাঁচামাল না পাওয়ায় উদ্যোক্তাদের বিদেশের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। সময়মতো কাঁচামাল না পাওয়া, কাঁচামালের স্বল্পতা এবং বেশি দামে কাঁচামাল ক্রয় করায় ব্যবসায়ীরা বিপাকের সম্মুখীন হয়। লোডশেডিং 'X' দেশের প্রতিনিয়ত সমস্যা। বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ উৎপাদনের সহায়ক নয়। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাসের সংযোগও এই শিল্পে নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে প্রায়ই শ্রমিকরা কর্মসময়ে অলস থাকে। দক্ষ শ্রমিক

https://teachingbd24.com

উৎপাদনের সহায়ক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাম থেকে চলে আসা অদক্ষ শ্রমিকদের কোনো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা না করে নিযুক্ত করা হয়। পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। নিজ দেশে যন্ত্রপাতি তৈরি না হওয়ায় বেশি দামে যন্ত্রপাতি কিনতে হয় এবং অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে প্রায়ই ধর্মঘটসহ বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হয়, যা উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। শ্রমিকরা প্রায়ই সামান্য দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির ওপর আঘাত হানে।
'X' দেশ ১০-১২টি আইটেমের পোশাক রপ্তানি করে। কিন্তু চীন, ভারত, তাইওয়ান, হংকং প্রভৃতি দেশ ১১৫-১২০টি আইটেমের পোশাক রপ্তানি করে। তাই 'X' দেশের আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প অর্থাৎ পোশাক শিল্প 'X' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে বলে আমি মনে করি।
পোশাক শিল্পখাত 'X' দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্পখাত। এই খাতের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ায় এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আয় বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে। খাতটি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
'X' দেশে পোশাক শিল্প বিকাশ লাভ করায় প্রতিবছর বহু টাকার পোশাক রপ্তানি করে থাকে। এদেশের আমদানি ব্যয়ের ১৮% তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় দ্বারা মেটানো হয়। আর এর মাধ্যমে 'X' দেশ তার লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। আবার পোশাক খাতে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অবহেলিত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। ফলে পোশাক শিল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে 'X' দেশে বিশাল ভূমিকা পালন করছে। 'X' দেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫-৮২ শতাংশেরও বেশি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উক্ত দেশ পোশাক রপ্তানি করে ২৮১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।
উপরের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, পোশাক শিল্প 'X' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ লাকি একটি কারখানা পরিচালনা করেন। সেই কারখানাটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগ এই শিল্প থেকে অর্জিত হয়। নানা বাধা অতিক্রম করে শিল্পটি বিশ্ব বাজারে স্থান করে নিয়েছে। বর্তমানে এই শিল্প রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২য়, যুক্তরাষ্ট্রে ৩য় এবং ইউরোপে ২০১১ সালে শীর্ষে ছিল। */আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩/*

ক. কুটির শিল্প কী? ১
খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে একটি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে? ২
গ. লাকির শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কী ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিল্পটি বাংলাদেশের অধিক সম্ভাবনাময়ী শিল্প— ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাকে কুটিরশিল্প বলে।

খ দেশে শিল্পায়ন ঘটলে দেশটি এমন কতগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা অতীতে আমদানি করতে হতো।
দেশে বড় বড় কল-কারখানার প্রসার ঘটলে নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে, যার ফলে সেক্ষেত্রে বিদেশি নির্ভরতা কমে। দেশে শিল্প বিকশিত হলে প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম দেশেই উৎপাদন করা যায়; বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই বলা যায়, শিল্পায়নের মাধ্যমে একটি দেশ বিভিন্ন উপায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করে।

গ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ পাটকে একসময় স্বর্ণসূত্র বলা হতো। তবে পাটের বিকল্প সিনথেটিক আঁশ আবিষ্কার হওয়ায় বিগত কিছু বছর এর বৈশ্বিক চাহিদা কমে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে পাট তার অতীত ঐতিহ্য ফেরত পেতে শুরু করেছে। */আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৩/*

ক. PPP কী? ১
খ. আমাদের দেশে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা জরুরি কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে পাটশিল্পের সমস্যাসমূহ আলোচনা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে পাটশিল্পের উন্নয়নে তোমার মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PPP হলো Public Private Partnership.

খ বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা জরুরি।
বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। এতে করে আমাদের বৈদেশিক আয়ের সিংহভাগই ব্যয় হয়ে যায়। তাই যদি আমদানি না করে দেশের ভেতরেই সেসব দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তবে আমদানি ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

গ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ বাংলাদেশের পাটশিল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত 'পাটনীতি-২০১১' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পাট শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।
একসময় পাটই ছিল বাংলার প্রধান অর্থকরী ফসল। এ খাত থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বিভিন্ন সমস্যার কারণে এ সম্ভাবনাময় খাতটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও পদক্ষেপ দ্বারা এর হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ইতোমধ্যে সরকার 'পাটনীতি-২০১১' গ্রহণ করে এ খাতকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। এছাড়া কৃষক পর্যায়ে, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, সহজ শর্তে ঋণদান, উন্নত চাষাবাদ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ, পাট ও পাটজাত পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে এ খাতকে আরো প্রসারিত করা যেতে পারে।
এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, উৎসবে পাটজাত পণ্যের মেলার আয়োজন করলে এই পণ্য ব্যবহারে মানুষ আগ্রহী হবে। এতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলগুলোকে চালু করতে পারলে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, পাটের সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনতে সরকারের 'পাটনীতি-২০১১' প্রণয়ন, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ শামীম সাহেব একটি কারখানা পরিচালনা করেন। যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এ শিল্পের নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ এই শিল্প থেকে অর্জিত হয়। */উত্তরা হাইস্কুল ও কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩/*

ক. ক্ষুদ্র শিল্প কী? ১
খ. রপ্তানিমুখী শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শামীম সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি বাংলাদেশের অধিক সম্ভাবনাময়ী শিল্প বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প কারখানায় বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কম মূলধন এবং মূলধনের তুলনায় বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

https://teachingbd24.com

খ যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

গ উদ্দীপকের শামীম সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ধরন হলো পোশাক শিল্প।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ১৯৭৬ সালে মাত্র তিনটি কারখানার তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প তার সাফল্যের চার দশকের অধিক সময় অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে পোশাক শিল্পের কারখানা ও কর্মচারীর সংখ্যা যেমন অভাবনীয় বেড়েছে, তেমনি আয়ও বেড়েছে কয়েক হাজার গুণ। বর্তমানে এ শিল্পের প্রায় ৫,০০০ কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ লক্ষাধিক। এসব শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগ হলো দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। তাদের ১৪-১৫ ঘণ্টার সস্তা শ্রমই মূলত এনে দিয়েছে আমাদের পোশাক শিল্পের বর্তমান সাফল্য। ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছর থেকে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ বর্তমানে এ খাত থেকে উপার্জিত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশেরও বেশি বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৮,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়। এ শিল্প বিদেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করায় একে 'সোনালী শিল্প' বলা হয়।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ফরহাদ সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ আমেরিকায় বসবাস করছেন। দেশের যেকোনো সাফল্যই তাকে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত করে তোলে। তিনি লক্ষ করেন আমেরিকার বিভিন্ন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিনি মনে করেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পোশাক শিল্পের অবদান আরো বাড়াতে হলে এ শিল্পের বিদ্যমান সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম স্থাপিত পাটকল কোন্‌টি? ১

খ. দেশের উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী বাংলাদেশের যেসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা বিদেশে রয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো বাড়াতে হলে যে শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান প্রয়োজন তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রথম স্থাপিত পাটকল হলো 'আদমজী জুট মিল'

খ দেশের উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা হলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূলতা ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

মূলত, কোনো দেশ যেসমস্ত দ্রব্য আমদানি করে সেসমস্ত দ্রব্য আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় নিজ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করলে তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। এ ধরনের শিল্প স্থাপনের ফলে দেশীয় শিল্প বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তাই, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী, বাংলাদেশের যেসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা বিদেশে রয়েছে সে সব পণ্যগু হলো তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য ও কুটির শিল্প। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের শিল্পজগতে এক অভাবনীয় সংযোজন। ১৯৭৬ সালে দেশে এ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দেশে বর্তমানে প্রায় ৫০০০ এর মতো পোশাক কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় বিপুল লোকের বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। পোশাক খাত হতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ এবং GDP'র ৫ শতাংশ অর্জিত হচ্ছে।

এক সময় বাংলাদেশের ঐতিহবাহী ও বৃহৎ শিল্প হলো পাটশিল্প। বাংলাদেশের পাটকে সোনালি আঁশ বলা হতো। শিল্পনীতি ২০১০—এ পাটজাত দ্রব্যকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে পাটনীতি ২০১১ অনুমোদিত হয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ আসে পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে। এ ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ শিল্পে অল্পশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণবিহীন লোকজন পারিবারিকভাবে এ শিল্প পরিচালনা করে বলে এখানে কম খরচে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ বিভিন্ন কুটির শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ঘ উদ্দীপকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো বাড়াতে হলে পোশাক শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। নিচে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধান বিশ্লেষণ করা হলো-

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকাংশই হলো মহিলা এবং কোনো অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণবিহীন। এদের দিয়ে কারখানা পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যবস্থাপকদের পদে পদে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এ জন্য শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার, পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কাপড়, সুতা, বোতাম এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়, যার কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য দেশীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির মান উন্নত করতে হবে, যাতে আমদানি নির্ভরতা কমে যায়।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে ১৫-২০ ধরনের পোশাক রপ্তানি হয়, কিন্তু বিশ্ববাজারে আরও অনেক ধরনের পোশাকের চাহিদা আছে। যার ফলে আমাদের পোশাকের বাজার সংকুচিত হচ্ছে। আমাদের উৎপাদনকে আরও বিস্তৃত করে অন্যান্য পণ্যের বাজারও আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী পোশাক রপ্তানিকারী/উৎপাদনক দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাজারে টিকে থাকা বাংলাদেশের জন্য কঠিন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পগুলোর সক্ষমতাকে আরও বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে উপরিউল্লিখিত সমস্যা ও সমস্যার সমাধান গ্রহণ করে এ শিল্পের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মি. এস-এর চট্টগ্রামের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে একটি চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের কারখানা আছে। এর উৎপাদিত দ্রব্যাদির পুরোটাই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মি. এস-এর মতো এদেশে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে এ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। *[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কি না? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারখানায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রাথমিক দ্রব্যকে (কাঁচামাল) মাধ্যমিক দ্রব্য এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকেই শিল্প বলে।

খ একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী কোনো নির্দিষ্ট কারখানাকেই ফার্ম বলে। যেমন– বাংলাদেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারী 'মেঘনা সিমেন্ট' নামের কারখানাটি হলো একটি ফার্ম। অন্যদিকে, একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্ম নিয়ে গঠিত হয় শিল্প। যেমন– বাংলাদেশের সকল সিমেন্ট ফার্ম নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্প।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি হলো চামড়া শিল্প। নিচে চামড়া শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমানে দেশে ও দেশের বাইরে চামড়াজাত দ্রব্য যেমন- জুতা, ব্যাগ ইত্যাদির চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা মেটানোর জন্য চামড়া শিল্পের প্রসার ঘটছে। চামড়াকে কেন্দ্র করে দেশে চামড়া বা ট্যানারি মিল, জুতা শিল্প ছাড়াও অন্যান্য চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিজেকে প্রথমশ্রেণির চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩-৩.৫ ভাগই আসে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য থেকে। বর্তমানে চামড়া শিল্প বাংলাদেশের জন্য একটি প্রতিশ্রুতিশীল খাত, যেখানে উৎপাদন বাড়লে দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতে পারে। একই সাথে সৃষ্টি হতে পারে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ।

উপরের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চামড়া শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি হলো চামড়া শিল্প। বাংলাদেশে চামড়া শিল্প নানা সমস্যায় জর্জরিত। নিচে চামড়া শিল্পের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এদেশের ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নতমানের ফিনিশড লেদার তৈরি করতে পারে না। আবার, চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণের দরকার হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ পায় না। চামড়া শিল্পের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অপরিহার্য, কিন্তু বাংলাদেশে এসব রাসায়নিক দ্রব্যের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভ্রাট উৎপাদন কাজ ব্যাহত করে।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পে যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ। এর ফলে চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়। অন্যদিকে, এদেশে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের বৈদেশিক বাজার কখনো প্রসার লাভ করেনি। এদেশের চামড়া শিল্প পণ্যের গুণগত মান নিম্ন হওয়ায় বিশ্ব বাজারে বিস্তৃতি লাভ করেনি। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উৎপাদনের জন্য ট্যানারিগুলোতে কোনো ট্রিটমেন্ট প্লান্ট না থাকায় ট্যানারির নির্গত বর্জ্য পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও চামড়ানীতির অভাবের কারণে চামড়াশিল্পের উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে আছে।

অতএব বলা যায়, বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে উপরের সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকায় এ শিল্প তার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধন করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶৩২ নাবিলা একজন নারী উদ্যোক্তা। আগে তিনি নিজে ঘরে বসে জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন। বর্তমানে তার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তার স্বামীও তাকে সহযোগিতা করে। এছাড়াও অধিক উৎপাদনের জন্য ১০ জন মহিলা শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠানটির মূলধন বর্তমানে ৫ লক্ষ টাকা।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. শিল্পের স্থানীয়করণ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের দুইটি সমস্যা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাবিলার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বা অঞ্চলে গড়ে ওঠে তখন তাকে শিল্পের স্থানীয়করণ বা ভৌগোলিক বিশেষীকরণ বলে।

খ মূলধনের অভাব বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। ফলে মূলধনের অভাব বাংলাদেশের শিল্প অনুন্নতির জন্যে দায়ী।

অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি একটি দেশের শিল্পোন্নয়নে অপরিহার্য। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রশিল্পের জন্যে যে উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান দরকার বাংলাদেশে তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে শিল্পের যেমন বিকাশ ঘটেনি তেমনি উৎপাদনও বাড়েনি। একটিও বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের ২টি সমস্যা।

গ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৩ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প নিটওয়ার খাত থেকে আয় নিম্নরূপ:

অর্থবছর	২০০৯-১০	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
রপ্তানি আয় (কোটি টাকায়)	১২,৩৪৮	২১,৫১৬	২৪,৪৯২	২৫,৪৯২

রপ্তানি আয় ক্রমবর্ধমান হলেও দেশে পোশাক শিল্পের অনুন্নত পরিবেশ, নিম্ন মজুরিহার, শ্রম অসন্তোষ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, অগ্নিকাণ্ড, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধা-সর্বোপরি আমেরিকায় জিএসপি সুবিধা বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি কারণে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। তবে আশার কথা সরকার এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি উদার শিল্পনীতি গ্রহণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শ্রমিকের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদেশি উদ্যোক্তাদের সুবিধা প্রদানসহ নতুন বাজার খোঁজার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১১]

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রার বাধাসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে, সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

খ আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে। এসব বিদেশি দ্রব্যের দাম অধিক বলে তা আমদানি করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যদি এসব দেশ নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে ঐসব দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করে, তবে সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার অনেক সাশ্রয় হবে।

গ সৃজনশীল ২৬ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৪ জাপানের একটি ব্যবসায়ী দল ঢাকায় এসে এদেশের শিল্পায়নের ওপর কিছু মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। তারা বলেন সর্বপ্রথম একটি সঠিক শিল্পায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। ব্যাংকঋণ সহজলভ্য করতে হবে। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়াও বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৩]

ক. কুটির শিল্পে কতজন শ্রমিক থাকে? ১

খ. ক্ষুদ্র শিল্প বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে শিল্পায়নের উপায় ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে শিল্পায়নের সম্ভাবনা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের অধিক নয়।

https://teachingbd24.com

খ যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বল্প মূলধন, কম শ্রমিক ও ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে।
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প তুলনামূলকভাবে কম পুঁজি ও বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে অর্থাৎ এগুলো অংশীদারি বা সমবায়ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হতে পারে। এ শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা উভয় খাতেই থাকতে পারে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ধাতব শিল্প, যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, কাচ শিল্প, সাবান ও দিয়াশলাই শিল্প, স্টেশনারি দ্রব্য শিল্প, গুটিপোকার চাষ ও রেশম শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের শিল্পায়নের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করা হলো-
বাংলাদেশে শিল্পের অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠতে সর্বপ্রথম সঠিক শিল্পনীতি প্রয়োজন। তাই এদেশের শিল্প ক্ষেত্রে যথাযথ অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সর্বশেষ শিল্পনীতি-২০১০ ঘোষণা করা হয়। এ শিল্পনীতির আওতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যা এদেশের উদ্যোক্তাদের মূলধন সংকট দূর করে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।
এদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে সস্তা শ্রমিক থাকলেও দক্ষতার অভাবে তারা শিল্পে অবদান রাখতে পারছে না। তাই এসব জনগণকে কারিগরি শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হলে শিল্পক্ষেত্রে এদের অবদান বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া শিল্প ঋণ সহজীকরণ ও প্রসার, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করে শিল্পায়নের সুযোগ বাড়ানো যায়। কাজেই বলা যায়, উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো শিল্পায়নের উপায় হিসেবে কাজ করবে।

ঘ বাংলাদেশে বর্তমানে শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনা বিরাজ করছে। নিচে তা মূল্যায়ন করা হলো-
কোনো দেশকে শিল্পোন্নত হতে হলে সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকতে হবে। বাংলাদেশে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের (প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা) আধার রয়েছে। এটি শিল্পায়নের একটি উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা। এ সকল সম্পদের উত্তোলন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে শিল্পোৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।
বর্তমান শিল্পনীতি-২০১০ এর আওতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ায় দেশে মূলধন সংকট মোকাবিলা করা সহজ হয়েছে যা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এছাড়া বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্প কৃষিনির্ভর হওয়ায় খুব সস্তা মূল্যে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। আবার বাংলাদেশে প্রচুর শ্রমশক্তি থাকায় এদেশে শিল্পের জন্য শ্রমিকের যোগান অনেক বেশি। তাই এগুলোকে বাংলাদেশে শিল্পায়নের সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
উপরিউক্ত ইতিবাচক দিকগুলো ছাড়াও শিল্পায়নের আরোও কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে আরো বিকশিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মাদাই ডালা, কুলা, ঝাকা, চাকি তৈরি ও বিক্রি করে। তার স্ত্রী, মা, ছেলে ও মেয়ে এ কাজে তাকে সহযোগিতা করে। তার পুঁজি কম থাকায় সে ঋণের জন্য ব্যাংকে যায়। কিন্তু জামানত দিতে না পারায় ব্যাংক তাকে ঋণ দেয় না। ফলে তাকে অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হয়। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আমদানি বিকল্প শিল্প কী? ১
খ. শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাসমূহ কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের উন্নয়নের জন্য তুমি কী কী সুপারিশ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশ বিদেশ হতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করে, সে সমস্ত দ্রব্য নতুন করে আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করলে ওই সমস্ত শিল্পকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলা হয়।

খ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্প। শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। মূলধন, শ্রমিক নিয়োগ, উৎপাদন কলাকৌশল ও মূল্যসংযোজন বিষয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিল্পখাতকে তিনটি উপখাতে ভাগ করা যায়। যথা- বৃহদায়তন শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প। উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পখাতকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ভোগ্যপণ্য শিল্প, মধ্যবর্তী পণ্য শিল্প ও মূলধনী দ্রব্য শিল্প। তাছাড়া 'শিল্পনীতি ২০১০' অনুসারে বাংলাদেশের শিল্পগুলোকে মোট ৯টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, শিল্প ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।

গ সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ করিম এমন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বলে মুনাফার পরিমাণ কম হয় এবং সঠিক সময়ে সে উৎপাদিত দ্রব্য শিপমেন্ট দিতে পারে না। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য করিম ওই প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কাঁচামাল দেশের ভেতরে উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।
[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. কীভাবে কুটির শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প থেকে পৃথক করা যায়? ২
গ. করিমের প্রতিষ্ঠান যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করিমের প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব এবং আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়নির্ভর শিল্প হলো হাইটেক শিল্প।

খ কুটিরশিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হতে আলাদা করা যায়।
ক্ষুদ্র শিল্প ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নন-ম্যানুফ্যাকচারিং দুটি খাতে বিভক্ত। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা এবং এ শিল্পে ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে। অন্যদিকে, কুটিরশিল্পের স্থায়ী মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম এবং সর্বোচ্চ ১০ জন পরিবারের জনবল দ্বারা পরিচালিত। উল্লেখ্য, সম্পদের মূল্য কিংবা শ্রমিকের সংখ্যার ভিত্তিতে একটি কুটিরশিল্প অতিক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে।

গ উদ্দীপকের করিমের প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের পোশাক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।
যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে। রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য থেকে লাভ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। রপ্তানিমুখী শিল্প বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগ বা সম্পূর্ণভাবে দেশি বিনিয়োগ দ্বারা ব্যক্তিখাত বা সরকারি খাতে স্থাপিত হতে পারে। যেসব রপ্তানিমুখী শিল্পে দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সে শিল্পের পণ্য উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বেশি হয়। পক্ষান্তরে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উপকরণের ওপর নির্ভরশীল রপ্তানিমুখী শিল্পের (পোশাক শিল্প) ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হয়।
উদ্দীপকের করিম সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করেন এবং সেই পণ্য শিপমেন্টের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করেন। তাই তার প্রতিষ্ঠাটিকে রপ্তানিমুখী শিল্পের (পোশাক শিল্পের) অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এ ধরনের শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—
১. রপ্তানিমুখী শিল্পে উৎপাদিত পণ্য কেবল বিদেশে রপ্তানি করা হয়।
২. এ শিল্প দেশি-বিদেশি কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

https://teachingbd24.com

৩. কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এ শিল্প স্থাপিত হয়।
৪. এ শিল্পের জন্য সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা থাকে না।
৫. কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা করে দ্রব্য বিক্রয় করতে হয়।

ঘ জামাল সাহেবের পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা তৈরি করে।
প্রথমত, পোশাক শিল্প দেশে একদল দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলেছে। বিনিয়োগ পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উদ্যোক্তাগণ দেশের শিল্পায়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে।
দ্বিতীয়ত, পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে দেশে অন্যান্য সহায়ক শিল্প (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ) যেমন— সুতা, কার্টুন, পলিব্যাগ, লেভেল, গামপেট, প্যাকিং প্রভৃতি পণ্যের কারখানার দ্রুত বিকাশ ঘটছে।
তৃতীয়ত, পোশাক শিল্পের জন্য যে বিপুল পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন হয়, তার অতি সামান্য অংশ দেশীয় বাজার থেকে যোগান দেওয়া হয়। এ শিল্পের কাপড়ের চাহিদা পূরণের জন্য দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।
চতুর্থত, পোশাক শিল্পের উন্নয়নের সুযোগে দেশে ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ছে। এ শিল্পের ফলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ ঘটছে এবং হোটেল ও পরিবহণ ব্যবসার পরিধি বাড়ছে।
পঞ্চমত, বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প সর্বোচ্চ অবদান রাখে। পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যেখানে রপ্তানি আয় ছিল ৬,৪১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ রপ্তানি আয় হয়েছে ২৫,৪৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত বছরে এ রপ্তানি আয় দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশ।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ মি. Y একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি আর্থিক সচ্ছলতার জন্য পরিবারের সদস্য নিয়ে স্বল্প মূলধন সহকারে হস্তচালিত যন্ত্রপাতি দিয়ে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে একটি কারখানা গড়ে তুলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মি. Y উল্লিখিত ক্ষেত্রে খুব একটা সফল হতে পারেনি।
[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম থেকে শিল্প কীভাবে পৃথক? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিল্পটিতে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণের উপায় সমূহ বর্ণনা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বেশি সংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একসাথে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, সেগুলোকে বৃহদায়তন শিল্প বলে।

খ ফার্ম ও শিল্প দুটি পৃথক ধারণা।
একটিমাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ফার্ম। আর এক ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী ফার্মের সমষ্টি হচ্ছে শিল্প। একটি শিল্পের অধীনে একাধিক ফার্ম থাকে। যেমন— স্টার জুট মিল হলো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম। এখন, উৎপাদনে নিযুক্ত স্টার জুট মিলসহ আমিন জুট মিল, হাফিজ জুট মিল ইত্যাদি ফার্মের সমন্বয়ে পাঠ শিল্প গড়ে উঠে।

গ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ 'ক' কলেজের মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফর উপলক্ষে সিলেটের চা বাগান দেখতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারল যে, বাংলাদেশের উৎপাদিত চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অনুন্নত প্রযুক্তি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে শিল্পটি জাতীয় আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করল।
[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৩]

ক. আমদানি বিকল্পন শিল্প কী? ১
খ. কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি সহায়তা করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি জিডিপিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত শিল্পের কাঙ্ক্ষিত অবদান নিশ্চিতকরণে তুমি কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সুপারিশ করবে? আলোচনা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমদানি দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি না করে, দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য যে শিল্প গড়ে তোলা হয়, তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

খ সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার যৌথ প্রয়াসের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি সহায়তা করে।
PPP-এর পূর্ণ রূপ হলো— Public Private Partnership. অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের স্বল্পতা থাকায় কোনো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেকোনো প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমানে PPP-এর অধীনে বেশ কিছু প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। যেমন: বিদ্যুৎ উৎপাদন, উড়াল সড়ক, রেলওয়ে ইত্যাদি। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে PPP অনেক সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের মিল্লটি হলো চা শিল্প। এ শিল্পের জিডিপিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে না পারার কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—
চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বড় কৃষিভিত্তিক শিল্প। নব্বইয়ের দশকে চা রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বের মধ্যে ছিল পঞ্চম। কিন্তু ধীরে ধীরে বাংলাদেশ তার এই অবস্থান হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য কিছু মৌলিক সমস্যাকে দায়ী করা যায়।
মূলত দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশের চা শিল্প তার পূর্বের অবস্থান হারিয়েছে। আমাদের দেশে অনেক চা বাগান রয়েছে যেখানে উদ্যোক্তা ও মালিকপক্ষের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয় না। বিশ্বের অন্যান্য চা রপ্তানিকারক দেশগুলো যেখানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত চা-এর উপযুক্ত ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরে সেখানে আমরা সেই পুরনো প্যাকিং ও বিপণন পদ্ধতি অনুসরণ করে যাচ্ছি। এ কারণে চা বাজারে আমরা অন্যান্য দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের চা প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাক্টরিতে এবং চা বাগানগুলোতে এখনো মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলেছি। এসব অনুন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে চাষাবাদ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় বলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া চা-এর উৎপাদন পুরোপুরি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল বলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। মূলত এসব কারণেই চা শিল্প জিডিপিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চা শিল্পটির জিডিপিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান নিশ্চিত করতে আমি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের সুপারিশ করব।
বর্তমানে দেশে মোট ১৫৮ টি চা বাগানের প্রায় ১,১৫,০০০ হেক্টর জমি চা বাগানের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৪,৭৫০ হেক্টর জমিতে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে সম্ভাবনাময় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও চা শিল্প জিডিপিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।
প্রথমত, চা চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একর প্রতি ফলন বাড়াতে হবে। তাহলে চায়ের উৎপাদন খরচ কমিয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, চা শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় ঋণ ও মূলধন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বীজ ও সারের যোগান বাড়াতে হবে। চতুর্থত, চা চাষ ও তার প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। এ জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমত, উন্নত

https://teachingbd24.com

প্যাকিং ও আধুনিক পদ্ধতিতে চা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ষষ্ঠত, চায়ের সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে শিল্পাঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া চায়ের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কার্যক্রম ও সুষ্ঠু চা নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর হবে এবং চা শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৩৯ যশোরের মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি ব্রিজ তৈরি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাজেটে অর্থ সংকুলন না হওয়ায় প্রতিবছরই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছিল না। এ বছর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। *[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন কত থাকে? ১
খ. কেন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধারণা নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের ধারণা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র শিল্পে ৭৫ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা মূলধন থাকে।

খ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি করে জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য রপ্তানিমুখী শিল্প প্রয়োজন।
দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ঘটলে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। এতে করে দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আরও বেশি আমদানি করা সম্ভব হবে। এভাবে রপ্তানি মুখী শিল্পের বিকাশ দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব।

গ উদ্দীপকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ধারণা নির্দেশ করছে।
দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্য সম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা PPP (Public Private Partnership) বলা হয়।
নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কাজ সম্পাদন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া হচ্ছে PPP। এরূপ অংশীদারিত্ব বা পরিকল্পনা বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে। ইদানীং PPP-এর অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এগিয়ে চলছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা দরকার। কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের এ বিপুল অর্থ সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। এ কাজে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। উন্নয়ন বিষয়ক এ ধারণার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সাল থেকে নীতিগতভাবে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (PSIG) জারি করে PPP পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে, বিশেষ করে মহাসড়ক, ফ্লাইওভার, বিমানবন্দর, সেতু, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি খাতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।
উদ্দীপকে যশোরে যাতায়াতের ব্রিজটি অর্থের অভাবে তৈরি করা যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংবলিত অর্থায়নে ব্রিজটি তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা PPP এর ধারণা নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের ধারণাটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পটির মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা PPP এর ধারণা নির্দেশ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে সরকারের এ ধরনের প্রকল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।
উদ্দীপকে আলোচিত যশোরগামী পথের ব্রিজটির মতো দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান PPP-এর মাধ্যমে সম্ভব। কেননা কেবল সরকারি বা বেসরকারি পুঁজি ও শর্তযুক্ত বিদেশি ঋণ দ্বারা বৃহদাকার শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার সম্ভব নয়। কারণ শিল্পায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো। এজন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জ্বালানি সরবরাহ, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ হলে দেশে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিপুল পুঁজির যোগান PPP-এর দ্বারাই সম্ভব। এ ছাড়া PPP-এর মাধ্যমে সামাজিক অবকাঠামোও শক্তিশালী করা সম্ভব। যৌথ উদ্যোগের এ কৌশল দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি সেবাখাতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণেও যথেষ্ট সহায়ক হবে। PPP এর মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও শিল্পায়ন হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে PPP-এর উদ্যোগ ছাড়া কেবল সরকারি বা বেসরকারি প্রচেষ্টা এককভাবে সফল নাও হতে পারে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ধারণা তথা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶৪০ 'X' বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ৮০ শতাংশই দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ এই শিল্প থেকে অর্জিত হয়। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্ববাজারে এ শিল্পটি স্থান করে নিয়েছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. রপ্তানীমুখী শিল্প কী? ১
খ. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে PPP-এর ভূমিকা কী? ২
গ. 'X' শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি বাংলাদেশের সম্ভাব্যময়ী শিল্প —ব্যাখ্যা কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে, সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

খ PPP-এর মাধ্যমে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়।
দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্য সম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা PPP (Public Private Partnership) বলা হয়। PPP-এর মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বড় বড় শিল্প সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন কঠিন। তখন বেসরকারি সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। এতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতির সঞ্চার হয়, যা বেকার জনগণের অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে।

গ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪১ বাংলাদেশের 'X' কোম্পানি দেশেই এখন বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী তৈরি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। পূর্বে এসব পণ্য সম্পূর্ণ বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। *[মদন মোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. 'কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুটির শিল্পের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে'— ব্যাখ্যা কর। ২

https://teachingbd24.com

গ. 'X' কোম্পানি কোন ধরনের শিল্প? অর্থনীতিতে কোম্পানির অবদান উল্লেখ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'X' কোম্পানির মতো আর কোন ক্ষেত্রে আমাদের শিল্প ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব এবং আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়ননির্ভর শিল্প হলো হাইটেক শিল্প।

খ স্বল্প পুঁজি ও পারিবারিক পরিবেশে কুটিরশিল্প স্থাপন করা যায় বলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ শিল্পের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

যে শিল্পে স্বল্প মূলধন এবং পারিবারিক সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে, তাকে কুটিরশিল্প বলে। পুঁজি কম হওয়ায় ঘরোয়া পরিবেশে বা অল্প জায়গা (যেমন- ১টি ঘর) নিয়ে যে কেউ এই শিল্প স্থাপন করতে পারে। তাই শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যেকোনো লোকই সামান্য প্রশিক্ষণ ও পুঁজির ব্যবস্থা করে খুব সহজেই কুটির শিল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

গ উদ্দীপকের 'X' কোম্পানিটি হলো আমদানি বিকল্প শিল্প।

অতিমাত্রায় আমদানিনির্ভরতা ও বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু কিছু দ্রব্য আমদানি না করে সুবিধামতো সেসব দ্রব্যের শিল্প দেশে স্থাপন করা হলে তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

দেশের অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করা দরকার। আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশের আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে তা ব্যবহার করা যাবে। দেশের শিল্পায়নের প্রয়োজনে সাধারণত মূলধনী দ্রব্য বেশি আমদানি করতে হয়। 'X' কোম্পানির মতো আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ করা হলে দেশের ভেতরে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে। বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও পুঁজি দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে শিল্পপণ্যের দিক থেকে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। এ ছাড়া আমদানি বিকল্প শিল্পায়নে বিভিন্ন রকম শিল্প স্থাপন করা যায় বলে দেশে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং সমগ্র শিল্প খাতের প্রসার ঘটে। এসব বিষয় বিবেচনায় দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকের 'X' কোম্পানিটি বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী তৈরি করে, যা পূর্বে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। 'X' কোম্পানিটির উৎপাদনের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। তাই বলা যায় 'X' কোম্পানিটি আমদানি বিকল্প শিল্প। অর্থনীতিতে এ ধরনের শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের 'X' কোম্পানির মতো আমাদের অন্য শিল্পগুলো নানান ভাবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কাজটি কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। এরূপ সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়। এদেশে প্রতিদিন নতুন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, অতি ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদি হলো উদ্দীপকের 'X' কোম্পানির শিল্পের ন্যায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের আধুনিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো শিল্প। দেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটলে বিনিয়োগ, উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে শিল্পোন্নয়নের উপকরণের যোগান বাড়ে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দেশগুলোর উন্নতির পেছনে রয়েছে শিল্প খাতের অভূতপূর্ব বিকাশ। তাই বলা যায়, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পায়ন হলো অপরিহার্য পূর্বশর্ত। শিল্পায়নের প্রসারের মাধ্যমে জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্যের যোগান নিশ্চিত করে দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া উপর্যুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের 'X' কোম্পানির মতো দেশের সার্বিক উন্নয়নে আমাদের অন্যান্য শিল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪২

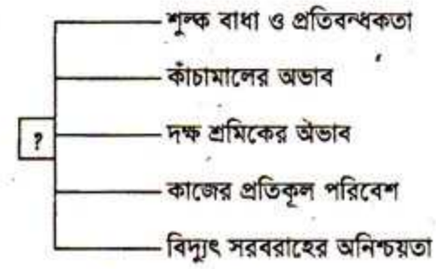

[আলহেরা একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৩]

ক. PPP কী? ১

খ. রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা কীভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব? ২

গ. উদ্দীপকের '?' শিল্পটি কী শিল্প? উক্ত শিল্পের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী ভূমিকা রাখে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি, কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে PPP বলা হয়।

খ দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ঘটলে অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। এতে করে দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে তাছাড়া বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আরও বেশি আমদানি করা সম্ভব হবে। এভাবে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব।

গ সৃজনশীল ২৬ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অতি সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। উক্ত শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের মতো উচ্চ জনসংখ্যার দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো শ্রমনিবিড় শিল্প বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এ শিল্পের সাথে জড়িত। দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় পোশাক শিল্প থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৭০-৮০ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে। এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের সাথে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ বিভিন্ন শিল্পেরও প্রসার ঘটে। বোতাম, হুক, চেইন (জিপার), গাম, কার্টুন, লেবেল, পরিবহন ইত্যাদি পোশাক শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং পোশাক শিল্পের প্রসারের সাথে এসব শিল্পেরও প্রসার ঘটে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও পোশাক শিল্পের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি, উদ্যোক্তা শ্রেণির সৃষ্টি সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

পরিশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৩: বাংলাদেশের শিল্প

৭৭. স্বাধীনতার পর শিল্পখাতের প্রায় ৯২ ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল কোন আদর্শ অনুসরণ করে? (অনুধাবন)
ক ইসলামিক খ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ
গ মিশ্র অর্থব্যবস্থা ঘ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা **খ**

৭৮. একটি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ফার্ম খ শিল্প
গ ইউনিট ঘ ইউনিট **ক**

৭৯. বাংলাদেশে প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয় কোন সালে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭৩ খ ১৯৮২
গ ১৯৮৬ ঘ ১৯৯১ **ক**

৮০. কোন শিল্পটি মূলত শ্রমঘন? (জ্ঞান)
ক বৃহৎ শিল্প খ ক্ষুদ্র শিল্প
গ মাঝারি শিল্প
ঘ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প **ঘ**

৮১. সাধারণত শিল্পখাত বলতে কোন খাতকে বোঝায়? (জ্ঞান)
ক সেবা খাত খ কৃষিখাত
গ ম্যানুফ্যাকচারিং খাত
ঘ এসএমই খাতে **গ**

৮২. যে শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত সে শিল্প কোন শিল্পের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ক নিয়ন্ত্রিত শিল্প খ অগ্রাধিকার শিল্প
গ সংরক্ষিত শিল্প ঘ হাইটেক শিল্প **গ**

৮৩. নিচের শিল্পনীতি অনুযায়ী, কোন শিল্পে সরকার বেশি গুরুত্ব প্রদান করছে? (জ্ঞান)
ক বৃহদায়তন শিল্প খ কুটির শিল্প
গ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঘ অতি ক্ষুদ্র শিল্প **গ**

৮৪. জাহাজ নির্মাণ কোন শিল্পের উৎপাদিত পণ্য? (জ্ঞান)
ক ক্ষুদ্র শিল্প খ মাঝারি শিল্প
গ বৃহৎ শিল্প ঘ অগ্রাধিকার শিল্প **গ**

৮৫. রেয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক নরম কাঠ খ কাঁচাপাট
গ মুলি বাঁশ ঘ বেত **গ**

৮৬. হোসিয়ারি কোন ধরনের শিল্প? (জ্ঞান)
ক বৃহৎ শিল্প খ ক্ষুদ্র শিল্প
গ মাঝারি শিল্প ঘ কুটির শিল্প **গ**

৮৭. রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করে কোন শিল্প? (জ্ঞান)
ক বৃহৎ শিল্প খ ক্ষুদ্র শিল্প
গ রপ্তানিমুখী শিল্প ঘ আমদানিমুখী শিল্প **গ**

৮৮. কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার? (জ্ঞান)
ক বিনিয়োগ খ মূলধন
গ শিল্প ঘ কৃষি **গ**

৮৯. বাংলাদেশের অর্থনীতির Life Line বলে পরিচিতি কোন্ শিল্প?
ক ঔষধ শিল্প খ বস্ত্র শিল্প
গ পাট শিল্প ঘ পোশাক শিল্প **ঘ**

৯০. EPZ এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান)
ক Export Procuring Zone
খ Export Producing Zone
গ Export Proxcl Zone
ঘ Export Processing Zone **ঘ**

৯১. কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তর পাট উৎপাদনকারী দেশ? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশ খ ভারত
গ চীন ঘ রাশিয়া **ক**

৯২. আদমজী জুট মিল কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৭ খ ১৯৫১ গ ১৯৫৩ ঘ ১৯৬১ **খ**

৯৩. কোন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন? (জ্ঞান)
ক ড. অরুপ রতন খ ড. মাকসুদুল আলম
গ শাইক সিরাজ ঘ ড. দেবাশীষ রায় **খ**

৯৪. বাংলাদেশে কয়টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট রয়েছে? (জ্ঞান)
ক ৪টি খ ৫টি গ ৬টি ঘ ৯টি **গ**

৯৫. চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক শ্রীমঙ্গল খ মৌলভীবাজার
গ হবিগঞ্জ ঘ পঞ্চগড় **ক**

৯৬. কোনটি বাংলাদেশের প্রথম পোশাক শিল্প? (জ্ঞান)
ক দেশবন্ধু গার্মেন্টস খ দেশ গার্মেন্টস
গ জেনারেশন নেক্সট ঘ হোম টেক্সটাইল **খ**

৯৭. পোশাক শিল্পের মেরুদণ্ড কোনটি? (অনুধাবন)
ক বিদেশি ক্রেতা খ সস্তা শ্রম
গ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ঘ সুতা ও কাপড় **খ**

৯৮. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কী ধরনের শিল্প বলা হয়? (জ্ঞান)
ক রপ্তানিমুখী শিল্প খ আমদানি বিকল্প শিল্প
গ বৃহৎ শিল্প ঘ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প **খ**

৯৯. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের পশ্চাদপদ কতিপয় দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে? (জ্ঞান)
ক জাতিসংঘ খ বিশ্বব্যাংক
গ ইউরোপীয় ইউনিয়ন
ঘ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক **ক**

১০০. PPP মানে কী? (জ্ঞান)
ক Public Private Partnership
খ Public Private Property
গ Production Private Partnership
ঘ Property Private Partnership **ক**

১০১. রহিম মিয়া ঝুড়ি, মোড়া, বেতের সোফা ইত্যাদি তৈরি করেন। উক্ত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো— (প্রয়োগ)
i. স্থানীয় বাঁশ ii. স্থানীয় বেত
iii. স্থানীয় আখের ছোবড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i ,ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

১০২. কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি
ii. কৃষি ব্যবস্থাপনার কাছাকাছি
iii. গ্রামীণ ও শহরের বিচ্ছিন্ন এলাকায় স্থাপিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৩. বৃহদায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. সাধারণত গোষ্ঠী মালিকানায় পরিচালিত
ii. দক্ষ ও কম দক্ষ শ্রমিক বিদ্যমান
iii. শহরের বিচ্ছিন্ন এলাকায় স্থাপিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৪. রপ্তানিমুখী শিল্পের গুরুত্ব হলো— (অনুধাবন)
i. বৈদেশিক ঋণভার হ্রাস
ii. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস iii. আমদানি নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৫. EPZ অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য
ii. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য
iii. শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০৬. বর্তমানে বস্ত্রকলগুলোতে প্রধান সমস্যা হলো— (অনুধাবন)
i. দক্ষ পরিচালনায়
ii. তুলার অনিয়মিত সরবরাহ
iii. অব্যবস্থাপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৭. বাংলাদেশে চা শিল্পের সমস্যা হলো— (অনুধাবন)
i. পরিবর্তক দ্রব্যের প্রচলন
ii. অনিয়মিত বৃষ্টিপাত
iii. চা নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৮. পোশাক শিল্পের কাঁচামাল হলো— (অনুধাবন)
i. সুই ও সুতা ii. কাপড় ও তুলা
iii. বোতাম ও জিপার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৯. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) এর বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. বেসরকারি খাতে অবকাঠামো নির্মাণ
ii. দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি PPP গ্রহণ করবে
iii. বেসরকারি খাত এককভাবে মূল্য, ফি বৃদ্ধি করতে পারবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১০ ও ১১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সায়মা চাকরি না পেয়ে তার বাড়ির আশেপাশের কয়েকজন বেকার মহিলাদের নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি বুটিকের কারখানা স্থাপন করেন।

১১০. সায়মার বুটিক কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? (প্রয়োগ)
ক বৃহৎ শিল্পের খ ক্ষুদ্র শিল্পের
গ কুটির শিল্পের ঘ পোশাক শিল্পের **গ**

১১১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সায়মার কারখানাটি যে ভূমিকা রাখে তা হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বেকারত্ব দূরীকরণ ii. দারিদ্র্য বিমোচন
iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১২ ও ১১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রমজান সাহেব যে শিল্পটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। এ শিল্পটিকে অভ্যন্তরীণ ভোগমুখী শিল্পও বলে। দেশের ভেতরে এই শিল্পদ্রব্যের বিস্তৃত বাজার রয়েছে।

১১২. রমজান সাহেব কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন? (প্রয়োগ)
ক পোশাক শিল্প খ পাট শিল্প
গ বস্ত্র শিল্প ঘ চিনি শিল্প **গ**

১১৩. উক্ত শিল্প উন্নয়নের উপায় হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংরক্ষণনীতি গ্রহণ
ii. উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়ন
iii. শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৪ ও ১১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব চৌধুরী একজন গার্মেন্টস মালিক। তিনি তার গার্মেন্টস এ প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। তার গার্মেন্টস-এর কাপড় বেশির ভাগ বিদেশি। তার শ্রমিকের মধ্যে ৮০% মহিলা। তিনি তার উৎপাদিত পোশাক GSP কোটায় রপ্তানি করে থাকেন।

১১৪. জনাব চৌধুরী উৎপাদিত তৈরি পোশাক সাধারণত বেশি ক্রয় করে কারা? (প্রয়োগ)
ক ভারত ও পাকিস্তান
খ সৌদি আরব ও জাপান
গ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশসমূহ
ঘ নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ **গ**

১১৫. জনাব চৌধুরী মনে করেন গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা
ii. রপ্তানি বাজার প্রসারিত করা
iii. কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

অধ্যায়-৪: জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

১১৬. আধুনিক পদ্ধতিতে কোন সালে প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৫৪০ সালে খ ১৬০০ সালে
গ ১৬৬৫ সালে ঘ ১৬৮৫ সালে **গ**

১১৭. কোনটি জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সরল সূত্র? (জ্ঞান)
ক $DP = \frac{TQ}{TC}$ খ $DP = \frac{AR}{MR}$
গ $DP = \frac{TP}{TL}$ ঘ $DP = \frac{TP}{TA}$ **খ**

১১৮. অশোধিত জন্মহারের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি? (জ্ঞান)
ক CDR খ CBR গ CRR ঘ CRB **খ**

১১৯. স্থূল জন্মহার পদ্ধতিটি কীসে প্রকাশ করা হয়? (জ্ঞান)
ক শতকে খ দশকে
গ হাজারে ঘ লাখে **গ**

১২০. কোনটি স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র? (জ্ঞান)
ক $CDR = \frac{P}{D} \times 1000$ খ $CDR = \frac{D}{P} \times 1000$
গ $CDR = \frac{P}{D} \times 100$ ঘ $CDR = \frac{D}{P} \times 100$ **খ**

১২১. বাংলাদেশ থেকে মরিয়ম ও জাহাঙ্গীর গত ২০০৮ সালে ডি. ভি লটারি পেয়ে আমেরিকা চলে গেলেন। মরিয়ম ও জাহাঙ্গীর কোন ধরনের অভিগমনের আওতায় পড়ে? (প্রয়োগ)
ক অভ্যন্তরীণ খ আন্তর্জাতিক অভিগমন
গ উদ্বাস্তু ঘ মিশ্রগমন **খ**

১২২. কোনটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণ? (অনুধাবন)
ক নির্ভরশীলতা খ শিক্ষার অভাব
গ কৃষিপ্রধান অর্থনীতি ঘ জীবনযাত্রার নিম্নমান **খ**

১২৩. কোনটি বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা? (জ্ঞান)
ক খাদ্য ঘাটতি খ আর্সেনিক
গ জনসংখ্যা ঘ যৌতুক প্রথা **গ**

১২৪. ম্যালথাস তার তত্ত্বটি কোন শতাব্দীতে প্রচার করেছিল? (জ্ঞান)
ক সপ্তদশ শতাব্দীতে
খ অষ্টাদশ শতাব্দীতে
গ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
ঘ উনবিংশ শতাব্দীতে **গ**

১২৫. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে কোন গতিতে? (অনুধাবন)
ক স্বাভাবিক গতিতে খ অস্বাভাবিক গতিতে
গ জ্যামিতিক গতিতে ঘ গাণিতিক গতিতে **গ**

১২৬. কোন হারে ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়? (অনুধাবন)
ক স্বাভাবিক হারে খ অস্বাভাবিক হারে
গ গাণিতিক হারে ঘ জ্যামিতিক হারে

১২৭. নিচের কোনটি জ্যামিতিক প্রগতি? (অনুধাবন)
ক ১, ৩, ৪, ৫ .....
খ ২, ৪, ৬, ৮, ১০ .....
গ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ .....
ঘ ১, ৩, ৬, ৯, ১২ ..... **গ**

১২৮. কোনটি গাণিতিক প্রগতি? (অনুধাবন)
ক ১, ২, ৪, ৮, ১৬ খ ১, ২, ৩, ৪, ৫
গ ২, ৫, ৯, ১৫, ১৮ ঘ ১, ৪, ১০, ৭, ৩ **খ**

১২৯. কাম্য জনসংখ্যার কল্যাণভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়েছেন কে? (জ্ঞান)
ক কার স্যান্ডার্স খ ডাল্টন
গ রবিনসন ঘ বোল্ডিং **ক**

১৩০. কোনটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব সূত্র?
ক $M = \frac{A - O}{O}$ খ $M = \frac{A - P}{Q}$
গ $M = \frac{O - A}{O}$ ঘ $M = \frac{A - P}{R}$ **ক**

১৩১. বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত একর? (জ্ঞান)
ক ০.১৫ একর খ ০.২৫ একর
গ ১.০৮ একর ঘ ১.২ একর **খ**

১৩২. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর কত তম দেশ? (জ্ঞান)
ক ৭ম খ ৮ম গ ৯ম ঘ ১০ম **খ**

১৩৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)
ক কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেশি
খ নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি
গ মহিলার তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি
ঘ শিশু মৃত্যু বেশি **গ**

১৩৪. বাংলাদেশে দিন দিন কোন খাতের শ্রম নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে? (জ্ঞান)
ক কৃষি খাতের খ অকৃষিখাতের
গ মৎস্য খাতের ঘ শিল্প খাতের **ক**

১৩৫. কোন জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে সবচেয়ে কম লোক বাস করে? (জ্ঞান)
ক বান্দরবান খ সিলেট
গ চুয়াডাঙ্গা ঘ পঞ্চগড় **ক**

১৩৬. 'ক' দেশে প্রতি বর্গ কি.মি. ১,০১৫ জন মানুষ বসবাস করে। 'ক' দেশ বলতে নিচের কোন দেশকে নির্দেশ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক নেপালকে খ ভুটানকে
গ জাপানকে ঘ বাংলাদেশকে **ঘ**

১৩৭. কোন সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭৩ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৫ ঘ ১৯৭৬ **খ**

১৩৮. কোনটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি দেশীয় সংস্থা? (জ্ঞান)
ক কেয়ার বাংলাদেশ
খ স্যোসাল মার্কেটিং কোম্পানি
গ NIPORT ঘ UNFPA **খ**

http://teachingbd.com

১৩৯. কোনো দেশের শ্রমশক্তিকে কী ধরনের সম্পদ বলে? (জ্ঞান)
ক বস্তুগত সম্পদ খ মানবসম্পদ
গ মানুষ্য সম্পদ ঘ শারীরিক সম্পদ **খ**

১৪০. সরকার কোন জেলায় একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে? (জ্ঞান)
ক খুলনা খ বরিশাল
গ চট্টগ্রাম ঘ কক্সবাজার **খ**

১৪১. নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কোন দিক দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ক সামাজিক খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ **খ**

১৪২. কোনটির মাধ্যমে নারীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সম্ভব? (অনুধাবন)
ক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে
খ নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে
গ নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
ঘ নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মাধ্যমে **ক**

১৪৩. কোনটি মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত? (জ্ঞান)
ক উন্নত স্বাস্থ্য সেবা খ শিক্ষা বিস্তার
গ পরিবেশ উন্নয়ন ঘ কারিগরি শিক্ষা **ক**

১৪৪. আত্মকর্মসংস্থান কীরূপ পেশা? (অনুধাবন)
ক বাস্তবমুখী খ নির্ভরশীল
গ সৃজনশীল ঘ স্বাধীন **ঘ**

১৪৫. আদমশুমারির জনমিতিক চলক হলো— (অনুধাবন)
i. শিক্ষার হার
ii. বয়স কাঠামো
iii. নারী-পুরুষের অনুপাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হলো— (অনুধাবন)
i পরিবারে অসচ্ছলতা দেখা দেয়
ii. মাথাপিছু আয় কমে যায়
iii. জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৪৭. জনসংখ্যার ভৌগোলিক কাঠামো বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
i. অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন
ii. গ্রামভিত্তিক বণ্টন iii. শহরভিত্তিক বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪৮. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন— (অনুধাবন)
i. স্বল্প পুঁজি
ii. নিজস্ব চিন্তা ও জ্ঞান
iii. বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৯ ও ১৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সজল সাহেব একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেখানকার সুযোগ-সুবিধা দেখে সজল সাহেব বিস্মিত হলেন এবং পরে তিনি সে দেশে চলে গেলেন এবং থেকে গেলেন।

১৪৯. সজল সাহেবের অভিগমন কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক স্থায়ী অভিবাসন খ নিট অভিবাসন
গ মোট অভিবাসন ঘ দেশান্তরিত অভিবাসন **ক**

১৫০. সজল সাহেব যে কারণে জার্মানিতে গেলেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কর্মসংস্থানের কারণ
ii. রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্নতার কারণ
iii. অর্থনৈতিক কারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

চিত্রটি দেখে ১৫১ ও ১৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

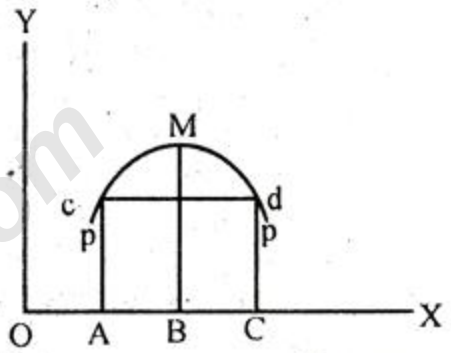

১৫১. উপরের চিত্র দ্বারা জনসংখ্যার কয়টি অবস্থা বোঝানো হয়? (প্রয়োগ)
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ঘ ৪টি **গ**

১৫২. উক্ত চিত্রের তত্ত্বটির সমালোচনা হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মাথাপিছু আয় স্থির থাকে না
ii. বণ্টন বিষয়টি অবহেলিত
iii. গাণিতিক ও জ্যামিতিক হার ভুল প্রমাণিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৩ ও ১৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জরিনা বেগম যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সহায়তায় তার নিজ এলাকায় একটি দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করে সফলতা লাভ করেছেন।

১৫৩. জরিনা বেগমের কাজটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
ক উদ্যোগ খ ব্যবসায় উদ্যোগ
গ আত্মকর্মসংস্থান ঘ ব্যবসায় **গ**

১৫৪. জরিনা বেগমের সফলতা লাভের কারণ— (অনুধাবন)
i. প্রশিক্ষণের সুযোগ
ii. পুঁজির প্রাপ্যতা
iii. ব্যক্তিগত দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৪: জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

প্রশ্ন ▶১ অর্থনীতির অধ্যাপক সাকিব নোমান 'Q' নামক একটি ধারণার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষাবিস্তার, উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের সরকারও বিষয়টির উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন— শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, অপুষ্টি দূরীকরণ, নারী শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়ন ইত্যাদি। *[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'Q' নামক ধারণাটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিষয়টির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা যথেষ্ট কি? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা ঘনত্ব হলো কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

খ জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ অধিক জনগণের জন্য অধিক খাদ্যের প্রয়োজন।

একটি দেশের খাদ্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। তাই অতিরিক্ত জনগণের জন্য খাদ্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু বিশ্ব বাজারে খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর দাম অনেক বেশি। ফলে স্বল্প আয়ের দেশগুলো চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা খাদ্য সমস্যা তৈরি করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Q' নামক ধারণাটি হলো মানবসম্পদ। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

কোনো দেশের উৎপাদনশীল, দক্ষ ও কর্মক্ষম জনশক্তিকে ঐ দেশের মানবসম্পদ বলে। একটি দেশের ভূমি ও মূলধনকে তথা বস্তুগত সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন কর্মক্ষম জনগণ। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমশক্তিকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। আর এই দক্ষ জনশক্তি বা শ্রমশক্তিকেই মানবসম্পদ বলা হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, অধ্যাপক সাকিব নোমান 'Q' নামক ধারণাটি ব্যাখ্যার জন্য শিক্ষার বিস্তার, উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। এই বিষয়গুলো মূলত একটি দেশের জনগণকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করে। তাই বলা যায়, 'Q' নামক ধারণাটি হলো মানবসম্পদ।

ঘ বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি তথা মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বা ব্যবস্থাসমূহ মূল্যায়ন করা হলো।

সাধারণত উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির দ্বারা মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলার নিয়মকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া, শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও কারিকুলামে পরিবর্তন এনেছে। এতে দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০% নারী। তাই, এই নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন নীতি-২০১১ গৃহীত হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ গ্রহণ এবং জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযুগী করা হয়েছে। আবাসন উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ন তহবিল গঠন করেছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের জনগণ দক্ষ শ্রমশক্তি তথা মানবসম্পদে পরিণত হচ্ছে। এই উপরের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা আপাতত যথেষ্ট। তবে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখতে হবে এবং আরও আধুনিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶২ জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা অতি প্রাচীন। তবে বর্তমানে এ সম্পর্কিত দুটি তত্ত্ব বহুল প্রচলিত। এ তত্ত্বদ্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। *[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে দুটি তত্ত্বকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. তত্ত্বদ্বয়ের আলোকে তুমি কি বাংলাদেশকে জনাধিক্যের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করবে? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট বহিরাগমন ও বহির্গমন এর পার্থক্যকে ঐদেশের নিট অভিবাসন বলা হয়।

খ আত্মকর্মসংস্থান একটি দেশের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর ফলে দেশে দারিদ্র্যের পরিমাণ বা মাত্রা হ্রাস পায়।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি নিজের অর্থ বা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার আলোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। এর ফলে উদ্যোক্তাসহ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মীরা তুলনামূলক উন্নত জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দুটি তত্ত্ব হলো ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব। নিচে তাদের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, 'জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক প্রগতিতে। ম্যালথাসের মতে, মানুষের অস্তিত্বের জন্য খাদ্য অত্যাবশ্যক হলেও তা জনসংখ্যা বাড়ার তুলনায় কম হারে বাড়ে। তার মতে, মানুষের অতি প্রজনন ক্ষমতার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে এবং তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে প্রতি ২৫ বছরে একটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমির যোগান সীমিত এবং সেখানে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে পারে না। এর ফলে এমন এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় এবং দেশে জনাধিক্য দেখা দেয়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল কথা হলো, কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোনো দেশের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে; কেবল দীর্ঘকালীন প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক নয় বরং স্বল্পকালীন প্রবৃদ্ধির জন্যও ক্ষতিকারক হতে পারে। অর্থাৎ এ অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য বা ঋণাত্মক হয়।

ঘ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশ একটি জনাধিক্যের দেশ কি না- তা বিবেচনা করা হলো—

ম্যালথাসের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা: বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বছর ১.৩৭% কিন্তু শস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ০.১৫%। অর্থাৎ যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। এর ফলে এদেশে ঘাটতি লেগেই আছে। আবার, জন্মহার হ্রাসের জন্য সরকার, বিভিন্ন দাতা ও সামাজিক সংস্থা জন্ম নিয়ন্ত্রণ

https://teachingbd24.com

পদ্ধতিকে উৎসাহিত করছে। অর্থাৎ, এদেশে জনাধিক্য হ্রাসের লক্ষ্যে ম্যালথাসের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কিছুটা কার্যকর হচ্ছে। কাজেই বলা যায়, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশকে জনাধিক্যের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা: কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য যে জনসংখ্যা প্রয়োজন তাকে ঐ দেশের কাম্য জনসংখ্যা বলে। আর এই কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত জনসংখ্যা কম হলে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ এবং বেশি হলে অধিক জনসংখ্যার দেশ বলা হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যার আয়তন বিশাল ও জন্মহার বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কম। তাই, এদেশে প্রকট বেকারত্ব, জীবনযাত্রার মান নিম্ন, পুষ্টিহীনতা, রোগ-ব্যাধি বিদ্যমান ও শিক্ষার অভাব প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অনেক অর্থনীতিবিদ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ বলে বিবেচনা করেন।

উপরের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্ব দুটির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে জনাধিক্যের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

প্রশ্ন ▶৩ রূপু রোজার ঈদে তার বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা থেকে নানার গ্রামের বাড়িতে যাবে। বাবা প্রথমে ঢাকার গাবতলীতে যান। বাসে কোনো টিকেট না পেয়ে সবাই মিলে রেল স্টেশনে যান। রূপু দেখে ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা নেই। অনেক কষ্টে নানার বাড়ি পৌঁছে। সে দেখে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ রোগা, গরিব এবং বেকার। সে গ্রাম্য মানুষের এসব সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনা করল। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান দুটি সূচক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করো। ৩

ঘ. রূপুর নানার গ্রামের মানুষদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান দুটি সূচক হলো আয়ুষ্কাল এবং শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন।

মানুষের কর্মক্ষম জীবনকাল তার আয়ুষ্কালের ওপর নির্ভর করে। যার আয়ুষ্কাল যত বেশি, তার কর্মক্ষম জীবনকালও তত বেশি। কোনো দেশের জনগণের আয়ুষ্কাল পরিমাপ করা হয় জনগণের জীবন প্রত্যাশা দ্বারা। যদি কোনো দেশের জনগণের জীবন প্রত্যাশা বাড়তে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের আর একটি সূচক হলো শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন। শিক্ষা মানুষকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করা হলো—

১. বাংলাদেশে প্রকট খাদ্যঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জুলাই-জানু.) সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ৬৮.৪০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করেছে। বিশাল এই খাদ্য ঘাটতির কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা।

২. বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থানের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে।

৩. কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি হলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। উন্নত দেশের তুলনায় তা অত্যন্ত কম।

৪. এদেশে প্রায় ১৫ কোটি ৮৯ লাখ লোকের বসবাস।[২] জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য সে তুলনায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় কম। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর তার বিশাল চাপ পড়ছে।

৫. অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও নাজুক অবস্থা। পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতাল নেই, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার। যারা আছে তারা তত প্রশিক্ষিত নয়। চিকিৎসার অভাবে রোগাক্রান্ত ও নিজীব জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

ঘ রূপুর নানার গ্রামের মানুষের বিদ্যমান অধিক জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়।

১. পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা প্রায় সব দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

২. শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে করে। তাছাড়া দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা যাবে এবং তাতে জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস পাবে।

৩. কর্মসংস্থান সুযোগের অভাবে বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র। ডি. ক্যাস্ট্রো তার বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অধিক। তাই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ থেকে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে। এতে অধিকাংশ লোক বিবাহের দায়িত্ব ও ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে জন্মহার কমবে।

৫. বাংলাদেশের নারী সমাজের সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা পরিবারের জন্য আয় উপার্জনে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের মর্যাদা কম। এ কারণে অনেক সময় তাদের মতের বিরুদ্ধেও তাদের ওপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। তাই জনসংখ্যা রোধকল্পে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে রূপুর নানার গ্রামের অধিক জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান হবে।

প্রশ্ন ▶৪ হানিফ স্যার অর্থনীতির ক্লাসে জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন রংপুর বিভাগের মোট আয়তন ২৫,৩২০ বর্গ কি.মি. এবং লোকসংখ্যা ১,৫০,০৩,২০০ জন। ঢাকা বিভাগের আয়তন ২০,৫০০ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা ৩,৫০,০০,০০০ জন। তিনি ক্লাসে আরও বলেন, কোনো দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ সেখানকার জলবায়ু, জমির উর্বরতা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা কী? ২

গ. রংপুর ও ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো ও মন্তব্য করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়া আর কী কী কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পরিমাণ সমান হলে তাকে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলে।

খ কোনো একটি কাজ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা বার বার করাই হলো প্রশিক্ষণ।

তাই কোনো কাজের জন্য প্রশিক্ষণ মানুষকে ঐ কাজটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ উপায়ে সম্পাদন করতে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণ মানুষকে উৎপাদনশীল করে তার শ্রমের গুণগত মান বাড়ায়। প্রশিক্ষণ যত উন্নত পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় মানুষ ততই তার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। এ জন্যই বলা হয়— প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে রংপুর ও ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করে নিচে মন্তব্য করা হলো।

[২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭

https://teachingbd24.com

একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কতজন লোক বাস করে তা জানার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব ধারণার উদ্ভব হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

$DP = \frac{TP}{TA}$; এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব

TP = মোট জনসংখ্যা

TA = দেশের মোট আয়তন

উদ্দীপকে রংপুর বিভাগের মোট আয়তন ২৫,৩২০ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখা ১,৫০,০৩,২০০ জন। তাহলে জনসংখ্যার ঘনত্ব,

$$DP = \frac{১,৫০,০৩,২০০}{২৫,৩২০} \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= ৫৯২.৫৪ \text{ জন [প্রতি বর্গ কি. মি.]}$$

$$= ৫৯৩ \text{ জন (প্রায়)}$$

অন্যদিকে, ঢাকা বিভাগের মোট আয়তন ২০,৫০০ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা ৩,৫০,০০,০০০ জন। সুতরাং জনসংখ্যা ঘনত্ব,

$$DP = \frac{৩,৫০,০০,০০০}{২০,৫০০} \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= ১৭০৭.৩২ \text{ জন [প্রতি বর্গ কি. মি.]}$$

$$= ১৭০৭ \text{ জন (প্রায়)}$$

সুতরাং জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করে দেখা যায়, রংপুরের মোট আয়তন বেশি কিন্তু জনসংখ্যা কম হওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। অন্যদিকে, ঢাকা বিভাগের আয়তন রংপুর বিভাগের থেকে কম হলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. এ ১১১৪ জন বেশি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব আরও কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। নিচে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

১. জনসংখ্যার ঘনত্ব ভূ-প্রকৃতির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ে সমতল ভূমিতে মানুষের জীবিকা নির্বাহের অনুকূল পরিবেশ, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা, জীবনধারণের ব্যয় কম বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়। আর বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল, তাই এখানকার জনসংখ্যাও অধিক ঘনবসতিপূর্ণ।

২. বাংলাদেশে মূলত পুরুষশাসিত সমাজ বিদ্যমান। ফলে সবাই পুত্রসন্তান কামনা করে। এক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের আশায় অধিক সন্তান হয়ে পড়ে। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩. খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্বেতসারের আধিক্য থাকলে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সন্তান জন্মদানের উপযোগী হয়।

৪. এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো বাল্যবিবাহ। এদেশের ছেলেমেয়েরা অল্পবয়সে বিবাহ করে, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়।

৫. যেসব অঞ্চলে জানমালের নিরাপত্তা বেশি সেখানে লোকবসতি বেশি। বাংলাদেশ সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা লাভের সুযোগ বেশি। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত জলবায়ু, জমির উর্বরতা, জীবনযাত্রার মান ছাড়াও উপর্যুক্ত কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৫ সুজন ও সুমন বাল্যবন্ধু। ছাত্রজীবন শেষে সুজন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে এবং সুমন অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে একদিন তাদের মধ্যে তর্ক হয়। সুজন পরিসংখ্যানিক উপাত্ত দিয়ে বলেন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, কর্মসংস্থানের সুযোগ, কৃষিজমির পরিমাণ এসব বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা অভিশাপস্বরূপ। অন্যদিকে, সুমন মনে করেন, অতিরিক্ত জনসংখ্যা সবসময় অভিশাপ নয়, বরং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আশীর্বাদে পরিণত করা যায়। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ১

খ. 'কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (০)'— কীভাবে সম্ভব? ২

গ. জনসংখ্যা সম্পর্কিত সুজনের মতামত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে অভিশাপ থেকে আশীর্বাদে পরিণত করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার সমান হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হয়।

কোনো দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে শতকরায় প্রকাশ করলে ঐ দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার পাওয়া যায়।

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$$

এখন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে যদি একটি দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান হয়, তাহলে ঐ দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হবে। তাই বলা যায়, কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিসংখ্যানিক উপাত্তের ভিত্তিতে সুজনের মতে, বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা অভিশাপস্বরূপ।

যে জনসংখ্যার দ্বারা জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। বাংলাদেশে কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে বেশি জনসংখ্যা বিদ্যমান। আর এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন—

বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। আবার, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বর্ধিত আবাসন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আবাদি জমিতে ঘর-বাড়ি গড়ে উঠছে। ফলে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। ফলে দিন দিন বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, এইসব দিক বিবেচনা করে সুজন বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে অভিশাপস্বরূপ বলে মনে করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুজনের বাল্যবন্ধু সুমনের মতে, মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে আশীর্বাদে পরিণত করা যেতে পারে।

কোনো দেশের জনসংখ্যাকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য, দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। আর একটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে আশীর্বাদে পরিণত করা যায়।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান: বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কর্মমুখী ও আধুনিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তাদের দক্ষতা ও উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

নারীর ক্ষমতা ও সম-অধিকার: বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। কিন্তু নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা থাকার জন্য তারা ঘরের বাইরে যেতে পারেন না। তাই, নারীকে সম-অধিকার প্রদান ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা উচিত।

মানবসম্পদ রপ্তানি: অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে শ্রমের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শ্রমবাজারের প্রসার ঘটবে। অর্থাৎ প্রশিক্ষিত শ্রমিক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে আশীর্বাদে পরিণত করা যায়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৬ স্বপন অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাস করার পর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য অনেক দিন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু চাকরি হয়নি। পরে গ্রামে গিয়ে আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে টাকা ধার করে একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলেন। এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পেরে তিনি খুব খুশি। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. 'স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক' — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. স্বপনের কর্মসংস্থান কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বপনের মতো সফল হতে দেশের বেকার যুবকদের করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কতজন লোক স্থায়ীভাবে বাস করে তা বোঝায়।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যেসব সহায়ক উপাদান প্রয়োজন তার মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ অন্যতম।

উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণের শারীরিক যোগ্যতা বাড়ানো হলে তাদের পক্ষে ভারী ও কষ্টকর কাজে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব হবে। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। বিভিন্ন ধরনের রোগ, অপুষ্টি ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ পরনির্ভরশীল। এ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সুতরাং বলা যায়, স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক।

গ স্বপনের কর্মসংস্থানটি আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থান হিসেবে পরিচিত। এ কর্মসংস্থানের প্রকৃতি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য যখন কেউ নিজের যৎসামান্য পুঁজি ও স্থাবর সম্পত্তি কিংবা অন্য কোনো উৎস হতে সংগৃহীত সামান্য পুঁজি এবং কোনো কাজ করার অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে উক্ত কাজে লাগিয়ে অর্থোপার্জন করে, তখন তাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। ব্যক্তির নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থানের এ ব্যবস্থাতে সরকারি বা বেসরকারি ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ দান, সহযোগিতা ও পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে। নির্দিষ্ট কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেই কাজ করা শুরু করলে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কার্যকর ও স্থায়ী হয়। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ নিজের বুদ্ধি ও শক্তিকে নিজেই কাজে লাগাতে ও বেকারত্বের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারে। এর মাধ্যমে সে উৎপাদন ও আয় বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা খুব বেশি; কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ অবস্থায় আত্মকর্মসংস্থান অর্থোপার্জন ও সুন্দর জীবনযাপনের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন– গবাদি পশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার, মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, শাকসবজির চাষ, মাশরুম চাষ, ফুলের চাষ, ফলের চাষ, কুটিরশিল্প স্থাপন, গম বা চালের কল ইত্যাদি। এছাড়া নার্সারি, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ইত্যাদিও আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে, ডেইরি ফার্ম ব্যবসায়ী স্বপন এখন একজন সফল উদ্যোক্তা। স্বপনের মতো সফল হতে হলে দেশের বেকার যুবকদের অনেক কিছুই করণীয় রয়েছে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

আত্মকর্মসংস্থানে ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কাজের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। সৎভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য যেকোনো কাজ করতে তাকে যেমন প্রস্তুত থাকতে হবে তেমনি কোনো কাজকেই অপমানজনক বা হেয় মনে করা যাবে না।

আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাজের উপযোগী সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তাকে ঠিক করতে হবে কোন কাজটি করা লাভজনক হবে, কাজের ঝুঁকি কতটা, প্রাপ্ত মূলধন দ্বারা কাজটি করা সম্ভব হবে কি না ইত্যাদি।

আজকাল যেকোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। তাই আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের পর ব্যক্তিকে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

স্ব-উদ্যোগে কোনো কাজ করার জন্য অল্প বিস্তর পুঁজির প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিজ উদ্যোগে নিজস্ব ও পরিবারের সঞ্চয় সংগ্রহ, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করে ঋণ গ্রহণ করে প্রাপ্ত পুঁজিকে উৎপাদনক্ষম কাজে লাগাতে হবে। আমাদের আত্মকর্মসংস্থানে ইচ্ছুক যুব সম্প্রদায়কে এসব বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

উপরিউক্ত করণীয়সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব হারুন যুব উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটি মৎস্য খামার করলেন। মৎস্য অফিসারের সহায়তায় উন্নত জাতের পোনা ও ডিম উৎপাদন করলেন। নিয়মিত মাছের খাদ্য ও যত্ন দিয়ে প্রচুর মাছ উৎপাদন করলেন। এতে তার প্রচুর মুনাফা হলো। তার অনুসরণে গ্রামের অনেক বেকার যুবক মাছ চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহিত হলো। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা হ্রাসে ভূমিকা রাখে? ২

গ. জনাব হারুনের মৎস্য খামারটি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হারুন ও তার অনুসারীদের ফার্মগুলোকে কি স্বকর্মসংস্থান বলা যেতে পারে? আলোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য হলো ঐ দেশের নিট অভিবাসন।

খ নারী শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের নারী সমাজের সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা পরিবারের জন্য আয় উপার্জনে অক্ষম। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে মহিলাদের জন্য ঘরে-বাইরে কাজের সংস্থান করতে পারলে তারা সন্তান জন্মদানের সুযোগ কম পাবে এবং জন্মহার হ্রাস পাবে। কারণ, কর্মজীবী মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়াও সম্ভব হয় না।

গ জনাব হারুন মৎস্য খামার তৈরি করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছেন। স্বকর্মসংস্থান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোনো ব্যক্তি নিজের বা ঋণের মাধ্যমে স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকলে, তাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ে, ফলে আয় বাড়ে এবং নিয়োগও বাড়ে। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অল্প মূলধনের সাহায্যে সহজেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটে।

উদ্দীপকের জনাব হারুন যুব উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটি মৎস্য খামার করলেন। সেখানে তিনি উন্নত জাতের পোনা ও ডিম উৎপাদন করলেন। এছাড়াও তিনি মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জন করলেন। জনাব হারুন মাছের খামার তৈরির মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন সাথে তার খামারে অনেক যুবকের কর্মের ব্যবস্থাও হয়েছে। যেহেতু তাকে অনুসরণ করে গ্রামের অনেক বেকার যুবক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। তাই বলা যায়, অধিক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

ঘ হ্যাঁ, জনাব হারুন ও তার অনুসারীদের ফার্মগুলোকে স্বকর্মসংস্থান বলা যাবে।

আত্ম শব্দের অর্থ 'নিজ' এবং কর্মসংস্থান অর্থ 'নিয়োগ'। কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থান

https://teachingbd24.com

বলে। হাঁস-মুরগি পালন, কবুতর পালন, নার্সারি, ফুলের চাষ, মৎস্য চাষ, ফলের বাগান, পশুপালন, বাঁশ ও বেতের কাজ, কম্পিউটার কম্পোজের দোকান, টাইপ মেশিন চালানো প্রভৃতি স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদাহরণ। স্বকর্মসংস্থানের কার্যাবলি একক বা যৌথ উদ্যোগে করা যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও NGO-সমূহ ঋণ ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে, যা কি না বেকারত্বের বোঝা হ্রাস করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে।

উদ্দীপকের হারুন যুব উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটি মৎস্য খামার করলেন। মৎস্য অফিসারের সহায়তায় উন্নত জাতের মাছের পোনা ও হাঁস-মুরগির ডিম উৎপাদন করলেন। তাছাড়া তিনি মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফাও অর্জন করলেন। তার এই সাফল্য দেখে গ্রামের অনেক বেকার যুবক মাছ চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করলেন। যা সহজেই প্রতীয়মান যে, উদ্দীপকের কাজগুলো স্বকর্মসংস্থানের আওতাভুক্ত।

সুতরাং বলা যায়, স্বকর্মস্থানের মাধ্যমে স্বল্প পুঁজি ও সামান্য প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে বেকার যুব সম্প্রদায় পরনির্ভরশীলতার গ্লানি মোচন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৮ শামীম ও শাহিন দুই ভাই। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এসএসসি পাসের পর তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তাই দুই ভাই উপজেলা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে স্থানীয় বাজারে 'ভাই ভাই মোবাইল সলিউশন' নামের একটি দোকান দেয়। প্রথম মাসেই সমস্ত খরচ বাদে নিট লাভ হয় ১০,০০০ টাকা। তাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি কী? ১

খ. অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'ভাই ভাই মোবাইল সলিউশন' প্রতিষ্ঠায় কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার মতে, উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের উদ্যোগটি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখবে? ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অধ্যাপক অ্যাডউইন ক্যানান, ডাল্টন, রবিন্স প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্বের একটি বিকল্প তত্ত্ব প্রচার করেন, যা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

খ বাংলাদেশের সকল সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অধিক জনসংখ্যা।

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে কাম্য মাত্রার চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে তা জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতি খুব বেশি সচ্ছল না হওয়ায় এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার সকল মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এদেশের বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মান খুব নিম্ন হওয়ায় এরা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের উল্লেখযোগ্য অবদান না থাকায় এরা বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এরূপ জনসংখ্যা সমস্যা দেশের সকল উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। তাই অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'ভাই ভাই মোবাইল সলিউশন' প্রতিষ্ঠায় আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। যেমন— হাঁস-মুরগি পালন, কবুতর পালন, মৎস্য চাষ, ফলের বাগান, পশুপালন, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনা, একক বা যৌথ খামার ইত্যাদি হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের উদাহরণ। এটি এমন এক ধরনের কর্মসংস্থান যা স্বল্প মূলধন ও সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে পরনির্ভরশীলতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও NGO-সমূহ এ ক্ষেত্রে ঋণ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে শামীম ও শাহিনের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এসএসসি পাসের পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তারা হতাশ না হয়ে এবং সরকারি বা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাকরির জন্য নির্ভরশীল না হয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করে। তারা উপজেলা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে ও সামান্য পুঁজির সমন্বয়ে 'ভাই ভাই মোবাইল সলিউশন' নামে স্থানীয় বাজারে একটি দোকান দেয়। এর ফলে তাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এভাবে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।

ঘ আমার মতে, উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের উদ্যোগটি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশর অর্থনীতিতে আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। এদেশের ৮ কোটি কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ২ কোটি বেকার। এর মধ্যে অনেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। আত্মকর্মসংস্থান বেকারত্বের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। স্বল্প পরিমাণ পুঁজি ও সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একক বা যৌথ উদ্যোগে এরূপ কর্মসংস্থান গড়ে তোলা যায়, যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থ রক্ষা করে। এর ফলে সামাজিক অপকর্ম ও অনাচার থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা যায়। মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও অর্থনীতিতে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়। যা বাংলাদেশকে একটি স্বনির্ভর দেশে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের উদ্যোগটি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে। তারা স্বল্প মূলধন ও সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান তৈরি করে দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম হয়। স্থানীয় বাজারে দোকান দেয়ায় বেচাকেনাও ভালো হয়। প্রথম মাসেই সমস্ত খরচ উঠে যায় এবং ১০,০০০ টাকা লাভ হয়। তাদের দেখে ঐ গ্রামের অন্যান্য বেকার বা দরিদ্র যুবকরা উৎসাহিত হবে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগটি সত্যিই প্রসংশনীয়। এর মাধ্যমে দেশকে দরিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই শামিম ও শহিনের মতো অন্যান্য বেকার যুবকদেরও স্বকর্মসংস্থানের প্রতি মনোনিবেশ করে দরিদ্রতাকে জয় করা উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৯

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. জন্মহার জনসংখ্যাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ জনসংখ্যা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উক্ত তত্ত্বটি কতটুকু কার্যকর? — মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মক্ষম জনশক্তি বা শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

খ কোনো দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক জন্মহার।

কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাকে সে দেশের জন্মহার বলে। জনসংখ্যার সাথে এর সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের জন্মহার বৃদ্ধি পেলে ওই অঞ্চলের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। আবার জন্মহার হ্রাস পেলে জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। অর্থাৎ জন্মহারের পরিবর্তন জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে। কোনো দেশের জনসংখ্যার মৃত্যুহার এবং নিট

https://teachingbd24.com

অভিবাসন স্থিতিশীল থাকলে উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। বিপরীত অবস্থায় জনসংখ্যা হ্রাস পায়। এভাবে জনসংখ্যাকে জন্মহার সরাসরি প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ তত্ত্বটি হলো থমাস রবার্ট ম্যালথাস এর জনসংখ্যা তত্ত্ব।

১৭৯৮ সালে 'An Essay On The Principle of Population' গ্রন্থে এই জনসংখ্যা তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। এ তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। এক্ষেত্রে জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো জনসংখ্যা বাড়ে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ..... ইত্যাদি হারে এবং খাদ্য বাড়ে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ..... ইত্যাদি হারে। তিনি মনে করেন, আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে মানুষের উন্নতি ও সুখ হবে না।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তালিকা হতে আমরা যে তথ্য দেখতে পাই, তা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ জনসংখ্যার জ্যামিতিক হার ও খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হারকে নির্দেশ করে। ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়তে পারে না। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ার খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বাড়ে না। এর ফলে এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় ও জনাধিক্য দেখা দেয়।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যথেষ্ট কার্যকর।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে দেখানো হয় যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলেও জমির স্বল্পতা থাকায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। বর্তমানে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং খাদ্য উৎপাদনের হার মাত্র ০.৬৫%।

উদ্দীপকে আলোচিত ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে এর খুব মিল খুঁজে পাই। বাংলাদেশের কৃষি জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর এবং উৎপাদিত খাদ্য জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে ও খাদ্য উৎপাদনের হার গাণিতিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ম্যালথাস বর্ণিত দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে একজন মানুষের ভরণপোষণের জন্য ১.২ থেকে ১.৮০ একর জমির প্রয়োজন। অথচ ১৯৭৫ সালে ছিল ০.২৮ যা বর্তমানে ০.২৫ একর।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যথেষ্ট কার্যকর। এই তত্ত্বে জনসংখ্যা সমস্যার সব লক্ষণই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। ফলে অধিক জনসংখ্যা ও খাদ্য ঘাটতি দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ১০ শিক্ষিতের হার কম হওয়া সত্ত্বেও এক সময় 'ক' দেশটির জনগণ সুখে শান্তিতে বাস করত। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ— এসবই তাদের ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বর্তমানে তারা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, উৎপাদিত পণ্য দ্বারা জনগণের খাদ্যের সংস্থান সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। ফলে ছিনতাই, রাহাজানি বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে অনেক মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১

খ. অধিক জনসংখ্যা কীভাবে স্বল্প মাথাপিছু আয়ের কারণ হিসেবে কাজ করে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন জনসংখ্যা তত্ত্বের সাদৃশ্য রয়েছে? কেন? ৩

ঘ. 'ক' দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মূলত কি দায়ী বলে তুমি মনে করো? এ থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ:

$DP = \frac{TP}{TA}$ যেখানে DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব,

TP = মোট জনসংখ্যা এবং TA = মোট আয়তন।

খ কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

তাই নির্দিষ্ট জাতীয় আয়কে ক্রমেই বেশি সংখ্যক জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় কমে যাওয়ারই কথা। প্রকৃতপক্ষে যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে ভাগ করলে মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবা প্রাপ্তির পরিমাণ কমে যায়, তেমনি নির্দিষ্ট জাতীয় আয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। তাই অধিক জনসংখ্যা স্বল্প মাথাপিছু আয়ের কারণ হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকের সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাদৃশ্য রয়েছে; তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপকটি পাঠ করে জানা যায়, অতীতে একসময়ে শিক্ষিতের হার কম হওয়া সত্ত্বেও 'ক' দেশের জনগণ সুখ-শান্তিতে বাস করত। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, এসবই তাদের ছিল। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সে দেশের জনগণ এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী দ্বারা জনগণের খাদ্যের সংস্থান সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে না। দেশে খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতিবছর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। তাছাড়া ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী প্রয়োজনমাফিক খাদ্য ক্রয় করতে পারছে না; পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করা তো দূরের কথা। এ অবস্থায় দেশটির জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনাহার, অর্ধাহার ও অপুষ্টির শিকার। অতিরিক্ত জনসংখ্যার দরুন কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত খাতে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ কম হওয়ার দেশের প্রকট বেকারত্ব বিদ্যমান। তাছাড়া অধিক জনসংখ্যা ও তার দ্রুত বৃদ্ধির দরুন নানাভাবে পরিবেশ দূষিত হওয়ায় ঘন ঘন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। দূষিত পরিবেশ সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করছে— ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব লক্ষণই ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'ক' দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মূলত অতিরিক্ত জনসংখ্যা দায়ী। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হলো— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ নিম্নরূপ:

১. আধুনিককালে কোনো দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যার উত্তাল তরঙ্গ রোধ করা যায়।

২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হচ্ছে— দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে মানুষ তা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবে।

৩. শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত কিছুটা দেরিতেই বিয়ে করে। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ পায়।

৪. নারীদের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তখন অব্যাহতভাবে কাজ করে অর্থোপার্জনের জন্য তারা পরিবার ছোট রাখবে।

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোকাবিলা করতে হলে আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ ও পুরুষদের বহুবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে।

এভাবে 'ক' দেশটিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। আর এমনটি হলে অতীতের সুখ-সমৃদ্ধি আবার ফিরে আসবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১

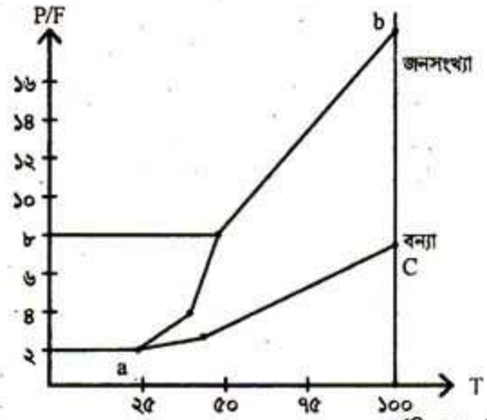

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. কীভাবে মানবসম্পদ তৈরি করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত রেখাচিত্রের b এবং c এর ব্যবধান দূর করা যায় কীভাবে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের বা এলাকায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে, তাকে ঐ দেশ বা এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

খ জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদের পাশাপাশি মানবসম্পদ একান্ত প্রয়োজন। আর মানবসম্পদ তৈরি করা যায় মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে। মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কোনো দেশের জনশক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলাকে বোঝায়। কাজেই, মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদ তৈরি করা যায়।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। কিন্তু এ জনসংখ্যার জীবন ধারনের উপকরণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। এভাবে জনসংখ্যা ও খাদ্য বৃদ্ধির পার্থক্যের কারণে প্রতি ২৫ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। মানুষ যদি নিজেরা জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ না করে তবে প্রকৃতি তার নির্মম হাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে জনসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে। নিচে চিত্রের সাহায্য তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো—

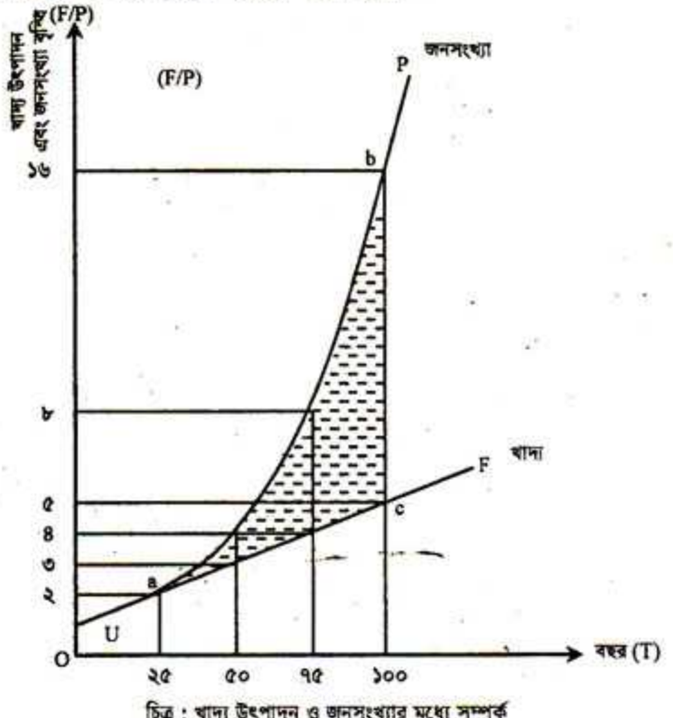

চিত্র : খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক

চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রতি ২৫ বছর সময়কে একক হিসেবে ধরা হয় এবং লম্ব অক্ষে খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। প্রতি ২৫ বছর অন্তর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে তথা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ...। এভাবে প্রাপ্ত বিন্দু সমূহের সমন্বয়ে খাদ্য রেখা পাওয়া যায় UF। সূচি থেকে প্রাপ্ত প্রতি একক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাপ দ্বারা জনসংখ্যা রেখা পাওয়া যায় UP। চিত্র থেকে লক্ষ করা যায়, ২৫ বছর সময়ের পর খাদ্য বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক হয়। ১০০ বছরের সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় abc পরিমাণ।

ঘ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উদ্দীপকের উল্লিখিত রেখাচিত্রের b ও c এর ব্যবধান দূর করা যায়।

ম্যালথাস ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ওপর ভিত্তি করে খাদ্য উৎপাদনে গাণিতিক হারের মতবাদ দেন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে খাদ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা b ও c এর ব্যবধান কমানো যায়।

আবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যেমন— জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকর, স্বাস্থ্যসেবা ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রেখা ভূমি অক্ষের কাছাকাছি চলে আসে। অর্থাৎ, b ও c এর ব্যবধান কমে যায়।

ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে ১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও ২. প্রাকৃতিক নিরোধ এই দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হলে জনাধিক্য দেখা দেয়। তখন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না গ্রহণ করা হলে প্রাকৃতিক নিরোধ কার্যকরী হয় এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ, b ও c এর ব্যবধান দূর করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১২ করিম খুলনায় জুট মিলে কাজ করে। সে মিলের পাশেই বস্তিতে বসবাস করে। সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনেক লোকের বাস। নাই পয়ঃনিষ্কাশন ও রাস্তাঘাটের সুবিধা। আমাশয়, কলেরা, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগ লেগেই আছে। একদিন টেলিভিশন দেখে সে জানতে পারল— এ দেশের স্বাস্থ্যগত সমস্যা, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণেই হচ্ছে। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; রাজশাহী কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে করিমের সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক স্থায়ীভাবে বাস করে তা বোঝায়।

খ কোনো একটি কাজ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা বার বার করাই হলো প্রশিক্ষণ।

কোনো কাজের জন্য প্রশিক্ষণ মানুষকে ঐ কাজটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ উপায়ে সম্পাদন করতে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণ মানুষকে উৎপাদনশীল করে তার শ্রমের গুণগত মান বাড়ায়। প্রশিক্ষণ যত উন্নত পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় মানুষ ততই তার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। এ জন্যই বলা হয়— প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো–

বাংলাদেশে জনাধিক্যের কারণে বাসস্থান সমস্যা প্রকট। শহরে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষেরই নিজস্ব কোনো ঘর-বাড়ি নেই। বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ রাস্তা, রেল লাইন, ড্রেন ইত্যাদির আশপাশে যত্রতত্র কুঁড়েঘর তুলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি ও জনাকীর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। বড় বড় শহরের আশপাশের বস্তি এলাকায় বিপুল সংখ্যক লোক গাদাগাদি করে বাস করে, যেখানে নেই কোনো

https://teachingbd24.com

স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। বিভিন্ন ধরনের প্রাণঘাতী রোগ-বালাই যেখানে মানুষের নিত্য সহচর।

বাংলাদেশে বর্তমানে চিকিৎসার সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসকের স্বল্পতা, চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অভাব, হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ না পাওয়া ইত্যাদি সরকারি খাতের চিকিৎসা সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে।

বাংলাদেশে বেশি জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব দেশের সর্বত্র বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষিত করছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় গ্রামাঞ্চলের পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। শহরাঞ্চলে অধিক যানবাহন, কলকারখানা, ইটের ভাটা ইত্যাদি থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত ধোঁয়া ও কলকারখানার বর্জ্য বাতাস দূষিত করছে।

সুতরাং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা উন্নয়নের পথে একটি বড় অন্তরায়।

ঘ উদ্দীপকে করিমের সমস্যা বা জনসংখ্যা সমস্যা একটি সর্বজনীন ও জটিল সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত উপায়ে উচ্চ জন্মহার কমিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এভাবে উচ্চ জন্মহার কমিয়ে সীমিত সম্পদের সাথে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য বিধান করে জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস করা যায় এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা জনগণের নিকট সহজলভ্য করা যায়।

২. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে লোক তা বজায় রাখার স্বার্থেই পরিবারের আয়তন ছোট রাখবে ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যাবে।

৩. শিক্ষার প্রসার অধিক জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। শিক্ষিত মানুষ অনেক আগেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে পরিবার ছোট রাখে। শিক্ষা ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে। আবার নারী শিক্ষা একদিকে নারীকে কর্মসংস্থানে সহায়তা করে এবং অন্যদিকে, কাজ-কর্মে জড়িত রেখে পরিবার ছোট রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উন্নতি ঘটানো যায়, তাহলে লোকের মাথাপিছু আয় বাড়বে, মানুষ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করবে। পরিণামে সে আপনা-আপনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

উপরিল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে করিমের মতো লোকদের সমস্যার সমাধান হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. জাকির বৃত্তি নিয়ে ইউরোপে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে যান। তিনি সেখানে দেখতে পান যে, শীত প্রধান ইউরোপে জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং গড় আয়ুষ্কাল বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে খাদ্যাভ্যাস, আবহাওয়া, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি এবং জীবনযাত্রার মান নিম্ন। বর্তমানে সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করেছে। উপরন্তু কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এতে মাথাপিছু আয় বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও হচ্ছে।

[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৪]

ক. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি লেখ। ১

খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকার আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক ডালটন কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি প্রদান করেন।

$M = \frac{A-O}{O}$, যেখানে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, O = কাম্য জনসংখ্যা, A = প্রকৃত জনসংখ্যা।

খ শিক্ষা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ নিজেকে সম্পদে পরিণত করার বিভিন্ন কৌশল ও সৃজনী ক্ষমতা অর্জন করে। মানুষ নিজেকে এবং রাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ হলো– ১. খাদ্যাভ্যাস, ২. আবহাওয়া, ৩. বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

১. খাদ্যাভ্যাস বাংলাদেশের উচ্চ জন্মহারের একটি অন্যতম কারণ। কেননা, বাংলাদেশের লোকেরা বেশি পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য খুবই কম ভক্ষণ করে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণে প্রজনন ক্ষমতা কমে।

২. জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর জন্মহার নির্ভর করে। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। এরূপ জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে।

৩. বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ। নানা কারণে সন্তান-সন্ততিদেরকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেয়া হয়। ফলে সন্তান উৎপাদন বেশি হয়। বাল্যবিবাহ ছাড়াও আমাদের দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। যা আমাদের দেশে উচ্চ জন্মহারের অন্যতম কারণ।

এসব কারণে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রা অত্যন্ত নিম্নমানের। শিক্ষার অভাবে উচ্চ জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনো ধারণা নেই। আর সন্তান প্রতিপালনে ব্যয় খুব বেশি নয় বলে অধিক সন্তান জন্ম দিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে প্রদর্শিত কারণগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকার বর্তমানে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকার আরও যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে সেগুলো হলো—

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সুদূরপ্রসারী কৌশল হচ্ছে দেশে শিক্ষার হার বাড়ানো ও মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো। সে লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্পও বাস্তবায়ন করছে। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুমোদিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ : সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীনে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় কার্যক্রম: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে নগর এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ভিটামিন এ খাওয়ানোসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগ ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে ১২,২৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়: এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে পরিবার পরিকল্পনার আবশ্যকতা ও জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক প্রচার করছে। সরকারের জনসংখ্যা বিভাগ ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের সাহায্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৪ সালের মোট জীবিত জনসংখ্যা	২০১৪ সালের মোট মৃত জনসংখ্যা
১৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২০,০০,০০০

[চি.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]

https://teachingbd24.com

ক. নিট অভিবাসন কাকে বলে? ১
খ. যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, তাকে কী বলে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. যদি দেশটির আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. হয়, তবে দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত হবে? ঘনত্ব বিবেচনা করে দেশটি জনবহুল হলে তার সমাধানের উপায় কী? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য হলো ঐ দেশের ঐ বছরের নিট অভিবাসন।

খ যে সংখ্যক জনসংখ্যা থাকলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা যেখানে উৎপাদন, আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে।

গ উদ্দীপকে দেশের ২০১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা ও ২০১৪ সালের মোট জীবিত ও মোট মৃত জনসংখ্যা দেওয়া আছে।

স্থূল জন্মহার: আমরা জানি, $CBR = \frac{B}{P} \times ১০০০$; যেখানে, CBR = স্থূল জন্মহার, B = নির্দিষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণকারী জীবিত শিশু, P = ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোট জনসংখ্যা। তাহলে উদ্দীপক অনুসারে উক্ত দেশের স্থূল জন্মহার–

$$= \frac{২৫,০০,০০০}{১৫,০০,০০,০০০} \times ১০০০$$
$$= ১৭ \text{ জন}$$

স্থূল মৃত্যুহার: আমরা জানি, $CDR = \frac{D}{P} \times ১০০০$ যেখানে, CDR = স্থূল মৃত্যুহার, D = এক বছরে মৃত মানুষের মোট সংখ্যা, P = বছরের মাঝামাঝি সময় মোট জনসংখ্যা। তাহলে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের স্থূল মৃত্যুহার–

$$= \frac{২০,০০,০০০}{১৫,০০,০০,০০০} \times ১০০০ = ১৩ \text{ জন}$$

ঘ একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কত জন বসবাস করে তা জানার জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যার ঘনত্ব ধারণা। উদ্দীপকে ২০১৪ সালে দেশের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব সূত্র ব্যবহার করে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব (DP) $= \frac{TP}{TA}$; যেখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব

TP = মোট জনসংখ্যা; TA = দেশের মোট আয়তন।

$$\therefore DP = \frac{১৫,০০,০০,০০০}{১,৪৭,৫৭০}$$
$$= ১০১৬ \text{ জন}।$$

উদ্দীপকের দেশটির আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা ঘনত্ব অধিক। এই বিপুল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ও জনগণকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদারকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার, সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে সরকারি আইন প্রণয়ন ও নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং, বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত, দেশটি জনসংখ্যাবহুল। উপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে উক্ত দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৫ তারিক ও হাসান দুই বন্ধু। দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে তারিক তার বন্ধুকে বলে, আমাদের জেলার আয়তন ১,২৩৬ বর্গকিলোমিটার আর জনসংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার। সে আরও জানায়, বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বছর পর জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার।

[রা.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]

ক. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝ? ১
খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্যসেবার কী সম্পর্ক? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে তারিকের জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব কীভাবে নির্ণয় করবে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ১০ বছর পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারিকের জেলায় খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বুঝিয়ে বলো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ। সুচিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ, সবল ও নিরোগ রাখতে পারলে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে। এদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন এবং সেগুলো থেকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটবে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্যসেবার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

গ উদ্দীপকের আলোকে তারিকের জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তা জনসংখ্যা ঘনত্ব সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়। একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কতজন লোক বসবাস করে তা জানার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব ধারণার উদ্ভব হয়। কোনো দেশের বিদ্যমান মোট জনসংখ্যাকে সে দেশের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা তথা জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$DP = \frac{TP}{TA};$$

এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব,

TP = মোট জনসংখ্যা এবং

TA = মোট দেশের আয়তন।

উদ্দীপকে তারিকের জেলার মোট জনসংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার, আয়তন ১,২৩৬ বর্গকিলোমিটার হওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে–

$$DP = \frac{১২,৬৫,০০০}{১,২৩৬} = ১,০২৩ \text{ (প্রতি বর্গ. কি.মি.)}$$

দেশের মোট আয়তন স্থির থাকে বলে লোকসংখ্যা বাড়া বা কমার ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে বাড়ে বা কমে। এভাবে উপরিউক্ত সূত্র ব্যবহার করে তারিকের জেলার জনসংখ্যা ঘনত্ব বের করা যায়।

ঘ জনসংখ্যাজনিত চাপের ফলে ১০ বছর পর তারিকের জেলায় খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হবে।

জীবনধারণের জন্য খাদ্য অত্যাবশ্যক। তাই জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের যোগান বাড়ানো উচিত। যখন জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে না তখন জনসাধারণের মধ্যে তথা দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। মানুষ তখন অনাহারে, অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ভুগবে।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো উন্নত বা দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। তবে এই দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে অধিক জনসংখ্যার জন্য। অধিক জনসংখ্যার ফলে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে জনসাধারণ তথা যুবক সমাজ অদক্ষ হয়ে পড়বে। সীমিত সম্পদের সাহায্যে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা কঠিন ব্যাপার।

বাসস্থান মানুষকে আশ্রয় দেয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আবাসিক চাহিদা বিশেষ করে শহরাঞ্চল বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতি বছর নতুন বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাবে। বাসস্থানের অভাবে

Teaching
https://teachingbd24.com

বিপুলসংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ রেল লাইন, রাস্তা ও ড্রেনের পাশে যত্রতত্র কুঁড়েঘর তুলে মানবেতর জীবনযাপন করবে।
তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারিকের জেলায় খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶১৬ 'X' একটি উন্নয়নশীল দেশ। উক্ত দেশটির জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় দেওয়া হলো:

বছর	১৯০০	১৯২৫	১৯৭৫
জনসংখ্যা	২	৪	১৬
খাদ্য উৎপাদন	২	৩	৫

[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১
খ. কারিগরি শিক্ষার প্রসার মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কীভাবে সহায়ক হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের সাথে অর্থনীতির কোন তত্ত্বটি সংগতিপূর্ণ এবং কেন? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে 'X' দেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে করো? ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ কারিগরি শিক্ষার প্রসার মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সহায়ক।
প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা, জ্ঞান ও আচরণের উন্নতি সাধন করা হয়। এতে কর্মীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই দেশের জনশক্তিকে দক্ষ উৎপাদনক্ষম ও নিষ্ঠাবান মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষা তথা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ তত্ত্বটি হলো থমাস রবার্ট ম্যালথাস এর জনসংখ্যা তত্ত্ব।
১৭৯৮ সালে 'An Essay On The Principle of Population' গ্রন্থে এই জনসংখ্যা তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। এ তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। এক্ষেত্রে জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো জনসংখ্যা বাড়ে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ . . . ইত্যাদি হারে এবং খাদ্য বাড়ে ১, ২, ৩, ৪, ৫ . . . ইত্যাদি হারে। তিনি মনে করেন, আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে মানুষের উন্নতি ও সুখ হবে না।
উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য হতে আমরা দুটি ধারা দেখতে পাই, যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ জনসংখ্যার জ্যামিতিক হার ও খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হারকে নির্দেশ করে। ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়তে পারে না। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ার খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বাড়ে না। এর ফলে এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় ও জনাধিক্য দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে সমর্থন করে। এই পরিস্থিতিতে 'X' দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।
অর্থনৈতিক প্রভাব: 'X' দেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিম্নরূপ—
প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 'X' দেশের জমি ক্রমশ উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।
দ্বিতীয়ত, 'X' দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পেলে বেকার সমস্যা ক্রমাগত প্রকট আকার ধারণ করবে।
তৃতীয়ত, 'X' দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় দ্রব্য ও সেবার দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসবে।
সামাজিক প্রভাব: জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক প্রভাবগুলো নিম্নরূপ—
প্রথমত, 'X' দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। তাই তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নিম্নগামী হবে।
দ্বিতীয়ত, 'X' দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভয়াবহ আবাসিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। এছাড়া চাষযোগ্য জমিও নষ্ট হবে।
তৃতীয়ত, 'X' দেশে জনসংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে বিশুদ্ধ পানির অপ্রতুলতা, অনিয়ন্ত্রিত শিল্প স্থাপন, ব্যাপকহারে বৃক্ষ কর্তন প্রভৃতি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এসব পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত ও জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলবে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতির ফলে 'X' দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন ▶১৭ অর্থনীতির শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে জনসংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি এ তত্ত্বের মাধ্যমে দেখান যে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্যোৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। প্রতি ২৫ বছর পর কোনো দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। ফলে খাদ্য ঘাটতিসহ নানা দুর্যোগ নেমে আসে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই এক সময় উভয়ের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য এ তত্ত্বের অনেকটাই বর্তমান যুগে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।
[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বেকারত্ব কী? ১
খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তত্ত্বটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কতটুকু কার্যকর? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একাধিক উপাদান কাজ করে। অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল মানবসম্পদ উন্নয়নের আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো : ১. খাদ্য ও পুষ্টি ২. বস্ত্র ৩. বাসস্থান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ৪. স্বাস্থ্য সুবিধা ৫. শিক্ষা ৬. গণসংযোগ মাধ্যম ৭. শক্তি ভোগ ও ৮. পরিবহণ।
এসব উপাদানের সহায়তায় মানুষের ভেতরের সুপ্ত গুণাবলির উন্নয়ন ও বিকাশই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন।

গ উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ তত্ত্বটি হলো থমাস রবার্ট ম্যালথাস এর জনসংখ্যা তত্ত্ব।
১৭৯৮ সালে 'An Essay On The Principle of Population' গ্রন্থে এই জনসংখ্যা তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। এ তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। এক্ষেত্রে জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো জনসংখ্যা বাড়ে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ . . . ইত্যাদি হারে এবং খাদ্য বাড়ে ১, ২, ৩, ৪, ৫ . . . ইত্যাদি হারে। তিনি মনে করেন, আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে মানুষের উন্নতি ও সুখ হবে না।
উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্য হতে আমরা ধারানাটি দেখতে পাই, যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ জনসংখ্যার জ্যামিতিক হার ও খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হারকে নির্দেশ করে। ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়তে পারে না। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ার খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বাড়ে না। এর ফলে এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় ও জনাধিক্য দেখা দেয়।

https://teachingbd24.com

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যথেষ্ট কার্যকর।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে প্রকাশ পায় যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলেও জমির স্বল্পতা থাকায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। তার মতে, খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ কখনো শেষ হবে না। একই জমি থেকে ক্রমাগত উন্নত মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব। তিনি দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নিরোধ ও বিলম্ব বিবাহ, নৈতিক সংযম প্রভৃতিকে প্রতিরোধমূলক নিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

উদ্দীপকে আলোচিত ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে এর খুব মিল খুঁজে পাই। বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যা বহুল দেশ। এখানে কৃষি জমি সীমাবদ্ধ, কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর এবং উৎপাদিত খাদ্য জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে ও খাদ্য উৎপাদনের হার গাণিতিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ম্যালথাস বর্ণিত দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি খুবই কার্যকর। এই তত্ত্বে জনসংখ্যা সমস্যার সব লক্ষণই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। ফলে অধিক জনসংখ্যা ও খাদ্য ঘাটতি দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। নিম্নের ছকে 'ক' দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:

বছর	১৯০০	১৯২৫	১৯৫০	২০২৫
জনসংখ্যা	১	২	৪	৩২
খাদ্য উৎপাদন	১	২	৩	৬

তবে 'খ' দেশে জনসংখ্যার অনুপাত, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতের ভূমিকা বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে অর্থনীতিতে আলোচ্য কোন তত্ত্বটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচ্য 'ক' এবং 'খ' দেশের জনসংখ্যার মধ্যে কোনটিতে কাম্য জনসংখ্যা রয়েছে তা যুক্তিসহকারে আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী লোকসংখ্যাকে ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে প্রতি ২৫ বছর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি: ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। জ্যামিতিক হারের উদাহরণ হলো— ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ . . . . . ধারা।

গাণিতিক হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি: ম্যালথাসের মতে, প্রাকৃতিক নিয়মে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ধীর গতিতে অর্থাৎ গাণিতিক হারে। যেমন— ১, ২, ৩, ৪, ৫, ... প্রভৃতি হারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক: ম্যালথাসের মতে, খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু অভাব এবং পাপ তাকে বিরত না করলে মানুষ নিজে দ্রুত জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করে। ম্যালথাস ২৫ বছর সময়কে একক ধরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক এভাবে দেখিয়েছেন—

বছর	১৯০০	১৯২৫	১৯৫০	২০২৫
জনসংখ্যা	১	২	৪	৩২
খাদ্য উৎপাদন	১	২	৩	৬

যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে ২০২৫ সালে জনসংখ্যা বাড়বে ৩২ গুণ এবং খাদ্যের যোগান বাড়বে ৬ গুণ।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত দুটি দেশের মধ্যে 'খ' দেশে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

'খ' দেশে জনসংখ্যার অনুপাত, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে।

যদি কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে কম হয় তাকে নিম্ন জনসংখ্যা বলে। জনসংখ্যার এ আয়তন প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অপ্রতুল এবং এ অবস্থায় শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুবিধাগুলো বিশেষভাবে উপভোগ করা যায় না। তাই প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয় না। আবার জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে যখন শ্রমের যোগান বাড়ে, শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নততর কলাকৌশলের ব্যবহার ঘটে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়, তখন মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে থাকে। অবশেষে জনসংখ্যা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার করে মাথাপিছু আয় সর্বাধিকমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তখন জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ বৃদ্ধি না হওয়ায় মাথাপিছু আয় কমে যায়। এ পর্যায়ের জনসংখ্যাকে অধিক জনসংখ্যা বলে। তাই দেখা যায় নিম্ন বা অধিক জনসংখ্যা কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল জনসংখ্যার যে আয়তনে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয় তাই হলো কাম্য জনসংখ্যা। কিন্তু উদ্দীপকের 'ক' দেশে খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক। যা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের বিপরীত।

সুতরাং উদ্দীপকের 'খ' দেশে কাম্য জনসংখ্যা বিরাজমান আছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আমিনুর সাহেব পনেরো বছর পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। নিজ গ্রামে এসে দেখেন যে আগের থেকে গ্রামে অনেক জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। যুবক ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া না করে অলস সময় পার করছে। শিক্ষিত অনেক যুবক বেকার বসে আছে। আর গ্রামের মেয়েদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই বিয়ে দিচ্ছে অভিভাবকরা। তিনি যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করলেন এবং বছর খানেক পরেই গ্রামের চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। এখন গ্রামে কেউই বেকার বসে নেই এবং একই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে গেছে। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. মৃত্যুহার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে আমিনুর সাহেব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ কীভাবে গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামে অধিক জনসংখ্যা বর্তমানে আশীর্বাদ না অভিশাপ? এ বিষয়ে মন্তব্য করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ কোনো দেশে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে তাকে সে দেশের মৃত্যুহার বলে। এর হার বের করতে হলে, কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যে সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফলকে ১০০০ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আমিনুর সাহেব যুবকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি। দেশের জনসংখ্যা শিক্ষিত হলে তারা কম সন্তান গ্রহণে আগ্রহী হয়। আবার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লে জন্মহার হ্রাস পায়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আমিনুর সাহেব পনেরো বছর পর বিদেশ থেকে ফিরে তার নিজে গ্রামে অধিক জনসংখ্যা ও তার বিভিন্ন কুফল দেখতে পেয়ে যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। যা তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, কর্মব্যস্ততার কারণে অনেকে বেশি বয়সে বিয়ে করেন এবং কম সন্তান গ্রহণ করেন। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পায়। সুতরাং আমিনুর সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামে অধিক জনসংখ্যা বর্তমানে আশীর্বাদস্বরূপ। কারণসমূহ হলো—

প্রথমত, কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তখন জনসংখ্যা সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। জনসংখ্যা শিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মঠ হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত সম্ভব। এর ফলে শিল্প ও কলকারখানার সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়।

দ্বিতীয়ত, কোনো দেশে কাম্য জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ঠিক থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, পণ্যসামগ্রীর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বর্তমান থাকলে সেক্ষেত্রে কোনো দেশের জনসংখ্যা সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। তখন জনসংখ্যা দায় হতে পারে না। যেমনটি আমিনুর সাহেবের গ্রামে লক্ষ করা যায়।

তৃতীয়ত, যদি কোনো দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে এবং সেই দেশের জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের অভাব না হয় তখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হয়। ফলে জনসংখ্যা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ হিসেবে কাজ করে যতক্ষণ অতিরিক্ত জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে।

চতুর্থত, কোনো দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি বেশি থাকলে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত হওয়া সম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনার পর এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আমিনুর সাহেবের গ্রামের জনসংখ্যা বর্তমানে আশীর্বাদস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ২০

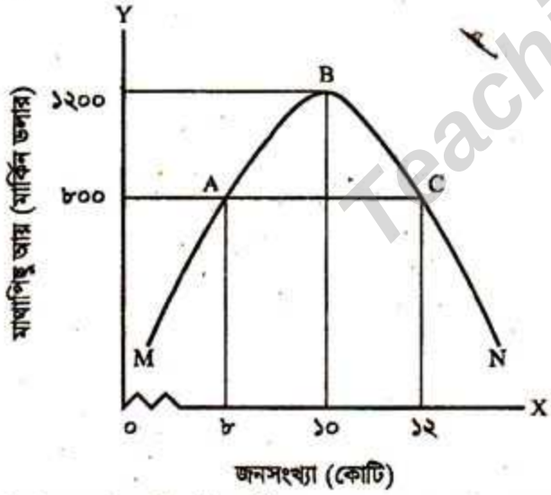

[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে? ১

খ. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' বিন্দুর অসামঞ্জস্যের পরিমাণ তুলনা কর এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি কোন বিন্দুর সাথে সজাতিপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বসবাস করে তাকে বোঝায়।

খ জনগণকে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায় আর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ একজন মানুষকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর দক্ষ করে গড়ে তোলে। একজন মানুষের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার গুণগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও প্রযুক্তির বিকল্প নেই।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে নির্দেশ করে। চিত্রের 'A' বিন্দুতে জনসংখ্যার অসমাঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে জনসংখ্যার পরিমাণ (X) এবং লম্ব অক্ষে মাথাপিছু আয় (Y) নির্দেশ করা হলো। চিত্রে 'A' বিন্দুতে মাথাপিছু আয় ৮০০ মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যার পরিমাণ ৮ কোটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেখানে কাম্য জনসংখ্যা ১০ কোটি। বিষয়টি অধ্যাপক ডাল্টনের সূত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

$$M = \frac{A - O}{O}; = \frac{৮ - ১০}{১০}; = \frac{-২}{১০}; = -০.২।$$

যেখানে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, A = প্রকৃত জনসংখ্যা, O = কাম্য জনসংখ্যা। M > O হলে জনসংখ্যার আধিক্য, M = O হলো কাম্য জনসংখ্যা আর M < O হলে জনসংখ্যা ঋণাত্মক। ফলে M <–.2 দ্বারা জনসংখ্যার ঋণাত্মক সম্পর্কে দেখায়। ফলে বোঝা যায় যে, দেশে জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ বেশি।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব। চিত্রে 'B' বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা ও 'C' বিন্দুতে জনসংখ্যার আধিক্য নির্দেশ করে। নিচে এদের তুলনা ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি কোন বিন্দুতে সামঞ্জস্য তা আলোচনা করা হলো :

উদ্দীপকের চিত্রে 'B' বিন্দুতে জনসংখ্যা ১০ কোটি এবং মাথাপিছু আয় ১২০০ মার্কিন ডলার। যা কাম্য জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে। অপরদিকে, 'C' বিন্দুতে জনসংখ্যার পরিমাণ ১২ কোটি আর মাথাপিছু আয় ৮০০ মার্কিন ডলার। যেখানে সম্পদের তুলনায় মাথাপিছু আয় কম।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অধিক। প্রায় ১৬ কোটির উপর জনসংখ্যা, যার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ সীমিত। তাই উদ্দীপকের চিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান 'C' বিন্দুতে অধিক যুক্তিযুক্ত। যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কম।

সুতরাং বলা যায়, যেহেতু 'C' বিন্দুতে জনসংখ্যা ও সম্পদের অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পেয়েছে তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উক্ত বিন্দুর সাথে সংগতিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২১ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে বিদ্যমান সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। এজন্য বিভিন্ন সমস্যা যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্বসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। তবে সাম্প্রতিককালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলছে। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কতটুকু কার্যকর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের প্রতি বর্গমাইলে গড়ে বসবাসকারী লোকসংখ্যাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়।

খ নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

নিজস্ব অথবা ঋণকরা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। যখন কোনো ব্যক্তি সেবাদানের বিনিময়ে বা ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ বা আয় উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে তখন একে আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলা হয়। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি নিজেকে কোনো না কোনো ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে।

গ সৃজনশীল ৯ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সরকার নারীদের প্রজনন হার হ্রাসের জন্য স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেরিতে সন্তান ধারণে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। অনগ্রসর পল্লি অঞ্চল ও হাওর এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা প্রায় ২.৭০ ভাগ। ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ১.৩৭ ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এরূপ হ্রাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যের প্রমাণ দেয়। এদেশে ১৯৭৪ সালে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ৪৮.৩ এবং মৃত্যুহার ১৯.৪। এ হার বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.৯ এবং ৫.২। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার পর বিগত শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৭.৩ শতাংশ হতে ২০১১ সালে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০১৬ সাল নাগাদ তা ৭৪ শতাংশে উন্নীত হবে। জনসংখ্যা কার্যক্রমের তৎপরতার ফলে এমনটি হয়েছে বলা যায়। আজকাল বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এমন পরিবার বিরল হয়ে উঠছে যারা দু'এর অধিক সন্তান গ্রহণ করেছে। এটি সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যের নিদর্শন।

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি না করা গেলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। উক্ত দেশে ১৯১০ সালে জনসংখ্যা ২ কোটি। ১৯৩৫ সালে এসে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪ কোটি। একই সময় ব্যবধানে জনসংখ্যার এ হার অব্যাহত থাকলেও দেশটিতে খাদ্য উৎপাদন সে হারে হয়নি। তাই দেশটিতে খাদ্য ঘাটতিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. 'তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে অর্থনীতিজ্ঞে আলোচ্য কোন তত্ত্বটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে বর্তমান বিভিন্ন প্রযুক্তির উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রযুক্তিতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করলে জনগণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। তাই বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারের বিকল্প নেই।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যথেষ্ট কার্যকর। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হলো।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে দেখানো হয় যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলেও জমির স্বল্পতা থাকায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। বর্তমানে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং খাদ্য উৎপাদনের হার মাত্র ০.৬৫%।

উদ্দীপকে আলোচিত ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে এর খুব মিল খুঁজে পাই। বাংলাদেশের কৃষিজমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর এবং উৎপাদিত খাদ্য জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে ও খাদ্য উৎপাদনের হার গাণিতিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ম্যালথাস বর্ণিত দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে একজন মানুষের ভরণপোষণের জন্য ১.২ থেকে ১.৮০ একর জমির প্রয়োজন। অথচ ১৯৭৫ সালে ছিল ০.২৮ যা বর্তমানে ০.২৫ একর।

উন্নয়নশীল বাংলাদেশে 'ক' দেশের মতো খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি। এজন্য এদেশে অধিক জনসংখ্যা ও খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। যা অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই বলা যায়, ম্যালথাসের তত্ত্ব মতে বাংলাদেশ একটি অধিক জনসংখ্যার দেশ।

প্রশ্ন ▶ ২৩ অর্থনীতির শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের মানবসম্পদের গুরুত্ব পড়াতে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অধিক হলেও বেশির ভাগই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, যা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। এ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার ইতোমধ্যেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. কাম্য জনসংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়সমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা, যেখানে উৎপাদন আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হবে। আর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিমাণ জনসংখ্যা কাম্য বলে বিবেচিত হয় বলে কাম্য জনসংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই।

কার্ম জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। এই বিশেষ জনসংখ্যাকেই কাম্য জনসংখ্যা বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকায় একেক দেশে একেক সংখ্যক জনসংখ্যা কাম্য বলে বিবেচিত। এ জন্য বলা হয়, কাম্য জনসংখ্যার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই।

গ উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতি মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলো সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। আর এ জন্য দরকার শিক্ষিত জাতি তৈরি করা। কারণ শিক্ষিত জাতি মানেই সমৃদ্ধ জাতি। তাই শিক্ষার হার বৃদ্ধিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি অধিক কর্মক্ষম ও দক্ষ হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমগ্র দেশে চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক হলেও শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে শ্রমের যোগান কম। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সেবার প্রসারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের আরো কিছু উপায় হলো নারীর ক্ষমতায়ন। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী, মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে মূল্যায়ন করা হলো।

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় নারী উন্নয়ন-২০১১ গৃহীত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এদেশের মানুষ আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে এক উদীয়মান মানবসম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা প্রায় ২.৭০ ভাগ। ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ১.৩৭ ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এরূপ হ্রাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যের প্রমাণ দেয়। আজকাল বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এমন পরিবার বিরল হয়ে উঠছে যারা দু'এর অধিক সন্তান গ্রহণ করেছে। এটি সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্যের নিদর্শন। তাই সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে এদেশে শিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বাংলাদেশ জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এ বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকাং জীবনধারণের বিভিন্ন মৌল উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ২০১৪ সালের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি। উক্তসময়ে বাংলাদেশের বহিরাগমন ২,৫০,০০০ জন এবং বহির্গমন ৫,৮০,০০০ জন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. শূন্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. কীভাবে স্থূল জন্মহার পরিমাপ করবে? ২

গ. দেশটির নিট অভিবাসন নির্ণয় করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাধিক্যের চাপে বাংলাদেশে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পরিমাণ সমান হলে তাকে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলে।

খ কোনো দেশে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাকে সে দেশের স্থূল জন্মহার বলে।

$$\therefore \text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে মোট জীবিত জনসংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

অর্থাৎ, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তালিকাভুক্ত জীবিত জনসংখ্যা ও ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে স্থূল জন্মহার পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী নিচে বাংলাদেশের নিট অভিবাসন নির্ণয় করা হলো।

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মোট আগমন ও মোট নির্গমনের পার্থক্যকে নিট অভিবাসন বলে। তাই কোনো দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থায়ীভাবে বহিরাগমন (I) ও বহির্গমন (E) এর পার্থক্য এবং মোট জনসংখ্যা (P) এর অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে নিট অভিবাসন হার পাওয়া যায়।

$$\therefore \text{নিট অভিবাসন হার} = \frac{I - E}{P} \times ১০০০$$

উদ্দীপক অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বহিরাগমন, I = ২৫০০০০ জন, বহির্গমন ৫৮০০০০ জন এবং মোট জনসংখ্যা, P = ১৬০০০০০০০ জন।

তাই, নিট অভিবাসন = (২৫০০০০ − ৫৮০০০০) বা − ৩৩০০০০ জন

$$\therefore \text{নিট অভিবাসন হার} = \frac{-৩৩০০০০}{১৬০০০০০০০} \times ১০০০$$

$$= -২.০৬২৫$$

$$= -২ \text{ (প্রায়)}$$

অর্থাৎ, দেশটির বহিরাগমন অপেক্ষা বহির্গমনের হার বেশি।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী জনাধিক্যের চাপে বাংলাদেশের সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাবে জনগণ দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার, অধিক জনসংখ্যার কারণে মাথাপিছু আয় নিম্ন হওয়ায় এদেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। তাই বাংলাদেশ বেকারত্ব, খাদ্য ঘাটতি, মূলধন গঠন হ্রাস ও পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আয়তনে ছোট হলেও বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত। এদেশে ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় প্রায় ১৬ কোটি লোক বসবাস করে। কিন্তু এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকায় অধকাংশ মানুষ জীবনধারণের বিভিন্ন মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আবার, বাংলাদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় জনগণের পক্ষে সঞ্চয় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এর ফলে মূলধন গঠন কম হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভাবে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন না হওয়ায় প্রচুর দ্রব্য আমদানি করতে হয়। এতে দেশটি বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই বলা যায়, জনাধিক্যের চাপে বাংলাদেশ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ নিম্ন মধ্যম আয়ের X দেশের আয়তন 1,47,570 বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় 16 কোটি 20 লক্ষ। একসময় নির্ভরশীল-শিশু ও বৃদ্ধ লোকসংখ্যার হার অধিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ হার মোট জনসংখ্যার 41 ভাগ। গত 25 বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু প্রায় ১ কোটি জনসংখ্যা দেশের বাহির হতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে। বর্তমানে যুব সমাজ সৃজনশীল উদ্ভাবনী কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রতিটি খাতে নতুন আবিষ্কার ও প্রয়োগের মাধ্যমে এ যুব সম্প্রদায় অনেক বেশি উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে X দেশের প্রবৃদ্ধি গত এক দশকে প্রায় সাত শতাংশের নিকটে ছিল। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্দীপকের X দেশের সাথে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে দারুণ মিল রয়েছে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. 'মানবসম্পদ উন্নয়ন' কী? ১

খ. বাংলাদেশে কী ধরনের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপক হতে X দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ. X দেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে দেশের জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে বোঝায়।

খ বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

একটি ছোট ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব হতে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পন্থায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই হলো পরিবার পরিকল্পনা। বর্তমানে সরকার নারীদের প্রজনন হার হ্রাসের জন্য স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেরিতে সন্তান ধারণে উদ্বুদ্ধ করা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

গ জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশের প্রতি বর্গমাইল বা বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে ওই দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ওই দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

X দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২০ লক্ষ অর্থাৎ ১৬,২০,০০,০০০ জন এবং আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। এ তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে-

জনসংখ্যার ঘনত্ব সূত্র, $DP = \frac{TP}{TA}$

সুতরাং X দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব $= \frac{16,20,00,000}{1,47,570}$

$= 1097.78$ জন

X দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে 1097 জন লোক বাস করে।

ঘ X দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আর এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন দেশটিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৯৭ জন যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। আবার, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বর্ধিত আবাসন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় দিন দিন বেকারত্ব বাড়ছে। বেশি জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমিতে কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে। এতে গ্রামাঞ্চলের পানি ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। এসব দিক বিবেচনা করে দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে অভিশাপস্বরূপ মনে হচ্ছে যা মূলত দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

তবে উদ্দীপকে দেখা যায় দেশটিতে বর্তমানে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার কমছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের যুব সম্প্রদায় অনেক বেশি উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করছে। ফলে বেকারত্বের হার কমে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় দেশটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হবে।

কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশটিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতিতে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ চার দশক পূর্বে রুম্মানের দেশের অধিকাংশ জনগণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করতে পারত না। এ ক্ষেত্রে তার দেশের সরকারের ক্রমাগত নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন- প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ, মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালুকরণ, প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ, গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা নির্মাণ, নদীতে সেতু, কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণসহ ভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে রুম্মানের দেশের জনগণের খুব কম অংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। *[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. নিট অভিবাসন একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে?- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানব উন্নয়নের সূচকগুলো চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে?—যথাযথ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাম্য জনসংখ্যা বলতে বোঝায় যে, একটি দেশের গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ করতে যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকা উচিত ওই দেশে সে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকা।

খ নিট অভিবাসন একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি দেশের নিট অভিবাসন সে দেশের বহিরাগমনের হার এবং বহির্গমনের হারের ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিক জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য হলো ঐ দেশের ওই বছরের নিট অভিবাসন। তাই যদি নিট অভিবাসন ধনাত্মক হয় অর্থাৎ, যদি বহিরাগমনের হার বহির্গমনের হার অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি বহিরাগমনের হার বহির্গমনের হার অপেক্ষা কম হয় তাহলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। সুতরাং , নিট অভিবাসন একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মানব উন্নয়নের সূচকগুলো চিহ্নিত করা হলো—

মানব উন্নয়ন সূচক হলো বিশ্বের সকল দেশের জীবনধারণের মান, শিক্ষা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির একটি তুলনামূলক সূচক। জাতিসংঘ নির্ধারিত একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রতিবছর পৃথিবীর কোনো দেশের মানবিক জীবনব্যবস্থা কতটা উন্নত তা নির্ধারণ করার জন্য এই মানব উন্নয়ন সূচক তৈরি করা হয়। মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণের নির্ধারকগুলো হলো— প্রত্যাশিত জীবনকাল, শিক্ষার্জন বা শিক্ষার হার এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জীবনযাত্রার মান।

উদ্দীপকে রুম্মানের দেশের সরকারের ক্রমাগত নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন সূচকে রুম্মানের দেশের অগ্রগতি নির্দেশিত হচ্ছে। যে সকল সরকারি পদক্ষেপের সাহায্যে রুম্মানের দেশের মানব উন্নয়ন সূচকগুলো চিহ্নিত করা যায় তা হচ্ছে—

১. **আয়ুষ্কাল বা প্রত্যাশিত জীবনকাল:** প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা চালুকরণ।

২. **শিক্ষার্জন বা শিক্ষার হার:** প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ, মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালুকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।

৩. **মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জীবনযাত্রার মান:** গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা নির্মাণ, নদীতে সেতু, কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণ।

ঘ মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপকের রুম্মানের দেশের সরকারের পদক্ষেপগুলো নানামুখী ভূমিকা পালন করেছে। নিচে এ বিষয়টি যথাযথ যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করা হলো—

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ একান্ত প্রয়োজন। মূলত একটি দেশের মানবসম্পদ বলতে সে দেশের জনশক্তিকে বোঝায়। আর কোনো দেশের জনশক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলা হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যপটটিতে দেখা যাচ্ছে, রুম্মানের দেশের জনগণ পূর্বে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই মৌলিক সুবিধাগুলো হতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তার দেশের সরকারের ধাপে ধাপে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ সে দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। মূলত রুম্মানের দেশের সরকারের এসব পদক্ষেপ মানব সম্পদের প্রভূত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করেছে। উদ্দীপকের দেশটির সরকার প্রথমেই দেশের মানুষের শিক্ষার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। এর ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেছে। এর ফলে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে মানব সম্পদ উন্নয়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সরকার প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সুস্থ-সবল মানবসম্পদ গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশিত জীবনকাল বা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পাকা রাস্তা নির্মাণ, নদীতে সেতু, কালভার্ট, ব্রিজ প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দেশের জাতীয় উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশের

Teachingbd24.com

মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মানব উন্নয়নের ক্রমোন্নতি নির্দেশ করছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের ফলে দেশের বেকার যুবকেরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকের রুম্মানের দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। যার ফলে বর্তমানে রুম্মানের দেশের জনগণের খুব কম অংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'Y' দেশের জনসংখ্যা কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৪ সালের মোট জীবিত জনসংখ্যা	২০১৪ সালের মোট মৃত সংখ্যা
১৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২০,০০,০০০

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৪]

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রতি হাজার স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি 'Y' দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার হয় তবে দেশটির ঘনত্ব কত। এবং ঘনত্বের বিবেচনায় দেশটির জনসংখ্যা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তোমার মতামত বিশ্লেষণ। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ নিজেকে সম্পদে পরিণত করার বিভিন্ন কৌশল ও সৃজনী ক্ষমতা অর্জন করে। মানুষ নিজেকে এবং রাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

গ সৃজনশীল ১৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ইমু যে দেশে বাস করে সেটি একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের তালিকা নিম্নরূপ:

বছর	১৯০০	১৯২৫	১৯৫০	২০২৫
জনসংখ্যা	১	২	৪	৩২
খাদ্য উৎপাদন	১	২	৩	৬

ইমুর বিদেশি বন্ধু ফিলিজের দেশে জনসংখ্যার অনুপাত, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. কীভাবে মানবসম্পদ তৈরি করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইমুর দেশের সাথে অর্থনীতিতে আলোচ্য কোন তত্ত্বটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইমুর দেশের সাথে ফিলিজের দেশের মধ্যে কোনটিতে কাম্য জনসংখ্যা রয়েছে তা যুক্তি সহকারে আলোচনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশ বা এলাকায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে, তাকে ওই দেশ বা এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

খ জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তুগত সম্পদের পাশাপাশি মানবসম্পদ একান্ত প্রয়োজন। আর মানবসম্পদ তৈরি করা যায় মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে। মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কোনো দেশের জনশক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবগোষ্ঠী গড়ে তোলাকে বোঝায়। কাজেই, মানুষের অন্তর্নিহিত কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করার মাধ্যমে মানবসম্পদ তৈরি করা যায়।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ২০১৬ সালের শুরুতে A দেশের জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। ঐ বছর ঐ দেশে ১০০০ জন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ৫০০ জন মানুষ মারা যায়। এ বছর A দেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ৩০০ জন মানুষ চলে যায় এবং A দেশে বসবাসের জন্য ১০০ জন মানুষ আগমন করে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▌ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে A দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A দেশের মানুষ অতিমাত্রায় অন্য দেশে চলে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ বর্ণনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যতজন লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

খ জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ অধিক জনগণের জন্য অধিক খাদ্যের প্রয়োজন। একটি দেশে খাদ্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। তাই অতিরিক্ত জনগণের জন্য খাদ্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু বিশ্ববাজারে খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দাম অনেক বেশি। ফলে স্বল্প আয়ের দেশের চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা খাদ্য সমস্যা তৈরি করে।

গ জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের সাথে দেশান্তরের শতকরা হার বিয়োগ করে যে হার পাওয়া যায়, তা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। নিচে A দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হলো—

A দেশের জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। ঐ বছর ঐ দেশের জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে ১০০০ জন এবং মানুষ মারা যায় ৫০০ জন। আবার দেশ থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ৩০০ জন মানুষ চলে যায় এবং ১০০ জন মানুষ এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আগমন করে। এ অবস্থায় দেশটির জন্মহার ও বহির্গমন হারের সমষ্টি থেকে মৃত্যু হার ও বহির্গমন হারের সমষ্টি বিয়োগ করে ঐ বিয়োগ ফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করে এবং ১০০ দিয়ে গুণ করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিরূপণ করা যাবে।

∴ A দেশের জন্মহার =

$$\frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মগ্রহণকারী জীবিত শিশুর মোট সংখ্যা}}{\text{বিবেচ্য বছরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

$$= \frac{১০০০}{৫০,০০০} \times ১০০০$$

= ২০ জন।

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে মৃত মানুষের মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

$$= \frac{৫০০}{৫০,০০০} \times ১০০০ = ১০ \text{ জন।}$$

$$\therefore \text{বহিরাগমনের হার} = \frac{\text{অন্য দেশে চলে যাওয়া জনসংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

$$= \frac{৩০০}{৫০,০০০} \times ১০০ = ০.২ \text{ জন}$$

$$\therefore \text{বহির্গমনের হার} = \frac{\text{অন্য দেশ থেকে আসা জনসংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০$$

$$= \frac{১০.৪}{৫০০০০} \times ১০০$$

= ০.২ জন

https://teachingbd24.com

∴ A দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার =

$$\frac{(\text{জন্ম হার} + \text{বহিরাগমনের হার}) - (\text{মৃত্যুহার} + \text{বহির্গমনের হার})}{১০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{(২০ + ০.৬) - (১০ + ০.২)}{১০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{২০.৬ - ১০.২}{১০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{১০.৪}{১০০০} \times ১০০$$

= ১.০৪ জন

∴ A দেশটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.০৪ জন।

ঘ উদ্দীপকে A দেশের মানুষ অতিমাত্রায় অন্য দেশে চলে গেছে। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে উন্নত ও নিরাপদ জীবন লাভ, কর্ম প্রাপ্তির সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি।

নিরাপদ ও উন্নত জীবন লাভের সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ হতে অন্য দেশে। এটি মূলত এক বা একাধিক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের গতিশীল প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যেমন- যেসব দেশে জনগণের উন্নত জীবন প্রত্যাশা প্রবল এবং সে ধরনের সকল সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকে সেসব দেশে মানুষের স্থানান্তর দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। সাধারণত শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থা, বৈষম্যমূলক আচরণ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রভৃতি কারণেই একটি দেশের মানুষ অন্য দেশে চলে যেতে পারে। উদ্দীপকে দেখা যায়, A দেশ থেকে ৩০০ মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অন্য দেশে চলে গেছে। সম্ভাব্য এসব কারণেই এমনটি ঘটেছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, A দেশের সুযোগ সুবিধা থেকে অন্যান্য দেশে সুযোগ সুবিধা বেশি থাকায় দেশটি থেকে অতিমাত্রায় মানুষ অন্য দেশে চলে গেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩০

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১০	২০	৪০	৮০	১৬০
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১০	২০	৩০	৪০	৫০

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. অভিবাসন কাকে বলে? ১

খ. "সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যাই কাম্য জনসংখ্যা" কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি রেখাচিত্রে অঙ্কন কর। ৩

ঘ. জনসংখ্যা সবসময় জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বাড়ে না– ব্যাখ্যা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে একস্থান বা একদেশ থেকে অন্যস্থান বা অন্য দেশে গমনকে নির্দেশ করে।

খ যে জনসংখ্যা একটি দেশের সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় ও উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা কাম্য জনসংখ্যা।

কাম্য জনসংখ্যা বলতে জনসংখ্যার এমন একটি স্তরকে বোঝায় যেখানে উৎপাদন ও আয় সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে। যদি কোনো দেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হয় তবে তাকে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ বলে। আবার যদি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের ব্যবহার বৃদ্ধি না পেয়ে জনসংখ্যা বেড়ে যায় তবে তাকে অধিক জনসংখ্যার দেশ বলা হয়। এসবের প্রেক্ষিতে সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সৃষ্টি মূলত ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে নির্দেশ করে। নিচে চিত্রের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

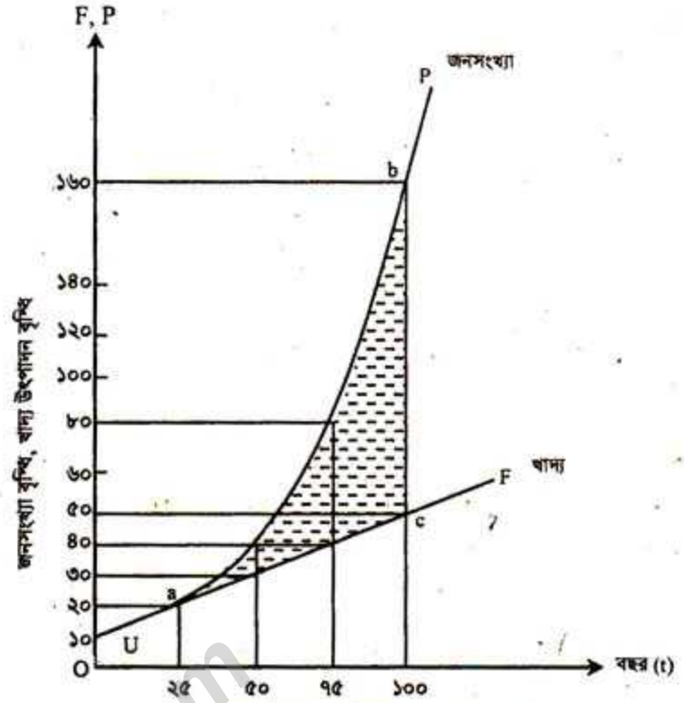

চিত্র : খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক

চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রতি ২৫ বছর সময়কে একক হিসাবে ধরা হয়েছে এবং লম্ব অক্ষে খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, প্রথম ২৫ বছর পর্যন্ত জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বাড়ে একইভাবে। চিত্রের তত্ত্বানুসারে দেখা যায়, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে তথা ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ ..... । খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রাপ্ত বিন্দুসমূহ যোগ করে পাওয়া যায় UF খাদ্য রেখা। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে যথা: ১০, ২০, ৪০, ৮০, ১৬০ ..... । সূচি থেকে প্রাপ্ত প্রতি একক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাপ দ্বারা পাওয়া যায় UP জনসংখ্যা রেখা। চিত্র থেকে আরো লক্ষ করা যায়, ২৫ বছর সময়ের পর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক হয়। ১০০ বছরের সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় abc পরিমাণ।

ঘ উদ্দীপকে সূচিটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে নির্দেশ করে। এ তত্ত্বে ম্যালথাস যেভাবে জনসংখ্যার সমস্যা চিহ্নিত করেছেন তা সবসময় প্রতিফলিত হয় না।

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের ভোগ-বিলাস, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়। বর্তমানে অনেক উন্নত দেশেই লোকসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে ম্যালথাস ব্যক্ত করেন যে, খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। বাস্তবে জৈব, রাসায়নিক সার ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, উন্নত প্রথায় চাষ, উন্নত বীজ, সেচ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি দ্বারা একই জমিতে খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হার ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সারণিতে কেবল খাদ্যের মাপকাঠিতে জনসংখ্যাকে বিচার করা হয়েছে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যার ধারণা অনুযায়ী, দেশের যাবতীয় সম্পদের ভিত্তিতে জনসংখ্যা সমস্যা বিবেচনা করা হলে অধিক সম্পদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। তাছাড়া অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে যদি দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা যায় তবে দেশের খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করা যায়।

তাই বলা যায়, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে— এ ধারণা সবসময় সত্য নয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩১ 'খ এর ছেলে গ' দুই বছর পূর্বে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করে গ্রামে এসে মৎস্য খামারের কাজ শুরু করেন। 'খ' বিষয়টি একদম মেনে নিতে পারেনি। সে চেয়েছে তার ছেলে বড় চাকরি করবে। কিন্তু তার ছেলে ঠিক উল্টো। ছেলেটি চান, নিজের উদ্যোগে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে। এ নিয়ে প্রায়শ পিতা-পুত্রের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। *[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. জন্মহার কী? ১

খ. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ছেলেটি কোন ধরনের কর্মসংস্থান বেছে নিয়েছে তার পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'খ' এর ছেলে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে সংখ্যক জীবন্ত শিশু-জন্মগ্রহণ করে তাকে সে দেশের জন্মহার বলে।

খ কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোনো দেশের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে; কেবল দীর্ঘকালীন প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক নয় বরং স্বল্পকালীন প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। অর্থাৎ এ অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য বা ঋণাত্মক হয়।

গ উদ্দীপকে ছেলেটির গৃহীত পদক্ষেপ মৎস্য চাষ তার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়ক হয়েছে। নিচে এ বিষয়ে কিছু যুক্তি প্রদান করা হলো।

দেশে বিদ্যমান ব্যাপক বেকার সমস্যা লাঘবে আত্মকর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। যা 'খ' এর ছেলে 'গ' এমএসসি পাস করেও করেছে। মানুষ বেকার থাকলে শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটে। এ অবস্থায় আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাকে কাজে নিয়োজিত রাখলে শ্রম ও সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। নিজে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাতে তার সাথে সম্পৃক্ত করে অন্যদেরও কাজে নিয়োগ করা যায়। এভাবে একজন স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাতে অন্যদেরও কর্মসংস্থান হয়। ফলে বেকারত্ব কমে। বেকারত্ব নানারকম সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। সেক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে সমাজকে সেসব সমস্যা থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

এভাবে দেখা যায়, 'খ' এর ছেলে 'গ' এমএসসি পাস করেও মৎস্য চাষের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ছেলেটির গৃহীত পদক্ষেপ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও কার্যকর।

ঘ উদ্দীপকে 'খ' এর ছেলে 'গ' আত্মকর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার গৃহীত এই আত্মকর্মসংস্থানের সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ—

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। নিজের হাতে নিজের কাজ করে মানুষ অনেক বড় হতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে বছর, মাস, দিন, এমনকি এক ঘণ্টাও বেকার থাকতে হয় না। উদ্যোগ গ্রহণ করে শুরু করে দিলেই কর্ম ও মুনাফার চাকা ঘুরতে থাকে। তাই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কর্মেরই শুধু সংস্থান হয় না বরং অপরেরও কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। এতে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

যারা কোনো কর্ম করে না তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটানোর জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় কিন্তু আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কর্মের ব্যবস্থা হয়। তাই এরূপ নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। নিজেকে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে। কর্মহীনতা থেকে আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং আর্থিক সমস্যা থেকে মানুষের নীতি-নৈতিকতা লোপ পায়। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তিসহ বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাজ থেকে বিদায় নেয়। ফলে সমাজে শান্তি ফিরে আসে।

সুতরাং বলা যায়, এসব কারণে 'খ' এর ছেলে 'গ' যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রশ্ন ▶৩২ বাংলাদেশে সম্পদের তুলনায় অনেক বেশি লোক বাস করে। এ জন্য এখানে জনাধিক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যা তথা খাদ্য ঘাটতি, ব্যাপক বেকারত্ব, ঘন ঘন প্রকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। তবে সাম্প্রতিককালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলছে। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি, মহামারি ইত্যাদি বিপর্যয়কর অবস্থাকে ম্যালথাস কী বলে অভিহিত করেছেন? ১

খ. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ হয় কীভাবে? ২

গ. বাংলাদেশে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কতটুকু কার্যকর তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি, মহামারি ইত্যাদি বিপর্যয়কর অবস্থাকে ম্যালথাস প্রাকৃতিক নিরোধ বলে অভিহিত করেছেন।

খ ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে দুইটি উপায়ের কথা বলেছেন। যেমন- ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive check) ও খ. প্রাকৃতিক নিরোধ (Positive check)।

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : বিলম্বে বিবাহ, যৌন সংযম, জন্মনিয়ন্ত্রণ, কৌমার্য অবলম্বন ইত্যাদি পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলা হয়। ম্যালথাস বলেছেন, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকলে দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দেবে।

খ. প্রাকৃতিক নিরোধ : মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণসংহারকে প্রাকৃতিক নিরোধ বলা হয়। এসব সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে ম্যালথাস দেশের জনগণকে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

গ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যথেষ্ট কার্যকর।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে দেখানো হয় যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেলেও জমির স্বল্পতা থাকায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। বর্তমানে এ-দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং খাদ্য উৎপাদনের হার মাত্র ০.৬৫%।

উদ্দীপকে আলোচিত ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে এর খুব মিল খুঁজে পাই। বাংলাদেশের কৃষি জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর এবং উৎপাদিত খাদ্য জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে ও খাদ্য উৎপাদনের হার গাণিতিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ম্যালথাস বর্ণিত দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে একজন মানুষের ভরণপোষণের জন্য ১.২ থেকে ১.৮০ একর জমির প্রয়োজন। অথচ ১৯৭৫ সালে ছিল ০.২৮ যা বর্তমানে ০.২৫ একর।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যথেষ্ট কার্যকর। এই তত্ত্বে জনসংখ্যা সমস্যার সব লক্ষণই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। ফলে অধিক জনসংখ্যা ও খাদ্য ঘাটতি দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

সরকার নারীদের প্রজনন হার হ্রাসের জন্য স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেরিতে সন্তান ধারণে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। অনগ্রসর পল্লি অঞ্চল ও হাওর এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা প্রায় ২.৭০ ভাগ। ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ১.৩৭ ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এরূপ হ্রাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যের প্রমাণ দেয়। এদেশে ১৯৭৪ সালে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ৪৮.৩ এবং মৃত্যুহার ১৯.৪। এ হার বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.৯ এবং ৫.২। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার পর বিগত শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৭.৩ শতাংশ হতে ২০১১ সালে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০২১ সাল নাগাদ তা ৮০ শতাংশে উন্নীত হবে। জনসংখ্যা কার্যক্রমের তৎপরতার ফলে এমনটি হয়েছে বলা যায়। আজকাল বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এমন পরিবার বিরল হয়ে উঠছে যারা দু'এর অধিক সন্তান গ্রহণ করেছে। এটি সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যের নিদর্শন।

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি না করা গেলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মুলিয়া পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষের একমাত্র ছেলে দুই বছর পূর্বে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করে গ্রামে এসে মৎস্য খামারের কাজ শুরু করে। অধ্যক্ষ সাহেব বিষয়টি একদম মেনে নিতে পারেননি। তিনি চান তার ছেলে বড় চাকরি করুক। অথচ ছেলেটি চায় নিজের উদ্যোগে স্বাবলম্বী হতে। এ নিয়ে প্রায়শই পিতা-পুত্রের মনমালিন্য হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আত্মকর্মস্থান কী? ১

খ. মৃত্যুহার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছেলেটির কর্মসংস্থান বেছে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অধ্যক্ষ সাহেবের ছেলে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ কোনো দেশে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে তাকে সে দেশের মৃত্যুহার বলে। এর হার বের করতে হলে, কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যে সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফলকে ১০০০ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

গ অধ্যক্ষ সাহেবের একমাত্র ছেলের গৃহীত পদক্ষেপ মৎস্য চাষ তার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়ক হয়েছে। নিচে এ বিষয়ে কিছু যুক্তি প্রদান করা হলো।

প্রথমত, দেশে বিদ্যমান ব্যাপক বেকার সমস্যা লাঘবে আত্মকর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। যা অধ্যক্ষ সাহেবের একমাত্র ছেলে এমএসসি পাস করেও করেছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ বেকার থাকলে শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটে। এ অবস্থায় আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাকে কাজে নিয়োজিত রাখলে শ্রম ও সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

তৃতীয়ত, নিজে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাতে তার সাথে সম্পৃক্ত করে অন্যদেরও কাজে নিয়োগ করা যায়। এভাবে একজন স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাতে অন্যদেরও কর্মসংস্থান হয়। ফলে বেকারত্ব কমে।

চতুর্থত, বেকারত্ব নানারকম সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। সেক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে সমাজকে সেসব সমস্যা থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

এভাবে দেখা যায়, অধ্যক্ষ সাহেবের একমাত্র ছেলে এমএসসি পাস করেও মৎস্য চাষের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই অধ্যক্ষ সাহেবের ছেলের গৃহীত পদক্ষেপ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও কার্যকর।

ঘ উদ্দীপকে অধ্যক্ষ সাহেবের ছেলে মুলিয়া আত্মকর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তার এ আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ–

১. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। নিজের হাতে নিজের কাজ করে মানুষ অনেক বড় হতে পারে।

২. আত্মকর্মসংস্থান বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে বছর, মাস, দিন, এমনকি এক ঘণ্টাও বেকার থাকতে হয় না। উদ্যোগ গ্রহণ করে শুরু করে দিলেই কর্ম ও মুনাফার চাকা ঘুরতে থাকে। তাই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কর্মেরই শুধু সংস্থান হয় না বরং অপরেরও কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। এতে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৪. যারা কোনো কর্ম করে না তারা তাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মিটানোর জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কর্মের ব্যবস্থা হয়। তাই নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

৫. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ সহজেই কর্মে নিয়োজিত হতে পারে এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা আসে। নিজেকে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে।

৬. কর্মহীনতা থেকে আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং আর্থিক সমস্যা থেকে মানুষের নীতি-নৈতিকতা লোপ পায়। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে এসব সমস্যাগুলো সমাজ থেকে বিদায় নেয়। ফলে সমাজে শান্তি ফিরে আসে।

সুতরাং বলা যায়, এসব কারণে অধ্যক্ষ সাহেবের একমাত্র ছেলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

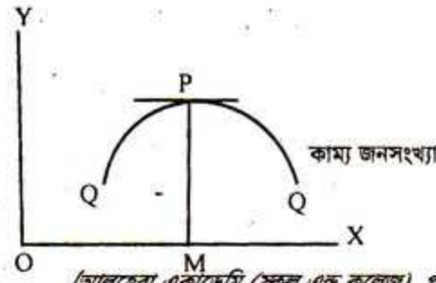

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ১

খ. কীভাবে স্থূল জন্মহার পরিমাপ করবে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা অতিরিক্ত কি না যাচাই কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মক্ষম জনশক্তি বা শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

খ সৃজনশীল ২৪নং এর 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র জনসংখ্যার কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী, জনসংখ্যার যে স্তরে দেশে বিদ্যমান সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়

Teachingbd24.com

তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। যে জনসংখ্যায় কাম্য স্তরের চেয়ে মাথাপিছু আয় কম হয়, তাকে নিম্ন জনসংখ্যা বা অধিক জনসংখ্যা বলা হয়।
উদ্দীপকের চিত্রটিতে OX অক্ষে জনসংখ্যা এবং OY অক্ষে মাথাপিছু আয় পরিমাপ করা হয়েছে। QQ জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত মাথাপিছু আয় রেখা। OM জনসংখ্যা স্তরে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ MP পরিমাণ। MP এর চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণ জনসংখ্যায় মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ নয়। তাই OM হলো কাম্য জনসংখ্যা স্তর। চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চিত্রটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথেই সংগতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে প্রদত্ত কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বানুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত।
কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী, দেশের প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য যে জনসংখ্যা প্রয়োজন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জনাধিক্য ঘটেনি বলে মনে করতে হবে।
বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় খুব কম হলেও তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যেখানে সত্তরের দশকের দিকে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ২২০ মার্কিন ডলার, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বি.বি.এস. রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী, এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১৬০২ মার্কিন ডলার। যদিও বর্তমানে দেশের জনগণের প্রকট বেকারত্ব, জীবনযাত্রার নিম্নমান, পুষ্টিহীনতা, রোগ-ব্যাধি বিদ্যমান, এমনকি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা এরূপ মৌলিক চাহিদারও অভাব রয়েছে।
উপরের আলোচিত বিষয়গুলোর কারণে অনেক অর্থনীতিবিদ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ বলে বিবেচনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ $M = \frac{A - O}{O}$

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশে আদমশুমারি সাধারণত কত বছর পর পর হয়? ১
খ. প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি যে তত্ত্বকে নির্দেশ করে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে আদমশুমারি সাধারণত দশ বছর পর পর হয়।

খ শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত দেশের জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।

গ উদ্দীপকে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে নির্দেশ করে। নিচে কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—
একটি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনসংখ্যার যে আয়তন দ্বারা সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জিত হয়, জনসংখ্যার সেই আয়তনকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য জনসংখ্যা স্তরে দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। অধ্যাপক ডাল্টন কাম্য জনসংখ্যা একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। $M = \frac{A - O}{O}$ এখানে, M = কাম্য জনসংখ্যা থেকে বিচ্যুতি, A = প্রকৃত জনসংখ্যা এবং O = কাম্য জনসংখ্যা। M এর ধনাত্মক মান অধিক জনসংখ্যা, ঋণাত্মক মান কম জনসংখ্যা এবং শূন্য মান কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে।
চিত্রে ভূমি অক্ষে জনসংখ্যা ও লম্ব অক্ষে মাথাপিছু আয় দেখানো হয়েছে। PP মাথাপিছু আয় রেখা। চিত্রে OA, OC জনসংখ্যা স্তরে মাথাপিছু আয় কম। OA জনসংখ্যা দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা থেকে কম জনসংখ্যা এবং OC জনসংখ্যা দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা থেকে অধিক জনসংখ্যা নির্দেশিত হয়। OB জনসংখ্যা স্তরে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ। ফলে এটি কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে।

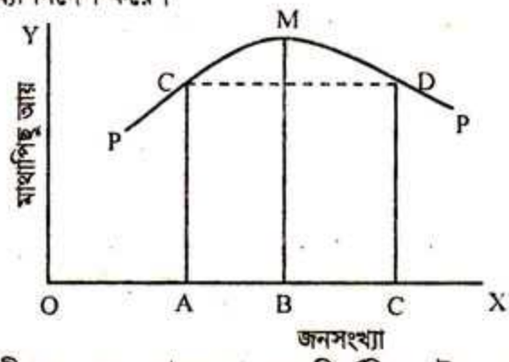

ঘ উদ্দীপকে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নির্দেশিত। উক্ত তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হলো—
সম্পদের দক্ষ ব্যবহারে যে জনসংখ্যায় সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন নিশ্চিত হয় সে জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। সামাজিক সম্পদের বিবেচনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি হলেও এখানে জনাধিক্য সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশে জন্মহার যেমন বেশি মৃত্যুহারও তেমনি বেশি। ফলে জনসংখ্যা খুব বেশি হারে বাড়ে না। আবার বাংল্যাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৩ সালে এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ৯২৩ মার্কিন ডলার, বর্তমানে যা ১৭৫১ মার্কিন ডলার।
বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক চাষাবাদের ফলে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও এদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পানি ও সামুদ্রিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করতে পারলে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। তবে এদেশে অধিক জনসংখ্যা বিদ্যমান থাকায় অধিকাংশ মানুষ নিম্ন মানের জীবনযাপন করে।
কাম্য জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে যতই যুক্তি থাকুক না কেন বাংলাদেশে ম্যালথাসের তত্ত্ব অধিক প্রযোজ্য। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদি এদেশের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই জনসংখ্যার বাস্তবতায় বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ হিসেবে গণ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ হাফিজুর রহমান একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি 'ক' জেলায় বসবাস করেন। তিনি তার এক বন্ধুকে জানান তার জেলার আয়তন ১২৩৬ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে তার মতে, আগামী ১০ বছর পর জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
খ. জনসংখ্যা বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে —ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ১০ বছর পর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে 'ক' জেলায় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে? এ ব্যাপারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।

খ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শ্রমের যোগানের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রমের যোগান দেয় শ্রমিক। শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পায়। আর শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা হ্রাস পেলে শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পায়। জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগানের মধ্যকার এ সমমুখী সম্পর্কের কারণে বলা হয়, জনসংখ্যা বাড়লে শ্রমের যোগানও বাড়ে।

গ উদ্দীপকের আলোকে 'ক' জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তা জনসংখ্যা ঘনত্ব সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়। একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকজন প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কতটা নিবিড়ভাবে বসবাস করে তা জানার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব ধারণার উদ্ভব। কোনো দেশের বিদ্যমান মোট জনসংখ্যাকে সে দেশের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা তথা জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়—

Teachingbd24.com

DP $\frac{TP}{TA}$; এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব, TP = মোট জনসংখ্যা

TA = মোট দেশের আয়তন। উদ্দীপকে 'ক'-এর জেলার মোট জনসংখ্যা ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার, আয়তন ১২৩৬ বর্গকিলোমিটার হওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে—

$$DP = \frac{১২,৬৫,০০০}{১২৩৬} = ১০২৩ \text{ (প্রতি বর্গ. মি. মি)}$$

দেশের মোট আয়তন স্থির থাকে বলে লোকসংখ্যা বাড়া বা কমার ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে বাড়ে বা কমে। এভাবে উপরিউক্ত সূত্র ব্যবহার করে 'ক' জেলার জনসংখ্যা বের করা সম্ভব।

ঘ ১০ বছর পর 'ক' জেলার প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং জেলাটির খাদ্য, শিক্ষা বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

১০ বছর পর উক্ত জেলার প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে—

$$DP = \frac{TP}{TA} = \frac{১৮,৫৮,০০০}{১২৩৬} = ১৫০৩ \text{ জন}$$

নিচে জনসংখ্যাজনিত চাপের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো—

জীবনধারণের জন্য খাদ্য অত্যাবশ্যক। তাই জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের যোগান বাড়ানো উচিত। যখন জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে না তখন জনসাধারণের মধ্যে তথা দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। মানুষ তখন অনাহারে, অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ভুগবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো উন্নত বা দক্ষ জনসম্পদ। তবে এই দক্ষ জনসম্পদ তৈরি অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে অধিক জনসংখ্যার জন্য। অধিক জনসংখ্যার ফলে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অভাবে জনসাধারণ তথা যুবক সমাজ অদক্ষ হয়ে পড়বে। সীমিত সম্পদের সাহায্যে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এক দুরূহ ব্যাপারে।

বাসস্থান মানুষকে আশ্রয় দেয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসিক চাহিদা বিশেষ করে শহরাঞ্চল বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতি বছর নতুন বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাবে। বাসস্থানের অভাবে বিপুলসংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ রেললাইন, রাস্তা ও ড্রেনের পাশে যত্রতত্র কুঁড়েঘর তুলে মানবেতর জীবনযাপন করবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকট বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সীমিত কৃষি জমির ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। ফলে একদিকে যেমন- কৃষিজাতগুলো খণ্ডিত হবে। অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 'ক' জেলায় খাদ্য, শিক্ষা বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶৩৭ শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে ক্লাসে বলেন দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার হার বাড়ানো, প্রশিক্ষণ কর্যক্রম পরিচালনা করা, খাদ্য ও পুষ্টিহীনতা দূর করা। এ বিষয়ে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রে এগিয়ে আসা দরকার। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম যথেষ্ট কিনা? মতামত দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। নিজস্ব অথবা ঋণকরা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

যখন কোনো ব্যক্তি সেবাদানের বিনিময়ে বা ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ বা আয় উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে তখন একে আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলা হয়। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি নিজেকে কোনো না কোনো ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো হলো– শিক্ষার হার বাড়ানো, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, খাদ্য ও পুষ্টিহীনতা দূর করা।

শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের মূখ্য উপকরণ। সর্বজনীন ও গনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকার তাই শিক্ষার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাত্যতামূলক করেছে এবং অন্যান্য শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সরকার শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জনগণের কর্মদক্ষতা তাদের জীবনমানের উপর নির্ভর করে। সুষম খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক উপাদানগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করে জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সরকার চেষ্ট করছে। এজন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উদ্দীপকে মানবসম্পদ উন্নয়নের এই সকল কার্যক্রমই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় হিসেবে শুধুমাত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হলে মানব সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, খাদ্য ও পুষ্টিহীনতা দূর করার সাথে সাথে আরও অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যনীতির অধীনে সরকারকে প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসাসেবা নিশ্চতকরণ ও চিকিৎসাসেবা আধুনিকায়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে নানামুখী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে প্রজনন ও মৃত্যুহার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক ও মাতৃ-মৃত্যুর হার যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া পল্লী অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানবসম্পদ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি দেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে এই কথা বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকের উল্লিখিত উপায়গুলোর সাথে উপরিউক্ত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶৩৮ শাহেদ আলী একজন শিক্ষিত যুবক। লেখাপড়া শেষে সে কিছুদিন চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। চাকরি না পেয়ে সে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়ে। তারপর একদিন গ্রামে এসে সে নিজ উদ্যোগে ছোট-খাটো ব্যবসা শুরু করে। সে প্রথমে গ্রামের পুকুরে মাছের চাষ শুরু করে। এরপর তার পৈত্রিক জমিতে বিভিন্ন ফল ও ফুলের চাষ আরম্ভ করে। শাহেদ আলী এখন পুরোপুরি স্বাবলম্বী। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. বেকারত্ব দূরীকরণে আত্মকর্মসংস্থানের ভূমিকা কী? ২

গ. শাহেদ আলী কীভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাহেদ আলীর নেওয়া সিদ্ধান্ত দেশের যুব সমাজের জন্য কী বার্তা বহন করে? আলোচনা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

https://teachingbd24.com

খ বেকারত্ব দূরীকরণে আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আত্মকর্মসংস্থান ব্যক্তিকে নিজ উদ্যোগে কাজের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট করে। এটি বেকারত্ব দূর করার অন্যতম প্রধান উপায়। নিজের সামান্য মূলধন বা অন্যের কাছ থেকে যৎসামান্য ঋণ নিয়ে সহজেই এ কাজ শুরু করা যায়। এটি ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। আত্মকর্মস্থান ব্যবস্থা করেছে এমন ব্যক্তি পরবর্তীতে অন্য বেকারদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

গ উদ্দীপকের শাহেদ আলী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। যেমন– হাঁস-মুরগী, কবুতার পালন, মৎস্য চাষ, ফলের বাগান, পশুপালন, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনা, একক বা যৌথ খামার ইত্যাদি হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের উদাহরণ। এটি এমন এক ধরনের কর্মসংস্থান যা স্বল্প মূলধন ও সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে পরনির্ভরশীলতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়।

উদ্দীপকের শাহেদ আলী একজন শিক্ষিত যুবক। সে তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করে আর সবার মতোই চাকরির সন্ধানে লিপ্ত হয়। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত চাকরির ব্যবস্থা না থাকায় সে অনেকদিন চেষ্টা করেও কোনো চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। তারপর একদিন গ্রামে এসে নিজ উদ্যোগে ছোট করে ব্যবসা শুরু করে। শুরুতে সে মৎস্য চাষের সিদ্ধান্ত নেয় এবং গ্রামের পুকুরে স্বল্প পরিসরে মাছ চাষ শুরু করে। পরবর্তীতে মাছ চাষ করে কিছুটা লাভের মুখ দেখার পর সে তার পৈতৃক জমিতে বিভিন্ন ফল ও ফুলের চাষ শুরু করে। বর্তমানে সে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে; যা শাহেদ আলীর আত্মকর্মসংস্থানের ধারণাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত শাহেদ আলীর নেয়া আত্মকর্মসংস্থানের সিদ্ধান্তটি দেশের যুবসমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে।

বাংলাদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশি; কিন্তু সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ অবস্থায় আত্মকর্মসংস্থান অর্থোপার্জনের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ নিজের বুদ্ধি ও শক্তি কাজে লাগিয়ে বেকারত্বের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারে এবং উৎপাদন ও আয় বাড়াতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের হতাশা দূর হয় এবং পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের শাহেদ আলী লেখাপড়া শেষ করে চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নিজেই ছোটখাটো কিছু ব্যবসা দিয়ে শুরু করে বর্তমানে নিজেকে একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার এ কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে তিনি বেকার ও হতাশ যুবকদের জন্য কিছু অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শাহেদ আলীর আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা থেকে দেশের যুবসমাজ যে বার্তা পেতে পারে তা হলো– প্রথমত, যেকোনো সময় ইতিবাচক মনোভাব দাও। দ্বিতীয়ত, অন্য কারো নয়, নিজের ভালো লাগার কাজটি করো। তৃতীয়ত, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দিনের কাজ দিনে শেষ করো এবং কাজের প্রতি শতভাগ মনোযোগ দাও। চতুর্থত, জীবনে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করো এবং বিশ্বাস করো যে, তুমি ও ব্যতিক্রমী কিছু করতে সক্ষম। পঞ্চমত, কখনো তাড়াহুড়া করো না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার চেষ্টা করো, কারণ এটাই হয়ে উঠবে তোমার জন্য সাফল্যের গল্প। ষষ্ঠত, মানুষকে সব সময় বিশ্বাস করো। তুমি যা-ই অর্জন করতে চাও, তোমার চারপাশে এমন কেউ না কেউ আছেন, যিনি তোমাকে সেটা অর্জনে সাহায্য করতে পারেন।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শাহেদ আলীর নেয়া আত্মকর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত দেশের যুবসমাজকে আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হয়ে উঠবার প্রয়োজনীয় বার্তা বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ অধ্যাপক আকমল হোসেন অর্থনীতির ক্লাসে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, খাদ্য উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ম্যালথাসের মতে, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিরোধের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও খাদ্যের মধ্যে সাময়িক ভারসাম্য আসে। তবে জনসংখ্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই কাম্য। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. থমাস ম্যালথাস কোন তত্ত্বের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত? ১

খ. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন কী হারে বৃদ্ধি পায়? ২

গ. অধ্যাপক আকমল হোসেন কীভাবে চিত্রের সাহায্যে 'ম্যালথাসীয় চক্রটি ব্যাখ্যা করেন? ৩

ঘ. জনাধিক্য সমস্যা সমাধানে 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক থমাস ম্যালথাস 'ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের' জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

খ ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে।

জনসংখ্যার সর্বাধিক পরিচিত ও বহুল আলোচিত তত্ত্বটি হলো- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব। ইংরেজ ধর্মযাজক ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে তার "An Essay on the Principle of Population" নামক বইটিতে জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। তত্ত্বটি তার নামানুসারে 'ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে; যথা– ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ... এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে; যথা– ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ...। প্রাকৃতিকভাবে মানুষের প্রজননক্ষমতা বেশি হওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে পারে না। এর ফলে এমন এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায় এবং দেশে জনাধিক্য দেখা দেয়।

গ নিচে চিত্রের সাহায্যে ম্যালথাসীয় চক্রটি ব্যাখ্যা করা হলো–

উদ্দীপকের আকমল হোসেন অর্থনীতির ক্লাসে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষার্থীদের তত্ত্বটি বোঝানোর সময় তিনি 'ম্যালথাসীয় চক্রের' সাহায্য নেন।

চিত্র: জনসংখ্যার ম্যালথাসীয় চক্র

চিত্রে দেখা যায়, কোনো দেশে প্রাথমিক অবস্থায় খাদ্যের যোগান ও বিদ্যমান জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় আছে। অর্থাৎ উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন মাফিক আছে। কিন্তু জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অচিরেই এ ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ফলে জনাধিক্য দেখা দেয়। এ অবস্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক নিরোধ কার্যকর হলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা লোপ পায়। তখন জনসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসে। তবে এই ভারসাম্য অবস্থা সাময়িক হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্তা গ্রহণ না করলে বার বার চক্রটির পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

ঘ জনসংখ্যা সমস্যা বা জনাধিক্য সমস্যা সমাধানে 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণের গুরুত্ব সর্বাধিক।

কোনো দেশে জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের জন্য খাদ্যসহ বিভিন্ন সম্পদের প্রয়োজন বাড়ে। তাই দেশে জনসংখ্যা অধিক হলে তার ভরণ-পোষণের জন্য খাদ্যসহ অন্যান্য সীমিত সম্পদের ওপর চাপ পড়ে। এ অবস্থা

https://teachingbd24.com

খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, বেকারত্বসহ নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই জনসংখ্যাকে দেশের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। ম্যালথাসের মতে, দুই উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়; যথা- (ক) প্রাকৃতিক নিরোধ ও (খ) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

অতিরিক্ত দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পেশা, অত্যধিক পরিশ্রম, নৈসর্গিক প্রতিকূলতা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বিপর্যয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা সংহার হওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক নিরোধ করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর হয়, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া প্রাকৃতিক নিরোধ একটি সাময়িক ব্যবস্থা বলে তা জনাধিক্য নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী কোনো সমাধান দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মানুষ স্বেচ্ছায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে বলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব থাকে না। এর মাধ্যমে জন্মহার কমিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তাই বলা যায়, জনাধিক্য সমস্যা সমাধানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রশ্ন ▶ ৪০ একটি দেশের জনসংখ্যা কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৬ সালের মোট জীবিত জনসংখ্যা	২০১৬ সালের মোট মৃত জনসংখ্যা
১৬,০০,০০,০০০ জন	৪৮,০০,০০০ জন	৩২,০০,০০০ জন

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৭]

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. ম্যালথাসীয় চক্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. প্রদত্ত উদ্দীপক থেকে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি দেশটির আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি. হয়, তবে দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত হবে? ঘনত্ব বিবেচনা করে দেশটি জনবহুল হলে তা সমাধানের উপায় কী? ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, তকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি যে চক্রাকার চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়, সেটিই হলো ম্যালথাসীয় চক্র।

ম্যালথাসীয় চক্রে দেখা যায়, কোনো দেশে প্রাথমিক অবস্থায় খাদ্যের যোগান ও বিদ্যমান জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি হওয়ায় অচিরেই এ ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। ফলে জনাধিক্য দেখা দেয়। এ অবস্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক নিরোধ কার্যকর হলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা লোপ পায়। তখন জনসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসে।

গ সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪১ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর:

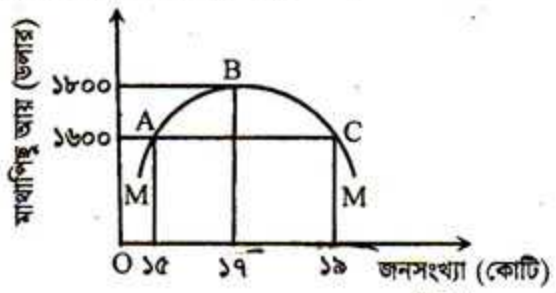

[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. মৃত্যুহার বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'A' বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ তুলনা কর। বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি কোন বিন্দুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ কোনো দেশে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে তাকে সে দেশের মৃত্যুহার বলে। এর হার বের করতে হলে, কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যে সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফলকে ১০০০ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০।$$

গ সৃজনশীল ২০ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ ২৫ বছর ব্যবধানান্তে 'ক' দেশের বিগত ১০০ বছরের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের অনুপাত দেখানো হলো:

বৎসর	১৯৪০	১৯৬৫	১৯৯০	২০১৫
খাদ্য উৎপাদন	২	৩	৪	৬
জনসংখ্যা	২	৪	৮	১৬

কিন্তু 'খ' দেশে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে অর্থনীতির কোন তত্ত্বটির সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' দেশের কোনটিতে কাম্য জনসংখ্যা আছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যা ঘনত্ব হলো কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

খ কর্মক্ষম জনশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি মানেই সমৃদ্ধ জাতি। দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যুযোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়রে জন্য তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

গ সৃজনশীল ১৮ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ সুনামগঞ্জের সুমন আর হবিগঞ্জের জয় একই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপকালে সুমন বলে তার জেলার আয়তন আনুমানিক ১০৭৫ বর্গ কিলোমিটার আর জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। সে আরো বলে বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ১০ বছর পর জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ লক্ষ।

[মদন মোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৪]

ক. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি লিখ। ১

খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সুমনের জেলার জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে সুমনের জেলায় কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

https://teachingbd24.com

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি হলো: $M = \frac{A - O}{O}$, যেখানে M = কাম্য জনসংখ্যা থেকে বিচ্যুতির মাত্রা, A = প্রকৃত জনসংখ্যা এবং O = কাম্য জনসংখ্যা।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। মানবসম্পদ বলতে মূলত জনশক্তিকে বোঝায়। কোনো দেশের মানুষের কর্মদক্ষতা উৎপাদন ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে তার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণের বিকাশই মানব উন্নয়ন। আর এই উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এতে করে দেশে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী মানবসম্পদ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ধারা আরো গতিশীল করা সম্ভব হবে।

গ একটি দেশে বা নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় প্রতি বর্গমাইল বা বর্গ কিলোমিটারে গড়ে যে সংখ্যক মানুষ বাস করে তাকে বলা হয় জনসংখ্যার ঘনত্ব। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সুমনের জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা হলো—

একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকজন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে কতটা নিবিড়ভাবে বসবাস করে তা জানার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব ধারণার উদ্ভব। কোনো দেশের বা এলাকার বিদ্যমান জনসংখ্যাকে সে দেশ বা এলাকার আয়তন দিয়ে ভাগ করলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা তথা জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

আমরা জানি, জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি হলো: $DP = \frac{TP}{TA'}$ যেখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব, TP = মোট জনসংখ্যা এবং TA = মোট আয়তন। উদ্দীপকে সুমন সুনামগঞ্জ জেলার অধিবাসী। তার জেলার আয়তন ১০৭৫ বর্গকিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার।

উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুমনের জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়।

সূত্রানুসারে সুমনের জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব, $DP = \frac{১৫,৩৫,০০০}{১০৭৫} =$ ১৪২৭.৯১ জন বা ১৪২৮ জন (প্রায়)। অর্থাৎ সুমনের জেলা তথা সুনামগঞ্জে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১৪২৮ জন মানুষ বসবাস করে।

ঘ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে সুমনের জেলায় বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় হলো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের বিশাল জনসংখ্যা ও তার দ্রুত বৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, অতীতের তুলনায় বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এলেও এখনো মোট জনসংখ্যার আকার বড়। ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার এরকম বৃদ্ধি নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে, যা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকের সুমন সুনামগঞ্জ জেলা নিবাসী। সুমনের জেলার জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। ইতোমধ্যে আমরা আরও জেনেছি যে, তার জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১৪২৮ জন লোক বসবাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বজায় থাকলে আগামী ১০ বছরে তার জেলার জনসংখ্যা ২০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকলে সুমনের জেলা সুনামগঞ্জ এর প্রভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থানের সংকুলান করা সম্ভবপর হবে না। তখন বাধ্য হয়ে কৃষি জমিতে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে হবে। এতে করে প্রয়োজনীয় কৃষি উৎপাদন আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান করতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনে জমিতে কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, যা জমির উর্বরতা কমানোর সাথে সাথে পানি ও বাতাসকে দূষিত করবে। শহরাঞ্চলে অধিক যানবাহন, কলকারখানা, ইটের ভাটা ইত্যাদি থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা দেয়া সম্ভবপর হবে না। এতে করে অদক্ষ ও অপুষ্ট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যা একসময় সমাজের বোঝা হিসেবে সামগ্রিক সমাজব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ ছাড়া এক জায়গায় বিপুল সংখ্যক লোকজন বসবাস করায় হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাস ও সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পাবে। যা সুনামগঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করবে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের সুমনের জেলা সুনামগঞ্জে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার বজায় থাকলে তা উক্ত জেলার অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার ওপর নানান রকম বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ মরিয়ম চট্টগ্রামের কেটি গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করে। কারখানার নিকটবর্তী একটি বস্তিতে সে বসবাস করে। এ বস্তিতে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অনুন্নত, একই সাথে অনেকেরই অসুখ-বিসুখ প্রায়ই লেগেই থাকে। একদিন স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে জানতে পারল উল্লিখিত সমস্যাগুলো অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে।

[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়ন কীভাবে জনসংখ্যা সমস্যাকে দূর করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের বা এলাকার প্রতি বর্গকিলোমিটার যতজন লোক বাস করে তাকে ওই দেশ বা এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করা যায়।

কোনো দেশের জনশক্তিকে উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশন প্রভৃতি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে যে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা হয় তারা সবাই দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তাই এ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে উক্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো—

দেশের ভৌগোলিক আয়তন ও প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হলে নানাবিধ সমস্যাসৃষ্টি হয়। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগুলোও অপূর্ণ থেকে যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাসস্থানের অভাবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বস্তি গড়ে ওঠে। এসব বস্তিতে বিশুদ্ধ পানীয় ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় তীব্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগ, বায়ুবাহিত রোগসহ নানা ধরনের সংক্রামকব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপরিউক্ত সমস্যা ছাড়াও নিম্ন মাথাপিছু আয়, বেকারত্ব, খাদ্যঘাটতি, মূলধন গঠনের নিম্নহার, শিল্পের অবনতি ও পরনির্ভরশীলতার মতো বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে।

পরিকল্পিত বস্তি গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে রাজধানী থেকে চাপ কমাতে হবে। এছাড়া এসব বস্তিতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিটি শিল্প এলাকায় যেসব বস্তি গড়ে ওঠে সেগুলোতে সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া এসব বস্তিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক কর্মীদের

Teachingbd24.com

দ্বারা প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তাদের বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হলে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ X দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেহারে পরবর্তীতে হয় তার একটি তালিকা দেয়া হলো:–

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০	–	২০০	–	৩০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬	–	২৫৬	–	৪০৯৬
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১	২	৩	৪	৫	–	৯	–	১৩

[স্কলারস হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৪]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. নিট অভিবাসন জনসংখ্যা ঘনত্বের ওপর কী প্রভাব ফেলে? ২

গ. X দেশের তথ্যের সাথে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত তত্ত্বের কি কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে? তা আলোচনা করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের বা এলাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে, তাকে ঐ দেশ বা এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

খ নিট অভিবাসন জনসংখ্যার ঘনত্বের ওপর কখনও ইতিবাচক, আবার কখনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে বসবাসের লক্ষ্যে একস্থান বা একদেশ থেকে অন্যস্থান বা অন্যদেশে গমনকে নির্দেশ করে। এটি মূলত এক বা একাধিক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের গতিশীল প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর ফলে বোঝা যায়, কোনো দেশের বা অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব কম না বেশি। বর্তমানে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিট অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ তত্ত্বটি হলো থমাস রবার্ট ম্যালথাস এর জনসংখ্যা তত্ত্ব।

১৭৯৮ সালে 'An Essay On The Principle of Population' গ্রন্থে এই জনসংখ্যা তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। এ তত্ত্বের মূলভিত্তি ছিল জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। এক্ষেত্রে জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো জনসংখ্যা বাড়ে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ..... ইত্যাদি হারে এবং খাদ্য বাড়ে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ..... ইত্যাদি হারে। তিনি মনে করেন, আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে মানুষের উন্নতি ও সুখ হবে না।

উদ্দীপকে প্রদত্ত তালিকা হতে আমরা যে তথ্য দেখতে পাই, তা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ জনসংখ্যার জ্যামিতিক হার ও খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হারকে নির্দেশ করে। ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়তে পারে না। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ার খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বাড়ে না। এর ফলে এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় ও জনাধিক্য দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত তত্ত্ব তথা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনাধিক্য সমস্যা দূর করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত তত্ত্বের কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে।

ম্যালথাসের মতে, প্রাকৃতিক নিরোধের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও উৎপাদিত খাদ্যের মধ্যে যে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তাই তিনি কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। বেশি বয়সে বিবাহ, বিবাহিত জীবনে সংযম, বহুবিবাহ পরিহার, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনবোধে কৌমার্য অবলম্বন ইত্যাদি জন্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধব্যবস্থা বলা হয়। নিচে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো-

কোনো দেশে খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে জনাধিক্য দেখা দেয়। এ অবস্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় কার্যকর হলে অর্থাৎ দারিদ্র্য, অপুষ্টি, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা লোপ পায়। তখন জনসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিরোধ পদ্ধতিটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়। উপরন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে দেশে বারবার জনাধিক্য দেখা দেয়। তাই ম্যালথাস তার তত্ত্বে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তথা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে পরিকল্পিত জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনাধিক্য সমস্যা সমাধানের প্রাকৃতিক নিরোধ পদ্ধতি পরবর্তী দুঃখ, বেদনা এড়ানো সম্ভব। বেশি বয়সে বিবাহ করার মাধ্যমে এবং বহুবিবাহ পরিহার করার মধ্য দিয়ে পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা কম রাখা সম্ভব। বেশি বয়সে বিয়ে করলে সমাজে এরসাথে দুই অথবা তিনটি প্রজন্ম বেঁচে থাকবে। এর ফলে জনাধিক্য কমবে। বহুবিবাহ পরিহার, বিবাহিত জীবনে সংযম ধারণ পরিবারের জনসংখ্যা কম রাখতে সাহায্য করে। বর্তমানে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু আছে। জনগণকে এসব পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমেও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং জন্মহার কমিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাকৃতিক নিরোধ এড়াতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ রবিউল পড়াশুনা শেষ করার পর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য অনেক দিন চেষ্টা করছিলেন কিন্তু চাকরি হয়নি। পরে গ্রামে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে টাকা ধার করে একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলেন। এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই শুধু স্বাবলম্বী হননি গ্রামের আরো কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছেন।

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে? ১

খ. স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ মানবসম্পদ উন্নয়নের সহায়ক — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রবিউলের নিজ কর্মসংস্থানের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, রবিউলের মতো নিজ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় যতজন লোক বাস করে সেই সংখ্যাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যেসব সহায়ক উপাদান প্রয়োজন তার মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ অন্যতম।

উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণের শারীরিক যোগ্যতা বাড়ানো হলে তাদের পক্ষে ভারী ও কষ্টকর কাজে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব হবে। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। বিভিন্ন ধরনের রোগ, অপুষ্টি ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ পরনির্ভরশীল। এ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সুতরাং বলা যায়, স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক।

গ উদ্দীপকের রবিউল আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলেন। অর্থনীতির ভাষায় রবিউলের কাজটি হলো স্বকর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান।

https://teachingbd24.com

স্ব শব্দের অর্থ নিজ, কর্মসংস্থান অর্থ নিয়োগ। আত্ম-কর্মসংস্থান বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে একজন কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক মানুষ বেকারত্বের অভিশাপ হতে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে উৎপাদন বা আয় অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকা।

উদ্দীপকের রবিউল একজন শিক্ষিত বেকার যুবক। দীর্ঘ সময় চাকরির জন্য বয় করে ব্যর্থ হয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অর্থ ধার করে একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। ধার করা টাকায় ডেইরি ফার্ম গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে রবিউলের আত্ম-কর্মসংস্থানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কোনো ব্যক্তি যখন নিজের বা ধার করা অর্থ দিয়ে স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার আলোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, তখন সে ধরনের কর্মসংস্থানকে বলা হয় আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন মানুষ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে রবিউলের গৃহীত পদক্ষেপটিকে (ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা) আত্মকর্মসংস্থান বলা যায়। রবিউলের মতো অনেকেই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। প্রকৃতপক্ষে নিজ কর্মসংস্থান অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

কোনো ব্যক্তি যখন নিজের বা ঋণের মাধ্যমে স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার আরোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয় তখন তাকে আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থান বা নিজ কর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

দেশে বিদ্যমান ব্যাপক বেকার সমস্যা লাঘবে উদ্দীপকের রবিউলের মতো করা স্বকর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। কেননা মানুষ বেকার থাকলে শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটে। এ অবস্থায় আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেলে শ্রম ও সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। নিজে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাতে তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যদেরও কাজে নিয়োগ দেয়া যায়। এভাবে একজন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাতে অন্যদেরও কর্মসংস্থান হয়। ফলে বেকারত্ব কমে। তাছাড়া বাংলাদেশে শিল্পোৎপাদন খুব কম। কুটির শিল্প স্থাপন আত্মকর্মসংস্থানের একটি উত্তম উপায় বলে এর মাধ্যমে একদিকে কর্মসংস্থান ও অপরদিকে শিল্পোৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। যা দেশীয় সম্পদ ব্যবহারের পথ সুগম করে। তাছাড়া বেকারত্ব নানা রকম সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। সেক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে সমাজকে সেসব সমস্যা থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে রবিউলের মতো নিজ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ রাজু ও সাজু দুই ভাই। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এস এস সি পাসের পর লেখাপড়া চালাতে পারেনি। হাতশায় থামা নয়। এই ভেবে দুই ভাই যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে মোবাইল সার্ভিসিং কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। মায়ের জমান ৫০০০/- টাকা নিয়ে স্থানীয় বাজারে 'ভাই ভাই মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার' নামে একটি দোকান দেয়। প্রথম মাসেই সমস্ত খরচ বাদে নিট লাভ হয় ২০০০০/- টাকা। এভাবেই তারা বাঁচতে শিখল। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর । প্রশ্ন নং ১০]*

ক. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী? ১
খ. জলবায়ু দ্বারা জনসংখ্যা কীভাবে প্রভাবিত হয়? ২
গ. 'ভাই ভাই মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার' প্রতিষ্ঠায় কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের উদ্যোগ সফল হতে কী ধরনের মানবীয় গুণাবলি আবশ্যক? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশ বা এলাকার জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান হলে তাকে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলে।

খ কোনো একটি দেশের জনসংখ্যা সেই দেশের জলবায়ুর ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে।

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। অপরদিকে, শীতপ্রধান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলনায় কম হয়। অর্থাৎ জলবায়ু জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০
জনসংখ্যা	১	২	৪	৮	১৬
খাদ্য উৎপাদন	১	২	৩	৪	৫

[উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নং ১১]

ক. আদমশুমারি কী? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের উপরিউক্ত সম্পর্কের সাথে কাম্য জনসংখ্যা ধারণাটির তুলনা কর। ৩
ঘ. সূচিতে উল্লিখিত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যেসব সমসার উদ্ভব হয় তা কিভাবে সমাধান করা যায়? মতামত দাও। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত দশ বছর অন্তর দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক জানার জন্য যে জরিপ পরিচালনা করা হয় তাকে আদমশুমারি বলে।

খ নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

নিজস্ব অথবা ঋণকরা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। যখন কোনো ব্যক্তি সেবাদানের বিনিময়ে বা ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ বা আয় উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে তখন একে আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলা হয়। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি নিজেকে কোনো না কোনো ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে।

গ উদ্দীপকের সূচিটি দ্বারা থমাস রবার্ট ম্যালথাসের জনসংখ্যাটি তত্ত্বটিকে দেখানো হয়েছে। প্রদত্ত সূচিটিতে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে এবং খাদ্য গাণিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়। জ্যামিতিক প্রগতির তুলনায় গাণিতিক প্রগতি অত্যন্ত ধীরে বৃদ্ধি পায় বলে সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে পড়ে এবং প্রতি ২৫ বছর অন্তর দ্বিগুণ হয়। জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে এ সম্পর্কের সাথে কাম্য জনসংখ্যা ধারণাটি নিম্নোক্তভাবে তুলনা করা যায়।

প্রথমত, সারণিতে কেবল খাদ্যের মাপকাঠিতে জনসংখ্যাকে বিচার করা হয়েছে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা ধারণায় দেশের যাবতীয় সম্পদের ভিত্তিতে জনসংখ্যা সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়েছে। কাম্য জনসংখ্যা ধারণা অনুসারে, একটি দেশের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে মোট সম্পদ অনেক বেশি হয় বলে এ ধারণায় জনসংখ্যা সমস্যাটিকে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় এ ধারণা অনুযায়ী, দেশে অধিক সম্পদ থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, সারণিতে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বানুসারে আমাদেরকে জনাধিক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যার ধারণায় বলা হয়— জনাধিক্যজনিত সমস্যাগুলো তখনই দেখা দেয় যখন দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় হ্রাস পায়।

এভাবে সূচিতে প্রকাশিত জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সাথে কাম্য জনসংখ্যা ধারণাটি তুলনা করা যায়।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ঘ প্রদত্ত সূচিতে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে প্রকাশিত সম্পর্কের ভিত্তিতে বলা যায়, যেকোনো দেশেই অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বাড়লে তা শীঘ্রই খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার দরুন দেশে খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি, ব্যাপক বেকারত্ব, তীব্র আবাসন সংকট, অপ্রতুল স্বাস্থ্য সেবা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। তখন তার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়:

প্রথমত, জনসংখ্যা ও খাদোৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমনটি করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির দরুন সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি সমস্যা মোকাবিলার জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য কৃষিতে উফশী পদ্ধতির চাষ প্রবর্তন, খাদ্যশস্যের বাফার স্টক বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে যতদূর সম্ভব ফসল রক্ষা, খাদ্য আমদানি ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, জনসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে পড়লে যে আবাসন সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধানের জন্য দেশের জন অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে স্বল্প মূল্যের অধিকসংখ্যক বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করতে হবে।

চতুর্থত, দেশে ব্যাপক বেকারত্ব দূর করার জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে লোকজনের আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের সমস্যা ও সমাধান করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৭ সালের মোট জীবিত জনসংখ্যা	২০১৭ সালের মোট মৃত্যু সংখ্যা
১৫,০০,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২০,০০,০০০

[উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. বেকারত্ব কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপক থেকে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি দেশটির আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. হয়, তবে দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত হবে? ঘনত্ব বিবেচনা করে দেশটি জনবহুল হলে তার সমাধানের উপায় কী? ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না- এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে।

খ মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একাধিক উপাদান কাজ করে। অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল মানবসম্পদ উন্নয়নের আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো : ১. খাদ্য ও পুষ্টি ২. বস্ত্র ৩. বাসস্থান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ৪. স্বাস্থ্য সুবিধা ৫. শিক্ষা ৬. গণসংযোগ মাধ্যম ৭. শক্তি ভোগ ও ৮. পরিবহণ।
এসব উপাদানের সহায়তায় মানুষের ভেতরের সুপ্ত গুণাবলির উন্নয়ন ও বিকাশই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন।

গ সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫০ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে বিদ্যমান সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। এজন্য বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্বসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তবে সাম্প্রতিককালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলছে।

[শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. কাম্য জনসংখ্যার সূত্রটি লেখ। ১

খ. স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. বাংলাদেশে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কতটুকু কার্যকর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক ডালটন কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি প্রদান করেন। $M = \frac{A - O}{O}$, যেখানে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, O = কাম্য জনসংখ্যা, A = প্রকৃত জনসংখ্যা।

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যার সাথে প্রজনন হার ধারণাটি সম্পর্কিত। এ হার নিবন্ধীকরণ, শুমারির এবং সাধারণ জরিপ যেকোনো তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পরিমাপ করা হয়। পক্ষান্তরে মৃত্যুসংখ্যা হলো পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক ক্ষয়শক্তি। ইহা জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে।
সাধারণ অর্থে, দেশের সকল লোকের প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু এ হার মোট জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয় যা সঠিক নয়। অন্যদিকে, মৃত্যুহার বছরের শুরু ও শেষের মৃত্যুহার ও আকস্মিক ঘটনার হার নির্দেশ করতে পারে না। এটি বছরের মধ্যসময়ের মৃত্যুহার নির্দেশ করে।

গ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি আলোচনার প্রেক্ষিতে বোঝা যাবে বাংলাদেশের জন্য এটি কতটা কার্যকর।
ম্যালথাস তার জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তুলনা করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে খাদ্যোৎপাদন বাড়ার তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হারে বাড়ে। এ অবস্থায় দেশে খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার, বেকারত্ব প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে দেশটিকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ বলা হয়। ম্যালথাসের এ জনসংখ্যার তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, বাংলাদেশেও খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। দারিদ্র্যের হার শতকরা প্রায় ২৮% ভাগ। জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জীবনযাত্রার মান নিচু। এখানকার মোট শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। আবার উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুহার, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতিও বিদ্যমান।
সুতরাং, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথে মিলে যায়। তাই ম্যালথাসের তত্ত্বটি বাংলাদেশে অধিক প্রযোজ্য।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
একটি ছোট ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব হতে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পন্থায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই হলো পরিবার পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে সরকার নারীদের প্রজনন হার হ্রাসের জন্য স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেরিতে সন্তান ধারণে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওর এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ইতোমধ্যে অনেকাংশেই সফল ভূমিকা রাখছে। ১৯৭০ সালে এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৭০ ভাগ যা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৩৭ ভাগ। ১৯৭৪ সালে এদেশে প্রতিহাজারে জন্মহার ছিল ৪৮.৩ এবং মৃত্যুহার ১৯.৪। এ হার বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.৯ এবং ৫.২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এরূপ হ্রাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যের প্রমাণ দেয়। তাছাড়া সরকারের সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে আজকাল শহরাঞ্চলে এমন পরিবার বিরল যারা দু-এর অধিক সন্তান গ্রহণ করে।
উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কর্মসূচি দ্বারা পুরোপুরি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও এটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫১ ২০১৬ সালে X দেশে ২০ লক্ষ জীবিত শিশু জন্ম লাভ করে এবং ১৬ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। উক্ত বছরের মধ্যম সময়ে মোট জনসংখ্যা হল ১৬ কোটি। ২০১৬ সালে ওই দেশে বহিরাগমনের হার ২ এবং বহির্গমনের হার ৩। *[স্কলারস হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র-দূরীকরণে সহায়ক– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার বের কর। ৩

ঘ. ২০১৬ সালে X দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত হবে এবং তুমি কীভাবে তা নির্ণয় করবে? ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে জনগণের মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ অর্থাৎ প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয়, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান একটি দেশের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর ফলে দেশে দারিদ্র্যের পরিমাণ বা মাত্রা হ্রাস পায়।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি নিজের অর্থ বা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার আলোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। এর ফলে উদ্যোক্তাসহ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মীরা তুলনামূলক উন্নত জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক।

গ উদ্দীপক হতে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হলো–

নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে একটি দেশের বা অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রতি হাজারে জীবন্ত শিশুর জন্মের সংখ্যাকে স্থূল জন্মহার (CBR) বলা হয়।

CBR নির্ণয়ের সূত্র- $CBR = \frac{B}{P} \times ১০০০$; যেখানে, B = কোনো বছরের মোট জীবিত শিশুর জন্মের সংখ্যা, P = উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা। অপরদিকে, নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে একটি দেশের বা অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রতি হাজারে মৃত্যুর সংখ্যাকে স্থূল মৃত্যুহার (CDR) বলে। CDR নির্ণয়ের সূত্র- $CDR = \frac{D}{P} \times ১০০০$; যেখানে, D = কোনো বছরের মোট মৃত্যুর সংখ্যা এবং P = উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১৬ সালে X দেশে মোট জীবিত শিশু জন্মলাভ করে ২০ লক্ষ এবং ১৬ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে দেশটির মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি। সুতরাং ২০১৬ সালে 'X' দেশের–

স্থূল জন্মহার, $CBR = \frac{B}{P} \times ১০০০ = \frac{২০০০০০০}{১৬০০০০০০০} \times ১০০০$

$= ১২.৫$ জন

এবং স্থূল মৃত্যহার, $CDR = \frac{D}{P} \times ১০০০ = \frac{১৬০০০০০}{১৬০০০০০০০} \times ১০০০$

$= ১০$ জন

ঘ নিম্নের সূত্রটির সাহায্যে ২০১৬ সালে উদ্দীপকের X দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা সম্ভব।

প্রতি বছরে একটি দেশের জনসংখ্যার প্রতি শ'তে জন্মের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যার পার্থক্য ব্যবধানকে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার বলে। উক্ত দেশে যদি বহিরাগমন ও বহির্গমনের ঘটনা ঘটে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের সূত্রটি হলো– $PGR = \left(\frac{B+I}{P} \times ১০০\right) - \left(\frac{D+E}{P} \times ১০০\right)$; এখানে, B = মোট জীবিত শিশুর সংখ্যা, D = মোট মৃত্যুর সংখ্যা, P= মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা, I = বহিরাগমন বা নতুন আগত নাগরিকের মোট সংখ্যা এবং E = বহির্গমনকৃত বা বহির্গত নাগরিকের সংখ্যা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১৬ সালে X দেশে মোট জীবিত শিশু জন্মলাভ করে ২০,০০,০০০। মোট মৃত্যুবরণ করে ১৬,০০,০০০। ২০১৬ সলের মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা ১৬,০০,০০,০০০। একই সালে X দেশের বহিরাগমনের হার ২; অর্থাৎ নতুন আগত নাগরিকের মোট সংখ্যা $= \frac{১৬০০০০০০০ \times ২}{১০০০} = ৩,২০,০০০$ জন।

অপরদিকে বহির্গমনের হার ৩; অর্থাৎ বহির্গত নাগরিকের মোট সংখ্যা $= \frac{১৬০০০০০০০ \times ৩}{১০০০} = ৪,৮০,০০০$ জন।

সুতরাং ২০১৬ সালে X দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, PGR

$$= \left(\frac{B+I}{P} \times ১০০\right) - \left(\frac{D+E}{P} \times ১০০\right)$$

$$= \left(\frac{২০০০০০০}{১৬০০০০০০০} \times ১০০\right) - \left(\frac{১৬০০০০০}{১৬০০০০০০০} \times ১০০\right)$$

$$= ১.২৫ - ১ = ০.২৫\%$$

অর্থাৎ ২০১৬ সালে X দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা ০.২৫ জন। উক্ত বছরের বহিরাগমন ও বহির্গমনের মোট পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বের করার সূত্রটি ব্যবহার করে উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটি নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫২ শিক্ষিতের হার কম হওয়া সত্ত্বেও এক সময় 'ক' দেশটির জনগণ সুখে শান্তিতে বাস করতো। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ সবই তাদের ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বর্তমানে তারা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, উৎপাদিত পণ্য দ্বারা জনগণের খাদ্য সংস্থা সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। ফলে ছিনতাই রাহাজানি বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে অনেক মানুষের প্রাণহানিও ঘটেছে। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন জনসংখ্যা তত্ত্বের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কি দায়ী বলে তুমি মনে কর? এ থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ কোনো একটি কাজ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা বার বার করাই হলো প্রশিক্ষণ।

তাই কোনো কাজের জন্য প্রশিক্ষণ মানুষকে ঐ কাজটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ উপায়ে সম্পাদন করতে সাহায্য করে। প্রশিক্ষণ মানুষকে উৎপাদনশীল করে তার শ্রমের গুণগত মান বাড়ায়। প্রশিক্ষণ যত উন্নত পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় মানুষ ততই তার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। এ জন্যই বলা হয়— প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৫: খাদ্য নিরাপত্তা

প্রশ্ন ▶ ১ বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা করছে। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১

খ. ভেজাল খাদ্য কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপসমূহের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা জরুরি কি না ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদিকে একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে।

খ খাদ্যের ব্যবহার বা উপযোগিতা বিনষ্ট করার মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য, খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।

সাধারণত খাদ্য নিরাপত্তা খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। এর যেকোনো একটি বিঘ্নিত হলেই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। আর ভেজাল খাদ্য তথা বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরিকৃত খাদ্য অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য গ্রহণ করলে মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

গ উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কাবিখা ইত্যাদি বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে দেশে উৎপাদিত খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হয়, যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দেশে খাদ্যের সামগ্রিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটানো যায়।

বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। খাদ্যোৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা এবং কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্পসময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা অত্যন্ত জরুরি। নিচে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

খাদ্য নিরাপত্তা এমন একটি বিষয়, যা সরকারের একার পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ, শুধু আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ দ্বারা খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যায় না। বরং এক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এ দেশে ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এসব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের দেশে কেউ কেউ খাদ্যে জেনে ভেজাল মেশায় আবার কেউ কেউ না জেনে মেশায়। অর্থাৎ খাদ্যে ভেজালের কুফল তথা খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। তাই বেসরকারি সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করতে পারে। আবার ভেজাল বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সরকার আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া পঁচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা করতে পারে।

সর্বোপরি সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সততার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেশের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল আর ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা আর তথ্যভিত্তিক প্রচারণা চালাতে পারে। তাই, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকাও অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ২ 'A' দেশের জনগণ অতি দরিদ্র। খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। 'A' দেশে প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর ফসল হানি হয়। কিছু জনগণ অতি মুনাফালোভী হওয়ায় ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। ফলে ভেজাল খাদ্য খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে দেশের সচেতন জনগণ, মিডিয়া এবং এনজিওসমূহ নিরাপদ খাদ্যের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং সরকারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের খাদ্য অনিরাপদের দিকগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমসমূহ কীভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে খাদ্য কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ খাদ্য যাতে পঁচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যেন পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের 'A' দেশের খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি দিক (খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার) ব্যাহত হয়েছে।

সাধারণত খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার (পুষ্টিসম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত) এই তিনটি দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এর যেকোনো একটি বা সবকয়টি বিঘ্নিত হলে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয় তথা খাদ্য অনিরাপদ হয়ে পড়ে। এখানে, খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ

https://teachingbd24.com

খাদ্যকে বোঝায়। আর খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা হলো খাদ্য ক্রয় করার জন্য জনগণের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ থাকা বা দ্রব্যসামগ্রীর দাম সহনীয় মাত্রায় থাকা। আবার, খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হলে কিংবা প্রয়োজনীয় পুষ্টি খাদ্যে না থাকলে খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত হয় না।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর স্বল্পতা বিদ্যমান তথা পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব রয়েছে। আবার, দেশটির জনগণ দরিদ্র হওয়ায় বলা যায় প্রয়োজনীয় খাদ্য তারা ক্রয় করতে ব্যর্থ। তার ওপর দেশটির কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফার লোভে খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে থাকে। এতে খাদ্য পুষ্টিহীন ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, 'A' দেশটিতে খাদ্য মারাত্মকভাবে অনিরাপদ হয়ে পড়ছে।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের সচেতন জনগণ, মিডিয়া ও সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হলো—

জনসাধারণ: সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভেজাল নিরূপণকারী কিট না থাকায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ জানতে পারছে না। সাধারণ জনগণ যদি এই ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে অবশ্যই দেশ থেকে ভেজালের সমস্যা দূর হবে। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

মিডিয়া: মিডিয়া প্রতিটি দেশের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে মিডিয়ার কার্যকারিতা অন্য যেকোনো মাধ্যম থেকে অধিক। এক্ষেত্রে খাদ্য ভেজালের কুফল বা ক্ষতিকারক দিকগুলো ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মিডিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

বেসরকারি সংস্থা: স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার, উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এদেশে ব্যাপক। এসব সংস্থাগুলো বিভিন্ন দিকনির্দেশনার মাধ্যমে জনগণকে ভেজালবিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত করতে পারে। আবার সরকারকে ভেজালবিরোধী আইন তৈরিতে চাপও প্রয়োগ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলাদেশে ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণভিত্তিক দারিদ্র্যের শতকরা হিসাব নিম্নরূপ:

দারিদ্র্যের ধরন	এলাকা	সময়কাল		
		১৯৮১-৮২	১৯৯১-৯২	২০১০-১১
দারিদ্র্য	পল্লি	৭৩.৮০	৪৭.৮০	৩৫.২০
	শহর	৬৬.০০	৪৬.৭০	২১.৩০

উক্ত দারিদ্র্য পরিস্থিতির কারণে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সরকার OMS কার্যক্রম পরিচালনা, সুলভমূল্য কার্ডের প্রচলন এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. 'শুধুমাত্র খাদ্যের অবাধ সরবরাহ থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পল্লি দারিদ্র্যের হারের ওপর স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকারের পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর, নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে।

খ খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার এই তিনটি বিষয়ের ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে।

খাদ্যের প্রাপ্যতা ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে। আবার, খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ হলো ক্রয়যোগ্যতা এবং মৌলিক পুষ্টি জ্ঞানের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ হলো খাদ্যের ব্যবহার। এখন, কোনো দেশে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে, কিন্তু তা যদি জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে কিংবা পুষ্টি জ্ঞান অনুযায়ী তার ব্যবহার নেই, তাহলে বলা যায়, ঐ দেশটির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। তাই, শুধু খাদ্যের অবাধ সরবরাহ (প্রাপ্যতা) থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

গ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিম্নে পল্লি দারিদ্র্যের হারের ওপর স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করা হলো—

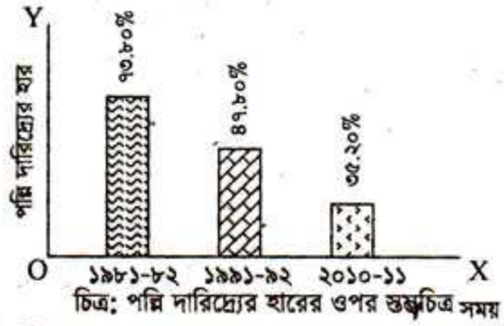

চিত্র: পল্লি দারিদ্র্যের হারের ওপর স্তম্ভচিত্র

উপর্যুক্ত স্তম্ভচিত্রের OX অক্ষে সময়কাল এবং OY অক্ষে পল্লি দারিদ্র্যের হার দেখানো হয়েছে। চিত্রে লক্ষ করা যায়, পল্লি দারিদ্র্যের হার ক্রমশ কমছে। যেখানে ১৯৮১-৮২ সালে ছিল ৭৩.৮০% সেখানে ২০১০-১১ সালে কয়েক বছরের ব্যবধানে দারিদ্র্যের হার কমে ৩৫.২০% হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নে মূল্যায়ন করা হলো—

পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার OMS (Open Market Sale) কার্যক্রম পরিচালনা, কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা), দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে প্রায় ২৩.৫%* লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে পল্লি-শহরে দরিদ্র লোক ছিল যথাক্রমে ৭৩.৮০% ও ৬৬.০০%। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০১০-১১ সালে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমে পল্লিতে ৩৫.২০% এবং শহরে ২১.৩০% হয়েছে। এর ফলে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে।

আবার, গত দুই দশক ধরে ভূমিহীন অদক্ষ দরিদ্র জনগণের জন্য সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বেশ প্রশংসিত হয়েছে। তবে, জনগণের খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে ত্রুটি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যে ভেজাল পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও সার্বিকভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪ 'Y' দেশে ২০১৫ সালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ ছিল। কিন্তু বেকার সমস্যা ছিল প্রকট। জনগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ফলে সে সময় দেশের অনেক লোক ক্ষুধায় কষ্ট পেত। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভেজালবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. 'খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'Y' দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কোন দিকটি বিঘ্নিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭; পৃ.-XXIII)

https://teachingbd24.com

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত (Contaminated) হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়।

খ সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

গ 'Y' দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার দিকটি বিঘ্নিত হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যথা- ১. পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ, ২. খাদ্য ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ৩. খাদ্যের সদ্ব্যবহার। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার পূর্বশর্ত খাদ্য প্রাপ্যতা। কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ, দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা অনেকটাই পরিবারের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এটি বাজারের ধরন, দাম নীতি এবং সময়ভেদে বাজার অবস্থা দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি জনসাধারণ উন্নত জীবনযাত্রায় প্রবেশ করে, তবে তাদের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতাও উন্নতি ঘটে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অন্যতম নিয়ামক ব্যক্তির আয়। যদি ব্যক্তির আয় কম হয় তবে তার ক্রয়যোগ্যতারও কমে যায়। আবার কোনো ব্যক্তির আয়ের স্তর বৃদ্ধি পেলে তার খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে তখনই নিশ্চিত হওয়া যায় যখন পরিবারসমূহ খাদ্য ক্রয়, বিনিময়, দান, ঋণ কিংবা সাহায্যের মাধ্যমে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'Y' দেশে ২০১৫ সালে খাদ্যশস্যের মজুদ পর্যাপ্ত থাকলেও জনগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। এর ফলে তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে সে সময় 'Y' দেশের অনেক লোক ক্ষুধায় কষ্ট পায়।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ হলো– খাদ্য আমদানি, দারিদ্র্য নিরসন এবং ভেজালবিরোধী অভিযান।

খাদ্যশস্য আমদানি: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে প্রতি বছর আমদানি করে থাকে।

দারিদ্র্য নিরসন: দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, অনেক লোক খাদ্যাভাবে অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য ক্রয়ের অক্ষমতার জন্যই এমনটি হয়। আর এজন্য দারিদ্র্যই দায়ী। তাই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য নিরসন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের করণীয়গুলো হলো: দেশের দরিদ্র লোকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাস জমি বিতরণে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান, দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা, দরিদ্রদের জন্য কর্মোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি।

ভেজালবিরোধী অভিযান: সরকার খাদ্য নিরাপত্তা তথা ভেজাল খাদ্য দূর করার জন্য যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা করেছে তা সব মহলে দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। এ অভিযানটি মোবাইল কোর্ট নামে পরিচিত। খাদ্য নিরাপদকরণে এ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রয়োজন সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্বে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী অফিসারদের সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীদের যেকোনো আর্থিক সম্পর্ক যাতে না গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখা।

প্রশ্ন ▶৫ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে শিক্ষক ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, কোনো দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দক্ষতা থাকতে হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই সার, বীজ, ডিজেলের মূল্য ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের ওপর যথেষ্ট ভর্তুকি প্রদান করেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য আমদানি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কীভাবে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর কোনো বিষয় সম্পৃক্ত করা যায় কি না উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে খাদ্যের ওপর চাপ হ্রাস পায়, যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়তে থাকলেও তার সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলে আগের থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

গ বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১. বিশ্বখাদ্য সম্মেলন ১৯৯৬ পরবর্তী সরকার এবং দাতাদেশ ও সংস্থা বাংলাদেশে খাদ্য নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। সে লক্ষ্যে 'National Food Policy Plan of Action' এবং 'Investment Plan for Food Security and Nutrition' প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে সমন্বিতভাবে খাদ্য নিরাপত্তার সকল দিক; যেমন খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা, উপযোগিতা বা ব্যবহার গুরুত্ব পাচ্ছে।

২. সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। এ লক্ষ্যে ইউরিয়া ব্যতীত সকল প্রকার সারের মূল্য অর্ধেকে কমিয়ে আনা, উচ্চ ফলনশীল বীজ সহজলভ্য করা, ডিজেলের মূল্যে কৃষককে ভর্তুকি দেওয়া, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ব্যাংক ঋণ সহজ করাসহ কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়, এতে কৃষকরা ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হয়।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে, নীতিমালার মধ্য থেকে প্রতিবছর আমদানি করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৪১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন।

উদ্দীপকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে যে তথ্য ও উপাত্ত দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, এখানে বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা সমস্যা থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে খাদ্য উৎপাদনে লক্ষণীয় বৃদ্ধি এবং সরকারের খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা নিম্নরূপ—

১. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২. কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ও স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

৩. দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, এ সময়ে দুর্গত মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের। এরূপ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে সরকার।

৫. দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্ন আয় ও দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যথা— ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং, গ্রাটিউইটাস রিলিফ, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি (OMS), কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হতে আমদানি করতে হতো। কিন্তু বিগত দশকে এই খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক বিতরণ ও ডিজেলে ভর্তুকি প্রদানসহ কৃষিবান্ধব নানান কর্মসূচি গ্রহণ করায় খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক— বুঝিয়ে বলো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপের কারণেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে?— মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা, যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেকোনো দেশের জন্য অতি আবশ্যক।

কোনো দেশের উৎপাদিত মোট খাদ্য দ্বারা যদি সেই দেশের সকল জনগণের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায় তাহলে উৎপাদিত খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। এতে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যা মোটেই কাম্য নয়। তাই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে এটি প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে পারে। সুতরাং, আমদানি ব্যয় কমাতে ও দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অতি আবশ্যক।

গ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকের আলোকে তা আলোচনা করা হলো—

খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হয়, যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দেশে খাদ্যের সামগ্রিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটানো যায়।

সরকার কৃষি খাতকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুকি ও সুদমুক্ত ঋণ এর ব্যবস্থা করে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও উন্নত বীজ সরবরাহ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ভর্তুকিসহ কৃষিবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে অভিনব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিকে আধুনিকায়নের জন্য তথা স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক ফলনের আশায় কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে ফসলের উৎপাদন বেড়ে যায়।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় যে, বিগত দশকে সরকার কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুকিসহ কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করায় পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এমনকি সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এ সকল কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটলে অতিশীঘ্রই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে গৃহীত তথা কৃষিবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার কারণেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিতে ভর্তুকিসহ কৃষিবান্ধব নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সাম্প্রতিক বাজেটগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছে। কৃষক পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করায় দ্রুত ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে সরকার বিনাসুদে ও সহজশর্তে মৌসুমি ঋণসহ বিভিন্ন রকম ঋণের ব্যবস্থা করেছে। কৃষি আধুনিকায়নের জন্য সরকার নানা রকম কৃষি যন্ত্রপাতি অতি স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে এবং কৃষক সম্প্রদায় যাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধি করতে পারে সে জন্য প্রত্যেক গ্রামে কৃষি অধিদপ্তর থেকে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে খামার তৈরি করাকে সরকার বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এতে পূর্বের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বেড়েছে। ফলে আমদানির পরিমাণ অনেকখানি কমে গিয়েছে এবং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় যে, বিগত দশকে কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য সরকার কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদিতে ভর্তুকি প্রদান করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন কৃষিবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সুতরাং, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহে মমিনুল স্যার ঢাকা থেকে গাজীপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে যাওয়ার সময় ব্যাগে কিছু নাস্তা ও দুইটি কমলা নিয়ে যান। পথিমধ্যে নাস্তা ও একটি কমলা খেলেও ভুলক্রমে ব্যাগে একটি কমলা থেকে যায়। প্রায় একমাস পর ব্যাগ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখেন ব্যাগের কমলাটি না পঁচে প্রায় পূর্বের মতোই রয়েছে। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১

খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ২

গ. মমিনুল স্যারের ব্যাগের কমলাটি পূর্বের ন্যায় থাকল কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা নিরাপদ খাদ্য ধারণাকে সমর্থন করে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যে মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত।

খ খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।

খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহার- খাদ্য নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, প্রায় এক মাস পরেও মমিনুল স্যারের কেনা কমলাটি আগের মতোই আছে; অর্থাৎ তা না পঁচে তাজা কমলার মতোই দেখাচ্ছে। এক মাস পরেও কমলাটি সতেজ দেখতে পাওয়ার বিষয়টি ভেজাল খাদ্যকে নির্দেশ করে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য-চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এখন তাই বিভিন্নভাবে ভেজাল খাদ্য তৈরি হচ্ছে। কমলালেবু, পেঁপে, আপেল, পাকা আম ইত্যাদি সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, কলা দ্রুত পাকাতে ইথিন, মিষ্টিতে স্যাকারিন, শুঁটকি মাছে কীটনাশক ও ডিডিটি, দুধের সাথে পানি ও পাউডার এবং জুস ও জেলির সাথে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে দেখা যায়, শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাক-সব্জি, মাছ-মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়।

সুতরাং বলা যায়, খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্যের হাত ধরেই মমিনুল স্যারের ব্যাগের কমলাটি আগের মতোই রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আজকাল বাংলাদেশে শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। ফলে প্রায় সব ধরনের খাদ্যই ভেজালযুক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে আমরা প্রায় সবাই পেটে নানা ধরনের পীড়া, শরীর ক্রমেই দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যন্ত কম বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি ইত্যাদি অসুখে ভুগছি। এসবই ভেজাল খাদ্যের কুফল বলা যায়। এরূপ অবস্থা আমাদেরকে এমন খাদ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ভেজালমুক্ত অর্থাৎ নিরাপদ।

যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়। ভেজাল খাদ্যের কথা উঠলেই নিরাপদ খাদ্যের কথা মনে হয়।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ-সবল রাখে ও তার আয়ুষ্কাল বাড়ায়। এ খাদ্য গ্রহণের ফলে তাই ব্যক্তি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটে। এর ফলে মানুষ জীবনের বেশিরভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে ও তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টি সমৃদ্ধি হয়। খাদ্য নিরাপদ করতে পারলে তাই তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয়। যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। নিরাপদ খাদ্যের পুষ্টিমানের তারতম্য ঘটে না। যথাযথ তাপমাত্রা ও পরিবেশে খাদ্য সংরক্ষণ করলে তার পুষ্টিমান বজায় থাকে। খাদ্য নিরাপদ করতে পারলে তাই তা থেকে তাজা খাবারের মতোই পুষ্টি প্রাপ্তি সম্ভব।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনা নিরাপদ খাদ্য ধারণাকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে নানা রকম কারণে মানুষ নদীর বাঁধ এবং পাকা সড়কের ওপরে আশ্রয় নেয়। রাসায়নিকের ব্যবহার বেড়েই চলছে। সরকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. মজুদের ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে, ব্যাখ্যা করো। ২

গ. খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত (Contaminated) হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়।

খ একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুদের ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। আর এই প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুদ রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে খাদ্যের মজুদ গড়ে ওঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি দিক হলো— খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার। এর যেকোনো একটি দিক নিশ্চিত না হলেই খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মোট দেশজ উৎপাদন কম হলে সরকার দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ করতে ব্যর্থ হয়। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

আবার, পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকাকে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্য নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন দেশের প্রতিটি পরিবার বা ব্যক্তির হাতে পুষ্টিকর এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বা অর্থ থাকবে। দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, নিম্ন আয় ইত্যাদি কারণে জনগণ প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করতে না পারলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া, খাদ্যে ভেজাল, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন ফরমালিন) এর ব্যবহার নিম্ন পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি কারণেও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কঠোর ও জনগণ সচেতন হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এদের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

১. **সরকারের করণীয়:** খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়েই যাতে দূষিত না হয়, তা সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে খাদ্য ভেজালবিরোধী অভিজান জোরদার ও কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। টিসিবির মাধ্যমে শুধু লাইসেন্সধারীদের নিকট ফরমালিন বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য দণ্ডদানের ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

২. **জনগণের ভূমিকা:** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণকে ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ভেজাল খাদ্য গ্রহণে ক্ষতিকর দিক ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা সম্পর্কে জানতে হবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতাদেরকে সাময়িক লাভের আশায় ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রি করা হতে বিরত থাকতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে দেশের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্র প্রচার করতে হবে।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশে কৃষিতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। হাওর, বাঁওড় ও উপকূলীয় এলাকায়ও এখন ধান চাষ হচ্ছে। সার, বীজ ও আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি অনেক কমেছে। এ ছাড়াও সরকার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যশস্য আমদানি, আপদকালীন মজুদ ও কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫; ড. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য আরো কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমতো খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।
খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহার। খাদ্য-নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

গ উদ্দীপকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করা হলো—

১. বাংলাদেশে কৃষি জমির পরিমাণ নিতান্তই সীমিত। তাই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষের জমির আওতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের হাওর-বাঁওড়, পানি নিষ্কাশন ও পানিসেচের ব্যবস্থা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় জমির লবণাক্ততা দূর করে কৃষি জমির আওতা বৃদ্ধি করেছে।

২. খাদ্যোৎপাদন লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ এবং কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার দেশে ১.৪ কোটি কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার ও খাদ্য আমদানির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকার বর্তমানে প্রতিবছর গড়ে ১০ লক্ষ মে. টন খাদ্য মজুদ করে।

৪. কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই মুক্ত, খরাসহিষ্ণু আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের জাত ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্পসময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উপরিউক্ত কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ—

১. ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আত্মপোষণমূলক চাষাবাদের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করা প্রয়োজন। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন শুরু করলে দেশে সার্বিকভাবে খাদ্যের যোগান বাড়বে।

২. খাদ্যের যোগান বিপুলভাবে বৃদ্ধির জন্য কৃষি-উৎপাদন কৌশলের যুগোপযোগী পরিবর্তন আবশ্যক। এক্ষেত্রে শস্যের ক্রমাবর্তন, বহুমুখী শস্যোৎপাদন বিন্যাস ইত্যাদি চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

৩. খাদ্যের সার্বিক যোগান বাড়ানোর জন্য ভুট্টা, আলু, ডাল, তেলবীজ, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদিও অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলোর উৎপাদন বাড়লে জনসাধারণের খাদ্যের মানও উন্নত হবে।

৪. খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের দ্বারাও খাদ্য-চাহিদার সাথে খাদ্যের যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। ভাত ও রুটির সাথে বেশি পরিমাণে আলু, সবজি ইত্যাদি গ্রহণ করলে চাল ও গমের চাহিদা কমবে এবং তার যোগান চাহিদার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৫. দেশে খাদ্যের যোগান বাড়াতে হলে কৃষকদের খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের উদ্ভাবিত নবতর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য দেশে-বিদেশে যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে তথ্য ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ ছাড়াও উপরিউল্লিখিত পদক্ষেপগুলোও প্রয়োগযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ১০ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশটি কৃষিপ্রধান হলেও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার। ভূমিহীন কৃষকের ব্যাপক উপস্থিতি, বর্গাচাষ প্রথা, খাদ্য গুদামজাতকরণের অভাব, অধিক পরিবহণ ব্যয় ইত্যাদি কারণে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকার টেকসই কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, অচিরে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১
খ. নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন কেন? ২
গ. খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকার আরো কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্য মিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত।

খ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও প্রয়োজন।
নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমৃদ্ধ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া আবশ্যক।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার জন্য কিছু কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব প্রথার বড় একটি ত্রুটি হলো— কৃষিখাতে ভূমিহীন কৃষকের অস্তিত্ব। ত্রুটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার কারণে এদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষকই ভূমিহীন। তারা খাদ্যশস্য বা অর্থের বিনিময়ে অন্যের জমি চাষ করে। চাষকৃত জমি নিজেদের না হওয়ায় তারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে কৃষিকাজ করে না। ফলে ফলন কম হয়। এ অবস্থায় খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়ে না এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে।

২. বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বর্গাচাষ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে চাষকৃত জমি বর্গাচাষির না হওয়ায় এবং জমির মালিক কর্তৃক যেকোনো সময়ে জমি থেকে উৎখাত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। এজন্য খাদ্য প্রাপ্তির পরিমাণ তেমন বাড়ে না।

৩. বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য গুদামজাতকরণের পর্যাপ্ততা নেই। খাদ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে তা ঠিকমতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদামজাত করা যায় না। সংরক্ষণজনিত ত্রুটির জন্যও গুদামজাতকৃত খাদ্যের একাংশ বিনষ্ট হয়।

৪. সাম্প্রতিক সময়ে ডিজেল ও গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় পরিবহণ ভাড়াও যথেষ্ট বেড়েছে। ফলে সব জায়গায় খাদ্যের যোগান ঠিকমতো দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি। উপরে উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য তা বিঘ্নিত হওয়ায় দেশে এখনও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে।

ঘ সাম্প্রতিককালে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার টেকসই কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সরকারের এ পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য যথেষ্ট নয়; এ ব্যাপারে আরো কিছু করণীয় আছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল বলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার ও তীব্রতা উভয়ই বাড়তে পারে। এর ফলে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ও তার মজুদ অনেকটাই কমে যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বৃহত্তর স্বার্থে চাল ও গমের বাফার স্টকের পরিমাণ বাড়ানো উচিত যাতে তার দ্বারা উদ্ভূত খাদ্য সংকট কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়।

https://teachingbd24.com

২. বাংলাদেশে যেহেতু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে হঠাৎ করে খাদ্যোৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসবে।

৩. দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে কৃষকদের খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের উদ্ভাবিত নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য দেশে-বিদেশে যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আইসিটি মারফত কৃষকরা তাদের কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসেই আবহাওয়া, কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদের নতুন নতুন কৌশল, উদ্ভিদের পরিপুষ্টিকর ও পানির ব্যবহার, কৃষিপণ্যের চাহিদা, বিদ্যমান দাম, পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিষেধক ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

সুতরাং, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও সরকার উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশের কৃষিতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের ফলে উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় এসেছে। দ্রুত বর্ধনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবনের ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দূর হয়েছে। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সরকার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যশস্য আমদানি, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিরাপদ খাদ্য কর্মসূচির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে খাদ্য কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ সম্প্রতি বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

কৃষিতে পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তির ধারণা বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারে শস্যের মানোন্নয়ন, নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক বীজ উদ্ভাবন, রোগ প্রতিরোধক ও উৎপাদনক্ষম গবাদিপশু ও পাখি প্রজননকেন্দ্র স্থাপন, ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ ইত্যাদি কৃষি প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত, কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, খাদ্যশস্য আমদানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. খাদ্য প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনই প্রধান নিয়ামক। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের যোগান একটি সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। তবে খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় খাদ্য আমদানি করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। বড় ধরনের দুর্যোগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতি বছর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য আমদানিকৃত খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়।

২. পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্পসময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করছে। সাথে সাথে তথ্য প্রযুক্তির মারফতে কৃষকরা তাদের ঘরে বসেই আবহাওয়া, কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদ কৌশল, উদ্ভিদের পুষ্টি উপকরণ, উদ্ভাবিত নতুন নতুন বীজ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে।

৪. অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত কিংবা আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যগুদাম থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত গৃহীত কর্মসূচি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের আয়তনে ৯০তম রাষ্ট্র হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে অষ্টম স্থানের অধিকারী। ২০১৭ সালের তথ্য মতে, এদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদানের। এসব পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহের জন্য যেসব ব্যবস্থা বর্তমান বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

এতদসত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনো গৃহীত হয়নি। এখনো অনেক মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রায় ২৩.৫% মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। একজন সুস্থ-সবল মানুষের জন্য দৈনিক ২২০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে শতকরা কতজনের ভাগ্যে তা জোটে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম অনেক বেশি। যা দিন দিন দরিদ্র জনগোষ্ঠী হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

তবে আশার কথা বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে অচিরেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষিখাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের পক্ষে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ মুদ্রাস্ফীতির হার ও মজুরি সূচক পরিবর্তনের হার:

বিষয়	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
মুদ্রাস্ফীতির হার	১৬.৭২	৭.৯১	৬.২৫	১৪.১১	৭.৭২	৫.২২
মজুরি সূচক পরিবর্তনের হার	১১.৮৫	১৮.৯০	৮.১৬	৭.২৪	১১.৮৯	১৪.৭৩

কাশেম স্যার ক্লাসে এসেই উপরের টেবিলটি এঁকে তথ্যসমূহ লিখলেন। এরপর ছাত্রদের দৃষ্টি টেবিলের দিকে আকৃষ্ট করে খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, গবেষণা জোরদার, ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। *[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝ? ১

খ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাধারণ ভোক্তা কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা সম্পর্কে কী ধরনের নির্দেশনা পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোন ধরনের কার্যক্রমের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

https://teachingbd24.com

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে দেশের সব মানুষ সব সময় বাহ্যিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বা খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ অশিক্ষিত, অসচেতন, স্বল্প শিক্ষিত। তাই এসব দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণের কণ্ঠস্বর থাকে দুর্বল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। দরিদ্র দেশের জনগণের এই অসচেতনতাকে পুঁজি করে অতিমুনাফালোভী, অসৎ ব্যবসায়ীরা আঙুল ফুলে রাতারাতি কলাগাছ হতে চায়। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণ সরকারের পাশাপাশি ভেজালবিরোধী সভা, সেমিনারের ব্যবস্থা, ভেজালবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

গ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

উল্লিখিত সূচিতে লক্ষ করা যায়, মানুষের মজুরি হারের অধিক পরিবর্তন হলেও মুদ্রাস্ফীতির হার বিগত সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১৬.৭২% যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে এসে কমে গিয়ে ৫.২২%-এ দাঁড়িয়েছে। এতে করে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণ কম পরিমাণ অর্থ নিয়ে অধিক পণ্য ক্রয় করতে পারবে।

অন্যদিকে, মজুরির হার ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ১১.৮৫% যা বেড়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এসে ১৪.৭৩%-এ দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, জনগণের মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক অর্থ খরচ করেও পণ্য ক্রয় করতে পারবে। দেশে একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেলে এবং মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে জনগণের জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। একই সাথে তারা প্রয়োজনমতো উপযুক্ত খাবার গ্রহণ করে উৎপাদনশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে এবং তাদের পরিবার সঠিক খাদ্য বা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। খাদ্য নিরাপত্তা ধারণায় সমাজের সকল মানুষের খাদ্যপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এটির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে যা উদ্দীপকের তথ্যে প্রতীয়মান হয়েছে।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকাই অগ্রগণ্য বলে আমি মনে করি।

এদেশের অধিকাংশ কৃষক অসচ্ছল। তারা অনেক সময় মূলধনের অভাবে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাই, সরকার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিনা শর্তে বা স্বল্প শর্তে ঋণ সহায়তা ও ভর্তুকি প্রদান করতে পারে।

সরকার নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে দেশে বিদ্যমান পলিসি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের সংশোধন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে শিক্ষার কারিকুলাম, স্বাস্থ্যনীতিমালা, পুষ্টি বিভাগ এসবের মধ্যে নীতিগত সামঞ্জস্য আনতে পারে। নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। উৎপাদিত বা সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান যাচাইকরণ, কারখানায় নজরদারি বাড়ানো, ফরমালিন ও কেমিক্যালযুক্ত ভেজাল খাদ্যদ্রব্য যাতে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সরকার জনসাধারণকে সচেতন করতে টেলিভিশন ও পত্রিকার মাধ্যমে এবং পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সংযুক্ত করে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকাই প্রধান, তবে খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণ ও বেসরকারি সংস্থাগুলোরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ এক সময় বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল। প্রতি বছরই ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হতো। ইদানীং সরকার কৃষকদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি দূর হয়েছে। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও অত্যাবশ্যকীয়।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমৃদ্ধ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

গ সরকার অনেক আগে থেকেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে তৎপর রয়েছে। এদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ:

১. জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

২. বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৩. খাদ্যোৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা এবং কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে।

৪. খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্পসময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৬. সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথমত, খাদ্যশস্য উৎপাদনে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে এর উৎপাদন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৯.৯৭লক্ষ মেট্রিক টন। আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন; যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার প্রতিবছর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা মজুত করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত ছিল ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

তৃতীয়ত, খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় খাদ্য আমদানি করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। তবে বড় ধরনের দুর্যোগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতি বছর দেশে বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়ে থাকে। এটি করা হয় খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্যোগকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানো এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয় ও নিরাপত্তা মজুত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। যা খাদ্য নিরাপত্তার একটি দিক বলা যায়।

https://teachingbd24.com

চতুর্থত, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে সে জন্য সরকার 'পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় ওএমএস, ফেয়ার প্রাইস কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৩.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'ক' দেশের জনগণ দরিদ্র, উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া দেশে প্রতিবছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু উক্ত দেশের জনগণ অতি মুনাফালোভী। শাকসবজি, ফলমূল সংরক্ষণে ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটায়। এরূপ ভেজাল খাবার খেয়ে দেশের যুবসমাজের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার এরূপ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং এনজিওরা সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সরকারও এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে প্রভাবিত হয়? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে 'ক' দেশের খাদ্য নিরাপত্তার দিকগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের কী ভূমিকা হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ খাদ্য প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনই প্রধান নিয়ামক হলেও খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খাদ্য আমদানি করতে হয়।

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। বড় ধরনের দুর্যোগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতি বছর দেশে বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। এটা করা হয় খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্যোগকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানো এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয় ও নিরাপত্তা মজুত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, যা খাদ্য প্রাপ্যতার দিকটি নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপক অনুসারে 'ক' দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক হিসেবে ভেজাল খাদ্যের দিকগুলো ফুটে উঠেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে জনসাধারণের ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বলে পরিচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন হুমকির সম্মুখীন।

ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এ সমস্যার দিকটি 'ক' দেশের বর্ণিত পরিস্থিতিতে লক্ষ করা যায়।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বেসরকারি সংস্থা: স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এ দেশে ব্যাপক। এ দেশের কিছু এনজিও সারাবিশ্বে রোল মডেল হিসেবে সফলতার সাথে কাজ করছে। তাই খাদ্য নিরাপদকরণেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশে খাদ্যে ভেজাল কেউ কেউ জেনে মেশায়, আবার অনেকে না জেনেও মেশায়। ভেজাল খাদ্যের উপাদানগুলো আমাদের শরীরে কী ক্ষতি করে তা সকলকে জানানোর ব্যবস্থা করতে পারে। আবার বিভিন্ন দিকনির্দেশনার মাধ্যমে জনগণকে ভেজালবিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত করা যায়। তারা সরকারকে ভেজালবিরোধী আইন তৈরিতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। জনগণের মাঝে ভেজাল নিরূপণকারী কিট সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে। পঁচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

জনসাধারণ: সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভেজাল নিরূপণকারী কিট না থাকায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ জানতে পারছে না। সাধারণ জনগণ যদি এই ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে অবশ্যই দেশ থেকে ভেজালের সমস্যা দূর হবে। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মুরাদ সাহেব ঢাকার কাওরান বাজারে রাতে মাছ কিনতে যেয়ে দেখেন মাছগুলো সব তাজা ও সতেজ। তিনি মাছওয়ালাকে প্রশ্ন করলেন, মাছগুলো কবে ধরা হয়েছে? মাছওয়ালা উত্তর দিল গতকাল। তিনি ফল বাজারে গিয়ে দেখলেন, তাজা তাজা আম যেন এখন গাছ থেকে পাড়া। কিন্তু তিনি ভাবলেন, এখন তো আমের সময় না। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ও ফল না কিনে বাড়ি ফিরলেন। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. মুরাদ সাহেব কেন মাছ ও ফল না কিনে বাড়ি ফিরলেন?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ খাদ্য যাতে পঁচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য যেন পঁচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা হলো খাদ্য সংরক্ষণ। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন।

গ ফরমালিনযুক্ত মাছ ও আম তথা ভেজাল খাদ্য দেখে মুরাদ সাহেব মাছ ও আম না কিনে বাড়ি ফিরলেন। কারণ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মিশানো এবং মাছ, মাংস, ফলমূল প্রভৃতি দ্রব্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে খাদ্যদ্রব্য অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। উল্লিখিত কথাগুলো চিন্তা করে মুরাদ সাহেব মাছ ও ফল না কিনে বাড়ি ফিরলেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সরকার: একটি দেশের সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজাল প্রদানকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। খাদ্যে ভেজালের উদ্দেশ্যে যে সকল উপাদান যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয়, তা আইনের মাধ্যমে বাতিল অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে। এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্যবসায়ী: ব্যবসায়ীরা খাদ্য নিরাপদকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাচ্ছে। এ দেশে খাদ্যে ভেজাল কেউ কেউ জেনে মেশায়, আবার অনেকে না জেনেও মেশায়। এ অবস্থায় দেশের সৎ ও ভালো ব্যবসায়ীরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জনসাধারণ: খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। অসাধু ব্যবসায়ীদেকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ইমরান সাহেব অফিস শেষে বাসায় ফেরার পথে রাস্তার পাশে ফলমূল, মাছ এবং সবজির বিশাল মজুত দেখে খুশি হন। কিন্তু কেনার সাহস পান না। কারণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছেন ফলমূল, মাছ এবং সবজি দীর্ঘসময় ধরে সতেজ এবং পচনরোধে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। জনমনে আতঙ্ক দূর করার জন্য সরকার 'Consumer Protection Act' এবং 'Food Act' সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। জনসচেতনতা সৃষ্টি, ভেজাল খাদ্য বর্জন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে বাধ্য করার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্যের উপযোগিতা কী? ১

খ. মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হওয়া খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমরান সাহেবের আতঙ্কের বিষয়টি কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনমনের আতঙ্ক কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কি না মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের সন্তোষজনক ও টেকসই যোগান, যা গ্রহণে সকল মানুষের সক্ষমতা রয়েছে, তাই খাদ্যের উপযোগিতা।

খ মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক হয়। এক্ষেত্রে দেশজ উৎপাদন দেশের জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, ভর্তুকি প্রদান, খাদ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের অংশগ্রহণ, সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। ফলে অধিক উৎপাদন খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ইমরান সাহেবের আতঙ্কের বিষয়টি ভেজাল খাদ্যের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

ফরমালিনযুক্ত মাছ ও আম তথা ভেজাল খাদ্য দেখে ইমরান সাহেব মাছ ও আম না কিনে বাড়ি ফিরলেন। কারণ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মিশানো এবং মাছ, মাংস, ফলমূল প্রভৃতি দ্রব্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে খাদ্যদ্রব্য অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি ল্যাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

ঘ সুন্দর, সুস্থ জাতি গঠনের জন্য নিরাপদ খাদ্য আবশ্যক। জনগণের আতঙ্ক কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'Consumer Protection Act' & 'Food Act' সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কাজ বাস্তবায়ন করেছে।

খাদ্যের ভেজাল রোধে সরকার নিরাপদ আইন ২০১৩ পাস করছে সরকার। এ আইনে খাদ্যে ভেজালের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ লক্ষ টাকার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে কিছুটা খাদ্য নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয় তৈরি হতে পারে।

জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার টেলিভিশন, পত্রিকা এবং পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বর্ণন্য করতে পারে। যার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ধরনের ভেজাল খাদ্য তৈরি ও বিপণন হতে সতর্ক হয়ে উঠেছেন। মাঠপর্যায়ে প্রতিটি স্তরে মান যাচাইয়ের জন্য মাঠকর্মী নিয়োগ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগত মান বাছাইকরণের জন্য সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে।

ফলে বলা যায়, জনগণের আতঙ্ক দূর করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ গ্রামে বসবাসকারী রহিম মিয়া একজন গরিব কৃষক। অন্যের জমি চাষ করে কোনোভাবে তিনি পরিবারের ভরণপোষণ করেন। এ বছর বন্যার পানিতে তার জমির ফসল ডুবে যায়। বন্যার ফলে খাদ্যশস্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ফলে রহিম মিয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রায় দিনই না খেয়ে কাটাতে হয়। অন্যদিকে, শহরে বসবাসকারী আফজাল হোসেন অসাধু মৌসুমি ফল বিক্রেতা। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে সে মৌসুমি ফলে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি মেশায়, যা মানুষের নানারকম রোগব্যাধি হওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। *[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে মজুত দ্বারা প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রহিম মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার কোন কোন দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন সমাজের সকল লোক শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার ক্রয়যোগ্যতার মধ্যে পেয়ে থাকে, তখন তাকে খাদ্য নিরাপত্তা বলা হয়।

https://teachingbd24.com

খ একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুদের ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। আর এই প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুদ রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে খাদ্যের মজুদ গড়ে ওঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে রহিম মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ভোগ এ বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়েছে।

রহিম মিয়া একজন গরিব কৃষক। অন্যের জমি চাষ করে পরিবারের ভরণপোষণ করে। কিন্তু বন্যায় তার চাষকৃত জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয়েছে। বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় রহিম মিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুত গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।

আবার, বন্যার ফলে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। রহিম মিয়া গরিব হওয়ায় তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে পারছে না। অর্থাৎ তার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নেই। ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রায় দিনই না খেয়ে কাটাতে হয়। এভাবে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অভাবে রহিম মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের খাদ্যের ভোগ বা ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, উদ্দীপকের আলোকে রহিম মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা এবং ভোগ —এই তিনটি দিক উপেক্ষিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নিতে পারে—

১. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকার উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর ভর্তুকি ও বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে।

২. খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার বন্ধুসুলভ দেশগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। খাদ্য মজুত বৃদ্ধি, গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য মজুত সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে সরকার।

৩. সরকার খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর হতে পারে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আফজাল হোসেনের মতো অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে সরকার আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। সরকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন— টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে খাদ্য ভেজালবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

সরকার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেশটির সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া সরকার নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের বিনিময়ে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, টিআর (টেস্ট রিলিফ), কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) এবং VGD & VGF ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

অতএব নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের ভূমিকা প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ১৮ শফিকুল মিয়া একজন মাছ ব্যবসায়ী। মাছকে দীর্ঘদিন ভালো রাখতে এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। তার এ মাছ না বুঝেই জনসাধারণ ক্রয় করে। এতে শফিকুল মিয়ার প্রচুর লাভ হয়। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. নিরাপদ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকুল মিয়ার কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্যের কার্যক্রমকে কীভাবে ধ্বংস করছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমৃদ্ধ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকুল মিয়ার কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্যের কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে ধ্বংস করছে। শুধু শফিকুল নয় তার মতো অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এ ধরনের অনৈতিক কাজ করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথোফেন, কাপড়ের রং, কীটনাশক যেমন- এন্ড্রিন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি। ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকাতে ব্যাপকভাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কপার সালফেট, কার্বনের ধোঁয়া, পটাশের লিকুইড সলিউশন এবং তাজা ও সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে। আম, কলা, খেজুর, পেঁপে, আনারস, মাল্টা, আপেল, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফলে ব্যবহৃত হচ্ছে- ফরমালিন, কার্বাইড, কীটনাশক ইত্যাদি। মাছে ফরমালিন, শাকসবজিতে কীটনাশক ও ফরমালিন, শুঁটকিতে ডিডিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। টমেটোতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফরমালিন। মিষ্টিতে কাপড়ের রং, এবং কৃত্রিম মিষ্টিদায়ক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি মুড়ি ও চিড়াতেও হাইড্রোজ, ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত প্যাকেটজাত খাদ্য যেমন— ফলের রস, স্ন্যাকসফুড, জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রং ব্যবহার করা হয় এবং সেমাই ও নুডলসে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

এক কথায় শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে মাছ-মাংস, ফলমূল, শাকসবজি, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে, গণমাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদনে ঢাকার বাজারে মৌসুমি ফলে ফরমালিন পরীক্ষার ফলাফল ও বিষাক্ত খাদ্যের ব্যাপকতার যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন ধ্বংসের সম্মুখীন।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, একটি দেশের সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন (টিসিবি) কে শক্তিশালী করতে পারে। এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য তথা ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

তৃতীয়ত, খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বিভিন্নভাবে দেশে উৎপাদন হয়। এসব উৎপাদন সরকার চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারে। আবার বিদেশ থেকে কোনো ভেজাল খাদ্য আমদানি করা হলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।

চতুর্থত, খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত বর্তমান যেসব আইন রয়েছে তার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে এবং কঠোর নতুন আইন তৈরি করতে হবে। সরকার সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজালের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে।

https://teachingbd24.com

পঞ্চমত, খাদ্যে ভেজালের উদ্দেশ্যে যে সকল উপাদান যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয়, সরকার তা আইনের মাধ্যমে বাতিল অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে।
এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও বহু লোক উক্ত খাদ্য সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে না। ফলে অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগছে। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হচ্ছে যা খাদ্য নিরাপত্তাকে আরো বিঘ্নিত করছে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন, মজুত ও আমদানি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১
খ. "খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে" ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির বহু লোক অনাহারে ভুগছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কৃষিক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি কি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে যথেষ্ট? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদিকে একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে।

খ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বা খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ অশিক্ষিত, অসচেতন, স্বল্প শিক্ষিত। তাই এসব দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণের কণ্ঠস্বর থাকে দুর্বল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। দরিদ্র দেশের জনগণের এই অসচেতনতাকে পুঁজি করে অতিমুনাফালোভী, অসৎ ব্যবসায়ীরা আঙুল ফুলে রাতারাতি কলাগাছ হতে চায়। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণ সরকারের পাশাপাশি ভেজালবিরোধী সভা, সেমিনারের ব্যবস্থা, ভেজালবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

গ খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম দিক খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বিঘ্নিত হওয়ায় উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশে বহু লোক অনাহারে ভুগছে।
খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার হলো খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এদের যে কোনো একটি বা সবকটি অর্জিত না হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এতে বিবেচ্য দেশে জনগণ অনাহার, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতিতে ভোগে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নতমানের খাবার থাকলেও উচ্চমূল্যের কারণে দরিদ্র জনগণ অনাহারে ভুগছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় শতকরা ২৩.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এদের স্বল্প আয় ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যের কারণে এই বিপুল দরিদ্র গোষ্ঠীর অধিকাংশই অনাহারে ভোগে। অর্থাৎ দেশটিতে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত হলেও খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা অর্জিত না হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশটির বহু জনগণ অনাহারে ভুগছে।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে যথেষ্ট; কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।
বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রকৃত অর্থে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন অবস্থা হতে অনেক দূরে রয়েছে। মূলত, খাদ্যশস্য বাদে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুল সরবরাহ, বেশিরভাগ সাধারণ লোকের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি এ অবস্থার জন্য দায়ী। তাই সরকারকে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মজুতকরণ ও আমদানি ছাড়াও আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন— কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি, বীজ ও জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি।
উদ্দীপকে দেখা যায়, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের মজুত বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে খাদ্য আমদানি করার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে দেশটিতে কৃষিপণ্য ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের উর্ধ্বগতি কমবে এবং তখন খাদ্যের মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালে চলে আসবে। অর্থাৎ, খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতার দিকটি অর্জিত হবে। আবার, বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র হওয়ায় কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান ও প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ, বীজ, সার ও উন্নত প্রযুক্তি প্রদান করা হলে এই বিশাল দরিদ্র কৃষক শ্রেণির আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। ফলশ্রুতিতে সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান ও ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হলে বাংলাদেশে খুব শীঘ্রই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২০ পপিকে তার মা স্কুলে টিফিনের সাথে একটি কমলালেবু দিল। কিন্তু পপি টিফিনটা খেলেও কমলালেবুটি আর খায়নি। সেটা ব্যাগেই থেকে যায়। প্রায় ১ মাস পরে তার মা ব্যাগ থেকে কমলালেবুটি বের করে এবং দেখতে পায় সেটি ঠিক আগের মতোই আছে। এতে কোনো পচন ধরে নাই। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১
খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের কোনো ভূমিকা আছে কী? মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা, যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।
খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহার। খাদ্য নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়।

গ উদ্দীপক অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক ভেজাল খাদ্যের দিকগুলো ফুটে উঠেছে।
খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে জনসাধারণের ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বলে পরিচিত। খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থ (ফরমালিন) মিশ্রণের ফলে খাদ্যটি বাহ্যিক দিক থেকে বহুদিন পর্যন্ত বেশ সহজে থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় পপিকে তার মা স্কুলের টিফিনের সাথে একটি কমলালেব দেন। কিন্তু ভুলবশত তা পপির ব্যাগে এক মাস রয়ে যায়। অথচ এত সময় পরেও কমলালেবুটি ঠিক আগের মতোই আছে। অর্থাৎ উক্ত কমলালেবুটি ফরমালিনযুক্ত ছিল। যা ভেজাল খাদ্যকেই নির্দেশ করে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নিরাপদ খাদ্যের ভেজাল ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, খাদ্য নিরাপত্তাকরণে জনসাধারণের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করা হলো।
ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানারকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি- এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধানে জনগণকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভেজাল খাদ্য ক্রয়ে বিরত থাকা।

https://teachingbd24.com

সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভেজাল নিরূপণকারী কিট না থাকায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ জানতে পারছে না। সাধারণত জনগণ যদি এই ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে অবশ্যই দেশ থেকে ভেজালের সমস্যা দূর হবে। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জানতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ভেজাল খাদ্য রোধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সচেতন শিক্ষিত মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। ভেজালের ব্যাপ্তি ও পরিণতি তথা ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন হলে আমাদের দেশ ভেজালযুক্ত খাবার হতে মুক্ত হতে পারবে। শুধু একা সরকারের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, ভেজাল খাদ্য রোধে তথা খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারের পাশাপাশি জনসাধারণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

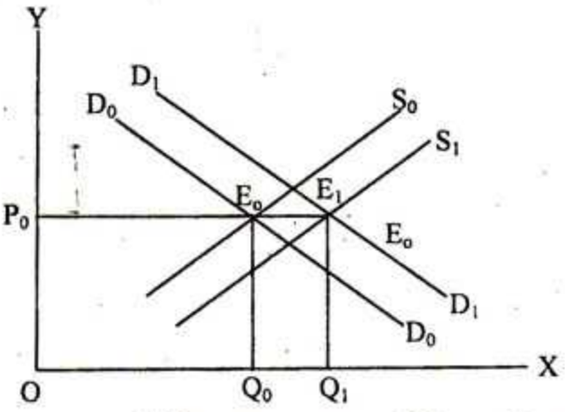

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. পুষ্টিকর খাদ্য কী? ১

খ. কীভাবে ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ সম্ভব? ২

গ. চিত্রে E_0 বিন্দু থেকে E_1 বিন্দুতে স্থানান্তর কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি কোন কোন উপাদানসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্যে আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি-এই ছয়টি উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকে, তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে।

খ নিম্নরূপ উপায়ে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা যেতে পারে:
গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা,আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ভেজালবিরোধী অভিযান শক্তিশালীকরণ,ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিকতা সৃষ্টি করা, ভেজাল খাদ্যের কুফল সম্পর্কে পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলা। সর্বোপরি বলা যায়, সুস্থ, সবল, কর্মঠ নাগরিক গড়ে তুলতে খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

গ উল্লিখিত চিত্রে E_0 হতে E_1 বিন্দুতে স্থানান্তর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তাকে ইঙ্গিত করেছে।
খাদ্য নিরাপত্তা হলো নির্ভরশীল স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান, যা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কোনো দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন চাহিদা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে যোগান বৃদ্ধি করতে হবে। এতে দামস্তর স্থির থেকে খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়ক্ষমতা জনগণের আয়ের মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ, খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হবে।
উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D_0 থেকে D_1 হয়। এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য যোগান S_0 থেকে S_1 করা হয়। এতে E_1 বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয়। এর ফলে দামস্তর P_0 স্থির থেকে উৎপাদন Q_0 হতে বেড়ে Q_1 হয়। অর্থাৎ, খাদ্যের প্রাপ্যতা $(OQ_1 - OQ_0)$ বা Q_0Q_1 পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দামস্তরও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত চিত্রে E_0 হতে E_1 বিন্দুতে স্থানান্তর খাদ্য নিরাপত্তাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি তথা খাদ্য নিরাপত্তা একটি দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।
সাধারণত খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহারের যেকোনো একটি বা সবকটি অর্জিত না হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই যদি একটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়, তবে বলা যায় উক্ত দেশে খাদ্য উৎপাদন বা যোগান যথেষ্ট। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকায় জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে এবং খাদ্য ভেজালমুক্ত। সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের প্রাপ্যতাকে বোঝায়। এই প্রাপ্যতা নির্ভর করে দেশজ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, সাহায্য ও মজুদের ওপর। দেশে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও যদি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ তা ক্রয়ের ক্ষমতা না থাকে, তবে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আবার, খাদ্য যদি ভেজালমুক্ত না হয় তথা নিরাপদ না হয় তবেও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।
আবার, খাদ্য নিরাপত্তা খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা ও পুষ্টিগুণ ছাড়াও কিছু আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিষয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য অনিরাপত্তা বৈশ্বিক পানি সংকটের জন্য দেখা দেয়। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ইত্যাদি অনেক দেশেই পানির মজুদ ক্রমেই কমে যাচ্ছে; ভূগর্ভস্থ পানি ব্যাপকভাবে উত্তোলন ও পানি সেচ এ অবস্থার জন্য দায়ী। বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তনও খাদ্য নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ। পৃথিবীব্যাপী উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে যার ফলে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ, বনজ সম্পদ ও পানির যোগান বিরূপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। তাছাড়া সব দেশেই নিবিড় চাষাবাদের কারণে জমির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ঘটায় ভূমির উর্বরতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণও কমছে। তাছাড়া দেশে ব্যাপকভাবে নগরায়ন এবং রাস্তাঘাট, বাঁধ, বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের ফলে কৃষিকাজের জন্য অতি মূল্যবান উপাদান তথা জমির পরিমাণ কমছে। এটিও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। পরিশেষে বলা যায়, খাদ্য নিরাপত্তা ওপরে উল্লিখিত বিষয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ নদীভাঙনে একমাত্র সম্পত্তি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে রহিম মিয়া ঢাকার মতিঝিলের ফুটপাতে তিন ছেলেমেয়েসহ পাঁচজনের পরিবার বস্তিতে মাথাগোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। তার ও স্ত্রীর উপার্জন দ্বারা সবার জন্য ঠিকমতো খাবার জোগাড় করতে পারে না। তার স্ত্রী যে বাসায় কাজ করেন, সে বাসা হতে অনেক শাক-সবজি, ফল বেগম সাহেবা তাকে দিলে তিনি বাসায় নিয়ে আসেন। কিন্তু তার সন্তানেরা এসব খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. স্থিতিশীলতা অর্জন খাদ্য নিরাপত্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শেষোক্ত সমস্যা সমাধানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা— কার কী ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যই নিরাপদ খাদ্য।

খ স্থিতিশীলতা অর্জনও খাদ্য নিরাপত্তার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।
পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য ক্রয়ে বা সংগ্রহে নিশ্চিতভাবে সমর্থ এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্তি বা সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াকে স্থিতিশীলতা বোঝায়। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এটি একটি বড় সমস্যা হলেও ধনী দেশেও এ সমস্যা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে অনেক দরিদ্র লোক যেমন তিন বেলা প্রয়োজনীয় খাবার সংস্থান করতে পারে না, তেমনি ধনী সমাজেও অনেকে এরূপ অভুক্ত থাকে। তাই স্থিতিশীলতা খাদ্য নিরাপত্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার এই তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
খাদ্যের প্রাপ্যতা ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে। আবার, খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ হলো ক্রয়যোগ্যতা এবং মৌলিক পুষ্টিজ্ঞানের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ হলো খাদ্যের ব্যবহার। এখন কোনো দেশে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে, কিন্তু তা যদি জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে তাকে কিংবা পুষ্টিজ্ঞান অনুযায়ী তার ব্যবহার নেই, তাহলে বলা যায় ওই দেশটিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, নদীভাঙনে উচ্ছেদ হওয়া রহিম মিয়া ও তার স্ত্রীর উপার্জনে পরিবারের সবার জন্য ঠিকমতো খাবার জোগাড় করা সম্ভব হয় না। এতে করে ক্রয়যোগ্যতার অভাবে খাদ্যের প্রাপ্যতার দিকটি বিঘ্নিত হয়। আবার, তার স্ত্রী যে বাসায় কাজ করেন তাদের দেওয়া শাকসবজি ও ফল খেয়ে সন্তানেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে খাদ্যের ব্যবহারের দিকটিও গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

ঘ উদ্দীপকে শেষোক্ত সমস্যাটি ভেজাল খাদ্যকে নির্দেশ করে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।
একটি দেশের সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। আবার, বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনকে (টিসিবি) শক্তিশালী করে ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে। এসব ভেজাল খাবার যেমন বিভিন্নভাবে দেশে উৎপাদন হয় তেমনি বিদেশ থেকেও আমদানি করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে সরকার চাইলেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।
তাছাড়া খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত বর্তমান যেসব আইন রয়েছে তার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে এবং কঠোর নতুন আইন তৈরি করতে হবে। এতে সরকার সংসদে ভেজালবিরোধী আইন পাস করে কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজালের সাথে জড়িতদের শাস্তি দিতে পারে। পাশাপাশি খাদ্য ভেজালের যেসব উপাদান যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয় সরকার তা আইনের মাধ্যমে বাতিল করতে পারে।
এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করছে।
[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১
খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট কিনা— ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ খাদ্য যাতে পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যেন পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার আর যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা নিম্নরূপ—
১. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
২. কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ও স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৩. দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, এ সময়ে দুর্গত মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের। এরূপ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে সরকার।
৫. দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্ন আয় ও দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যথা— ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং, গ্রাটিউইটাস রিলিফ, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রহমান সাহেব ২০১৪ সালে দৈনিক মজুরি পেতেন ২০০ টাকা, তখন খাদ্যের দামস্তর ছিল ২০ টাকা। ২০১৮ সালে মজুরি পান ৪০০ টাকা এবং খাদ্যের দামস্তর ২৫ টাকা। এ সময় খাদ্য উৎপাদন কম থাকা সত্ত্বেও আমদানি করে খাদ্য মজুদ করা হয়। তবে এখনো নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হয়নি। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ।
[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১
খ. কীভাবে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে ২টি সময়ের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা পরিমাণ নির্ধারণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুসারে সরকার কোন ধরনের খাদ্য জনগণের জন্য নিশ্চিত করতে চায়, যা জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হবে।
খাদ্য নিরাপত্তা মূলত বিঘ্নিত হয় যখন জনগণের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য পায় না। অর্থাৎ, খাদ্যের যোগান যখন চাহিদার চেয়ে কম হয় তখন খাদ্য নিরাপত্তায় ঘাটতি দেখা দেয়। যখন দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তখন খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্যের চাহিদা ও যোগান সমান হবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এভাবে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

গ নিচে উদ্দীপক হতে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হলো—
কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমান দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অন্যতম নিয়ামক হলো ব্যক্তির আয়। যদি কোনো ব্যক্তির আয় বেড়ে যায় তাহলে তার খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতাও বেড়ে যায়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের রহমান সাহেব ২০১৪ সালে ২০০ টাকা মজুরি পেতেন এবং তখন খাদ্যের দামস্তর ছিল ২০ টাকা। ২০১৮ সালে তার মজুরি দ্বিগুণ হয়ে ৪০০ টাকা হলেও দামস্তর অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ টাকা হয়েছে। ২০১৪ সালে সে ১০ একক খাদ্য ক্রয় করতে পারলেও ২০১৮ সালে তার ক্রয়যোগ্যতা বেড়ে ১৬ একক হয়েছে।

ঘ জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপদ খাদ্য সরকার নিশ্চিত করতে চায়।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকার উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর ভর্তুকি ও বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে।

খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে বন্ধুসুলভ দেশগুলোর সাথে। এ লক্ষ্যে খাদ্য মজুত বৃদ্ধি, গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য মজুত সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে সরকার। খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর হতে পারে।

সরকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে খাদ্য ভেজালবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। সরকার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেশটির সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া সরকার নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের খাদ্যশস্যের বিনিময়ে গ্রামীন যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, টিআর (টেস্ট রিলিফ) কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) এবং VGD & VGF ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৫ 'ক' একটি জনবহুল ও কৃষিপ্রধান দেশ। একসময় দেশটির অধিকাংশ লোক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার ছিল। ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষ, উৎপাদন স্বল্পতা, সংরক্ষণের সমস্যা, ক্রয়ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি কারণে এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে 'ক' দেশে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণসহ কৃষি গবেষণার মাধ্যমে নতুন দ্রুতবর্ধনশীল, কষ্টসহিষ্ণু জাতের ফসল উদ্ভাবন করা হয়েছে। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১

খ. খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে খাদ্য মজুদ দ্বারা প্রভাবিত হয়?—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেসব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তা উল্লেখ কর। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর কোন কোন বিষয় সম্পৃক্ত করা যায়?—উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুদের ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। আর এই প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুদ রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে খাদ্যের মজুদ গড়ে ওঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকের আলোকে তা আলোচনা করা হলো —

খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। দেশের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হয়, যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দেশে খাদ্যের সামগ্রিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটানো যায়।

উদ্দীপকের 'ক' দেশ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃষিখাতের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুকি ও সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও উন্নত বীজ সরবরাহ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ভর্তুকিসহ কৃষিবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে অভিনব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করছে। তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম এবং গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পসময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত উদ্ভাবন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, আধুনিক সংরক্ষণ সুবিধাসহ উৎপাদিত ফসলের বিপণন সহজ করার মধ্য দিয়ে কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া উপকূল ও মঙ্গা এলাকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পরমাণু ও প্রাণপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত বর্ধনশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ফসল উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা 'ক' দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও আর যে যে বিষয় সম্পৃক্ত করা যায় তা নিম্নরূপ—

প্রথমত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার ও তীব্রতা উভয়ই বাড়তে পারে। এর ফলে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ও তার মজুদ অনেকটাই কমে যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বৃহত্তর স্বার্থে চাল ও গমের বাফার স্টকের পরিমাণ বাড়ানো উচিত যাতে তার দ্বারা উদ্ভূত খাদ্য সংকট কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, নানা সীমাবদ্ধতার কারণে হঠাৎ করে খাদ্যোৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসবে।

তৃতীয়ত, দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে কৃষকদের খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের উদ্ভাবিত নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য দেশে-বিদেশে যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আইসিটি মারফত কৃষকরা তাদের কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসেই আবহাওয়া, কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদের নতুন নতুন কৌশল, উদ্ভিদের পরিপুষ্টিকর ও পানির ব্যবহার, কৃষিপণ্যের চাহিদা, বিদ্যমান দাম, পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিষেধক ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

চতুর্থত: খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের দ্বারাও খাদ্য-চাহিদার সাথে খাদ্যের যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। ভাত ও রুটির সাথে বেশি পরিমাণে আলু, সবজি ইত্যাদি গ্রহণ করলে চাল ও গমের চাহিদা কমবে এবং তার যোগান চাহিদার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

সুতরাং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্দীপকের 'ক' দেশে খাদ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৬ প্রায়ই পত্রিকায় খবর ছাপা হয়-প্যাকেটের দুধ খেয়ে শিশুর মৃত্যু, রুটি খেয়ে স্কুল ছাত্ররা অসুস্থ, মিষ্টি খেয়ে বিয়েবাড়িতে অজ্ঞান ইত্যাদি নানা ধরনের খবর। এমন কি হোটেলে খাবার খেয়ে একত্রে বহু লোকের মৃত্যুর খবর কম শোনা যায় না। এসব খবর আর শুনতে নারাজ সাবেক সচিব শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, দেশের সকল জনসাধারণ ও সরকারের আন্তরিকতাই পারে এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে। *[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

Teachingbd24.com

ক. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা কী? ১
খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করে? ২
গ. কীভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত খাবারসমূহকে ভেজালমুক্ত রাখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর খাবারের এ ধরনের ভেজাল প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে।

খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে খাদ্যের ওপর চাপ হ্রাস পায়, যা কি না খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করে।
বাংলাদেশে যেহেতু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে হঠাৎ করে খাদ্যোৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হয় না, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত খাবারসমূহ হলো প্যাকেটের দুধ, রুটি, মিষ্টি, ও হোটেলের খাবার। এসব খাবারে ভেজাল থাকায় মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে উক্ত খাবারসমূহকে ভেজালমুক্ত রাখা যায়।
খাদ্যে ভেজাল শুধুমাত্র আইন করেই বন্ধ করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন হয় জনগণের সচেতনতা, সাবধানী ব্যবসায়ী ও সৎ কর্মচারীদের। খাদ্যে ভেজাল রোধ করার জন্য খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়েই যাতে তা কলুষিত না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যদ্রব্য মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে একেক শ্রেণির খাদ্য একেক জায়গা থেকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে উন্নতমানের খাদ্যের সাথে নিম্নমানের খাদ্যের সংমিশ্রণ রোধ করা যায়। খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে ন্যূনতম কীটনাশক ব্যবহার করলে খাদ্য দূষণের হার অনেক কমে যাবে। এছাড়া ভেজাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
সর্বোপরি জনসাধারণ, সরকার, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উদ্দীপকের এসব খাবার ভেজালমুক্ত রাখা যায়।

ঘ শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমেই খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই খাবারে ভেজাল প্রতিরোধে জনসচেতনা সৃষ্টির বিকল্প নেই বলেই আমি মনে করি। নিচে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো—
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক কিছু কিছু আইন প্রণীত হলেও তার যথাযথ প্রয়োগ নেই বললেই চলে। বস্তুত এত জনবহুল এবং দরিদ্র দেশে কেবল আইন করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই ভেজাল রোধে জনসচেতনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ফরমালিন ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কাপড়ের রং, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য যে বিপন্ন ও হুমকির মধ্যে পড়ছে। অধিকাংশ জনগণই এ ব্যাপারে সচেতন নয়। জনগণ যদি খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে সচেতন হতো তাহলে খাদ্যের ভেজাল অনেক কমে যেত।
বর্তমানে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ঘটেছে তাতে এককভাবে সরকারের পক্ষে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত সম্ভব নয়। বরং সরকারের সাথে দেশের জাতি, বর্ণ, ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে এক সাথে কাজ করতে হবে। যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল করে জনগণের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। তাদেরকে দ্রুত খুঁজে বের করে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান নিশ্চিতকরণে জনগণকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জনসাধারণ বিভিন্ন সংগঠনের অধীনে সংগঠিত হয়ে ভেজালবিরোধী প্রচারণা ও অভিযান চালানো, ভেজাল পণ্য বর্জন ও ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুললে খাদ্যে ভেজালের হার অনেকটাই থাকবে না।
উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে জনসচেতনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ 'ক' দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনগণেরই শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো খাদ্য নিরাপত্তার অভাব। তাই টেকসই কৃষিব্যবস্থা, ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি, উফশী প্রযুক্তিসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণে সরকার তৎপর। এসব কর্মসূচি গ্রহণ করায় কৃষি উৎপাদন বাড়লেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে শতভাগ সাফল্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখা প্রয়োজন খাদ্যের যোগান থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয় না। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্যের জন্য পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য প্রয়োজন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. BSTI এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় বেশি প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো ছাড়া আর কী কী প্রচেষ্টা 'ক' দেশের সরকার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গ্রহণ করতে পারে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খাদ্যের যোগান থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয় না'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSTI এর পূর্ণরূপ হলো-Bangladesh Standards and Testing Institution.

খ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা সম্ভব।
দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় যখন খাদ্যের চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ কম হয়। খাদ্যের যোগান মূলত নির্ভর করে এর উৎপাদনের ওপর। অর্থাৎ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এর যোগান বাড়বে আর খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস পেলে এর যোগানও হ্রাস পাবে। তাই বলা যায়, খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে হলে এর যোগান বাড়াতে হবে যা কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই সম্ভব।

গ 'ক' দেশের সরকার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য টেকসই কৃষি ব্যবস্থা, ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি, উফশী প্রযুক্তিসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উল্লিখিত এসব পদক্ষেপ ছাড়া 'ক' দেশের সরকার আর যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে নিচে তা উল্লেখ করা হলো-
বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ এবং তার মজুদ দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে দেশের স্বার্থে চাল ও গমের বাফার স্টকের পরিমাণ বাড়ানো উচিত, যাতে তার দ্বারা উদ্ভূত খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলা করা যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশের কৃষকদের বেশিরভাগই আত্মপোষণের জন্য চাষাবাদ করে বলে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন শুরু করলে সার্বিকভাবে খাদ্যের যোগান বাড়বে। আর কৃষকদের এ কাজে সরকারই উদ্বুদ্ধ করতে পারে।
উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপের সাথে 'ক' দেশের সরকার গ্রহণ করতে পারে।

ঘ খাদ্যের যোগান থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপের সমন্বিত প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো-
খাদ্য নিরাপত্তা বলতে সকল মানুষের সমগ্র জীবনের কার্যকর ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে বোঝায়। যখন কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হয় তখন খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তাই খাদ্য নিরাপত্তাকরণে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হলে কৃষকেরা ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হয়। আবার দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এসব ফসলের দ্রব্যমূল্য কম থাকে, ফলে দেশের সাধারণ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। এতে খাদ্যে নিরাপত্তা ঘটবে।
অন্যদিকে, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়াতে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিয়ে লাভবান হয়ে থাকেন। কেননা খাদ্যের যোগানই যেখানে অনেক সমস্যা সেখানে মান নির্ধারণ বা মান যাচাইকরণ অনেকের নিকট অপ্রাসঙ্গিক। এমতাবস্থায় বর্তমানে

https://teachingbd24.com

ভেজাল খাদ্য দূরীকরণে সরকারি, বেসরকারি সহায়তার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি আবশ্যক। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য আমদানির মাধ্যমেও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।
উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, খাদ্যের যোগান নিশ্চিতের পাশাপাশি উক্ত কর্মকাণ্ডগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রহিম সাহেব বাজার হতে ৪টি আনারস ক্রয় করেন। সম্প্রতি তিনি সপরিবারে ঈদের ছুটিতে বাড়ি চলে যান। ১৫ দিন বাড়িতে অবস্থান করার পরে বাসায় ফিরে আসেন। এসে দেখেন ১৫ দিন পূর্বে ক্রয়কৃত ৪টি আনারস নষ্ট হয়নি। এতে তার বাচ্চারা খুশি হলেও তিনি ও তার স্ত্রী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১
খ. কখন খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে রহিম সাহেবের আনারস নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কী? ৩
ঘ. ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে খাদ্য কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ একটি দেশে খাদ্য প্রাপ্তি অপর্যাপ্ত হলে, জনসাধারণ খাদ্য ক্রয়ে অক্ষম হলে কিংবা ভোগকৃত খাদ্যাদি যথেষ্ট পুষ্টি সম্পন্ন না হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
সাধারণত খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহারে এই তিনটি বিষয়ের ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে। এর যে কোনো একটি বিঘ্নিত হলেই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এছাড়াও প্রতিকূল আবহাওয়া, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পরিবহন ধর্মঘট, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার পথে বাধা হতে পারে।

গ উদ্দীপকে রহিম মিয়ার ক্রয়কৃত আনারস ১৫ দিন পরেও নষ্ট না হয়ে পূর্বের মতোই আছে। এ বিষয়টি ভেজাল খাদ্যকে নির্দেশ করে।
বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবেই বেড়ে চলছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণ জনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তাই বিভিন্নভাবে ভেজাল খাদ্য তৈরি হচ্ছে। কমলালেবু, পেঁপে, আপেল, আনারস, পাকা আম ইত্যাদি সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয় কলা দ্রুত পাকাতে ইথিলিন, মিষ্টিতে স্যাকারিন, শুঁটকী মাছে কীটনাশক ও ডিডিটি, দুধের সাথে পাউডার ও পানি এবং জুস ও জেলির সাথে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে দেখা যায়, শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়।
সুতরাং বলা যায়, খাদ্যে ভেজাল থাকার কারণেই রহিম সাহেবের ক্রয়কৃত আনারস আগের মতোই রয়েছে।

ঘ ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে আইন প্রণয়ন, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।
সাধারণত যে খাদ্য ভক্ষণ করলে স্বাস্থ্যে কোনো ক্ষতি হয় না, তাকে ভেজালমুক্ত খাদ্য বলে। কিন্তু অনেক সময় কিছু অসাধু ও লোভী ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফার লোভে খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে থাকে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পুষ্টিহীন ও নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন করে। যা ভক্ষণ করলে ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগ হতে পারে। তাই ভেজাল খাদ্য বন্ধে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাদের আইনের আওতায় এনে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়রোধে সবসময় মোবাইল কোর্ট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রীর দোকান, হোটেল, ফলের দোকান, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা ইত্যাদিতে নিয়মিত ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যায়। এসব ব্যবস্থা ছাড়াও সরকার খাদ্যে ভেজাল মেশানোর উদ্দেশ্যে যেসব উপাদান যেমন ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথোফেন ইত্যাদি ব্যবহার হয়, সেগুলোর আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়েই যাতে তা কলুষিত না হয় সে ব্যাপারে সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দূরীকরণ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব রাশেদ খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন দেশে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় ভেজাল খাদ্য বিক্রি করছে। ভেজাল খাদ্য জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অধিক হারে বাড়িয়ে দিচ্ছে। *[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১
খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খাদ্য ভেজালমুক্তকরণে সরকার ও জনগণের ভূমিকা কীরূপ হওয়া উচিত? ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যেনো পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা।
খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক কারণে সব খাদ্যই পচে নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন কারণে খাদ্য নষ্ট হতে পারে। খাদ্য যাতে পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

গ শিক্ষক জনাব রাশেদ ক্লাসে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।
নিরাপদ খাদ্য ভোগের মাধ্যমে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন-খনিজ, আমিষ, শর্করা, চর্বি প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করা যায়। এসব পুষ্টির মাধ্যমে মানুষের শারীরিক বিকাশ ও মানসিক দৃঢ়তা বাড়তে থাকে।
নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি সংগৃহীত হয়, পাওয়া যায় পরিমিত পুষ্টি। ফলে শরীর হয় সতেজ ও প্রাণবন্ত কোনো রোগ সহজে আক্রমণ করতে পারে না। কেননা নিরাপদ খাদ্য শরীরের এন্টিবডি তৈরি করে, যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য মানুষের শারীরিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশও ঘটায়, বাড়ায় মানসিক দৃঢ়তা। ফলে বেড়ে যায় প্রতিযোগিতার ক্ষমতা। বাংলাদেশে কোনো বিশেষ ব্র্যান্ডে আয়োডিন যুক্ত লবণের বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'যে লবণে মাথা খুলে' সত্যিই নিরাপদ খাদ্য ব্রেইন বা মাথা গঠনে ভূমিকা রাখে। কথায় বলে, 'সুস্থ দেহ সুন্দর মন।' নিরাপদ খাদ্য শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং সুস্থ শরীর সুন্দর মন নিশ্চিত করে। তাই সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন।

ঘ সমাজে ভেজালবিরোধী কার্যক্রমে সরকার ও জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
সরকার : একটি দেশের সরকার সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজাল বিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। আবার খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বিভিন্নভাবে দেশে উৎপাদন হয়। এসব উৎপাদন সরকার চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারে। সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজাল প্রদানকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

https://teachingbd24.com

জনসাধারণ : জাতীয়, আঞ্চলিক এবং এলাকাভিত্তিক ভোক্তা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (CAB) এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শাখা খুলে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। জন্য গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। জনসাধারণ বিভিন্ন সংগঠনের অধীনে সংগঠিত হয়ে হাট-বাজারে ভেজালবিরোধী প্রচারণা ও অভিযান চালাতে পারে। খাদ্য ভেজালকারী কৃষক বা বিক্রেতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা কিংবা ভেজালকারী কৃষক বা বিক্রেতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা কিংবা ভেজালকারীকে আইনের আশ্রয়ে সোপর্দ করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জনগণ দেশে বিদ্যমান সব ধরনের ভেজাল খাদ্য, পানীয় ও ফল ক্রয় ও খাওয়া বর্জন করতে পারে। এতে করে এসব খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে বাজারে নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় শুরু হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজে ভেজালবিরোধী কার্যক্রমে সরকার ও জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ আ. আলিম ভ্যান চালিয়ে যে টাকা আয় করে তা চাল, ডাল, তেল, খড়ি ইত্যাদি কিনতে ব্যয় হয়ে যায়। সে ছেলেমেয়েদের জন্য মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্যের কিছুই কিনতে পারে না। এ জন্য তার পরিবার অপুষ্টির শিকার। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন কেন? ২

গ. আ. আলিমের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নেই কেন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আ. আলিমের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত হয় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও অত্যাবশ্যকীয়।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমৃদ্ধ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের আ. আলিমের পরিবারে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি।

খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলতে বোঝানো হয়, পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির উপযুক্ত সম্পদ থাকা। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বরং খাদ্যপ্রাপ্তি জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে। দেশে আয়বৈষম্য, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যাহত হওয়ায় দেশের বেশিরভাগ সম্পদ এক শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। পক্ষান্তরে দেশের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছে। ফলে দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ক্রয়ক্ষমতার অভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

উদ্দীপকের আ. আলিমও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত একজন শ্রমিক। তার অর্জিত অর্থ চাল, ডাল, তেল, খড়ি কিনতেই ফুরিয়ে যায়। বাজারে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা সত্ত্বেও ক্রয়ক্ষমতার অভাবে তার পরিবারকে অপুষ্টির শিকার হতে হচ্ছে।

ঘ আ. আলিমের পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত ও পুষ্টিকর খাবারের যোগান থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক দরিদ্রতা তথা খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। তাই দেশের দারিদ্র্য অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে মানুষের আয়স্তর বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভূমিহীনদের অগ্রাধিকার প্রদান, অর্থায়নের ব্যবস্থা করা, কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া কৃষি আধুনিকীকরণ ও দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

দরিদ্র্যতা নিরসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্র তৈরি হলে আ. রহিমের মতো দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে।

কাজেই বলা যায়, উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গৃহীত হলে খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা অর্জিত হবে যা আ. আলিমের মতো অসংখ্য পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের অপুষ্টি থেকে মুক্তি দিবে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ আহাদ আলী গ্রামে বাস করে। তার ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও অনেক। সে সবার জন্য ঠিকমত খাবার যোগাড় করতে পারে না। তাছাড়া খাদ্যশস্য যা পাওয়া যায় তার দামও বেশি। ফলে তাকে অনেক কষ্টে দিন যাপন করতে হয়। সব মিলিয়ে আহাদ আলী খাদ্যসংকটের মধ্যে রয়েছে। সরকার যদি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্য সহজলভ্য করার ব্যবস্থা নেয় তাহলে আহাদ আলীসহ অনেকেরই খাদ্য কষ্ট লাঘব হবে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. খাদ্যনিরাপত্তা বলতে কি বুঝ? ১

খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ২

গ. আহাদ আলী কী কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে? ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে সরকারের কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে দেশের সকল মানুষ সব সময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজন মাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।

খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি দিক। যথা— খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহার। খাদ্য নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়।

গ উদ্দীপকের আহাদ আলী খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্য প্রাপ্যতা ও ক্রয় যোগ্যতা বিঘ্নিত হবার কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেসব দ্রব্যসামগ্রী অত্যাবশ্যক তার মধ্যে খাদ্য প্রধান। এজন্য অতি প্রয়োজনীয় এ দ্রব্যের উৎপাদন, প্রকৃতি ও মান এবং প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের প্রাপ্যতা, জনসাধারণের খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা তথা খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার; এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি উদ্ভব হয়েছে। এর যেকোনো একটির অনুপস্থিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হতে পারে।

উদ্দীপকের আহাদ আলী গ্রামে বাস করেন। তার ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার দরুন সে অনুপাতে তিনি খাদ্য জোগাড় করতে পারেন না। গ্রামে খাদ্যের উৎপাদন কম হওয়া এবং প্রয়োজন মাফিক খাদ্যের মজুদ কম থাকাই মূলত এ সমস্যার সৃষ্টি করে। এখানে আহাদ আলীর খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আবার খাদ্যের যোগান অপেক্ষা জনসংখ্যা বেশি থাকার দরুন গ্রামে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রয় ক্ষমতা কম থাকার কারণে আহাদ আলী উচ্চ মূল্যে পরিবারের প্রয়োজনীয় খাবার ক্রয় করতে পারছেন না। এভাবে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অভাবে আহাদ আলীর পরিবারের খাদ্যের ভোগ বা ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে।

সুতরাং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা খাদ্য নিরাপত্তার এ দুটি দিক বিঘ্নিত হওয়ার কারণেই আহাদ আলী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নিতে পারে—

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকার উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর ভর্তুকি ও বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে। খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার বন্ধুসুলভ দেশগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। খাদ্য মজুত বৃদ্ধি, গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য মজুত সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে সরকার।

সরকার খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর হতে পারে। সরকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন– টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে খাদ্য ভেজালবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। এছাড়াও সরকার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেশটির সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া সরকার নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের বিনিময়ে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, টিআর (টেস্ট রিলিফ), কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) এবং VGD & VGF ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

অতএব নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের ভূমিকা প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ৩২ ঘটনা-১: মাসুদ ফলের আরোতে গিয়ে দেখতে পায় ফল বিক্রেতা কার্বাইড দিয়ে ফল পাকাচ্ছে।

ঘটনা-২: মাসুম হোটেলে খেতে গিয়ে দেখে কয়েক দিনের বাসি পোড়া তেল দিয়ে রান্না হচ্ছে।

ঘটনা-৩: নারিস সবজি বাজারে গিয়ে দেখতে পারে বেশির ভাগ সবজি? সার প্রয়োগ করে উৎপাদিত।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে কী করা প্রয়োজন? ১

খ. খাদ্য আমদানি করতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোনটির নেতিবাচকতা প্রকাশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের কীরূপ ভূমিকা হতে পারে? ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

খ খাদ্য নিরাপত্তার প্রাথমিক শর্ত খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য আমদানি করা হয়।

খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হলো দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কিন্তু দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার কারণে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কম হলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এতে খাদ্যের প্রাপ্যতায় বিঘ্ন ঘটে। তাই দেশে খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে ও ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের নিমিত্তে খাদ্য আমদানি করা হয়।

গ উদ্দীপকটি খাদ্য নিরাপত্তার নেতিবাচকতা তথা ভেজাল খাদ্যকে নির্দেশ করছে।

এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রঙ প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে ভেজাল খাদ্য বলে বিবেচিত। তাছাড়া বালি ও দুর্গন্ধযুক্ত বা পঁচে যাওয়া খাদ্য অস্বাস্থ্যকার পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন, খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার ও অপকৌশল অবলম্বন ইত্যাদিও খাদ্যে ভেজালের অন্তর্গত। এসব খাদ্য খেলে মানুষের রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। খাদ্যে ভেজাল দুইভাবে ঘটে। যথা- ১. অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত খাদ্য শস্য সংরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও ২. ইচ্ছাকৃত বা অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের তিনটি ঘটনাই খাদ্যে ভেজালের প্রমাণ বহন করে।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

একটি দেশের সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন (টিসিবি) কে শক্তিশালী করতে পারে। এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য তথা ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

যেহেতু খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বিভিন্নভাবে দেশে উৎপাদন হয়। তাই এসব উৎপাদন সরকার চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারে। আবার বিদেশ থেকে কোনো ভেজাল খাদ্য আমদানি করা হলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।

খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত বর্তমান যেসব আইন রয়েছে তার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে এবং কঠোর নতুন আইন তৈরি করতে হবে। সরকার সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজালের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। এছাড়াও খাদ্যে ভেজালের উদ্দেশ্যে যে সকল উপাদান যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয়, সরকার তা আইনের মাধ্যমে বাতিল অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে।

এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ তুষার বিদেশে যাওয়ার পূর্বে ভুলক্রমে কিছু ফল টেবিলের উপর রেখে যায়। একমাস পরে এসে দেখে ফলগুলো আগের মতোই আছে। এতে সে অবাক হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা কী? ১

খ. কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান খাদ্য নিরাপত্তাকে কীভাবে নিশ্চিত করে। ২

গ. তুষারের ফলগুলো আগের মত থাকলো কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা নিরাপদ খাদ্য ধারণাকে সমর্থন করে কী? মতামত দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য।

খ কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

দেশের বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তাই যদি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিতে বিভিন্ন সমস্যা থাকায় কাঙ্খিত উৎপাদন হচ্ছে না। তাই কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান করলে কৃষকরা কম মূল্যে কৃষি উপকরণ পাবে, যার কারণে তারা সহজে ও কম খরচে কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে পারবে, এছাড়াও কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রদানের ফলে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল বীজ আবিষ্কৃত হবে। উৎপাদনে লাভবান হওয়ার কৃষকরা বেশি খাদ্য উৎপাদন আশায় করবে। যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনানুসারে তুষারের ফলগুলো খাদ্যে ভেজালের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ তুষারের রেখে যাওয়া ফলগুলোতে ফরমালিন দেওয়া ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য-চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উপাদান বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এখন তাই বিভিন্নভাবে ভেজাল খাদ্য তৈরি হচ্ছে। কমলালেবু, পেঁপে, আপেল, পাকা আম ইত্যাদি সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, কলা দ্রুত পাকাতে ইথিন, মিষ্টিতে স্যাকারিন, শুঁটকি মাছে কীটনাশক ও ডিডিটি, দুধের সাথে পানিও

Teachingbd24.com

পাউডার এবং জুস ও জেলির সাথে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে দেখা যায়, শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্য ও ইফতারি সামগ্রীসহ প্রায় সবধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়।
সুতরাং বলা যায়, খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্যের হাত ধরে তুষারের টেবিলের কমলাটি আগের মতোই থাকতে পেরেছে।

ঘ উদ্দীপকের কার্যক্রম দ্বারা ভেজাল খাদ্যের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি করে নিরাপদ খাদ্যের ধারণাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে।
বাংলাদেশে বর্তমানে ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথোফেন, কাপড়ের রং, কীটনাশক যেমন- এন্ড্রিন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি। ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকাতে ব্যাপকভাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কপার সালফেট, কার্বনের ধোঁয়া, পটাশের লিকুইড সলিউশন এবং তাজা ও সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে। মাছে ফরমালিন, শাকসবজিতে কীটনাশক ও ফরমালিন, শুঁটকিতে ডিডিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। টমেটোতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফরমালিন। মিষ্টিতে কাপড়ের রং, এবং কৃত্রিম মিষ্টিদায়ক প্রয়োগ করা হয়। এমনকি মুড়ি ও চিড়াতেও হাইড্রোজ, ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত প্যাকেটজাত খাদ্য যেমন– ফলের রস, স্ন্যাকফুড, জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রং ব্যবহার করা হয় এবং সেমাই ও লুডুলসে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। গুঁড়ো দুধের ব্যবহার করা হচ্ছে মেলামিন।
এসব ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ হয়ে পড়ছে অসুস্থ। জনসাধারণ পেটের নানারকম পীড়া, শরীর দুর্বল ও কৃশ হওয়া, চুল পড়া, শারীরিক ওজন অত্যাধিক বাড়া এবং কমা ইত্যাদিতে ভুগছে, যা রীতিমতো আশঙ্কাজনক। উদ্দীপকের খাদ্যদ্রব্যে ব্যবসায়ী ফরমালিন ব্যবহার করে নিজে লাভবান হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু জনস্বাস্থ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্যের ধারণাকে ব্যাহত করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জয়নাল একজন মাছ ব্যবসায়ী। মাছকে দীর্ঘদিন ভালো রাখতে এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। তার এ মাছ না বুঝেই জনসাধারণ ক্রয় করেন। এতে জয়নালের প্রচুর লাভ থাকে, তবে জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তার দিক কয়টি? ১
খ. কীভাবে খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে? ২
গ. উদ্দীপকের অবস্থা কী নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তার দিক তিনটি। যথা-খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা ও খাদ্যের সদ্ব্যবহার।

খ খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য আহরণের ক্রয় ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। কারণ খাদ্য প্রাপ্য নিশ্চিত করতে হলে যেমন খাদ্যের যোগান বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতাও বিবেচ্য। কারণ খাদ্যের দাম তার চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অপেক্ষাকৃত কম আয়ের অসচ্ছল লোকদের ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না।

গ উদ্দীপকে ভেজাল খাদ্যের দিকগুলো ফুটে উঠেছে।
খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে জনসাধারণের ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বলে পরিচিত।
বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন হুমকির সম্মুখীন।
ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানারকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে মাছ ব্যবসায়ী জয়নালের মাছে কেমিক্যাল মেশানো খাদ্যে নিরাপত্তার ভেজাল খাদ্যের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে সমন্বিত ভূমিকা পালন করতে হবে।
ভেজাল খাদ্য জনজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা সরকারের একার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিচে ভেজাল খাদ্য হতে পরিত্রাণের জন্য সকলের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—
সরকার: সরকার ভেজাল বিরোধী আইন কঠোর করার মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজাল খাবার প্রদানকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। তাছাড়া খাদ্য ভেজালের উদ্দেশ্যে যে সকল উপাদান যেমন-ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয়, তা আইনের মাধ্যমে বাতিল বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে।
ব্যবসায়ী: সরকারের পাশাপাশি খাদ্যে ভেজাল মেশানো রোধ করতে ব্যবসায়ীদেরও ভূমিকা রাখতে হবে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশাচ্ছে। কেউ জেনে মেশাচ্ছে আবার অনেক ব্যবসায়ী না জেনে এ কাজ করে থাকে। এ অবস্থায় দেশের সৎ ও ভালো ব্যবসায়ীরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।
জনসাধারণ: খাদ্যে ভেজাল মেশানো সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে পারে এবং নিজে ভেজাল খাদ্য ক্রয় থেকে বিরত থাকতে পারে। উপরে উল্লিখিত উপায়ে উদ্দীপকের অবস্থা তথা ভেজাল খাদ্য সমস্যা থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। এজন্য উল্লিখিত সকলের পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ বাংলাদেশে কৃষিতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। হাওর, বাঁওড় ও উপকূলীয় এলাকায়ও খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে। অত্যাধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারপরও সরকার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ভেজাল বিরোধী আইন, আপদকালীন মজুদ, বাজার মনিটরিং ও কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১
খ. নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য আরো কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও অত্যাবশ্যকীয়।

https://teachingbd24.com

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমৃদ্ধ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

গ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক হ্রাস পেলেও সরকারিভাবে নীতিমালা প্রণয়ন, কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সহায়তা ও মৌসুমি দারিদ্র্য নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদির ফলে দেশীয় উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনকালীন বিষাক্ত কেমিক্যাল ও কীটনাশক প্রয়োগের ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়েছে। এরূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে; নানারূপ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সেই জীবন হারাচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে, মাঠ পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে তদারকি জোরদার করেছে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৫]

ক. খাদ্যের উপযোগিতা কী? ১

খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে খাদ্যে নিরাপত্তা বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপদকরণে উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থার সাথে আর কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় বলে তুমি মনে কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের সন্তোষজনক ও টেকসই যোগান, যা গ্রহণে সকল মানুষের ক্ষমতা রয়েছে, তাই খাদ্যের উপযোগিতা।

খ খাদ্য যাতে পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যেন পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপক অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো-

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নীতিমালার মধ্য থেকে প্রতিবছর আমদানি করা হয়। এছাড়া দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা কমানোর জন্য কৃষিবিমা ও কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়ে যাতে দূষিত না হয় সেজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে খাদ্য ভেজাল বিরোধী আইন প্রণয়ন, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা, লাইসেন্সধারীদের নিকট ফরমালিন বিক্রি (টিসিবি) ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা নিম্নরূপ-

১. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

২. কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ও স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, এ সময়ে দুর্গত মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের। এরূপ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে সরকার।

৪. দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্ন আয় ও দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যথা-ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং গ্রাটিউইটাস রিলিফ, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি (OMS), কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে খাদ্য সংকট প্রকট হয়ে ওঠায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারটি ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই চরম খাদ্য সংকটে পড়েছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি এখন একটি গ্লোবাল ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]

ক. পুষ্টিকর খাদ্য কাকে বলে? ১

খ. নিরাপদ খাদ্যই দক্ষ শ্রমিকের জন্য একান্ত প্রয়োজন— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. খাদ্য নিরাপদকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপদকরণে ভেজাল প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্যে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যেমন- শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে।

খ মানুষকে কর্মক্ষম ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে প্রয়োজন পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্যের।

অনিরাপদ খাদ্য তথা ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে তার উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। পক্ষান্তরে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করলে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, নিরাপদ খাদ্য দক্ষ শ্রমিকের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

গ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকের আলোকে তা আলোচনা করা হলো—

খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হয়, যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দেশে খাদ্যের সামগ্রিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটানো যায়।

সরকার কৃষি খাতকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুকি ও সুদমুক্ত ঋণ এর ব্যবস্থা করে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও উন্নত বীজ সরবরাহ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ভর্তুকিসহ কৃষিবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে অভিনব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিকে আধুনিকায়নের জন্য তথা স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক ফলনের আশায় কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে ফসলের উৎপাদন বেড়ে যায়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় যে, সরকার কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুকিসহ কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করায় পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এমনকি সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এ সকল কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটলে অতিশীঘ্রই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ঘ একটি দেশের খাদ্য নিরাপদকরণে ভেজাল প্রতিরোধ ও গণ সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার কঠোর হলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজাল প্রদানকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। খাদ্যে ভেজালের উদ্দেশ্যে যে সকল উপাদান যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয়, তা আইনের মাধ্যমে বাতিল অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে। এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা ভেজাল প্রতিরোধ গড়ে তুললে তা খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বে খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে বা খাদ্য নিরাপদকরণে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপদকরণে খাদ্য প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও অপচয় রোধসহ ভেজাল প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

আবার, ভেজাল খাদ্যের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনগণ সচেতন হলে তা ক্রয় ও ভোগ থেকে বিরত হবে। এর ফলশ্রুতিতে বিক্রেতা বা উৎপাদক খাদ্য ভেজালকরণে উৎসাহী হবে না। এছাড়া, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের ক্ষতিকর দিকসমূহ প্রচার করা হলে দেশে গণসচেতনতা তৈরি হবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপদকরণ নিশ্চিত হবে। তাই পরিশেষে বলা যায়, খাদ্য নিরাপদকরণে ভেজাল প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কৃষিঋণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা করছে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১

খ. ভেজাল খাদ্য কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপসমূহের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা জরুরি কি না ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদিকে একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে।

খ খাদ্যের ব্যবহার বা উপযোগিতা বিনষ্ট করার মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য, খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।

সাধারণত খাদ্য নিরাপত্তা খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। এর যেকোনো একটি বিঘ্নিত হলেই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। আর ভেজাল খাদ্য তথা বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরিকৃত খাদ্য অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য গ্রহণ করলে মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

গ উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কাবিখা ইত্যাদি বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে দেশে উৎপাদিত খাদ্যের পর্যাপ্ত মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হয়, যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দেশে খাদ্যের সামগ্রিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটানো যায়।

বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। খাদ্যোৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা এবং কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্পসময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা অত্যন্ত জরুরি। নিচে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

খাদ্য নিরাপত্তা এমন একটি বিষয়, যা সরকারের একার পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ, শুধু আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ দ্বারা খাদ্যে ভেজাল রোধ করা যায় না। বরং এক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এ দেশে ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এসব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের দেশে কেউ কেউ খাদ্যে জেনে ভেজাল মেশায় আবার কেউ কেউ না জেনে মেশায়। অর্থাৎ খাদ্যে ভেজালের কুফল তথা খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। তাই বেসরকারি সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করতে পারে। আবার ভেজাল বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সরকার আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা করতে পারে।

সর্বোপরি সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সততার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেশের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল আর ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা আর তথ্যভিত্তিক প্রচারণা চালাতে পারে। তাই, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকাও অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ লাকসাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রায়ই স্কুলের সামনের রাস্তার পাশে যেসব খোলা খাবার বিক্রি হয় তা খেয়ে থাকে। ফলে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। সে কারণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভ্রাম্যমান দোকানগুলো উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। *[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা কী? ১

খ. মোট দেশজ উৎপাদন কীভাবে খাদ্যের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা নিরসনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা যথেষ্ট- ব্যাখ্যা কর। ৪

https://teachingbd24.com

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলো।

খ মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব।
কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়া সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দেশের জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সহজলভ্য কৃষি উপকরণ, ভর্তুকি প্রদান, খাদ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের অংশগ্রহণ, সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। ফলে অধিক উৎপাদন খাদ্য প্রাপ্যতার ঝুঁকি হ্রাস করে। তাই বলা যায়, মোট দেশজ উৎপাদন অধিক খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার ভেজাল খাদ্যের দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ, খোলা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিক্রয় ইত্যাদি অনিরাপদ খাদ্য তথা ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত, মোট কথা যে খাদ্য খেয়ে মানুষ রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয়,তার স্বাভাবিক শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় তাই অনিরাপদ ভেজাল খাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।
উদ্দীপকের লাকসাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কুলের সামনে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন রকম খোলা খাবার খেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যা স্পষ্টত খাদ্য নিরাপত্তার ভেজাল খাদ্যের দিকটি নির্দেশ করছে। সাধারণত রাস্তা ঘাটে বিক্রয় হওয়া খোলা খাবারগুলো অস্বাস্থ্যকর খোলা পরিবেশে তৈরি, সংরক্ষণ ও পরিবেশন করা হয়। এতে করে এসব খাবারে সহজে মশা মাছি বসে ও রাস্তার ধুলা বালি পড়ে খাবারকে দূষিত ও অনিরাপদ করে তোলে। এছাড়াও এসব খাবারের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার ও অপকৌশল অবলম্বন করা হয়, যা ভেজাল খাদ্যের ধারণার অন্তর্গত। এসব অনিরাপদ বা ভেজাল খাদ্য খেয়ে লাকসাম স্কুলের শিক্ষার্থীদের মত সাধারণ জনগণ নানারকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি, অরুচি, ক্ষুধামন্দা এসব ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভেজাল খাদ্য খাওয়ার ফলে জনসাধারণ লিভার সিরোসিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসা, অন্ত্রনালির দাহ, ক্যান্সার ইত্যাদি কঠিন রোগসমূহে আক্রান্ত হচ্ছে। এসবের ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন হুমকির সম্মুখীন।
বাংলাদেশে বর্তমানে ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ তাই একান্তভাবে কাম্য।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভেজাল খাদ্য সমস্যা নিরসনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেয়া ভাসমান দোকানগুলো উচ্ছেদের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়।
সাম্প্রতিককালে খাদ্যদ্রব্যাদির দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় ভেজাল খাদ্য ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হয়ে উঠেছে। খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু আইন প্রণীত হলেও তার যথাযথ প্রয়োগ নেই বললেই চলে। এর জন্য সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও জনসাধারণের সমন্বয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। জনসাধারণ ভেজাল খাদ্যের মারাত্মক কুফল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হলে তারাই এ ধরনের খাদ্য ক্রয়ের সময় সচেতন হবে এবং তা ক্রয় না করে সে ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।
উদ্দীপকের লাকসাম উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলের সামনে বিক্রয় হওয়া ভেজাল খাদ্য বিক্রয় জনিত সমস্যা নিরসনে ভ্রাম্যামান দোকানগুলো উচ্ছেদ করেছে। এতে করে সমস্যাটির আপাত সমাধান পেলেও সেইসব দোকান আবার অন্য জায়গায় গিয়ে একই খাবার বিক্রয় করবে। স্কুলের ছেলে মেয়েরা সহ অন্যান্য সাধারণ মানুষজন সেই সব খাবার খেয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্যসমস্যায় ভুগবে। তাই কোন কোন খাদ্যে কীভাবে ভেজাল দেওয়া হয় সে সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণকে পূর্ণভাবে অবহিত করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে হবে। এছাড়াও স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্য ভেজালকরণের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে ভেজাল বিরোধী কমিটি গঠন করতে পারে। এ কমিটি বিভিন্ন এলাকায় ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা ও সভা সমাবেশের মাধ্যমে জনগণ ও খাদ্য বিক্রেতাদের এ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনসাধারণকে ভেজাল খাদ্যের অনৈতিক ও দন্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে তুললে তারা ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
পরিশেষে বলা যায়, খাদ্য নিরাপদকরণ বা ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে সরকার, এনজিও ও জনসাধারণের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। কোনো পক্ষের একক কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো উদ্যোগে এ সমস্যার স্থায়ী এবং কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪০ বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা করছে। *[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১
খ. মজুদের ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপসমূহের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা জরুরি কি না ব্যাখ্যা করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা হয়।

খ একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুদের ভূমিকা অপরিসীম।
খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। আর এই প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুদ রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে খাদ্যের মজুদ গড়ে ওঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪১ বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়ো-টেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফ-সহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা করে। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে — ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপসমূহের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা জরুরি কি না তা তোমার মতামতের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, খাদ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদিকে একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে।

https://teachingbd24.com

খ জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে সে হারে খাদ্য উৎপাদন না বাড়লে দেশে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এই খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যপণ্য আমদানি করতে হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কমে যায়। মানুষ তখন আরও বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যতার কারণে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে খাদ্য ক্রয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ ইতোমধ্যে বাজারে শীতকালীন নতুন সবজির আগমন শুরু হয়েছে। মি. পলাশ বাঁধাকপি, মুলা, গাজর কিনে একই দোকানে টকটকে লাল টমেটো দেখে অবাক হলেন। হাতে নিয়ে দেখলেন পাকা টমেটো যেমন হওয়ার কথা তা তার চেয়ে অনেক শক্ত। তাই টমেটো না কিনেই ফিরলেন। তিনি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জেনেছেন ফলমূল, মাছ সবজি দীর্ঘসময় সতেজ ও পচনরোধে এবং অপরিপক্ব ফলকে পাকাতে ব্যবসায়ীরা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। জনমনে আতঙ্ক দূর করার জন্য সরকার 'ভোক্তার অধিকার আইন' এবং Food Act-সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টি ভেজাল খাদ্য বর্জন ও আইন প্রয়োগে বাধ্য করার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. 'শুধুমাত্র খাদ্যের পর্যাপ্ততাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. পলাশ এর আতঙ্কের বিষয়টি কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনমনে আতঙ্ক কমানোর জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত (Contaminated) হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়।

খ শুধুমাত্র খাদ্যের পর্যাপ্ততাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না।
খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহার; খাদ্য নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা না থাকে বা ক্রয়ক্ষমতা থাকলেও ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা না থাকলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি. পলাশের আতঙ্কের বিষয়টি ভেজাল খাদ্যের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত।
ফরমালিনযুক্ত মাছ ও আম তথা ভেজাল খাদ্য দেখে মি. পলাশের মাছ ও আম না কিনে বাড়ি ফিরলেন। কারণ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।
বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মিশানো এবং মাছ, মাংস, ফলমূল প্রভৃতি দ্রব্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে খাদ্যদ্রব্য অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

ঘ সুন্দর, সুস্থ জাতি গঠনের জন্য নিরাপদ খাদ্য আবশ্যক। জনগণের আতঙ্ক কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।
নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ওই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'Consumer Protection Act' & 'Food Act' সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কাজ বাস্তবায়ন করেছে।
খাদ্যের ভেজাল রোধে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ পাস করছে সরকার। এ আইনে খাদ্যে ভেজালের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ লক্ষ টাকার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে কিছুটা খাদ্য নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয় তৈরি হতে পারে।
জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার টেলিভিশন, পত্রিকা এবং পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ধরনের ভেজাল খাদ্য তৈরি ও বিপণন হতে সতর্ক হয়ে উঠেছেন। মাঠপর্যায়ে প্রতিটি স্তরে মান যাচাইয়ের জন্য মাঠকর্মী নিয়োগ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগত মান বাছাইকরণের জন্য সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে।
ফলে বলা যায়, জনগণের আতঙ্ক দূর করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। কিন্তু কৃষিখাতে উন্নয়নের জন্য বিগত দশকে সরকার কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক বিতরণ এবং আধুনিক কৃষি উপকরণ ও ডিজেলে ভর্তুকি প্রদানসহ কৃষি বিপণন সহজীকরণ ও কৃষিঋণ বিতরণের ফলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে সবজি উৎপাদনে ৩য়, ধান ও মাছ উৎপাদনে ৪র্থ, আম উৎপাদনে ৭ম এবং আলু উৎপাদনে ৮ম স্থান অর্জন করেছে। ফলে সরকার এসব উৎপাদিত পণ্যের কিছু বিদেশে রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে"— মূল্যায়ন করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।
খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সদ্ব্যবহার। খাদ্য নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়।

গ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-৫: খাদ্য নিরাপত্তা

১৫৫. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
ক সকল আবাদি জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন
খ বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য আমদানি
গ নিরাপদ সময়ে খাদ্য গ্রহণ
ঘ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের টেকসই যোগান **ঘ**

১৫৬. খাদ্য নিরাপত্তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কয়টি বিষয় জড়িত? (জ্ঞান)
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি **খ**

১৫৭. খাদ্য ক্রয়ে অক্ষম হলে কোনটি দেখা দেয়? (জ্ঞান)
ক খাদ্য নিরাপত্তা খ খাদ্য ঘাটতি
গ খাদ্য অনিরাপত্তা ঘ খাদ্য আমদানি **গ**

১৫৮. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার পূর্বশর্ত কী? (অনুধাবন)
ক খাদ্য প্রাপ্যতা খ খাদ্য ব্যবহার
গ খাদ্য শৃঙ্খলা ঘ খাদ্য ঘাটতি **ক**

১৫৯. অনুন্নত দেশের মানুষ কোন ক্ষেত্রে বেশি আত্মনির্ভরশীল? (জ্ঞান)
ক শিল্প ক্ষেত্রে খ বাণিজ্য ক্ষেত্রে
গ শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘ কৃষি ক্ষেত্রে **ঘ**

১৬০. খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় কোনটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক খাদ্য উৎপাদন খ খাদ্য আমদানি
গ খাদ্য মজুদ ঘ খাদ্য বিপণন **গ**

১৬১. খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রধানত কোনটির ওপর নির্ভর করে? (অনুধাবন)
ক অবাধ বাণিজ্যের উপর
খ ভূমির উর্বরতার ওপর
গ দেশজ খাদ্য উৎপাদন
ঘ সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজার **গ**

১৬২. বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি?
ক গম খ আখ গ আলু ঘ ধান **ঘ**

১৬৩. 'কাবিখা' এর পূর্ণ রূপ কী?
ক কাজের বিকল্প খাদ্য খ কাজের বিভিন্ন খাদ্য
গ কাজের বিচিত্র খাদ্য ঘ কাজের বিনিময়ে খাদ্য **ঘ**

১৬৪. পুষ্টি বলতে কী বোঝায়? (জ্ঞান)
ক উচ্চ ক্যালরিসম্পন্ন খাবার
খ প্রয়োজনীয় ভিটামিনসমৃদ্ধ পরিমিত খাবার
গ যে খাবারে শক্তি হয় ঘ ভিটামিন **ক**

১৬৫. নিরাপদ খাদ্য বলতে কোনটিকে বোঝায়? (অনুধাবন)
ক স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন
খ হোটেলের খাদ্য
গ দামি খাদ্য ঘ ফাস্ট ফুড **ক**

১৬৬. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিচের কোনটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা? (জ্ঞান)
ক প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন
খ আমদানি
গ খাদ্য সাহায্য গ্রহণ
ঘ খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ **ঘ**

১৬৭. অসাধু ব্যবসায়ী ফলমূলে কী রাসায়নিক পদার্থ মেশায়?
ক ফরমালিন খ কার্বাইড
গ মিথানল ঘ প্রিজারভেটিভ **ক**

১৬৮. আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান হুমকিস্বরূপ কোনটি? (অনুধাবন)
ক অনুকূল আবহাওয়া
খ প্রতিকূল আবহাওয়া
গ প্রাকৃতিক আবহাওয়া
ঘ ভেজাল খাদ্য **খ**

১৬৯. খাদ্য নিরাপদ নিশ্চিতকরণে সারাবিশ্বে রোল মডেল হয়ে কে কাজ করছে? (জ্ঞান)
ক সরকার খ জনগণ
গ এনজিও ঘ বিএসটিআই **গ**

১৭০. ভেজাল খাবার রোধের জন্য কোনটি জরুরি? (অনুধাবন)
ক জনসচেতনতা খ বিভিন্ন আইন
গ সংবাদ মাধ্যম ঘ অনিয়ম ও দুর্নীতি **ক**

১৭১. খাদ্য ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদারকরণে ভূমিকা রাখে কোনটি? (জ্ঞান)
ক মোবাইল কোম্পানি
খ মোবাইল কোর্ট
গ দোকান মালিক সমিতি
ঘ রাজনৈতিক দল **খ**

১৭২. BSTI- এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান)
ক Bangladesh Standard & Testing Institute
খ Bangladesh standard & Testing Inteligence
গ Bangladesh standard & Testing Intelligence
ঘ Bangladesh standing & Testing Temporary **ক**

১৭৩. TCB কী? (জ্ঞান)
ক Trading Corporation of Bangladesh
খ Trade Corporation of Bangladesh
গ Trading Council of Bangladesh
ঘ Trade Council of Bangladesh **ক**

১৭৪. পিএফডিএস বলতে কী বোঝায়? (জ্ঞান)
ক গণখাদ্য বিতরণ
খ সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা
গ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল
ঘ খোলা বাজারে খাদ্য বিক্রয় **খ**

১৭৫. নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে কোনটি অর্জন সম্ভব? (জ্ঞান)
ক বৈদেশিক বাণিজ্য খ বৈদেশিক নীতি
গ আমদানি ঘ বৈদেশিক মুদ্রা **ঘ**

১৭৬. খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ কোনটি? (জ্ঞান)
ক হাইড্রোজেন খ অক্সি-সিলিকন
গ ফরমালিন ঘ ক্যালসিয়াম **গ**

১৭৭. শাকসবজিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
ক ফরমালিন
খ কীটনাশক ও ফরমালিন
গ ফরমালডিহাইড ঘ মিথানল **খ**

Teachingbd.com

১৭৮. খাদ্য নিরাপত্তায় ওয়ার্ল্ড ভিশন কোন ধরনের সংস্থা? (জ্ঞান)
ক সরকারি খ বেসরকারি
গ আন্তর্জাতিক ঘ আধা সরকারি **খ**

১৭৯. খাদ্যে ভেজাল মেশালে সর্বোচ্চ শাস্তি কীরূপ? (জ্ঞান)
ক ২ বছর কারাদণ্ড খ ৫ বছর কারাদণ্ড
গ ২০ হাজার টাকা জরিমানা
ঘ মৃত্যুদণ্ড **ঘ**

১৮০. রিপা একটি ভোক্তা অধিকার সংগঠনের সদস্য। তার সংগঠনের সদস্যরা চাঁদা তুলে ভেজাল খাদ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে কোনটি বৃদ্ধি পাবে? (প্রয়োগ)
ক জনসচেতনতা খ খাদ্য চাহিদা
গ সামাজিক আন্দোলন
ঘ খাদ্যের প্রাপ্যতা **ক**

১৮১. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
i. খাদ্যের প্রাপ্যতা
ii. খাদ্যের লভ্যতা বা এর ক্ষমতা
iii. খাদ্যের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৮২. নিরাপদ খাদ্য বলতে বোঝায় — (অনুধাবন)
i. খাদ্যের পুষ্টিমান বিদ্যমান
ii. খাদ্যটি সংরক্ষণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকবে
iii. খাদ্যের রাসায়নিক কোনো পদার্থ মিশানো হবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৮৩. খাদ্য ভেজাল দেওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে — (অনুধাবন)
i. জনসাধারণ ii. অসাধু ব্যবসায়ী
iii. অর্থনীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৮৪. ভেজাল খাদ্যের ফলে — (অনুধাবন)
i. শরীর দুর্বল হয়
ii. ওজন কমা বা বাড়া
iii. স্মরণশক্তি হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৮৫. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সহায়ক— (অনুধাবন)
i. এনজিও ii. জনসচেতনতা
iii. সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নিশা বাংলাদেশের নাগরিক এবং তার দেশের জনসংখ্যার হার অনেক বেশি হওয়ায় মানুষ সময়মতো খাবার পায় না, তাই তারা শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল। অপরদিকে, জন কানাডার নাগরিক যেখানে জনসংখ্যা অনেক কম এবং মানুষেরা সময়মতো খাবার পায়।

১৮৬. অধিক জনসংখ্যা নিশার দেশে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে? (প্রয়োগ)
ক খাদ্যের প্রাপ্যতা
খ অর্থনৈতিক ভারসাম্য সমস্যা
গ প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট
ঘ অধিক রপ্তানি **ক**

১৮৭. উক্ত সমস্যা সমাধান করা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে
ii. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে
iii. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নীলা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। কাজের লোক তার বাসার অধিকাংশ কাজ করলেও রান্নার কাজটি সে নিজেই করে থাকে। কেননা খাদ্যে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতাসহ সর্বাধিক পুষ্টি বজায় রাখাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৮. নীলার রান্নার মাধ্যমে কোনটি বাজায় থাকে? (প্রয়োগ)
ক স্বাস্থ্য ঝুঁকি খ নিরাপদ খাদ্য
গ খাদ্যের স্বাদ ঘ খাদ্যে অপুষ্টি **খ**

১৮৯. উক্ত খাদ্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পৃক্ত বিষয় হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পুষ্টির দিক ii. আর্থিক দিক
iii. বাণিজ্যিক দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯০ ও ১৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকার বিভিন্ন কাঁচামালের বাজারে গিয়ে ভেজাল খাদ্য বিক্রেতাদের জরিমানা ও দণ্ড প্রদান করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা কাজ করি জনগণের জন্য, জনগণ যেন ভালো ও পুষ্টিকর খাবার সহজে পেতে পারে এটিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

১৯০. ভ্রাম্যমান আদালত কী নিশ্চিত করতে চায়? (প্রয়োগ)
ক খাদ্যের পর্যাপ্ততা খ খাদ্য নিরাপত্তা
গ সরকারের আয় ঘ জনগণের সুখ শান্তি **খ**

১৯১. ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রমের ফলে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে
ii. জনগণের কর্মক্ষমতা বাড়বে
iii. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

অধ্যায়-৬: অর্থায়ন

প্রশ্ন ▶ ১ সাফিন ও নাফিনসহ সাত বন্ধু তাদের নিজস্ব মূলধন নিয়ে একটি কারবার আরম্ভ করলেন। সম্ভাবনাময় হওয়ায় কারবারটি সম্প্রসারণের জন্য তারা পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের চিন্তা করলেন। সাফিন এমন একটি অনুমোদিত মূলধনের কথা চিন্তা করল যার দ্বারা কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে। অন্যদিকে নাফিন এমন একটি দলিল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যা দ্বারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে কিন্তু কোম্পানির লভ্যাংশের আংশীদার হতে পারবে না। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকে সাফিন যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাফিন ও নাফিনের অর্থ সংগ্রহের যে দুটি উৎসের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন হলো এমন একটি কার্যপ্রক্রিয়া, যা অর্থসংগ্রহ ও ব্যবহারের সাথে জড়িত।

খ অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণত চেকের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য ব্যাংক প্রদত্ত অর্থকে ব্যাংক ঋণ বলা হয়। আর, অর্থায়নের যতগুলো উৎস রয়েছে তার মধ্যে এই ব্যাংক ঋণ অন্যতম। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি এবং ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। তাই বলা যায়, অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাফিন শেয়ার এর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। নিচে শেয়ারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো।
সাধারণত শেয়ার বলতে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশকে বোঝায়। এই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যে কেউ উক্ত কোম্পানির আর্থিক মালিকানা লাভ করে। এজন্য শেয়ার মালিকগণকে কোম্পানির লাভ-ক্ষতি বহন করতে হয়। পুঁজি বাজারে বিভিন্ন ধরনের শেয়ার লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রাথমিক শেয়ার, মাধ্যমিক শেয়ার, সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার ইত্যাদি। বিভিন্ন শেয়ারে ঝুঁকির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে, মাধ্যমিক শেয়ারের মূল্য বেশি উঠা-নামা করে বলে এ ধরনের শেয়ারে অন্যান্য শেয়ারের চেয়ে ঝুঁকি বেশি থাকে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাফিন মূলধন সংগ্রহের জন্য পুঁজি বাজার থেকে এমন একটি অনুমোদিত মূলধন ক্রয়ের কথা চিন্তা করল, যার দ্বারা সে কোম্পানির মালিকানা লাভ করতে পারবে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব লাভ করবে। তাই বলা যায়, সাফিন যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল, তা হলো শেয়ার। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাফিন ও নাফিনের অর্থ সংগ্রহের উৎস দুটি যথাক্রমে শেয়ার ও বন্ড। শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।
যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। আর বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি, যাতে ঋণগ্রহীতা সুদ ও আসলসহ একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে। সাধারণত শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে মুনাফা বা লাভ হলে শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হয়, আর লাভ না হলে তা দিতে হয় না। এজন্য এক্ষেত্রে শেয়ারের ঝুঁকি কম। কিন্তু, বন্ডের ক্ষেত্রে কোম্পানির লাভ বা ক্ষতি যাই হোক বন্ড হোল্ডারদেরকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ফেরত দিতে হয়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাফিন ও নাফিন তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। যেখানে সাফিন শেয়ার ক্রয় এবং নাফিন বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। এক্ষেত্রে সাফিনের শেয়ার কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে। কিন্তু নাফিনের বন্ড দ্বারা কোম্পানির মালিকানা লাভ করা যায় না। শুধু নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়।
তাই শেয়ারহোল্ডারগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও বন্ডের ধারকদের এরূপ কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ▶ ২ পঞ্চগড়ে ক্রমবর্ধমান চা চাষ দেখে মি. 'X' পঞ্চগড়ে একটি চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করতে চান। তিনি জানেন যে, এতে অনেক মূলধন প্রয়োজন হবে। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা, না কি বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে টাকা ধার নিবেন— এই চিন্তায় অস্থির। অবশ্য এক সময় তার মনে হয় যে, তিনি তার বর্তমান যে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি আছে তার কিছু শেয়ার বিক্রি করবেন। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৭; ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর । প্রশ্ন নং ১০]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়ন কেন করা হয়? ২

গ. অর্থায়নের উৎসগুলো কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিল্পের অর্থায়নে পুঁজিবাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ কোনো দেশে শিল্পায়ন তথা শিল্প-কারখানা স্থাপন ও বিনিয়োগের জন্য প্রচুর মূলধন দরকার।
আধুনিককালে প্রায় সব দেশেই শিল্পের উদ্যোক্তারা নিজস্ব তহবিল ছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ও উৎপাদনমুখী করার জন্য সরকার, ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করে থাকে।

গ মি 'X' অর্থায়নের উৎস হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করতে পারেন।
অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্যতম। নতুন শিল্প স্থাপন, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, শিল্পের আধুনিকায়ন ইত্যাদির প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়ন করে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষ খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণও প্রদান করে। এছাড়া, শিল্পায়ন ও নতুন ব্যবসায় স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। আবার, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি বা পুঁজিবাজার ছাড়াও ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে অর্থায়নের কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস রয়েছে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোক্তা সাধারণত ব্যবসায়ের প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মি. 'X' চা কারখানা স্থাপন করতে চাইলে অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ সব থেকে সুবিধাজনক হবে কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করে।

Teachingbd24.com

ঘ মি. 'X' এর মতো উদ্যোক্তাদের স্থাপিত শিল্পের অর্থায়নে পুঁজিবাজার নানাভাবে ভূমিকা রাখে।

প্রথমত, শেয়ারবাজারে বিশেষ করে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার প্রতিনিয়ত বেচাকেনা হয়। এর ফলে পুঁজির গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, দেশে অনেক উচ্চবিত্ত লোক আছে যারা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের সঞ্চয়কে কোনো উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার না করে অলসভাবে ফেলে রাখে। শেয়ারবাজার এসব সঞ্চয়কারীর অলস অর্থকে বিনিয়োগ করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী আছে যারা তাদের সঞ্চয় বা আমানতকে বিনিয়োগের কাজে খাটাতে চায়। কিন্তু বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্পের যুগে কোনো ক্ষুদ্র আমানতকারীর পক্ষে এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয় করে তারা যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভের মাধ্যমে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

চতুর্থত, শেয়ারবাজার জনগণকে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে। পণ্য বাজারের মতো শেয়ারবাজারেও জনগণ ইচ্ছেমতো যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। আবার, ইচ্ছা করলে প্রয়োজনের সময় এসব শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকা ফেরত পেতে পারে। এ কারণে জনগণ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। এর ফলে শেয়ারবাজারের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶৩ ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে মি. রউফ তার কয়েকজন বন্ধুসহ ব্যক্তিগত সঞ্চয় দিয়ে প্রিন্টিং এর ব্যবসা শুরু করলেন। কিছুদিন পর তারা অনুভব করলেন, ব্যবসায় আরও পুঁজি খাটালে মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো, শেয়ারবাজারে প্রবেশ করবে। যথারীতি শেয়ার বিক্রি করে পুঁজি সংকটের মোকাবিলা করে তারা ব্যবসাকে প্রসারিত করলেন। এতে উৎপাদন খরচ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক পরিবর্তন আসল। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বন্ড কী? ১

খ. ঝুঁকি ও মুনাফার দৃষ্টিকোণ হতে বন্ড এবং শেয়ার কীভাবে পৃথক? ২

গ. মি. রউফ এবং তার বন্ধুদের অর্থায়নের উৎস ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেয়ারবাজার হতে মি. রউফ ও তার বন্ধুরা কীভাবে উপকৃত হলেন?— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল, যা বিক্রি করে কোম্পানি বা সরকার তহবিল সংগ্রহ করে।

খ যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। আর বন্ড হলো— দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি, যাতে ঋণগ্রহীতা সুদ ও আসলসহ একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে।

সাধারণত শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে মুনাফা বা লাভ হলে শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হয়, আর লাভ না হলে তা দিতে হয় না। এজন্য শেয়ারের ঝুঁকি কম। কিন্তু, বন্ডের ক্ষেত্রে কোম্পানির লাভ বা ক্ষতি যাই হোক বন্ড হোল্ডারদেরকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ফেরত দিতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. রউফ এবং তার বন্ধুদের অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস হলো ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং পরবর্তী উৎস হলো পুঁজিবাজার।

ব্যক্তি তার আয়ের পুরোটা ব্যয় না করে কিছু অংশ সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থ যখন বিনিয়োগ করা হয়, তখন তা অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থায়নের আরেকটি উৎস হলো পুঁজিবাজার। যে বাজারে যৌথমূলধনী কারবার, সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাকে পুঁজিবাজার বলে। সাধারণত, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. রউফ ও তার কয়েকজন বন্ধু তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় দিয়ে প্রিন্টিং ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে তারা তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করেন। কাজেই বলা যায়, মি. রউফ ও তার বন্ধুরা প্রথমে ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং পরবর্তীতে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছেন।

ঘ শেয়ারবাজার হতে মি. রউফ ও তার বন্ধুরা যেভাবে উপকৃত হলেন, তা নিচে আলোচনা করা হলো—

সাধারণত শেয়ারবাজার দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করে থাকে। তাই ব্যবসায়ীগণ দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির জন্য শেয়ারবাজারকে বেছে নেন। শেয়ারবাজার থেকে অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া এ বাজার থেকে সংগৃহীত মূলধন জামানতমুক্ত। তাই, প্রতিভাবান শিল্প উদ্যোক্তাগণ সহজেই শেয়ারবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করে শিল্প স্থাপন বা সম্প্রসারণ করতে পারেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. রউফ ও তার বন্ধুরা নিজস্ব পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও তা দিয়ে তারা বৃহৎ আয়তনে উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাই তারা শেয়ারবাজারে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করেন। এর ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে করে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাজন সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে কোনো রকম আর্থিক বাধ্যবাধকতা থাকে না। ফলে এ ধরনের সংগৃহীত মূলধনে ঝুঁকি কম।

কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. রউফ ও তার বন্ধুরা শেয়ারবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করায় তাদের ব্যবসায় উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪ মানিক এবং রতন দুই বন্ধু। দুজনেই অনার্সের ছাত্র। তারা প্রাইভেট টিউশনি করে প্রচুর টাকা আয় করেন। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের জন্য তারা স্কয়ার কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন। আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিতরণ করা হয়। লটারিতে জিতে মানিক স্কয়ার কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। অন্যদিকে, লটারিতে হেরে রতন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে 'একমি' কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. 'বন্ড থেকে আয় প্রাপ্তি পূর্বনির্ধারিত এবং নিশ্চিত।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রতনের ক্রয়কৃত শেয়ার কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মানিক ও রতনের ক্রয়কৃত শেয়ার একই ধরনের নয়।'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ বন্ড একটি ঋণ সম্পর্কিত দলিল। এ দলিলে ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সুদের হারসহ আনুষঙ্গিক শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।

বন্ডের ধারককে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়, যা তার আয়ও বটে। কোম্পানির লাভ হোক বা না হোক এ সুদ পরিশোধ করতেই হয়। বন্ডের মালিকরা প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির ঋণদাতা। নির্দিষ্ট সুদের হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ডের মালিকরা কোম্পানিকে ঋণ দিয়ে থাকে। এ কারণে বলা হয়, 'বন্ড থেকে আয় প্রাপ্তি পূর্বনির্ধারিত এবং নিশ্চিত।'

গ রতনের ক্রয়কৃত শেয়ার হলো মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার।

প্রাথমিক শেয়ার ইস্যুর পর পরবর্তী পর্যায়ে যখন শেয়ার কেনাবেচা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার বলা হয়। যে বাজারে এ

https://teachingbd24.com

ধরনের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেট বলে। শেয়ারবাজার বলতে মূলত সেকেন্ডারি শেয়ারবাজারকেই বোঝায়। সেকেন্ডারি মার্কেটে কেনাবেচাই হলো শেয়ার ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র। স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত সদস্যবৃন্দ এ বাজারে কেনাবেচা করে। এদেরকে 'ব্রোকার' বা 'ডিলার' বলা হয়।

শেয়ারবাজারের যেকোনো সদস্য এ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মতো এ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে হয় না।

একজন বিনিয়োগকারী কখনই শেয়ারবাজারে সরাসরি কেনাবেচায় অংশ নিতে পারেন না। যখন কেউ শেয়ারবাজারে শেয়ার কিনতে বা বিক্রি করতে চায় তখন তাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্রোকার বা ডিলারদের মাধ্যমেই তা করতে হয়। এই ব্রোকার বা ডিলাররা শেয়ার ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী এবং শেয়ার বিক্রেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, রতন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে যে শেয়ার ক্রয় করেছিল তা মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার।

ঘ লটারিতে জিতে মানিক 'স্কয়ার' কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। যা ছিল প্রাইমারি শেয়ার। অন্যদিকে, রতন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে 'একমি' কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। যা ছিল মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে প্রাইমারি শেয়ার ও মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার একই ধরনের নয়। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রাইমারি শেয়ার: কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। ফেস ভেল্যুর ভিত্তিতে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার হাউসে BO (Beneficiary Owners) হিসাব খোলার মাধ্যমে যেকোনো নাগরিক প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করতে আবেদন করতে পারে। প্রাথমিক শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার লটের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি হয়। প্রাথমিক শেয়ার অবিক্রীত থাকলে অবলেখক ঐ শেয়ার ক্রয় করে।

সেকেন্ডারি শেয়ার: প্রাথমিক শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হলে তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার বলে। শেয়ারবাজারের মাধ্যমে এ শেয়ার হস্তান্তর বা ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

সেকেন্ডারি শেয়ার প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন অস্তিত্ববিশিষ্ট কোনো শেয়ার নয়। এ শেয়ারের দাম তার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তাই চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এর দাম পরিবর্তিত হয়। বাজারে প্রতিদিন শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করে। ফলে বাজার দামে মাধ্যমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। বিও হিসাবধারী যে কেউ মাধ্যমিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে। প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মতো এ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে হয় না।

প্রশ্ন ▶৫ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ইতোমধ্যেই দেশটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। দেশে বৃহৎ শিল্প কারখানা, পাওয়ার প্লান্ট, পদ্মা সেতুসহ বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। এসব কার্য সম্পাদনে সরকারের রাজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই অর্থায়নের জন্য প্রায়ই বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর অর্থায়ন হ্রাস করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অর্থায়নের কোন উৎসের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবকাঠামোগুলোর উন্নয়নে সাহায্যের পরিবর্তে সরকার কোন কোন উৎস হতে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে? আলোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ার হলো কোনো লিমিটেড কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ।

খ বন্ডের ধারক একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে ফলে তার মুনাফা সুনিশ্চিত। তাই বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই।

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বন্ডের ধারককে কোম্পানির লাভ অথবা লোকসান কোনোটির ভারই বহন করতে হয়না। এতে কোম্পানি যখন লাভবান হয় তখন বন্ডের মালিককে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হয়না। আবার, কোম্পানি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও বন্ডের মালিককে তার নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হয়। এতে বন্ডের মালিককে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়না। তাই বলা যায়, বন্ড বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ উদ্দীপকে সরকারি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস ও বাহ্যিক উৎস উভয়ের কথা বলা হয়েছে।

কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থায়ন দুই প্রকার। যথা- সরকারি অর্থায়ন ও বেসরকারি অর্থায়ন। সরকারি অর্থায়নকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— অভ্যন্তরীণ উৎস ও বাহ্যিক উৎস। কোনো দেশের সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ অভ্যন্তরীণ উৎস যেমন— কর, শুল্ক, অ-কর রাজস্ব ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। আবার, বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় যখন সরকারের জন্য যথেষ্ট হয় না, তখন সরকার বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থায়ন করে থাকে। যেমন— বিভিন্ন দেশ হতে সাহায্য, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা— বিশ্বব্যাংক, IMF, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

উদ্দীপকে, দেশে বৃহৎ শিল্প-কারখানা, পাওয়ার প্লান্ট ও পদ্মা সেতুর মতো বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। যেখানে সরকারের রাজস্ব তহবিল হতে ও বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজস্ব তহবিল অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক সাহায্য বাহ্যিক উৎসকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সরকারি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অবকাঠামোগুলো উন্নয়নে সরকার সাহায্যের পরিবর্তে বেসরকারি উৎস হতে অর্থায়ন করতে পারে।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকে বেসরকারি অর্থায়ন বলে। অর্থাৎ সরকারি অর্থায়ন ব্যতীত অন্য সব অর্থায়ন এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী হতে পারে আবার অ-ব্যবসায়ীও হতে পারে। বেসরকারি অর্থায়নকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— ব্যক্তিগত অর্থায়ন, ব্যবসায় অর্থায়ন ও অ-ব্যবসায় অর্থায়ন। সরকার যদি বেসরকারি উৎস হতে আয়ের পরিমাণ বাড়ায় তাহলে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বা সাহায্য হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে সরকার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, পাওয়ার প্লান্ট ও পদ্মা সেতুর মতো বড় বড় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রথমে রাজস্ব তহবিল তথা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্য তথা বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থায়ন করে, যা কোনো দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে হুমকি। তাই সরকার স্বনির্ভরতা অর্জনে বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কোনো দেশের স্বনির্ভরশীলতা অর্জনে অবশ্যই বৈদেশিক সাহায্য বা দান-অনুদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক উৎসের পরিবর্তে যদি বেসরকারি অর্থায়নকে কাজে লাগানো যায় তাহলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথ আরো সুগম হবে। তাই আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে ও একটি স্বনির্ভর জাতি গড়ে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রশ্ন ▶৬ মিসেস রেবেকা সুলতানা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি নগদ ৫ লক্ষ টাকা পেনশন পেয়েছেন। স্বামীর পরামর্শে ৪ লক্ষ টাকায় পারিবারিক সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলেন এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ'-এ বিভিন্ন কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

https://teachingbd24.com

ক. বন্ড কী? ১
খ. প্রাইমারি শেয়ারের ঝুঁকি কম— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মিসেস রেবেকা সুলতানার কোন খাতে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু মুনাফা নিশ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বিনিয়োগে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকলেও সবচেয়ে অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে— বুঝিয়ে বল। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল, যা বিক্রি করে কোম্পানি বা সরকার তহবিল সংগ্রহ করে।

খ প্রাইমারি শেয়ারের দাম পূর্বনির্ধারিত হওয়ায় এ ধরনের শেয়ারে ঝুঁকি কম।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এ শেয়ারে মালিক কোনো নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পায় না। তবে প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা কোম্পানির পরিচালনায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া, প্রাইমারি শেয়ারের ফেইস ভ্যালুই হলো প্রাইমারি শেয়ারের মূল্য। প্রাইমারি শেয়ারের দাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ফলে এতে কোনো ধরনের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায়, অন্যান্য শেয়ারের তুলনায় প্রাইমারি শেয়ারে ঝুঁকি কম।

গ মিসেস রেবেকা সুলতানার পারিবারিক সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু মুনাফা নিশ্চিত।

বাংলাদেশ সরকার সমাজের নিম্নবিত্তের লোকদেরকে সঞ্চয়মুখী করে তোলা এবং মুনাফা প্রদান বাবদ সামান্য টাকা আয় করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পারিবারিক সঞ্চয়পত্র চালু করেছে। পারিবারিক সঞ্চয়পত্র ৫ বছরমেয়াদি। এ সঞ্চয়পত্রের জন্য প্রদেয় মুনাফার হার নির্দিষ্ট যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদেয়। সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ পূর্তির পর মুনাফা ও আসল টাকা ফেরত পাওয়া যায়, আর মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙালে হ্রাসকৃত হারেও মুনাফা পাওয়া যায়। এক কথায় সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্তব্য আসল টাকা ও মুনাফা নির্ধারিত ও নিশ্চিত।

মিসেস রেবেকা তার ১ লক্ষ টাকা দিয়ে যে শেয়ার ক্রয় করেন সেখান থেকে প্রাপ্তব্য মুনাফা অনিশ্চিত। মিসেস রেবেকা যে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেছেন ওই কোম্পানি কেবল লাভ করলেই শেয়ারহোল্ডারকে মুনাফা দেয়; ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিছুই দেয় না। তাছাড়া, মিসেস রেবেকার ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্যের ব্যাপক পতন ঘটলে তার যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলে তিনি কিছুই পাবেন না।

ঘ উদ্দীপকের শেষোক্ত বিনিয়োগের অর্থাৎ 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ' এ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকলেও অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শেয়ার মার্কেট বা স্টক এক্সচেঞ্জ হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বেচাকেনার একটি বিপণন কেন্দ্র। এ বাজারে সাধারণত যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রি করে। বিনিয়োগকারীরা শেয়ারের লভ্যাংশ কোম্পানির লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পেয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে যেকোনো দ্রব্যের মতো শেয়ারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে তার বাজার দাম নির্ধারিত হয়। এতে শেয়ারের দাম উঠানামা করে বিধায় দাম ও মুনাফা কমবেশি হতে পারে। তবে যেসব কোম্পানির সুনাম আছে এবং যেগুলো বছর শেষে অধিক স্টক ডিভিডেন্ড বা ক্যাশ ডিভিডেন্ড বা উভয়ই বেশি পরিমাণে প্রদান করে সেগুলোর চাহিদা বেশি হওয়ায় তার বাজার দামও বেশি হয়। এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলে আকস্মিকভাবে অনেক মুনাফা লাভ করা যায়। আবার, কোনো কোম্পানির চাহিদা হঠাৎ করে কমে গেলে তৎসংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারের দাম তথা মুনাফা অনেক কমে যায়। এতে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বিরাজ করে।

উদ্দীপকে মিসেস রেবেকা সুলতানা পেনশনের টাকার কিছু অংশ দিয়ে 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ' হতে কতিপয় শেয়ার ক্রয় করেন। 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ' মার্কেটে শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা পাওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। তবে শেয়ার মার্কেটের অন্যান্য সুবিধা যেমন— নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, Cost of fund কম, বিনিয়োগকারীরা সবাই এ মার্কেটের অংশগ্রহণকারী হতে পারে ইত্যাদির ফলে শেয়ার বাজারের অধিক জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। এ ধরনের বিনিয়োগে অধিক মুনাফা লাভের সম্ভাবনা থাকায় মানুষ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনেও রাজি থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৭ দেলোয়ার সাহেব তার সঞ্চিত পাঁচ লক্ষ টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন। ২০১৩ সালে 'X' কোম্পানির প্রতিটি প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য ছিল ১০.০০ টাকা। বর্তমানে এই শেয়ারের বাজার মূল্য ৭৫.০০ টাকা। গত বছর এই শেয়ারের মূল্য ছিল ১২০.০০ টাকা।

[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. IPO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দু'ধরনের শেয়ারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শেয়ারের মূল্যে পরিবর্তনের ধারণাটি বন্ড মার্কেটের সাথে তুলনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IPO-এর পূর্ণরূপ হলো— Initial Public Offering.

খ মালিক বা উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন এবং অবণ্টিত মুনাফা ছাড়া ঋণ হিসেবে যে সমস্ত উৎস হতে ঋণ সংগ্রহ করা হয় তাকে অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলে। অর্থায়নের এ উৎস আবার দু'ধরনের; যথা— দেশীয় ও আন্তর্জাতিক।

ক্রেতা থেকে অগ্রিম গ্রহণ, প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ, বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক ইত্যাদি হলো অর্থায়নের দেশীয় বাহ্যিক উৎস। আর দাতা দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সাহায্য, ঋণদান, অনুদান ইত্যাদি হলো অর্থায়নের আন্তর্জাতিক বাহ্যিক উৎস।

গ উদ্দীপকের দু'ধরনের শেয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা— প্রাইমারি বা প্রাথমিক শেয়ার এবং সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক শেয়ার। নিচে এ দু'ধরনের শেয়ারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

১. কোম্পানি বা ইস্যু হাউস যে শেয়ার আইপিও (IPO) এর মাধ্যমে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়ে এবং আবেদন দ্বারা সরাসরি কিংবা লটারির মাধ্যমে তা ক্রয় করা যায়, সেটিই প্রাইমারি শেয়ার। অন্যদিকে, প্রাইমারি শেয়ার মালিকরা যখন তাদের শেয়ার ব্রোকার হাউসে বিক্রি করে তখন ঐ বিক্রিত শেয়ার হয়ে যায় সেকেন্ডারি শেয়ার।

২. প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদলায় না; যে তা পায় সেই তার মালিক হয়। কিন্তু সেকেন্ডারি শেয়ারের মালিকানা শেয়ার বিক্রির সাথে সাথে বদলাতে থাকে।

৩. প্রাইমারি শেয়ার ব্যাংক বা কোনো ইস্যু হাউসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সেকেন্ডারি শেয়ার কেবল স্টক এক্সচেঞ্জ থেকেই ক্রয় করতে হয়।

৪. প্রাইমারি শেয়ার ইস্যুকারক কর্তৃক আইপিও-এর মাধ্যমে নির্বাচিত বিও (Beneficiary Owners) একাউন্টধারীর একাউন্টে পৌঁছায়। অন্যদিকে, সেকেন্ডারি শেয়ার ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনা যায়।

৫. প্রাইমারি শেয়ারের দাম তার ফেইসভ্যালু (FV) দ্বারা প্রকাশিত হয়। সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারি শেয়ারের দাম তার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং তা প্রায়ই ওঠা-নামা করে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকটি পাঠ করে জানা যায়, শেয়ারবাজারে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের মূল্য সময় ব্যবধানে অনেক ওঠা-নামা করে। শেয়ার মূল্যের এ উত্থান-পতন বন্ডের বাজারে বন্ডের মূল্যের ওঠা-নামা অপেক্ষা তীব্র ও ক্রিয়াশীল।

১. শেয়ার মার্কেটে সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী সবাই অংশগ্রহণ করে শেয়ার কেনাবেচায় অংশ নেয়। তাই এখানে শেয়ারের মূল্য নির্ধারণে সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা একযোগে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বন্ড মার্কেটে মূলত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাই বন্ড কেনা-বেচায় অংশ নেয়। এ জন্য এখানে বন্ডের মূল্য নির্ধারণে একক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

২. শেয়ারের মূল্যের সাথে সুদের হারের কোনো সম্পর্ক নেই। শেয়ারের মূল্য কোম্পানির লাভ-লোকসানের সাথে জড়িত। কোম্পানি থেকে লাভের প্রত্যাশা বাড়লে শেয়ারের মূল্য বাড়ে; বিপরীত অবস্থায় তার মূল্য কমে। কিন্তু বন্ডের মূল্য সরাসরি সুদের হারের সাথে সম্পর্কিত। বাজারে সুদের হার বাড়লে বন্ডের মূল্য কমে; আবার সুদের হার কমলে বন্ডের মূল্য বাড়ে।

৩. শেয়ারবাজারে শেয়ারের মূল্যের উত্থান-পতন নিত্যদিনের ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে শেয়ার কেনা-বেচা চলাকালীন অবস্থায় তার মূল্য ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বন্ডের বাজারে বন্ডের মূল্য ধীর গতিতে পরিবর্তিত হয়। প্রায়শই এর মূল্য কিছু সময় ধরে একই থাকতে পারে।

৪. শেয়ারের মূল্য অসাধু শেয়ার ব্যবসায়ীদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। কিন্তু বন্ডের কেনা-বেচায় মূলত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা জড়িয়ে থাকায় কেউ বন্ডের মূল্য নির্ধারণে কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ৮ বিভাবতী একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জনাব জামির ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয় সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সমাজের বিত্তবান লোকের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানান। অতি সম্প্রতি দেশের জনৈক বিত্তবান ব্যক্তি ৪ কোটি টাকা খরচ করে ভবন নির্মাণ করে দেন। সরকারের ICT মন্ত্রণালয় শিক্ষার আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। সরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নগদ অর্থ সহায়তাসহ বিভিন্ন অনুদান প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় খুবই অগ্রগামী। ফলে বিভাবতী দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করেছে।

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. প্রাথমিক শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ারের পার্থক্য দেখাও। ২

গ. বিভাবতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কোন উৎস থেকে অর্থায়ন হয়— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থায়নের উৎসগুলোর পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ প্রাইমারি শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য রয়েছে :

১. শেয়ার ইস্যু করে বিক্রির জন্য বাজারে প্রথমে যে শেয়ার ছাড়ে এবং ক্রেতা ঐ শেয়ার আইপিও (IPO) আবেদনের মাধ্যমে লাভ করে তাই হলো প্রাথমিক শেয়ার। অন্যদিকে, প্রাইমারি শেয়ার মালিকরা তাদের শেয়ার ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে অন্য বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রি করলে তা হয় সেকেন্ডারি শেয়ার।

২. প্রাইমারি শেয়ার সাধারণত ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সেকেন্ডারি শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ থেকেই সংগ্রহ করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাবতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে অর্থায়ন হয়।

যখন কোনো স্বীকৃত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন করা হয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। আর যদি কোনো ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে অর্থায়ন করা হয়, তবে তাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, প্রধান শিক্ষক জনাব জামির বিভাবতী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য আর্থিক সহযোগিতা আহ্বান করেন। এতে সাড়া দিয়ে জনৈক বিত্তবান ব্যক্তি ৪ কোটি টাকা প্রদান করেন, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে বিবেচিত। আর সরকারের ICT মন্ত্রণালয় শিক্ষার আধুনিক সরঞ্জাম এবং সরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নগদ অনুদান প্রদান করে, যা অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে বিবেচিত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থায়নের উৎসগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। নিচে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণত অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো বিভিন্ন ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থা ইত্যাদি। অন্যদিকে, অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো হলো— আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বন্ধক, মহাজন, ধনাঢ্য ব্যক্তি ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিভাবতী বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস জনৈক বিত্তবান ব্যক্তি থেকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস সরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন করা হয়। স্পষ্টত, প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের আওতা ও পরিধি তুলনামূলক বেশি।

আবার, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে অর্থায়নে দেশের প্রচলিত আইন বা দাতা প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলি পূরণ করতে হয়। অন্যদিকে, অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে অর্থায়নের ব্যক্তির ইচ্ছামাফিক শর্ত পূরণ করতে হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন— বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি সহজ শর্তে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বিশেষ করে গ্রাম্য মহাজন, ফড়িয়া জামানত ব্যতীত ও নিম্ন সুদে ঋণ দিতে রাজি থাকে না। কাজেই বলা যায়, অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোতে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৯ আতিক একজন মুদি দোকানদার। সেই সাথে সে শেয়ারবাজারে শেয়ার কেনাবেচাও করে। সে শেয়ারের দাম কমলে শেয়ার কেনে ও দাম বাড়লে শেয়ার বিক্রি করে। এতে আতিক সাহেব লাভবান হতে থাকে এবং তার পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তাকে দেখে অনেকে শেয়ার ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়। *[য. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. শেয়ার ও বন্ড মার্কেটের মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আতিক সাহেবের শেয়ার কোন ধরনের? তার বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. আতিক সাহেবের পুঁজি গঠনে শেয়ারবাজার কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ অর্থায়নের উৎস হিসেবে শেয়ার ও বন্ড উভয় মার্কেটের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলনা করে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

১. সুদের হারের সাথে শেয়ারবাজারের কোনো সম্পর্ক নেই। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির মালিক এবং কোম্পানির লভ্যাংশ লাভ করে থাকে। অন্যদিকে, সুদের হারের সাথে বন্ডমার্কেট সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। কারণ বন্ডের মূল্য সুদের হারের উঠানামার সাথে সাথে উঠানামা করে থাকে।

২. শেয়ারমার্কেটের মাধ্যমে অর্থায়নে কোনোরূপ ঝুঁকি নেই। কারণ— এখান থেকে পুঁজি সংগ্রহ করলে ঐ পুঁজির জন্য সুদ গুনতে হয় না। কিন্তু বন্ডমার্কেটের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে বন্ডের সুদ না দিতে পারার ঝুঁকি আছে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আতিক সাহেবের শেয়ার হলো মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার। প্রাথমিক শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার বিক্রি করে তখন তা মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হলে তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার বলে। সেকেন্ডারি শেয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

প্রাইমারি শেয়ারের বিশেষ রূপ: সেকেন্ডারি শেয়ার প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন অস্তিত্ববিশিষ্ট কোনো শেয়ার নয়। প্রাথমিক শেয়ারই শেয়ারবাজারে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা সেকেন্ডারি শেয়ার বলে বিবেচিত হয়।

চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ: এ শেয়ারের দাম তার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তাই চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়মিতই এর দাম পরিবর্তিত হয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের অবাধ স্বাধীনতা: শেয়ারবাজারের যেকোনো সদস্য এ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের মতো এ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে হয় না।

বোনাস বা রাইট শেয়ার ভোগের সুবিধা: এ শেয়ারের মালিক শেয়ারের সংখ্যানুপাতে বোনাস ও বোনাস শেয়ার পায় এবং রাইট শেয়ার ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে।

ঘ আতিক সাহেবের মতো দেশের পুঁজি গঠনে শেয়ারবাজার নানাভাবে ভূমিকা রাখে। শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ারবাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। শেয়ারবাজার এই 'শিল্প পুঁজি' (Industrial Capital) গঠন ও শিল্পের অর্থসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথমত, শেয়ারবাজার দেশে পুঁজির গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। শেয়ারবাজারে বিশেষ করে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার প্রতিনিয়ত বেচাকেনা হয়। এর ফরে পুঁজির গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, শেয়ারবাজার দেশে পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে অনেক উচ্চবিত্ত লোক আছে যারা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের সঞ্চয়কে কোনো উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার না করে অলসভাবে ফেলে রাখে। শেয়ারবাজার এসব সঞ্চয়কারীর অলস অর্থকে বিনিয়োগ করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, শেয়ারবাজার দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী আছে যারা তাদের সঞ্চয় বা আমানতকে বিনিয়োগের কাজে খাটাতে চায়। কিন্তু বর্তমান বৃহদায়তন শিল্পের যুগে কোনো ক্ষুদ্র আমানতকারীর পক্ষে এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয় করে তারা যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে শেয়ারবাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে।

চতুর্থত, শেয়ারবাজার জনগণকে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান করে। পণ্য বাজারের মতো শেয়ারবাজারেও জনগণ ইচ্ছেমতো যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। আবার, ইচ্ছা করলে প্রয়োজনের সময় এসব শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকা ফেরত পেতে পারে। এ কারণে জনগণ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। এর ফলে শেয়ারবাজারের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ কবির সাহেব আবেদনপূর্বক 'X' কোম্পানির ১০০ টাকার অভিহিত মূল্যের ৫০০টি শেয়ার ক্রয় করলেন। পরবর্তীতে তিনি অর্ধেক শেয়ার প্রতিটি ২০০ টাকা দামে বিক্রয় করলেন। এক বছর পর কবির সাহেবের শেয়ার হিসাবে বিনামূল্যে উক্ত কোম্পানির কিছু শেয়ার যুক্ত হলে তিনি খুশি হলেন। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. শেয়ারবাজার কী? ১

খ. অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শেয়ারের নাম লেখো। ৩

ঘ. কবির সাহেবের বিনামূল্যে অর্জিত শেয়ারের সাথে রাইট শেয়ারের তুলনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন বাজারের যে অংশে কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হয় তাকে 'শেয়ারবাজার' বলে।

খ বাজারে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির যোগান, সহজে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ, রাজস্ব বৃদ্ধি করে পুনঃপুনঃ ঋণ গ্রহণের দুশ্চিন্তা দূর করা যায় বলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থায়নের যে কয়টি উৎস রয়েছে তার মধ্যে মূলধন বাজার প্রধান। এটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, হিমাগার স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূলধন বাজার থেকে অর্থায়ন করা হয়।

গ কবির সাহেবের আবেদনপূর্বক ক্রয়কৃত শেয়ারের নাম হলো প্রাইমারি শেয়ার।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাইমারি বা প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। কোম্পানি নিজেই জনসাধারণের মধ্যে এ শেয়ার বিক্রি করে। ফেসভেল্যুর ভিত্তিতে প্রাইমারি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। প্রাইমারি শেয়ার অবলেখিত হতে হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই কাজ করে থাকে।

স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকারেজ হাউসে বিও হিসাব খোলার মাধ্যমে যেকোনো নাগরিক প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করার আবেদন করতে পারে। প্রাইমারি শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার লটের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি হয়। প্রাইমারি শেয়ার অবিক্রীত থাকলে অবলেখক ঐ শেয়ার ক্রয় করে। প্রাইমারি শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বাজারকে প্রাথমিক শেয়ারবাজার বলে। প্রাইমারি শেয়ার সম্পর্কিত বিষয় প্রসপেকটাস ছাপিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে কবির সাহেবের বিনামূল্যে অর্জিত শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে। নিচে বোনাস শেয়ারের সাথে রাইট শেয়ার তুলনা করা হলো।

কোম্পানি সঞ্চয়ী তহবিলে প্রচুর অর্থ জমা হলে তা থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে অর্থ পরিচালকদের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত শেয়ার হিসেবে পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে বিতরণ করে তাকে বোনাস শেয়ার বলে। অর্থাৎ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের বিনিময়ে তাদেরকে যে পূর্ণ আদায়ী শেয়ার বণ্টন করা হয় তাকে বোনাস শেয়ার বলে। এ শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। অনেক সময় কোম্পানির মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করে কিয়দাংশ মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কারবারে রেখে দেয় এবং তার বিনিময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ভেতর পূর্ণ আদায়ী অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার বণ্টন করে। এরূপ শেয়ার কোম্পানির অংশীদার ছাড়া অন্য কেউ ক্রয় করতে পারে না।

অন্যদিকে, পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির বর্তমান অংশীদারগণকে অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এরূপ শেয়ারকে রাইট শেয়ার বলা হয়। অনেক সময় কোম্পানি পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে চায়। এজন্য অতিরিক্ত শেয়ার ইস্যু করা হয়। এরূপ শেয়ার ক্রয়ের জন্য কোম্পানি বর্তমান শেয়ার মালিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। এ ধরনের শেয়ারই হলো 'রাইট শেয়ার'। কোম্পানির বর্তমান শেয়ার মালিক ছাড়া অন্য কেউ তা ক্রয় করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ১১ সাজ্জাদ সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি পেনশন থেকে প্রাপ্ত টাকা কোথায় বিনিয়োগ করবেন সেই বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। তার সহকর্মীরা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি কিছু টাকা ব্যাংকে রাখলেন এবং অবশিষ্ট টাকায় বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ও বন্ড ক্রয় করলেন। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অর্থায়ন বলতে কী বোঝ? ১

খ. নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধা উল্লেখ করো। ২

গ. সাজ্জাদ সাহেব কোন খাত থেকে নির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিত মুনাফা পাবেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন বিনিয়োগ খাত থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত, কিন্তু সব থেকে অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি? ব্যাখ্যা করো। ৪

https://teachingbd24.com

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন হলো একটি কার্যপ্রক্রিয়া, যা অর্থসংগ্রহ ও ব্যবহারের সাথে জড়িত।

খ প্রতিষ্ঠানের মালিক বা উদ্যোক্তা ব্যবসায় শুরুর সময় স্থায়ী মূলধন নিজে থেকে সরবরাহ করতে পারে। নিজস্ব সঞ্চয় থেকে কত টাকা খাটানো যাবে সে সম্পর্কে মালিক জ্ঞাত থাকে। নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থসংস্থানে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না বলে এ ধরনের অর্থায়নের ঝামেলা অনেক কম। অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা করা যায়।

গ সাজ্জাদ সাহেব বন্ড ও ব্যাংক খাত থেকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত মুনাফা পাবেন।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলো বন্ড। এতে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়কাল এবং আরও শর্তাবলি উল্লেখ থাকে। সুদের হারের ওপর বন্ডের মূল্য নির্ভর করে। বন্ড জামানতযুক্ত ও জামানতবিহীন হয়। বন্ডের ক্রেতা প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে সুদ এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আসল টাকা ফেরত পেয়ে থাকে। বন্ড অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে সুস্পষ্টভাবে ঋণকৃত অর্থের পরিমাণ, ঋণের নিশ্চয়তা ইত্যাদি থাকায় বর্তমান সময়ে বন্ড বহুল ব্যবহৃত এবং অর্থায়নের নির্ভরযোগ্য একটি উৎস হিসেবে কাজ করে। কেননা বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানির লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন বন্ডের মালিক নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে।

অন্যদিকে, ব্যাংক অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকেও জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সুদের হারের প্রেক্ষিতে তাদের অর্থ সঞ্চিত রাখে। এ খাত থেকেও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুনিশ্চিত মুনাফা পেয়ে থাকে।

উপরিউক্ত সুবিধাগুলো বিবেচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাজ্জাদ সাহেব ব্যাংক ও বন্ড খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মুনাফা পাবেন।

ঘ উদ্দীপকে সাজ্জাদ সাহেবের শেয়ার বিনিয়োগ খাতটি থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত, কিন্তু সব থেকে বেশি মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রধান উৎস হলো শেয়ার। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। বিভাজিত এক একটি অংশকেই শেয়ার বলা হয়। যারা এ শেয়ার ক্রয় করে তারা হলেন শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিকানা লাভ করে থাকেন। তারা কোম্পানির মালিক বিধায় কোম্পানির লাভ-লোকসান হলে তারা শেয়ারের অনুপাতে লাভের যেমন অংশ পায় তেমনি লোকসানের ভাগও বহন করতে হয়। এ কারণে শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বা দায় অনেকটাই সীমাবদ্ধ। শেয়ারবাজারে ব্যবসায়ীরা কম দামে শেয়ার ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন। তারা মূলত সেকেন্ডারি মার্কেটেই শেয়ার কেনা-বেচা করে থাকেন। এ বাজারে কোম্পানির শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করতে পারে। তাই বাজারে শেয়ারের দাম বাড়লে বিনিয়োগকারীরা অধিক লাভবান হয়। আবার শেয়ারের দাম কমলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেয়ারের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলে শেয়ার বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় থাকে এবং শেয়ার বাজারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাই শেয়ার মূল্যের ওঠা-নামা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ বিনিয়োগকারী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

তাই বলা যায়, শেয়ারের দরপতনের কারণে বাজারে যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে তাতে এ খাত থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত। তবে যখন শেয়ারের মূল্য অধিক বাড়ে তখন আবার এ খাত থেকেই অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ১২ আনোয়ার একজন ব্যাংক-কর্মকর্তা। স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত হাউজের মাধ্যমে তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করেন। অন্যদিকে, তার বন্ধু মামুন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লটারির মাধ্যমে একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে বেশ লাভবান হন। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. আনোয়ারের ক্রয়কৃত শেয়ার কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রাপ্তি স্থান, হাতবদল, ঝুঁকি গ্রহণ, দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আনোয়ার এবং মামুনের ক্রয়কৃত শেয়ার কি একই? তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো কাজ করার লক্ষ্যে অর্থসংগ্রহ করা এবং এর যথাযথ ব্যবহারকে অর্থায়ন বলে।

খ সৃজনশীল ১০ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনোয়ারের ক্রয়কৃত শেয়ারটি মাধ্যমিক শেয়ার।

প্রাথমিক শেয়ার ইস্যুর পর পরবর্তী পর্যায়ে যে শেয়ার কেনাবেচা হয় তখন তা মাধ্যমিক শেয়ার নামে পরিচিত। একজন বিনিয়োগকারী কখনোই শেয়ারবাজারে সরাসরি কেনাবেচা করতে পারে না। তাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্রোকারের মাধ্যমে করতে হয়। এই ব্রোকাররা শেয়ার ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী এবং শেয়ার বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

মাধ্যমিক বাজার হলো শেয়ার বাজারের মূল প্রাণকেন্দ্র। এ বাজারে কোনো কোম্পানির শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করে। বাজার শেয়ারে দাম বাড়লে বিনিয়োগকারী লাভবান হয়, আবার বাজার শেয়ারের দাম কমলে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বাজার মূলত শিল্পের মূলধন গঠনে বিশেষ অবদান রাখে।

অতএব, আনোয়ারের ক্রয়কৃত শেয়ারটি মাধ্যমিক শেয়ার। যা শুধু তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়, বরং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অধিকতর কাম্য।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, আনোয়ারের ক্রয়কৃত শেয়ার মাধ্যমিক শেয়ার। আর মামুনের ক্রয়কৃত শেয়ার প্রাথমিক শেয়ার। নিচে প্রাপ্তি স্থান, হাত বদল, ঝুঁকি গ্রহণ, দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আনোয়ার ও মামুনের শেয়ারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহী বিনিয়োগকারী ব্যক্তি BO একাউন্টের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে শেয়ার পেতে পারেন। আর মাধ্যমিক শেয়ার স্টক একচেঞ্জের মাধ্যমে পেতে পারেন।

প্রাথমিক শেয়ার কোম্পানি হতে প্রাপ্ত শেয়ার একবার হাত বদল হয়। অন্যদিকে, মাধ্যমিক শেয়ার অনেকবার হাত বদল হয়।

প্রাথমিক শেয়ারের ঝুঁকি কম। অনেক ক্ষেত্রে এ শেয়ার ঝুঁকিমুক্ত। আর মাধ্যমিক শেয়ারের ঝুঁকি বেশি। আবার, মুনাফার পরিমাণও বেশি।

প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য কত হবে তা ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে। আর, মাধ্যমিক শেয়ারের Face Value থাকলেও এর বাজার দাম কত হবে তা নির্ধারণ করবে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, আনোয়ার এবং মামুনের ক্রয়কৃত শেয়ারের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পদ্মা নদীর উপরে একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত সেতু নির্মাণের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অর্থসংস্থানের মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে 'পদ্মা সেতু' নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের এ সিদ্ধান্তে দেশের জনগণ গর্ববোধ করে। *[য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. পুঁজিবাজার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাথমিক অবস্থায় পদ্মা সেতুর জন্য অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থসংস্থানের সম্ভাব্য উৎসসমূহের বিশদ বিবরণ দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুঁজিবাজার বলতে এমন কতকগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত রূপকে বোঝায় যারা দীর্ঘমেয়াদি ঋণের কারবার করে।

খ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশকে শেয়ার বলে। আর কোম্পানির ঋণ গ্রহণের দলিলকে ঋণপত্র বা বন্ড বলে।

শেয়ার মালিকগণ লাভ-লোকসান বহন করে। কিন্তু বন্ডের মালিকগণ তা করে না। আবার, শেয়ারহোল্ডার বা মালিকদের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকে। কিন্তু বন্ডের মালিকরা কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের আলোকে প্রাথমিক অবস্থায় পদ্মা সেতুর জন্য অর্থসংস্থানের উৎসগুলো হলো নিজস্ব অর্থায়ন, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

নিজস্ব অর্থায়নের উৎস: সরকার প্রাথমিক অবস্থায় পদ্মা সেতু নির্মাণে নিজস্ব অর্থায়নের উৎস হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব আয়, অভ্যন্তরীণ ঋণ ইত্যাদি উৎস হতে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিশ্বব্যাংক: বাংলাদেশ সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ: সরকার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত পদ্মা সেতু প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন– ADB, IMF প্রভৃতি উৎস হতে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে শুধু নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। নিচে নিজস্ব অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎসসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো।

রাজস্ব আয়: রাজস্ব আয় সরকার যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সরকার অতিরিক্ত আয়ের জন্য জনগণের ওপর আরোপিত কর হার বৃদ্ধি করে অর্থসংস্থান করতে পারে।

অভ্যন্তরীণ ঋণ: সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প: সরকার জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের অধীনে সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ইত্যাদি বিক্রি করে পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থ সংস্থান করতে পারে।

নিট মূলধনী আয়: সরকার জনগণের নিকট বন্ড ও বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র বিক্রি করে অর্থসংস্থান করতে পারে।

করের আওতা বৃদ্ধি: সরকার দেশটির নতুন নতুন পণ্য ও ব্যক্তি করের আওতায় এনেও অর্থসংস্থান করতে পারে।

শেয়ারবাজার: পদ্মা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য শেয়ারবাজারে নতুন শেয়ার ছাড়তে পারে।

এছাড়া সরকার দেশের জনগণের কাছে সাহায্য আহ্বান করতে পারে। সুতরাং, উপর্যুক্ত উৎসগুলো থেকে সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রতন সাহেব একজন ব্যবসায়ী। নিজ ব্যবসার পাশাপাশি তিনি শেয়ারের ব্যবসাও করেন। একবার গ্রামীণফোনের শেয়ার কিনে বেশ লাভবান হওয়ায় এ শেয়ারের দিকেই তার আকর্ষণ বেশি। রতন সাহেব গ্রামীণফোনের প্রথম পর্যায়ের ক্রেতা যিনি সরাসরি গ্রামীণফোনের কাছ থেকে শেয়ার কিনেন। এজন্য তিনি মতিঝিলে স্টক এক্সচেঞ্জে যান। শেয়ারের মূল্যসূচক জেনে তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তা ক্রয় করেন। ফলে রতন সাহেবের শেয়ার ক্রয়জনিত ঝুঁকি ন্যূনতম থাকে। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ার কীভাবে সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে রতন সাহেব কোন ধরনের শেয়ারে বিনিয়োগ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রতন সাহেবের বিনিয়োগকৃত পুঁজি দেশের অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহের কাজকে বোঝায়।

খ প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট শেয়ার হস্তান্তরিত হলেই প্রাইমারি শেয়ার সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে প্রাইমারি শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার কোনো ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করে তখন তা সেকেন্ডারি শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

গ উদ্দীপকে রতন সাহেব সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক শেয়ারে বিনিয়োগ করেন।

প্রাথমিক শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হলে তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার বলে। এ শেয়ারের দাম বাজারে প্রতিদিন ওঠা-নামা করে। ফলে বাজার দামে মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। শেয়ারবাজার বলতে মূলত সেকেন্ডারি বাজারকেই বলা হয়। যেখানে পুরাতন বা পূর্ববর্তী সময়ে ইস্যুকৃত শেয়ারের লেনদেন হয়। এখানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতা মুখোমুখি না হয়ে শেয়ার কেনা-বেচা করতে পারে। এ বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই হচ্ছে বিনিয়োগকারী। কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে লেনদেনে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে আর্থিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করে লেনদেনকে প্রভাবিত করে। এ শেয়ারের বিনিয়োগ ঝুঁকি বেশি থাকে আবার লাভের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। যদি শেয়ারে লাভ থাকে তাহলে শেয়ার বিক্রি করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এজন্য, রতন সাহেবের সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক শেয়ারের বিনিয়োগের প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল। তবে এ শেয়ার বিনিয়োগে ঝুঁকিও বেশি থাকে।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রতন সাহেবের বিনিয়োগকৃত তহবিলটি পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন—

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। তাই তাদের আয়ের পরিমাণও কম। এতদসত্ত্বেও দেশের মধ্যে জনগণ তাদের সীমিত সঞ্চয় শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করে থাকে এবং লাভবান হয়। ফলে জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এসব কোম্পানির মধ্যে অনেক কোম্পানি অধিক মুনাফা অর্জন করে এবং উচ্চহারে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে। দেশে সাধারণ মানুষ এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ পায়। শেয়ারবাজার দেশের মূলধনের যোগান এবং এর গতিশীলতা বাড়ায়। ফলে দেশে নানা ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়।

কাজেই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রতন সাহেবের বিনিয়োগকৃত তহবিলটি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'A' বাজারে যখন সুদের হার উচ্চ থাকে 'B' বাজারে তখন মন্দা ভাব বিরাজ করে। 'A' বাজারের মাধ্যমে অর্থায়নে ক্রেতা ঋণদাতায় পরিণত হয়, আর 'B' বাজারের ক্রেতা আর্থিক মালিকানা লাভ করে। তবে 'B' বাজার একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় প্রবণতা, দেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধির হার ও গতিশীলতা আনয়নে ভূমিকা রাখে।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]

Teachingbd24.com

ক. বোনাস শেয়ার কী? ১
খ. উন্নয়নশীল দেশে অর্থায়নের উৎস হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' বাজারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির বণ্টনযোগ্য মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না করে যদি সমমূল্যের শেয়ার বিতরণ করা হয়, তবে তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

খ উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যমান দারিদ্র্যের চক্র ভেঙে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অর্থায়নের উৎস হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) যথেষ্ট অবদান রাখে।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশ পর্যাপ্ত মূলধন ও বিনিয়োগের অভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হয়। এজন্য এ সকল দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগণের আয় বৃদ্ধির দ্বারা দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। যা দেশটির উন্নয়ন নিশ্চিত করে। কাজেই বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়ন বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' বাজার হলো যথাক্রমে বন্ড ও শেয়ার বাজার। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হলো।

বন্ড মার্কেট হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন মেয়াদে বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয়। এক্ষেত্রে বন্ডের চাহিদা সুদের হারের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং বন্ড ক্রেতা কোম্পানির ঋণদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে যে বাজারে কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলে। এ বাজারে ভালো কিংবা মন্দভাব দেখা দিতে পারে এবং শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির মালিকানার অংশীদারিত্ব লাভ করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুদের হারের সাথে 'A' বাজারের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এই বাজারের মাধ্যমে অর্থায়নে ক্রেতাগণ ঋণদাতায় পরিণত হয়। অন্যদিকে, 'B' বাজারের ক্রেতাগণ কোম্পানির আর্থিক মালিকানা লাভ করে। তাই বলা যায়, A ও B বাজার হলো যথাক্রমে বন্ড ও শেয়ার বাজার। উক্ত দুটি বাজারের মধ্যে বন্ড বাজারের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে তুলনামূলক Cost of Fund বেশি হলেও শেয়ার মার্কেটে তা কম। তাছাড়া, বন্ড মার্কেটে সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু শেয়ার মার্কেটে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, A ও B বাজার তথা বন্ড ও শেয়ার বাজারে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

ঘ সঞ্চয় প্রবণতা ও মূলধন গঠন হার বৃদ্ধির মাধ্যমে শেয়ার বাজার একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের শেষ লাইনটির যৌক্তিকতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

কোনো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অত্যাবশ্যক। আর শিল্পোন্নয়ন নির্ভর করে পুঁজি গঠনের ওপর। আবার, পুঁজি গঠন বৃদ্ধি পায় যদি একটি দেশের জনগণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, মানুষের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে কাজে লাগানো হলে দেশটির পুঁজি গঠন হয়। এক্ষেত্রে শেয়ার বাজার কার্যকরি ভূমিকা রাখে। সাধারণত শেয়ার বাজার হতে ক্রয়কৃত শেয়ার থেকে লাভ পাওয়া যায়। যা মূলত মানুষের সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধি করে। আবার, নতুন কলকারখানা স্থাপন, পুরাতন কলকারখানার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং শিল্পের জন্য স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করা যায়।

আবার, শেয়ার বাজার থেকে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিকতা কম। ফলে উদ্যোক্তাগণ খুব সহজেই শেয়ার বাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া শিল্প উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। যা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোক্তাগণ এমন উৎস হতে ঋণ সংগ্রহ করতে চায়, যেখানে খুব শীঘ্রই পরিশোধ করতে হবে। আর শেয়ার বাজার হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বাজার। তাই শেয়ার শিল্প স্থাপনে অবদান রাখে। এভাবে শেয়ারবাজার সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি ও মূলধন গঠন হার বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজেই বলা যায়, উদ্দীপকের শেষ লাইনটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ স্কয়ার হাসপাতালের প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। ডা. হক সাহেব প্রতিটি শেয়ার ১৫০ টাকা দরে ক্রয় করেন। কিন্তু শেয়ারের দরপতনের কারণে তিনি ১২৫ টাকা দরে বিক্রি করে দেন। পরবর্তীতে তিনি একটি কোম্পানির বন্ড ক্রয় করেন। এই বিনিয়োগ তিন কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. শেয়ার কী? ১
খ. প্রাথমিক শেয়ার কীভাবে সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়? ২
গ. ডা. হক সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে যে সকল পার্থক্য রয়েছে তা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. পুঁজি গঠনে শেয়ারবাজারের ভূমিকা আছে কী? মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌথ মূলধনী কোম্পানির অনুমতিত মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশকে শেয়ার বলে।

খ প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট শেয়ার হস্তান্তরিত হলেই প্রাথমিক শেয়ার সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে প্রাইমারি শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার কোনো ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করে তখন তা সেকেন্ডারি শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ডা. হক সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে যে সকল পার্থক্য রয়েছে, নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

শেয়ার হলো যৌথ মূলধনী কোম্পানির অনুমতি মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ। বিনিয়োগের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি হলেও শেয়ার হতে মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ বেশি। তাছাড়া শেয়ার বিক্রয় যৌথ মূলধনী কোম্পানির অর্থ সংস্থানের প্রধান উৎস। পক্ষান্তরে, কোম্পানি তার গৃহীত ঋণের কথা স্বীকার করে ঋণদাতাকে যে দলিল প্রদান করে, তাকে বন্ড বলে। বন্ডে বিনিয়োগকারী চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ডা. হক সাহেব ১৫০ টাকা দরে শেয়ার ক্রয় করলেও দর পতনের কারণে তা ১২৫ টাকায় বিক্রি করেন। অর্থাৎ শেয়ার হতে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া, সুদের হারের সাথে শেয়ার বাজারের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, বন্ড হতে মুনাফা প্রাপ্তি কম হলেও তা নিশ্চিত। সুদের হারের সাথে বন্ড মার্কেটের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।

ঘ কোনো দেশের পুঁজি গঠনে শেয়ার বাজার নানাভাবে ভূমিকা রাখে। শেয়ার বাজার দেশে পুঁজি গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। শেয়ার বাজারে বিশেষ করে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার প্রতিনিয়ত বেচাকেনা হয়। এর ফলে পুঁজির গতিশীলতা এবং উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দেশে অনেক উচ্চবিত্ত লোক আছে যারা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের সঞ্চয়কে কোনো উৎপাদমুখী কাজে ব্যবহার না করে অলসভাবে ফেলে রাখে। শেয়ার বাজার এসব সঞ্চয়কারীর অলস অর্থ বিনিয়োগ করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। আবার শেয়ার বাজার দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী আছে যারা তাদের সঞ্চয় বা আমানতকে বিনিয়োগের কাজে খাটাতে চায়। কিন্তু বর্তমান বৃহদায়তন শিল্পের যুগে কোনো ক্ষুদ্র আমানতকারীর পক্ষে

https://teachingbd24.com

এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শেয়ার জারে শেয়ার ক্রয় করে তারা যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে শেয়ার বাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে।

শেয়ার বাজার জনগণকে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান করে। পণ্য বাজারের মতে শেয়ার বাজারেও জনগণ ইচ্ছামতো যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। আবার, ইচ্ছা করলে প্রয়োজনের সময় এসব শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকা ফেরত পেতে পারে। এ কারণে জনগণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। এর ফলে শেয়ার বাজারের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। তাই পরিশেষে বলা যায়, পুঁজি গঠনে শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সামিয়া হাসান একটি ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক। ব্যবসায়ের পাশাপাশি তিনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পূর্বে তিনি প্রশিক্ষণ নেন এবং ভেবেচিন্তে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। সামিয়া নিয়মিত স্টক এক্সচেঞ্জে যাতায়াত করেন এবং শেয়ারের মূল্য সূচক জেনে তিনি তা বিক্রয় করেন। ফলে তার শেয়ার ক্রয়জনিত ঝুঁকি ন্যূনতম থাকে এবং এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি অনেক লাভবান হন। এছাড়া তার মত অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর অর্থ দ্বারা শিল্প পুঁজি সমৃদ্ধ হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পুঁজিবাজার কি? ১

খ. ব্যক্তিগত সঞ্চয় অর্থায়নের নির্ভরযোগ্য উৎস— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের শেয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ দ্বারা শিল্পপুঁজি সমৃদ্ধ হয়— তুমি কি এ বিষয়ে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘমেয়াদি ঋণযোগ্য তহবিলের বাজারকে পুঁজিবাজার বলে।

খ ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রাপ্যতার দিক থেকে অর্থায়নের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

ব্যক্তি তার আয়ের সবটুকুই ব্যয় না করে কিছু অংশ সঞ্চয় করে। এই সঞ্চয় সুদের হার, কর ব্যবস্থা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাধারণত দুর্ঘটনায় সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি, কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা সম্পত্তি ক্রয়, উৎপাদনক্ষম কোনো কাজ শুরু করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ সর্বাগ্রে তার সঞ্চয় কাজে লাগায়। কারণ ব্যক্তি সঞ্চয় দ্বারা অর্থায়নের জন্য তা করে কোনো অতিরিক্ত সুদ বহন করতে হয় এবং তা সহজেই প্রয়োজন মতো পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, ব্যক্তি সঞ্চয় অর্থায়নের নির্ভরযোগ্য উৎস।

গ উদ্দীপকে মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো-

প্রাথমিক শেয়ার ইস্যুর পরবর্তী পর্যায়ে যখন শেয়ার কেনাবেচা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার বলা হয়। যে বাজারে এ ধরনের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেট বলে। সেকেন্ডারি মার্কেটে কেনাবেচাই হলো শেয়ার ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র। স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত সদস্যবৃন্দ এ বাজারে কেনাবেচা করে। একজন বিনিয়োগকারী কখনই শেয়ারবাজারে সরাসরি কেনাবেচায় অংশ নিতে পারেন না। যখন কেউ শেয়ারবাজারে শেয়ার কিনতে বা বিক্রি করতে চায় তখন তাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্রোকার বা ডিলারদের মাধ্যমেই তা করতে হয়। এই ব্রোকার বা ডিলাররা শেয়ার ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী এবং শেয়ার বিক্রেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সামিয়া হাসান ভেবেচিন্তে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। তিনি এই ধরনের শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করেন। তাই বলা যায়, সামিয়া হাসানের ক্রয়কৃত শেয়ার হলো মাধ্যমিক শেয়ার।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বৃহৎ বিনিয়োগকারীর পরিমাণ কম হওয়ায় অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ শিল্পপুঁজি সমৃদ্ধ হয় বলে আমি মনে করি।

কোনো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন প্রয়োজন। আর এই শিল্পায়ন নির্ভর করে শিল্প পুঁজি গঠনের ওপর। প্রকৃতপক্ষে দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ এবং তা শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে শিল্পপুঁজি গঠিত হয়। এক্ষেত্রে শেয়ার বাজার দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। এর ফলে দেশের পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক সামিয়া হাসান শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে লাভবান হন। তার মতো আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছেন। এতে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ শেয়ার বাজার হতে অর্থ সংগ্রহ করে বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ করছে। ফলশ্রুতিতে দেশে শিল্পপুঁজি গঠন হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শেয়ার বাজার দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী আছে যারা তাদের সঞ্চয়কে বিনিয়োগের কাজে খাটাতে চায়। কিন্তু বর্তমান বৃহদায়তন শিল্পের যুগে কোনো ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর পক্ষে এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয় করে তারা যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অংশগ্রহণ করতে পারে। শেয়ারবাজার বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়প্রবণতা বাড়ায়, দেশে পুঁজি গঠন ও এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামিয়া হাসানের মতো অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ দ্বারা আমাদের দেশের শিল্পপুঁজি সমৃদ্ধি লাভ করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মিসেস রোকেয়া সুলতানা স্কুলের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসরে যাওয়ার পর ১৫ লক্ষ টাকা পেনশন পেয়েছেন। তার স্বামীও একজন অবসরপ্রাপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তার পরামর্শে মিসেস সুলতানা ১০ লক্ষ টাকার পারিবারিক সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলেন এবং অবশিষ্ট টাকা দ্বারা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের নিবন্ধিত সদস্যদের নিকট হতে ক্রয় করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. FDI কী? ১

খ. 'নিজস্ব সঞ্চয়-অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মিসেস সুলতানার কোন খাতে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঝুঁকি বিবেচনার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে কোন খাতের বিনিয়োগ হতে অধিক মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে কর— বুঝিয়ে লেখ। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক FDI হলো Foreign Direct Investment অর্থাৎ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ।

খ প্রতিষ্ঠানের মালিক বা উদ্যোক্তা ব্যবসায় শুরুর সময় স্থায়ী মূলধন নিজে থেকে সরবরাহ করতে পারে। নিজস্ব সঞ্চয় থেকে কত টাকা খাটানো যাবে সে সম্পর্কে মালিক জ্ঞাত থাকে। নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থসংস্থানে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না বলে এ ধরনের অর্থায়নের ঝামেলা অনেক কম। অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা করা যায়।

গ উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা ১৫ লক্ষ টাকা পেনশন পেয়েছেন যার ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংকে পারিবারিক সঞ্চয়পত্র ক্রয় এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করলেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক খাতটিকে কম ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়।

অর্থায়নের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করে ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সুদের হারের প্রেক্ষিতে তাদের অর্থ সঞ্চিত রাখে। এ খাত থেকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

https://teachingbd24.com

প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে সুদ এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরে আসল টাকা ফেরত পেয়ে থাকে। তাই ব্যাংক খাতটি অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে সুস্পষ্টভাবে অর্থের পরিমাণ, অর্থের নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। বর্তমান সময়ে এটি বহুল ব্যবহৃত এবং নির্ভরযোগ্য উৎসের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

অতএব উপরিউক্ত সুবিধাগুলো বিবেচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মিসেস সুলতানা ব্যাংক খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত মুনাফা পাবেন বলে এ খাতে বিনিয়োগটি কম ঝুঁকিপূর্ণ।

খ উদ্দীপকে মিসেস সুলতানার শেয়ার বিনিয়োগ খাতটি থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত। কিন্তু সব থেকে বেশি মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা এ খাতেই বেশি।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রধান উৎস হলো শেয়ার। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। বিভাজিত এক একটি অংশকেই শেয়ার বলা হয়। যারা এ শেয়ার ক্রয় করে তারা হলেন শেয়ারহোল্ডার। শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিকানা লাভ করে থাকেন। তারা কোম্পানির মালিক বিধায় কোম্পানির লাভ-লোকসান হলে তারা শেয়ারের অনুপাতে লাভের যেমন অংশ পায় তেমনি লোকসানের ভাগও বহন করতে হয়। এ কারণে শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বা দায় অনেকটাই সীমাবদ্ধ। শেয়ারবাজারে ব্যবসায়ীরা কম দামে শেয়ার ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন। তারা মূলত সেকেন্ডারি মার্কেটেই শেয়ার কেনাবেচা করে থাকেন।

এ বাজারে কোম্পানির শেয়ারের দাম ওঠানামা করতে পারে। তাই বাজারে শেয়ারের দাম বাড়লে বিনিয়োগকারীরা অধিক লাভবান হয়। আবার শেয়ারের দাম কমলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেয়ারের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলে শেয়ারবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে এবং শেয়ারবাজারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাই শেয়ার মূল্যের ওঠানামা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ বিনিয়োগকারী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

তাই বলা যায়, শেয়ারের দরপতনের কারণে বাজারে যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে তাতে এ খাত থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত। তবে যখন শেয়ারের মূল্য অধিক বাড়ে তখন আবার এ খাত থেকেই অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মাহমুদ একজন ব্যবসায়ী। তার একটি ছোটখাটো মুদির দোকন আছে। সেই সাথে শেয়ার বাজারে সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার কেনা-বেচার কাজও করে। শেয়ারের দাম যখন কম থাকে তখন শেয়ার ক্রয় করে, আবার শেয়ারের দাম যখন বৃদ্ধি পায় তখন শেয়ার বিক্রি করে লাভবান হয়। তবে শেয়ারের দাম হঠাৎ কমে গেলে শেয়ার ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রবিনিয়োগকারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুঁজি বাজারের স্থিশীলতার স্বার্থে শেয়ারের দামের অস্বাভাবিক ওঠা-নাম বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. শেয়ার বাজার কী? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ার বাজার ও সেকেন্ডারি শেয়ার বাজারের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহমুদ একজন নিয়মিত ব্যবসায়ী হয়েও শেয়ার বাজারে অংশ নেয় কেন? ৩

ঘ. শেয়ার বাজারের অস্বাভাবিক ওঠা-নামা রোধে তুমি কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে বা স্থানে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার বেচা-কেনা হয় তাকে শেয়ার বাজার বলে।

খ প্রাইমারি শেয়ার বাজার এবং সেকেন্ডারি শেয়ার বাজারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. প্রাইমারি শেয়ার বাজারে কোম্পানি বা ইস্যু হাইস আই.পি.ও (IPO)-এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ছাড়ে এবং আবেদন দ্বারা সরাসরি কিংবা লটারির মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। অন্যদিকে সেকেন্ডারি শেয়ার বাজারে প্রাইমারি শেয়ার মালিকরা তাদের মালিকানায় থাকা শেয়ার ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করে।

২. প্রাইমারি শেয়ার বাজারে শেয়ার ইস্যু-কারক কর্তৃক আই.পি.ও (IPO)-এর মাধ্যমে নির্বাচিত বি.ও. একাউন্টধারীর একাউন্টে পৌছায়। অন্যদিকে সেকেন্ডারি শেয়ার বাজারে শেয়ার ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনা যায়।

গ পুঁজিবাজার বা শেয়ার বাজার থেকে ঝুকিহীনভাবে বা কম ঝুঁকি নিয়ে অর্থ উপার্জন বা ব্যবসারের মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলে উদ্দীপকের মাহমুদ একজন নিয়মিত ব্যবসায়ী হয়েও শেয়ার বাজারে অংশ নেয়।

শেয়ার হলো এক ধরনের অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় ঋণপত্র। শেয়ার বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কোম্পানি এটি ইস্যু করে থাকে। যে কোনো সাধারণ মানুষ ব্রোকারেজ হাউসের মাধ্যমে এই শেয়ার ক্রয়—বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

উদ্দীপকের মাহমুদ একজন ব্যবসায়ী, যার একটি মুদি দোকান রয়েছে। এ ছাড়াও সে সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। যেসব সুবিধার জন্য মাহমুদ একজন নিয়মিত ব্যবসায়ী হয়েও শেয়ার বাজারে অংশ নেয় তা হলো– প্রথমত, শেয়ার বাজার হতে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে মাহমুদ তার ব্যবসায়ের জন্য অতিরিক্ত মূলধন জোগাড় করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শেয়ার বাজারে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করা হলে অলস সময়ে কম পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব, যা মাহমুদের মত ব্যবসায়ীদের শেয়ার ব্যাজারের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। তৃতীয়ত, শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মূলত বিভিন্ন কোম্পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকানা লাভ করা হয়। এর ফলে ওই সব কোম্পানি যে লাভ করে বছর শেষে তার একটি নির্ধারিত অংশ মাহমুদের মতো বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ হিসেবে পেয়ে থাকে। যা মাহমুদকে বা মাহমুদের মতো অন্যদের শেয়ার বাজারে অংশ নিতে উৎসাহিত করে থাকে। মূলত উপরে উল্লিখিত কারণগুলোর জন্যই উদ্দীপকের মাহমুদ একজন নিয়মিত ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নেয়।

ঘ শেয়ার বাজারে দাম বাড়লে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার ক্রয় করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আবার হঠাৎ করে দাম পড়ে গেলে তারা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে শেয়ারের দামের অস্বাভাবিক ওঠা-নাম বন্ধ হওয়া উচিত। এই অস্বাভাবিক ওটা-নামা রোধে আমার কিছু সুপারিশ রয়েছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো-

আমাদের শেয়ার বাজারে সবসময় একটা অস্থিরতা লেগেই আছে। আজ শেয়ার বাজারে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায় তো, কাল আবার নিম্নমুখী। দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রবণতা চলছে। অথচ শেয়ার বাজার একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থনৈতিক চিত্রকে প্রতিফলিত করে। তাই দেশের উন্নতির স্বার্থেই শেয়ার বাজারের স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা, নীতিমালা এবং গাইডলাইন।

দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার স্বার্থেই উদ্দীপকের শেয়ার বাজারের অস্বাভাবিক ওঠা-নামা রোধ করতে হবে, পুঁজিবাজারকে গতিশীল করতে হবে। ফটকাবাজদের হাত থেকে একে রক্ষা করতে হবে। কেউ যাতে কোনো অবস্থাতেই বাজারকে কৃত্রিমভাবে ম্যানিপুলেট করতে না পারে, সে জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে এসইসি (SEC) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শেয়ার বাজারকে পুনর্গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাজার সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। সাধারণ মানুষদের শেয়ার বাজারে পুঁজি বিনিয়োগে সতর্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে

https://teachingbd24.com

প্রয়োজনে গণমাধ্যমের সহায়তা নেয়া যায় বা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে শেয়ার বাজার সম্পর্কে ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে কস্ট প্রাইসে এক্সপোজার বিবেচনা, বন্ডে বিনিয়োগ এক্সপোজারের বাইরে রাখা, হাউসগুলোর নতুন শাকা খোলার অনুমতি এবং লেনদেন ডাটার গোপনীয়তা রক্ষা করা। এ ছাড়াও অটোমেশন তথা আধুনিক কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার ব্যহার নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে সকল প্রকার জালিয়াতি দূর করার মাধ্যমে শেয়ার বাজারের অস্বভাবিক ব্যবহার প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

উপরে প্রস্তাবিত উপায়গুলোর আন্তরিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে বিদ্যমান বর্তমান অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ শেয়ারের দামের ওঠা-নাম রোধ করে শেয়ারবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶২০ সাদিয়া ও আইরিন দুই বোন। দু'জনেই ছাত্রী। তারা প্রাইভেট টিউশনি করে প্রচুর টাকা আয় করে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তারা কেয়া কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে। আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হওয়া লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিতরণ করা হয়। লটারি জিতে সাদিয়া কেয়া কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে। অন্যদিকে, লটারিতে হেরে আইরিন 'ক' স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে 'তিব্বত' কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে। *[হলিক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ব্যক্তিগত অর্থায়ন কী? ১

খ. কেন বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে সাদিয়ার শেয়ার কী ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে সাদিয়া ও আইরিনের শেয়ার কী একই ধরনের। তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো ব্যক্তি তার দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যে অর্থের সংস্থান করে তাকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন বলে।

খ বন্ডের ধারক একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে ফলে তার মুনাফা সুনিশ্চিত। তাই বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই।

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বন্ডের ধারককে কোম্পানির লাভ অথবা লোকসান কোনোটির ভারই বহন করতে হয় না। এতে কোম্পানি যখন লাভবান হয় তখন বন্ডের মালিককে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফাও প্রদান করা হয় না। আবার কোম্পানি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও বন্ডের মালিককে তার নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হয়। এতে বন্ডের মালিককে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। তাই বলা যায়, বন্ড বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ উদ্দীপক অনুসারে সাদিয়ার শেয়ার হলো প্রাথমিক শেয়ার।

কোনো কোম্পানি যকন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাইমারি বা প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। কোম্পানি নিজেই জনসাধারণের মধ্যে এ শেয়ার বিক্রি করে। ফেস ভেল্যুর ভিত্তিতে প্রাইমারি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। প্রাইমারি শেয়ার অবলেখিত হতে হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই কাজ করে থাকে।

স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকারেজ হাউসে বিও হিসাব খোলার মাধ্যমে যেকোনো নাগরিক প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করতে আবেদন করতে পারে। প্রাইমারি শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার লটের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি হয়। প্রাইমারি শেয়ার অবিক্রীত থাকলে অবলেখক ঐ শেয়ার ক্রয় করে। প্রাইমারি শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বাজারকে প্রাথমিক শেয়ারবাজার বলে। প্রাইমারি শেয়ার সম্পর্কিত বিষয় প্রসপেকটাস ছাপিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়।

ঘ লটারি জিতে সাদিয়া কেয়া কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে যা ছিল প্রাথমিক শেয়ার। অন্যদিকে, লটারিতে হেরে আইরিন 'ক' স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে 'তিব্বত' কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে যা ছিল মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার।

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে প্রাইমারি শেয়ার ও মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার একই ধরনের নয়। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রাইমারি শেয়ার: কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। বাজারে প্রথম যে শেয়ার ছাড়া হয় তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে।

কোম্পানি নিজেই জনসাধারণের মধ্যে এ শেয়ার বিক্রি করে। ফেস ভেল্যুর ভিত্তিতে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার হাউসে BO (Beneficiary Owners) হিসাব খোলার মাধ্যমে যেকোনো নাগরিক প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করতে আবেদন করতে পারে। প্রাথমিক শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার লটের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি হয়। প্রাথমিক শেয়ার অবিক্রীত থাকলে অবলেখক ঐ শেয়ার ক্রয় করে।

সেকেন্ডারি শেয়ার: প্রাথমিক শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার বিক্রি করে তখন তা মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হলে তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার বলে। শেয়ারবাজারের মাধ্যমে এ শেয়ার হস্তান্তর বা ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এ শেয়ার বিনিয়োগকারী জনসাধারণের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সাদিয়ার লটারীতে জিতা শেয়ার ও আইনের ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত শেয়ারের মাধ্যমে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶২১ ফায়েদের বন্ধু সাদি একটি কোম্পানিতে কাজ করে। GMG নামক কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার দাম ১০ টাকা ছিল। সাদির পরামর্শে ফায়েদ GMG কোম্পানির ১০০০টি শেয়ার ক্রয় করেন প্রতিটি ১৫ টাকা মূল্যে। পরবর্তীতে উক্ত শেয়ারের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় তিনি ১২ টাকা উক্ত শেয়ার বাজারে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুধরনের শেয়ারের মধ্যে তুলনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফায়েদের শেষোক্ত বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ— ব্যাখ্যা কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ-সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ মালিক বা উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন এবং অবণ্টিত মুনাফা ছাড়া ঋণ হিসেবে যে সমস্ত উৎস হতে ঋণ সংগ্রহ করা হয় তাকে অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলে।

অর্থায়নের এ উৎস আবার দু'ধরনের; যথা- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক। ক্রেতা থেকে অগ্রিম গ্রহণ, প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ, বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক ইত্যাদি হলো অর্থায়নের দেশীয় বাহ্যিক উৎস। আর দাতা দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সাহায্য, ঋণদান, অনুদান ইত্যাদি হলো অর্থায়নের আন্তর্জাতিক বাহ্যিক উৎস।

গ উদ্দীপকে X কোম্পানির ১০ টাকা দামের শেয়ার প্রাথমিক শেয়ারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, রহিমের ক্রয়কৃত শেয়ারটি মাধ্যমিক শেয়ারের অন্তর্ভুক্ত। এই দুই শেয়ারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, কোনো কোম্পানি বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে শেয়ার প্রাথমিকভাবে ইস্যু করে তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলে। অন্যদিকে, প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের পর বিনিয়োগকারী যে শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তাকে মাধ্যমিক শেয়ার বলে।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ব্যাংককে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, সেকেন্ডারি শেয়ার স্টক একচেঞ্জ হতে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

https://teachingbd24.com

তৃতীয়ত, প্রাথমিক শেয়ার অবিক্রীত থাকলে সংশ্লিষ্ট অবলেখক তা ক্রয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বাজারে অবিক্রীত শেয়ার ক্রয়ের দায়-দায়িত্ব অবলেখকের ওপর বর্তায় না। তাছাড়া প্রাথমিক শেয়ারে ঝুঁকি কম বা ঝুঁকি নেই বলা চলে, কিন্তু মাধ্যমিক শেয়ারে ঝুঁকি সর্বদা বিদ্যমান আবার মুনাফার সম্ভাবনাও অধিক থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ফায়েদ শেয়ার বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করেন।

বন্ড হলো এক ধরনের ঋণপত্র যা সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং তা দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ঘটাতে সক্ষম। এ ঋণের দলিলে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের মেয়াদ বা সময়কাল এবং অন্যান্য শর্তাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। এ ঋণ দলিলে সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকে এবং সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে যা সরকার কিংবা কোম্পানি প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানির খরচ কম হয়। কারণ এ ধরনের ঋণের সুদের হার কম হয় এবং শেয়ারের চেয়ে এটি কম খরচে বিক্রি করা যায়। তাছাড়া, বাংলাদেশে শেয়ার কেনা-বেচার সাথে যারা জড়িত তাদের সিংহভাগ লোকই শেয়ার সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও রাখে না। দেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এসব ছাড়াও শেয়ার বাজারে ব্যাপক দরপতন ঘটে। শেয়ার মূল্যের ওঠা-নামার কারণে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী আজ সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে বন্ডের মালিকদের শেয়ারহোল্ডারদের মতো কারবারের লোকসান বা দায় বহন করতে হয় না। তাই তাদেরকে ঝুঁকি বহন করতে হয় না।

যেহেতু বন্ডের মালিকেরা সুনির্দিষ্ট হারে সুদ বা আয় পেয়ে থাকে তাই বলা যায় ফায়েদের বন্ডে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২২ কাশেম সাহেব গত বছর সরাসরি X কোম্পানি প্রথম যে শেয়ার বিক্রয় করে তা হতে ১০০০ হার শেয়ার ক্রয় করেন। এ বছর তার ছেলের বিয়েতে টাকার প্রয়োজন হলে তিনি তা বিক্রি করে দেন। ইতোপূর্বে তার স্ত্রী কিছু বন্ড ক্রয় করেছিলেন তাও তিনি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. শেয়ার কি? ১

খ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের শেয়ারের কথা উল্লেখ আছে? ২

গ. বন্ড ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মূলধন গঠনে শেয়ার বাজারের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ার হলো কোনো লিমিটেড কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ।

খ উদ্দীপকে কাশেম সাহেব X কোম্পানি থেকে প্রথম যে শেয়ার কিনেন তা হচ্ছে প্রাইমারি শেয়ার, অন্যদিকে তার স্ত্রী কিছু বন্ড ও ক্রয় করেন।

কোনো কোম্পানি যখন বাজারে প্রথম শেয়ার বিক্রয় করে তখনই শেয়ারকে প্রাইমারি শেয়ার বলে। অন্যদিকে, যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে যখন প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান না হয় তখন কোম্পানি বন্ড ইস্যু করে। বন্ড হলো কোম্পানির এক ধরনের ঋণপত্র বা দলিল। সুতরাং, উদ্দীপকে শেয়ার বন্ডে কথা উল্লেখ আছে।

গ বন্ড ও শেয়ারের মধ্যে যেসব পার্থক্য দেখা দেয় সেগুলো নিম্নরূপ-

কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশকে শেয়ার বলে। আর কোম্পানির ঋণগ্রহণের দলিলকে ঋণপত্র বা বন্ড বলে। শেয়ার মালিকগণ লাভ-লোকসান বহন করে। কিন্তু বন্ডের মালিকগণ তা করে না। আবার শেয়ার হোল্ডারদের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকে। কিন্তু বন্ডের মালিকরা কোম্পানির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। বন্ডে ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সুদের হার প্রভৃতি উল্লেখ থাকে। ফলে এর মালিকানা হস্তান্তর করা সম্ভব। কিন্তু শেয়ার বাজারে এরূপ ঋণের মেয়াদ সুদের হার দলিলে উল্লেখ থাকে না। তাছাড়া যদি কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি বন্ধক রেখে বন্ডের মাধ্যমে কোম্পানি পর্যাপ্ত বহবিল সংগ্রহ করে এবং কোম্পানির উক্ত বন্ডের টাকা ফেরতদানে ব্যর্থ হলে, বন্ড হোল্ডাররা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে তাদের ঋণের টাকা আদায় করতে পারে। কিন্তু শেয়ার হোল্ডাররা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে না। এরপরও বন্ডের বাজারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে শেয়ার বাজার বেশি জনপ্রিয়।

সুতরাং, শেয়ার ও বন্ডের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বোঝা যায় যে, এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ঘ শেয়ার বাজার দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করে। তাই মূলধন গঠনে শেয়ার বাজারের ভূমিকা অপরিসীম।

শেয়ার বাজার থেকে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যায়। এই ফলে পুঁজির গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। দেশে অনেক উচ্চবিত্ত লোক আছে যারা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার অভাবে তাদের সঞ্চয়কে কোনো উৎপাদনমুখী পথে ব্যবহার না করে অর্থ অলসভাবে ফেলে রাখে। শেয়ার বাজারে এসব অলস অর্থের বিনিয়োগ করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। আবার সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী আছে যারা সঞ্চয়কে বিনিয়োগের কাজে খাটাতে চায়। কিন্তু বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্পের যুগে এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয় করার মাধ্যমে তা সম্ভব।

শেয়ার বাজার জনগণকে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান করে। পণ্য বাজারের মতো শেয়ার বাজারেও জনগণ ইচ্ছামতো যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে প্রয়োজনের সময় এসব শেয়ার বিক্রয় করে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে। এ কারণে জনগণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। ফলে দেশে মূলধন গঠনের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, বাংলাদেশে বিনিয়োগে সবেচেয় জনপ্রিয় মাধ্যম হলো শেয়ার বাজার, যা দেশের মূলধন গঠনে ভূমিকা পালন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ লতিফ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় না করে বন্ড ক্রয় করে। তার ধারণা বন্ড থেকে যেমন সুবিধা পাওয়া যায় তেমনটি শেয়ার থেকে পাওয়া যায় না। বন্ড থেকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত আয় পাওয়ায় তার এরকম ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। *[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. রাইট শেয়ার কাকে বলে? ১

খ. জিরো কুপন বন্ড ও কুপন বন্ডের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধাগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটের অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পনির বর্তমান অংশদীরগণকে অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এরূপ শেয়ারকে রাইট শেয়ার বলা হয়।

খ জিরো কুপন বন্ড ও কুপন বন্ডের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

জিরো কুপন বন্ড তার গায়ে লিখিত মূল্যে বা তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা হয়। কিন্তু কুপন বন্ড তার গায়ে লিখিত মূল্যেই বিক্রি কর হয়। জিরো কুপন বন্ডে ক্রয়মূল্য ও পরিশোধমূল্যের পার্থক্যই হলো বন্ড ক্রেতা তথা ঋণদাতার আয়। অন্যদিকে কুপন বন্ডের গায়ে লিখিত নির্দিষ্ট সুদের হারই হলো বন্ড ক্রেতার আয়। এ ছাড়া, জিরো কুপন বন্ড সুদের হারের সাথে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু কুপন বন্ড সুদের হারের সাথে সংশ্লিষ্ট।

গ বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের কতগুলো সুবিধা রয়েছে।

ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিলে উচ্চাহারে সুদ প্রদান করতে হয়। এ জন্য কোম্পানির উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানির খরচ কম হয়, কারণ এ ধরনের ঋণের সুদের হার কম হয় এবং শেয়ারের চেয়ে এটি কম খরচে বিক্রি করা যায়। অন্যদিকে, কোম্পানি আইন অনুযায়ী, বন্ডের সুদ

https://teachingbd24.com

করবাদযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই এই মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানি কর রেয়াত পায়। আবার বন্ডধারকদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। তাই তারা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না বলে কোম্পানি স্বাধীনভাবে তার কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে।

বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে বন্ডের মালিকদের শেয়ারহোল্ডারদের মতো কারবারের লোকসান বা দায় বহন করতে হয় না। এ ছাড়া কখনো শেয়ারবাজার খুব অস্থির হয়ে পড়লে বাজারে শেয়ার গ্রহণযোগ্য হয় না। তখন কোম্পানির জন্য বন্ডই তহবিলের উৎস হতে পারে। আর কোম্পানি গঠনের পর শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ সংকুলান না হলে কোম্পানি বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে। এভাবে দেখা যায়, বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানি বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করতে পারে।

ঘ বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে কিছু সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশের শেয়ার কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ লোকই শেয়ার সংক্রান্ত ন্যূনতম জ্ঞানও রাখে না। তাছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক সময়মতো বার্ষিক সাধারণ সভা না ডাকা, লভ্যাংশ প্রদানে গড়িমসি করা, সঠিক লাভ-ক্ষতির হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ না করা ইত্যাদি কারণে শেয়ারবাজারের ওপর জনগণের একরকম আস্থা নেই বললেই চলে। এসব ছাড়াও শেয়ারবাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও তদারকির জন্য গঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে না।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার দু'বার ১৯৯৬ ও ২০১০ সালে ধসের সম্মুখীন হয়েছে। লাখ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে ফিরেছে। কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুর সীমিত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, শেয়ার মার্কেটে কিছু লোভী দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীর চতুর কারসাজি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনুন্নত অবকাঠামো, আমলাতন্ত্র, মূলধনের অভাব ইত্যাদি কারণে শেয়ার মার্কেটে ব্যাপক দরপতন ঘটে। অবশ্য বিগত বছর দুয়েক থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটছে। এখন শেয়ারগুলোর দাম খুব একটা ওঠানামা করে না। শেয়ার বাজারে অস্থিরতা কাটাতে সরকারও যথেষ্ট তৎপর। এরই মধ্যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত সব কোম্পানির স্পন্সরকে ওই কোম্পানির ৩০ শতাংশ শেয়ার ধারণ করা এবং কোম্পানির পরিচালকদের ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

উপরিউক্ত এসব কার্যাবলি গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের শেয়ারবাজরে বর্তমানে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ অনিতা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার প্রতিষ্ঠান জনগণের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে। প্রয়োজনে ব্যবসায়ী, জনগণ এবং সরকারকে ঋণ দিতে পারে। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ঋণের লেনদেন হয় কেন? ১

খ. অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে অনিতা কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত? সেই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অনিতার প্রতিষ্ঠান যে বাজারে অন্তর্গত তার উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণের লেনদেন হয়।

খ অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অধিক মূলধন প্রয়োজন যা এখানে ভোক্তারা সহজেই পেতে পারে এবং এর স্থায়িত্বও অনেক বেশি। মূলধন বাজার নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ভারী শিল্প যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন করে থাকে এবং এই অর্থায়নের কার্যকারিতা ঋণগ্রহণকারী অনেকদিন ভোগ করতে পারে। তাই বলা যায়, অর্থায়নের জন্য তথা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থায়নের জন্য মূলধন বাজারই শ্রেয়।

গ আনিতার কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে, তাকেই বলে বাণিজ্যিক ব্যাংক। ঋণ প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থের আইনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শতাংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। নিজস্ব কিছু অর্থ থাকলেও এ ব্যাংকের তহবিলের সিংহভাগ অর্থ আমানতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে শুধু ব্যবসায়ী বা জনগণকে ঋণ দেয় তা নয় প্রয়োজনে সরকারকেও ঋণ দিয়ে থাকে।

ঘ আনিতার প্রতিষ্ঠানটি অর্থ বাজারের অন্তর্গত। অর্থ বাজারের উপাদানগুলো নিম্নরূপ।

১. অর্থ বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থ বাজারের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নেতৃত্ব দানের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই ওপর বর্তায়। এজন্য এ ব্যাংককে অর্থ বাজারের অভিভাবকও বলা হয়।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবার করে। এজন্য এ ব্যাংক হলো অর্থ বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ব্যাংক মূলত চাওয়া মাত্র ফেরতযোগ্য ঋণ লেনদেন করে এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বা পরে বিনিময় বিল ভাঙিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে অর্থ সরবরাহ করে।

৩. বর্তমানে কৃষি, শিল্প, সমবায় ইত্যাদি ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণও প্রদান করে। এজন্য এগুলো হলো অর্থ বাজারের উপাদান। এসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও স্বল্পমেয়াদি ঋণও প্রদান করে।

৪. গ্রাম্য মহাজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি প্রয়োজনে জনসাধারণকে ঋণ দেয়। সুতরাং, এরা অপ্রাতিষ্ঠানিক হলেও অর্থ বাজারের সদস্য।

৫. সরকার স্বল্পমেয়াদি ঋণ চাহিদা মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে ব্যক্তির মতো সরকারও জনসাধারণের কাছ থেকে তথা অর্থ বাজার থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। এজন্য সরকারও অর্থ বাজারে একজন সদস্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই আনিতার প্রতিষ্ঠানটি অর্থবাজারের অন্তর্গত বলা যায়।

অতএব বলা যায়, উপরের উপাদানসমূহের সমন্বয়ে আনিতার প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব জামাল হোসেন ও জনাব কামাল একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তারা তাদের শিল্প কারখানার মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। জনাব জামাল নিজেদের মধ্যে থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ না হওয়ায় জনাব কামাল বাহ্যিক কিছু উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালান। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সাধারণ শেয়ার কী? ১

খ. বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জামাল কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব কামালের প্রচেষ্টা কীভাবে সফল হাতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির লভ্যাংশ বা মূলধন প্রত্যাবর্তনে কোনো অগ্রাধিকার পায় না তাকে সাধারণ শেয়ার বলে।

খ বন্ডের ধারক একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে ফলে তার মুনাফা সুনিশ্চিত। তাই বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই।

https://teachingbd24.com

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বন্ডের ধারককে কোম্পানির লাভ অথবা লোকসান কোনোটির ভারই বহন করতে হয়না। এতে কোম্পানি যখন লাভবান হয় তখন বন্ডের মালিককে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হয়না। আবার, কোম্পানি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও বন্ডের মালিককে তার নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হয়। এতে বন্ডের মালিককে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়না। তাই বলা যায়, বন্ড বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ উদ্দীপকে জামাল অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের কথা বলেছেন।

কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট তহবিলের যে অংশ মালিক বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে সরবরাহ করা হয় তাকে অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস বলা হয়। এটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয়, যা ভবিষ্যতে কোনো দ্রব্য বা সম্পত্তি ক্রয় কিংবা উৎপাদনক্ষম ছোটখাটো কোনো কাজে অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে ব্যবহার করা হয়।

উদ্দীপকের জামাল প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধির জন্য নিজেদের মধ্য থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন যা অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে নিজস্ব সঞ্চয় অন্যতম। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় নিয়ে নিজস্ব সঞ্চয় গঠিত হয়। ব্যক্তি যা আয় করে তার সবটাই ব্যয় করে না, দুর্দিনের মোকাবিলা ও ভবিষ্যতে কিছু করার আশায় আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে। ব্যক্তির মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সঞ্চয় করে। একমালিকানা ও অংশীদারি কারবারে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার সবটাই মালিক ব্যয় করে না। তার কিছু অংশ সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে কারবার সম্প্রসারণ, কলকারখানায় ব্যববহৃত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের পরিবর্তন, গবেষণাকার্য পরিচালনা, নতুন উদ্ভাবিত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়লে উদ্দীপকের জামালের মতো মালিক বা মালিকরা এ সঞ্চয় ব্যবহার করে।

ঘ বিভিন্ন বাহ্যিক উৎস, যেমন- ঋণ সংগ্রহ, শেয়ার বাজার থেকে সংগৃহীত অর্থ ইত্যাদির সাহায্যে তহবিল গঠন করার মাধ্যমে উদ্দীপকের জনাব কামালের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল দিয়ে মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে যখন বাইরের কোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিল বা বহিঃস্থ তহবিল বলে।

উদ্দীপকের কামালের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সহপ্রতিষ্ঠাতা জামাল যখন অর্থায়নের নিজস্ব উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধন যোগানে ব্যর্থ হন তখন কামাল সাহেব বাহ্যিক কিছু উৎস থেকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চালান। সাধারণত মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ যখন পর্যাপ্ত হয় না তখন অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা মেটাতে উদ্যোক্তা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পাওনাদারদের কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করতে পারে। এ অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসমূহ হলো শেয়ারবাজার, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ, বিনিয়োগ ব্যাংকের ঋণ, বিমা কোম্পানি, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ উৎসসমূহ হলো বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন, মহাজন ও সুদের কারবারি ইত্যাদি। এছাড়াও বিদেশি ঋণ বা দান ইত্যাদি বহিঃস্থ উৎস হতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অর্থায়নের বিভিন্ন বাহ্যিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে কামাল সাহেব তার প্রতিষ্ঠানের মূলধন বাড়াতে পারেন। এ ছাড়াও পুঁজিবাজারে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার বিক্রির মাধ্যমেও তিনি তার প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মি. জয়নাল আবেদিন একজন প্রাক্তন ব্যাংক কর্মকর্তা। অবসরের পর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের নিবন্ধিত হাউজের মাধ্যমে তিনি কিছু প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। একমাস পর দুটি কোম্পানীর শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দুটি কোম্পানির ক্রয়কৃত শেয়ার তিনি বিক্রয় করে দেন এবং অন্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। এই প্রক্রিয়ায় বছর শেষে তিনি বেশ লাভবান হন। অন্যদিকে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানি আর্থিকভাবে লাভবান হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অর্থায়ন সংকট কী? ১

খ. বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেই কেন? ২

গ. জয়নাল সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ার কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিল্পপুঁজি গঠনে জয়নাল সাহেবের বিনিয়োগকৃত অর্থ কোন অবদান রাখছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করার সময় যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয় সেসব সমস্যাকেই একত্রে অর্থায়ন সংকট বলে।

খ বন্ডের ধারক একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে ফলে তার মুনাফা সুনিশ্চিত। তাই বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই।

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বন্ডের ধারককে কোম্পানির লাভ অথবা লোকসান কোনোটির ভারই বহন করতে হয়না। এতে কোম্পানি যখন লাভবান হয় তখন বন্ডের মালিককে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হয়না। আবার, কোম্পানি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও বন্ডের মালিককে তার নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হয়। এতে বন্ডের মালিককে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। তাই বলা যায়, বন্ড বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জয়নাল সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ারটি মাধ্যমিক শেয়ার।

প্রাথমিক শেয়ার ইস্যুর পর পরবর্তী পর্যায়ে যে শেয়ার কেনাবেচা হয় তখন তা মাধ্যমিক শেয়ার নামে পরিচিত। একজন বিনিয়োগকারী কখনোই শেয়ারবাজারে সরাসরি কেনাবেচা করতে পারে না। তাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্রোকারের মাধ্যমে শেয়ার কেনাবেচা করতে হয়। এই ব্রোকাররা শেয়ার ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারী এবং শেয়ার বিক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

মাধ্যমিক বাজার হলো শেয়ার বাজারের মূল প্রাণকেন্দ্র। এ বাজারে কোনো কোম্পানির শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করে। বাজার শেয়ারে দাম বাড়লে বিনিয়োগকারী লাভবান হয়, আবার বাজার শেয়ারের দাম কমলে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বাজার মূলত শিল্পের মূলধন গঠনে বিশেষ অবদান রাখে।

অতএব, জয়নাল সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ারটি মাধ্যমিক শেয়ার। যা শুধু তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়, বরং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অধিকতর কাম্য।

ঘ হ্যাঁ, শিল্পপুঁজি গঠনে জয়নাল সাহেবের বিনিয়োগকৃত অর্থ বিশেষ অবদান রাখছে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

প্রথমত, শেয়ারবাজারে বিশেষ করে সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার প্রতিনিয়ত বেচাকেনা হয়। এর ফলে পুঁজির গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত,দেশে অনেক উচ্চবিত্ত লোক আছে যারা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের সঞ্চয়কে কোনো উৎপাদনমুখী কজে ব্যবহার না করে অলসভাবে ফেলে রাখে। শেয়ারবাজার এসব সঞ্চয়কারীর অলস অর্থকে বিনিয়োগ করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, সমাজে এমন অনেক ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী আছে যারা তাদের সঞ্চয় বা আমানতকে বিনিয়োগের কাজে ঘটাতে চায়। কিন্তু বর্তমানে বৃহদায়তনে শিল্পের যুগে কোনো ক্ষুদ্র আমানতাকারীর পক্ষে এককভাবে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয় করে তারা যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভের মাধ্যমে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

চতুর্থত, শেয়ারবাজার জনগণকে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে। কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে। আবার, ইচ্ছা করলে প্রয়োজনের সময় এসব শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকা ফেরত পেতে পারে। এ কারণে জনগণ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। এর ফলে শেয়ারবাজারের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং পুজিবাজার শক্তিশালী হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ লুৎফর সাহেব জমি বিক্রি করে টাকা পেয়েছেন। তিনি কিছু টাকা ব্যাংকে রাখলেন এবং অবশিষ্ট টাকায় বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ও বন্ড ক্রয় করলেন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ার কিভাবে সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়? ২

গ. লুৎফর সাহেব কোন খাত থেকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত মুনাফা পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন বিনিয়োগ খাত থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত কিন্তু অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহের কাজকে বোঝায়।

খ প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট শেয়ার হস্তান্তরিত হলেই প্রাইমারি শেয়ার সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে প্রাইমারি শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার কোনো ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করে তখন তা সেকেন্ডারি শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

গ লুৎফর সাহেব বন্ড ও ব্যাংক খাত থেকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত মুনাফা পাবেন।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলো বন্ড। এতে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়কাল এবং আরও শর্তাবলি উল্লেখ থাকে। সুদের হারের ওপর বন্ডের মূল্য নির্ভর করে। বন্ড জামানতযুক্ত ও জামানতবিহীন হয়। বন্ডের ক্রেতা প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে সুদ এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আসল টাকা ফেরত পেয়ে থাকে। বন্ড অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে সুস্পষ্টভাবে ঋণকৃত অর্থের পরিমাণ, ঋণের নিশ্চয়তা ইত্যাদি থাকায় বর্তমান সময়ে বন্ড বহুল ব্যবহৃত এবং অর্থায়নের নির্ভরযোগ্য একটি উৎস হিসেবে কাজ করে। কেননা বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানির লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন বন্ডের মালিক নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে।

অন্যদিকে, ব্যাংক অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকেও জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সুদের হারের প্রেক্ষিতে তাদের অর্থ সঞ্চিত রাখে। এ খাত থেকেও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুনিশ্চিত মুনাফা পেয়ে থাকে।

উপরিউক্ত সুবিধাগুলো বিবেচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, লুৎফর সাহেব ব্যাংক ও বন্ড খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মুনাফা পাবেন।

ঘ উদ্দীপকে লুৎফর সাহেবের শেয়ার বিনিয়োগ খাতটি থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত।

যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রধান উৎস হলো শেয়ার। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। বিভাজিত এক একটি অংশকেই শেয়ার বলা হয়। যারা এ শেয়ার ক্রয় করে তারা হলেন শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিকানা লাভ করে থাকেন। তারা কোম্পানির মালিক বিধায় কোম্পানির লাভ-লোকসান হলে তারা শেয়ারের অনুপাতে লাভের যেমন অংশ পায় তেমনি লোকসানের ভাগও বহন করতে হয়। এ কারণে শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বা দায় অনেকটাই সীমাবদ্ধ। শেয়ারবাজারে ব্যবসায়ীরা কম দামে শেয়ার ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন। তারা মূলত সেকেন্ডারি মার্কেটেই শেয়ার কেনা-বেচা করে থাকেন। এ বাজারে কোম্পানির শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করতে পারে। তাই বাজারে শেয়ারের দাম বাড়লে বিনিয়োগকারীরা অধিক লাভবান হয়। আবার শেয়ারের দাম কমলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেয়ারের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলে শেয়ার বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় থাকে এবং শেয়ার বাজারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাই শেয়ার মূল্যের ওঠা-নামা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ বিনিয়োগকারী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

তাই বলা যায়, শেয়ারের দরপতনের কারণে বাজারে যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে তাতে এ খাত থেকে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত। তবে যখন শেয়ারের মূল্য অধিক বাড়ে তখন আবার এ থেকেই অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ অর্থনীতিতে অর্থকে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয়। শিক্ষক অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছক আঁকলেন এবং বললেন অর্থায়নের ক্ষেত্রে এসব উৎস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

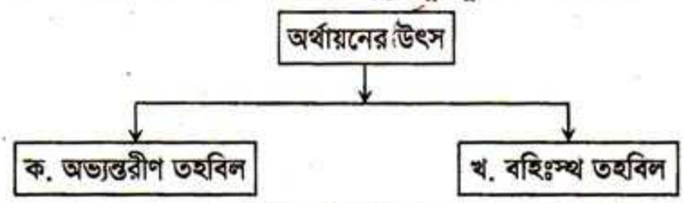

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশে মোট কয়টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে? ১

খ. বন্ডের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে 'ক' ও 'খ' তহবিলের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থায়নের ক্ষেত্রে অর্থের উৎস হিসেবে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট দুইটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

খ বন্ডের ধারক একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে ফলে তার মুনাফা সুনিশ্চিত। তাই বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই।

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বন্ডের ধারককে কোম্পানির লাভ অথবা লোকসান কোনোটির ভারই বহন করতে হয় না। এতে কোম্পানি যখন লাভবান হয় তখন বন্ডের মালিককে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফাও প্রদান করা হয় না। আবার কোম্পানি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও বন্ডের মালিককে তার নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হয়। এতে বন্ডের মালিককে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। তাই বলা যায়, বন্ড বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ অর্থায়নের উৎস হিসেবে 'ক' হচ্ছে অভ্যন্তরীণ তহবিল এবং 'খ' হচ্ছে বহিঃস্থ তহবিল।

কোনো প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে তাকে অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের উৎস বলা হয়। এটি অর্থায়নের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিন্তু ক্ষুদ্র উৎস। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয়, কোম্পানির অবণ্টিত মুনাফা, স্থায়ী সম্পদ বিক্রি, অবচয় তহবিল ইত্যাদি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ তহবিল।

অন্যদিকে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার না করে যখন বাইরের কোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে বহিঃস্থ তহবিল বলে। মালিকের বিভিন্ন সময় অর্থের প্রয়োজন হলে বিভিন্ন উৎস থেকে ধার বা ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। একে বাহ্যিক অর্থসংস্থান বলে। মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ যখন পর্যাপ্ত হয় না তখন অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা মেটাতে উদ্যোক্তা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পাওনাদারদের কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করতে পারে। এ অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ হলো শেয়ারবাজার, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ, বিনিয়োগ ব্যাংকের ঋণ, বিমা কোম্পানি, পুঁজিবাজার, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ হলো- বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন, মহাজন ও সুদের কারবারি ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিদেশি ঋণ বা দান ইত্যাদি বহিঃস্থ উৎস হতে পারে।

https://teachingbd24.com

ঘ অর্থায়নের ক্ষেত্রে অর্থের উৎস হিসেবে নিজস্ব অর্থায়ন বা অভ্যন্তরীণ তহবিলের গুরুত্ব অধিক। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থাসংস্থান করে তখন তা হয় নিজস্ব অর্থায়ন। নিজস্ব অর্থায়নের কতগুলো সুবিধা রয়েছে। যেমন-

অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা: ব্যক্তি বা কারবারের নিজস্ব সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ: নিজস্ব সঞ্চয় থেকে কত টাকা খাটানো যাবে সে সম্পর্কে তা জ্ঞাত থাকে।

তাৎক্ষণিক অর্থায়ন: অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা করা যায়।

কম ঝামেলা: নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থসংস্থানে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না বলে এ ধরনের অর্থায়নের ঝামেলা অনেক কম।

কম ব্যয়: সংগৃহীত তহবিলের বিপরীত কোনো সুদ প্রদান করতে হয় না। তাই তহবিলের সংগ্রহ ব্যয় নেই।

দায় মুক্ততা: নিজস্ব সঞ্চয়ের অর্থ বলে এখানে ঋণ পরিশোধের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

স্বার্থরক্ষা: কারবার যৌথ মূলধনী কাবার হলে শেয়ার হোল্ডারদে স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

মন্দার সময় সুবিধা: মন্দার সময় কম দামে কঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কেনা যায়।

উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ তহবিলকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রাকিব, রায়হান ও সাকিব তিন বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তারা নিজ উদ্যোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। দুই বছর পর তারা দেখতে পেল কোম্পানিতে আরও প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত মূলধন নেই। তারা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মূলধন গ্রহণ না করে পুঁজিবাজারকে অগ্রাধিকার দেয়।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. অর্থায়ন বলতে কী বোঝ? ১

খ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিওর গুরুত্ব আছে কি? ২

গ. রাকিব, রায়হান ও সাকিব মূলধন সংগ্রহে পুঁজিবাজারকে কেন অগ্রাধিকার দিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বাজার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন হলো একটি কার্য প্রক্রিয়া, যা অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সাথে জড়িত।

খ অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও (NGO)-এর গুরুত্ব আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য এনজিও (NGO) রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মরত এসব এনজিও বর্তমানে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা ছাড়াও গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সেবা খাতসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গ পুঁজিবাজার থেকে ঝুঁকিহীনভাবে অধিকমূলধন সংগ্রহ করা যায় বলে রাকিব, রায়হান ও সাকিব পুঁজিবাজারকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পুঁজিবাজার হলো এমন একটি বাজার যেখানে দীর্ঘমেয়াদি Securities এর লেনদেন হয়। শিল্প স্থাপনের পর ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে মুনাফা পাওয়ার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। কিন্তু কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে মূলধনের যোগান দিলে সাথে সাথে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। ব্যাংক থেকে ঋণের মাধ্যমে শিল্প পুঁজি যোগান দিতে হলে এর বিপরীত জমি কিংবা বাড়ি জামানত হিসেবে রাখতে হয়। দেশে অধিকাংশ উদ্যোক্তাগণের পক্ষে এ ধরনের জামানত প্রদান সম্ভব নয়। কিন্তু শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। আবার, শেয়ার মার্কেট থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে কোনো রকম আর্থিক বাধ্যবাধকতা থাকে না। তাই এতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারার ঝুঁকিও থাকে না। সে জন্য এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত নিরাপদ।

উপসংহারে বলা যায়, যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পস্থাপনে পুঁজিবাজার শ্রেষ্ঠ। তাই রাকিব, রায়হান ও সাকিব মূলধন সংগ্রহের জন্য পুঁজিবাজারকে প্রাধান্য দেয়।

ঘ যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন বাজারের ভূমিকা অপরিসীম

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের অর্থ মূলধন বাজারে প্রবাহিত হলে মূলধনের প্রবাহ বাড়বে। প্রাথমিক ঋণপত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঋণপ্রবাহের গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শিল্পোন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। মূলধন বাজার শুধু উন্নয়নশীল দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিলের কাম্য বণ্টনই নিশ্চিত করে না। এটি অর্থনীতিতে অতিরিক্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। কারণ তহবিলের প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি এরূপ বাজার সঞ্চয়ের প্রান্তিক উপযোগ বাড়াতে এবং অর্থ সংস্থানের প্রান্তিক ব্যয় কমাতে সহায়তা করতে পারে।

আবার, উন্নয়নশীল এদেশের উন্নয়ন অনেকাংশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ। বিনিয়োগ আসে সঞ্চয় থেকে। সঞ্চয় সংগ্রহ ও তার লেনদেন প্রক্রিয়ায় মূলধন বাজার সহায়তা করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রয়াসে মূলধন বাজার সহায়তা করে থাকে। এ ছাড়াও মূলধন বাজার যে পুঁজি লেনদেন করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তাতে সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে বেকারত্ব লাঘব হয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়ে। এতে জীবনযাত্রা মান উন্নত হতে পারে।

এভাবেই মূলধন বাজার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ করে চট্টগ্রাম এর উন্নয়নের জন্য লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত বিমান বন্দন পর্যন্ত ১৬.৫ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এলিভোটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের জন্য সম্প্রতি একনেক ৩২৫০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন দিয়েছে যা সম্পূর্ণ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয় হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহর ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে চীনের আর্থিক সহায়তায় ৮৪৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী ট্যানেলের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. পুঁজি বাজার বলতে কী বুঝ? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ার কীভাবে সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়? ২

গ. এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অর্থায়নের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কর্ণফুলী টানেলের অর্থায়নের যে উৎস তার বিশদ ব্যাখ্যা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুঁজিবাজার বলতে এমন কতগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত রূপকে বোঝায় যারা দীর্ঘমেয়াদি ঋণের কারবার করে।

খ প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট শেয়ার হস্তান্তরিত হলেই প্রাইমারি শেয়ার সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে প্রাইমারি শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার কোনো ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করে তখন তা সেকেন্ডারি শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

https://teachingbd24.com

গ চট্টগ্রামে খুব শিগগির শুরু হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ। যানজট আর জনদুর্ভোগ কমাতে তিনি ধাপে এই মেগা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত হবে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। এর দৈর্ঘ্য হবে ১৬.৫ কি.মি.। এটি নগরীর প্রধান সড়কে নির্মাণাধীন মুরাদপুর ফ্লাইওভারের সাথে যুক্ত হবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগরীর লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভিটেড এক্সপ্রেসওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের টাকায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে গত ২৭ জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'মুরাদপুর, ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে নির্মাণাধীন উড়াল সড়কে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারণ' বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক সভা হয়। এতে বন্দরের গত পাঁচ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়। বন্দরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত হয়। বন্দর থেকে নয়, প্রকল্পের ব্যয় সরকার বহন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উপলক্ষে সম্প্রতি একনেক ৩২৫০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন দিয়েছে, যা সম্পূর্ণ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয় হবে। প্রকল্পটির নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করবে সিডিএ। সরকার গৃহীত 'ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার' অর্থনৈতিক করিডোরের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

ঘ চট্টগ্রাম হলো বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং বৃহত্তম বাণিজ্যিক নগরী। কর্ণফুলী নদীর মুখে অবস্থিত চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমেই অধিকাংশ দেশের আমদানি ও রপ্তানি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রাম শহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। একভাগে রয়েছে নগর ও বন্দর এবং অপর ভাগে রয়েছে ভারী শিল্প এলাকা। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দিন দিন চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। কিন্তু বিনিয়োগ ধরে রাখার মতো জমি আর চট্টগ্রাম শহরে নেই। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলী নদীর ওপারকে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু করতে টানেলটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উদ্দীপকের কর্ণফুলী টানেলটি চট্টগ্রাম বন্দর নগরকে কর্ণফুলী নদীর অপর অংশের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করবে এবং পরোক্ষভাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের মাধ্যমে সারাদেশের সাথে যুক্ত করবে। বর্তমানে কর্ণফুলী নদীর ওপর তিনটি সেতু নির্মিত হয়েছে, যা বিরাজমান প্রচুর পরিমাণ যানবাহনের জন্য যথেষ্ট নয়। নদীর মরফলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্ণফুলী নদীর তলদেশে পলি জমা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কর্ণফুলী নদীর ওপর আর কোনো সেতু নির্মাণ না করে এর তলদেশে টানেল নির্মাণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। এজন্য সরকার চট্টগ্রাম জেলার দুই অংশকে সংযুক্ত করার জন্য কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। এর জন্য ব্যয় ধরা হয় ৮৪৪৬ কোটি টাকা। চীনের আর্থিক সহায়তায় এই টানেলটি নির্মাণ করা হবে। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরকালে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী চীনের এক্সিম ব্যাংক ২০ বছরমেয়াদি ৪ হাজার ৭৯৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার ঋণদিবে। আর বাকি টাকা সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করবে।

উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী কর্ণফুলী টানেলের নির্মাণ ব্যয় ৮৪৪৬ কোটি টাকা ধরা হলেও প্রকল্প শুরু করতে দেরি হওয়ায় এবং নির্মাণের মেয়াদকাল ২০২২ সাল নির্ধারণ হওয়ায় নির্মাণ ব্যয় প্রায় ১ হাজার ৯৪৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বেড়ে যাবে। যার পুরো অর্থায়ন সরকারকেই করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ আফনান ও মিনহাজসহ পাঁচ বন্ধু তাদের নিজস্ব মূলধন নিয়ে একটি কারবার আরম্ভ করলেন। কারবারটি সম্প্রসারণের জন্য তারা পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের চিন্তা করলেন। আফনান এমন একটি অনুমোদিত মূলধনের কথা চিন্তা করল যার দ্বারা কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে। অন্যদিকে মিনহাজ এমন একটি দলিল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যা দ্বারা নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পাবে কিন্তু কোম্পানির লভ্যাংশের অংশীদার হতে পারবে না।

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৯]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আফনান যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আফনান ও মিনহাজের অর্থ সংগ্রহের যে দুটি উৎসের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ-সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত চেকের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য ব্যাংক প্রদত্ত অর্থকে ব্যাংক ঋণ বলা হয়। আর, অর্থায়নের যতগুলো উৎস রয়েছে তার মধ্যে এই ব্যাংক ঋণ অন্যতম। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি এবং ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। তাই বলা যায়, অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আফনান শেয়ার এর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। নিচে শেয়ারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো।

সাধারণত শেয়ার বলতে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশকে বোঝায়। এই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যে কেউ উক্ত কোম্পানির আর্থিক মালিকানা লাভ করে। এজন্য শেয়ার মালিকগণকে কোম্পানির লাভ-ক্ষতি বহন করতে হয়। পুঁজি বাজারে বিভিন্ন ধরনের শেয়ার লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রাথমিক শেয়ার, মাধ্যমিক শেয়ার, সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার ইত্যাদি। বিভিন্ন শেয়ারে ঝুঁকির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে, মাধ্যমিক শেয়ারের মূল্য বেশি উঠা-নামা করে বলে এ ধরনের শেয়ারে অন্যান্য শেয়ারের চেয়ে ঝুঁকি বেশি থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আফনান মূলধন সংগ্রহের জন্য পুঁজিবাজার থেকে এমন একটি অনুমোদিত মূলধন ক্রয়ের কথা চিন্তা করল, যার দ্বারা সে কোম্পানির মালিকানা লাভ করতে পারবে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব লাভ করবে। তাই বলা যায়, আফনান যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল, তা হলো শেয়ার। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আফনান ও মিনহাজের অর্থ সংগ্রহের উৎস দুটি যথাক্রমে শেয়ার ও বন্ড। শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। আর বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি, যাতে ঋণগ্রহীতা সুদ ও আসলসহ একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে। সাধারণত শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে মুনাফা বা লাভ হলে শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হয়, আর লাভ না হলে তা দিতে হয় না। এজন্য এক্ষেত্রে শেয়ারের ঝুঁকি কম। কিন্তু, বন্ডের ক্ষেত্রে কোম্পানির লাভ বা ক্ষতি যাই হোক বন্ড হোল্ডারদেরকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ফেরত দিতে হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, আফনান ও মিনহাজ তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। যেখানে আফনান শেয়ার ক্রয় এবং মিনহাজ বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। এক্ষেত্রে আফনানের শেয়ার কোম্পানির মালিকানা

https://teachingbd24.com

নির্দেশ করে। কিন্তু মিনহাজের বন্ড দ্বারা কোম্পানির মালিকানা লাভ করা যায় না। শুধু নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়।
তাই শেয়ারহোল্ডারগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও বন্ডের ধারকদের এরূপ কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ▶ ৩১ আকলিমা বেগম একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। তিনি পেনশন পেয়ে ৫ লক্ষ টাকার পারিবারিক সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলেন এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে 'চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ' এ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলেন। */মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৬/*

ক. শেয়ার কী? ১
খ. বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই কেন? ২
গ. আকলিমা বেগমের কোন খাতে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু মুনাফা নিশ্চিত ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কোন বিনিয়োগের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকলেও অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ার হলো কোনো লিমিটেড কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ।

খ বন্ডের ধারক একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে ফলে তার মুনাফা সুনিশ্চিত। তাই বন্ড বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই।
বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। বন্ডের ধারককে কোম্পানির লাভ অথবা লোকসান কোনোটির ভারই বহন করতে হয় না। এতে কোম্পানি যখন লাভবান হয় তখন বন্ডের মালিককে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হয় না। আবার, কোম্পানি যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও বন্ডের মালিককে তার নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হয়। এতে বন্ডের মালিককে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। তাই বলা যায়, বন্ড বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ সৃজনশীল ১৮নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ শরীফ সাহেব একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত হাউজের মাধ্যমে তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন। অন্যদিকে, তার বন্ধু মামুন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লটারির মাধ্যমে একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে বেশ লাভবান হন। */ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৬/*

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১
খ. বন্ড কীভাবে শিল্পের পুঁজি গঠনে ভূমিকা রাখে? ২
গ. শরীফ সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ারগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর, শরীফ সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ারের চাইতে ঝুঁকিপূর্ণ মামুন সাহেবের শেয়ার? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ-সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ শিল্পের পুঁজি গঠনে বন্ড বা ঋণপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিল্পসমূহকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মূলধন বা পুঁজি। বন্ড বা ঋণপত্র এই শিল্প পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বন্ড হলো এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল, যা ইস্যুর মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কোম্পানি গঠনের পর শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের সংকুলান না হলে কোম্পানি ঋণপত্র বা বন্ড ইস্যু করে, সেই ইস্যুকৃত বন্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি গঠন করে। তাই বলা যায়, শিল্পের পুঁজি গঠনে বন্ড বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায়, বন্ড হলো কোম্পানির অর্থায়নের শেয়ার-পরবর্তী উৎস।

গ সৃজনশীল ২৬নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের শরীফ সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ার হলো সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক শেয়ার আর মামুন সাহেবের কৃয়কৃত শেয়ার হলো প্রাইমারি শেয়ার বা প্রাথমিক শেয়ার। শরীফ সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ার হতে মামুন সাহেবের শেয়ার, ঝুঁকিপূর্ণ তা আমি মনে করি না।
কোনো কোম্পানি যখন পুঁজি বাজারে নতুন শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ছাড়ে তখন তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলা হয়। অপরদিকে, প্রাথমিক শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট থেকে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তর হলে তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি শেয়ার। প্রাথমিক শেয়ারের চাইতে সেকেন্ডারি শেয়ারের বিনিয়োগ অধিক ঝুঁকি বহুল।
উদ্দীপকের শরীফ সাহেবের ক্রয়কৃত মাধ্যমিক শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বাজারের চাহিদা যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে এ ধরনের শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাজার চাহিদা সবসময় উঠা-নামা করে। ফলে এ ধরনের শেয়ারের দামও উঠা-নামা করে। বাজারে শেয়ারের দাম যখন হঠাৎ করেই দ্রুত বাড়তে থাকে তখন কিছু অনভিজ্ঞ ক্রেতা অতি মুনাফার লোভে বিরাট অঙ্কের শেয়ার ক্রয় করে। এরপর দ্রুত শেয়ারের দাম পড়ে গেলে এসব ক্রেতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কোম্পানির পিই রেশিও, ইপিএস, মুনাফা প্রভৃতি বিষয় শেয়ারের লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন এ ধরনের শেয়ারের ওপর দারুণভাবে প্রভাব থাকে। এসব কারণে মাধ্যমিক শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবসময়ই ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে, মামুন সাহেবের ক্রয়কৃত মোবাইল ফোন কোম্পানির শেয়ার তথা প্রাথমিক শেয়ার সার্টিফিকেট লটারীর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। কোম্পানির শেয়ারের টাকা জমা দেয়ার শেষ দিন থেকে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে কোম্পানি প্রাথমিক শেয়ার বণ্টনের কাজ শেষ করে। লটারির মাধ্যমে শেয়ার না পেলে বা কম শেয়ার পেলে বাকি টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগারীকে ফেরত দেয়া হয়। তাই প্রাথমিক শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থ হারানোর ঝুঁকি থাকে না। তাছাড়া এ ধরনের শেয়ার জালিয়াতির সম্ভাবনাও খুব কম থাকে।
তাই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মামুন সাহেবের নয়, বরং শরীফ সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ারই অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সুবিল মিয়া দীর্ঘদিন সৌদি আরবে কাজ করে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে। বর্তমানে সে তার গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সুবিল মিয়া তার সঞ্চিত টাকা এবং স্থানীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কিছু ঋণ নিয়ে একটি মৎস্য খামার গড়ে তোলে। */মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৭/*

ক. অর্থায়ন কী? ১
খ. শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ও জীবনযাত্রার মান উন্নতি করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুবিল মিয়ার মৎস্য খামারের অর্থায়নে উৎসসমূহ কী কী? ৩
ঘ. সুবিল মিয়া শেয়ার মার্কেট কিংবা বন্ড মার্কেট থেকে ঋণ নিতে পারত কী? বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ পুঁজি গঠনের মাধ্যমে শেয়ার বাজার কোনো দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
কোনো দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দ্রুত শিল্পোন্নয়ন। আর শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করে পুঁজি গঠনের ওপর। শেয়ার বাজার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে পুঁজি গঠনে সহয়তা করে। এর ফলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে। তাই বলা যায়, শেয়ার বাজার বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিল মিয়ার মৎস্য খামার গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে অর্থায়ন করা হয়।

যখন কোনো স্বীকৃত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন করা হয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে। আর যদি কোনো ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে অর্থায়ন করা হয়, তবে তাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুবিল মিয়া দীর্ঘদিন সৌদি আরবে কাজ করে কিছু টাকা সঞ্চয় করে। তার এই সঞ্চিত অর্থ মৎস্য খামার গড়ে তুলতে ব্যবহার করা হয়। তাই এটি অর্থায়নের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। আবার, সে অধিক মূলধনের জন্য স্থানীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও ঋণ গ্রহণ করে। যা অর্থনীতিতে অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে বিবেচিত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিল মিয়ার মৎস্য খামারটি যৌথ মূলধনী কারবার না হওয়ায় শেয়ার কিংবা বন্ড মার্কেট হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণত বহুসংখ্যক ব্যক্তি সরকারি অনুমোদন নিয়ে সম্মিলিতভাবে মূলধন সংগ্রহ করে যে কারবার পরিচালনা করে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান শেয়ার মার্কেট কিংবা বন্ড মার্কেট হতে অর্থ সংগ্রহ করে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু একমালিকানা কারবার এ ধরনের সুবিধা পায় না।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুবিল মিয়া তার মৎস্য খামারটির অর্থসংস্থান করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। তার এই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে পরিচালনা করেন। তাই বলা যায়, মৎস্য খামারটি একমালিকানা কারবারের প্রতিষ্ঠান। যার কারণে সুবিল মিয়া অর্থায়নের ক্ষেত্রে শেয়ার মার্কেট কিংবা বন্ড মার্কেটের সুবিধাসমূহ ভোগ করতে পারবেন না।

আবার, শেয়ার মার্কেটে কোনো কোম্পানিকে শেয়ার ছাড়তে হলে সরকারিভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। আর বন্ড মার্কেটে বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কোম্পানি বন্ড বিক্রি করতে পারে। তাই পরিশেষে বলা যায়, সুবিল মিয়া শেয়ার মার্কেট কিংবা বন্ড মার্কেট হতে ঋণ নিতে পারত না।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ সাফি ও মাফি দুই ভাই তাদের নিজস্ব মূলধন নিয়ে একটি কারবার আরম্ভ করলেন। সম্ভাবনাময় হওয়ায় কারবারটি সম্প্রসারণের জন্য তারা পুঁজি বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের চিন্তা করলেন। সাফি এমন একটি অনুমোদিত মূলধনের কথা চিন্তা করল যার দ্বারা কোম্পানির মালিকানা নিদেশ করে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে। অন্যদিকে মাফি এমন একটি দলিল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যা দ্বারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে কিন্তু কোম্পানির লভ্যাংশের অংশীদার হতে পারবে না। *[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকে সাফি যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাফি ও মাফির অর্থ সংগ্রহের যে দুটি উৎসের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলা হয়।

খ অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত চেকের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য ব্যাংক প্রদত্ত অর্থকে ব্যাংক ঋণ বলা হয়। আর, অর্থায়নের যতগুলো উৎস রয়েছে তার মধ্যে এই ব্যাংক ঋণ অন্যতম। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক—সাধারণত স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি এবং ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। তাই বলা যায়, অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাফি শেয়ার এর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। নিচে শেয়ারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো।

সাধারণত শেয়ার বলতে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশকে বোঝায়। এই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যে কেউ উক্ত কোম্পানির আর্থিক মালিকানা লাভ করে। এজন্য শেয়ার মালিকগণকে কোম্পানির লাভ-ক্ষতি বহন করতে হয়। পুঁজি বাজারে বিভিন্ন ধরনের শেয়ার লক্ষ করা যায়। যেমন- প্রাথমিক শেয়ার, মাধ্যমিক শেয়ার, সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার ইত্যাদি। বিভিন্ন শেয়ারে ঝুঁকির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে, মাধ্যমিক শেয়ারের মূল্য বেশি উঠা-নামা করে বলে এ ধরনের শেয়ারে অন্যান্য শেয়ারের চেয়ে ঝুঁকি বেশি থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাফি মূলধন সংগ্রহের জন্য পুঁজি বাজার থেকে এমন একটি অনুমোদিত মূলধন ক্রয়ের কথা চিন্তা করল, যার দ্বারা সে কোম্পানির মালিকানা লাভ করতে পারবে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব লাভ করবে। তাই বলা যায়, সাফি যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল, তা হলো শেয়ার। পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাফি ও মাফির অর্থ সংগ্রহের উৎস দুটি যথাক্রমে শেয়ার ও বন্ড। শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। আর বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি, যাতে ঋণগ্রহীতা সুদ ও আসলসহ একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে। সাধারণত শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে মুনাফা বা লাভ হলে শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হয়, আর লাভ না হলে তা দিতে হয় না। এজন্য এক্ষেত্রে শেয়ারের ঝুঁকি কম। কিন্তু, বন্ডের ক্ষেত্রে কোম্পানির লাভ বা ক্ষতি যাই হোক বন্ড হোল্ডারদেরকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ফেরত দিতে হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সাফি ও মাফি তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পুঁজিবাজার থেকে শেয়ার ক্রয় এবং বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছে। এক্ষেত্রে সাফির শেয়ার কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে। কিন্তু মাফির বন্ড দ্বারা কোম্পানির মালিকানা লাভ করা যায় না। শুধু নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়।

তাই শেয়ারহোল্ডারগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারলেও বন্ডের ধারকদের এরূপ কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ মি. আনিস একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি অবসর ভাতার কিছু ব্যাংকে জমা রাখেন এবং বাকিটা দিয়ে চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ থেকে শেয়ার ক্রয় করেন। অপর দিকে তার বন্ধু মি. জামাল অবসর ভাতা দিয়ে কিছু বন্ড এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে লটারির মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করে বেশ লাভবান হন। *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বন্ড কী? ১

খ. মূলধন বাজার অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দু ধরনের শেয়ারের মধ্যে তুলনা করো। ৩

ঘ. মি. জামাল লাভবান হওয়ার পিছনে যুক্তি তুলে ধরো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল যা বিক্রি করে কোম্পানি বা সরকার তহবিল সংগ্রহ করে।

খ বাজারে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির যোগান, সহজে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ, রাজস্ব বৃদ্ধি করে পুনঃপুনঃ ঋণ গ্রহণের দুশ্চিন্তা দূর করা যায় বলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থায়নের যে কয়টি উৎস রয়েছে তার মধ্যে মূলধন বাজার প্রধান। এটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, হিমাগার স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূলধন বাজার থেকে অর্থায়ন করা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের মি. আনিস সেকেন্ডারি শেয়ার এবং মি. জামাল প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করেছেন। নিচে উভয় শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলে—

কোম্পানি বা ইস্যু হাউস যে শেয়ার আইপিও (IPO)-এর মাধ্যমে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়ে এবং আবেদন দ্বারা সরাসরি কিংবা লটারির মাধ্যমে তা ক্রয় করা যায় সেটিই প্রাইমারি শেয়ার। অন্যদিকে, প্রাইমারি শেয়ার মালিকরা যখন তাদের শেয়ার ব্রোকার হাউসে বিক্রি করে তখন ওই বিক্রীত শেয়ার হয়ে যায় সেকেন্ডারি শেয়ার।

প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদলায় না, যে তা পায় সেই তার মালিক হয়। কিন্তু সেকেন্ডারি শেয়ারের মালিকানা শেয়ার বিক্রির সাথে সাথে বদলাতে থাকে। আবার প্রাইমারি শেয়ার ব্যাংক বা কোনো ইস্যু হাউসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সেকেন্ডারি শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ থেকেই ক্রয় করতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. জামাল প্রাইমারি শেয়ার ক্রয় করে লাভবান হয়েছেন। নিচে এর পেছনে যুক্তি তুলে ধরা হলো—

বাজারে প্রথমে যে শেয়ার ছাড়া হয় তাকে প্রাইমারি শেয়ার বলে। এ শেয়ার কোম্পানি নিজেই জনগণের মধ্যে বিক্রি করে। তাই এ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনো স্টক একচেঞ্জের প্রয়োজন হয় না। একজন বিনিয়োগকারী ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকার শেয়ারও আবেদন করতে পারে। শেয়ার আবেদন চাহিদার বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বণ্টন করা হয়। তাই এক্ষেত্রে কোনো প্রতারণার সুযোগ নেই। এ শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগকারী তাৎক্ষণিক মূলধন লাভ করতে পারেন।

প্রাইমারি শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানি পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও কোম্পানির মালিকানা ও ভোটাধিকার লাভ করেন। প্রাইমারি শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারগণের ঝুঁকি কম ও দায় সীমাবদ্ধ। এখানে যে শেয়ারহোল্ডার যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে সে কেবল তার জন্যই দায়বদ্ধ থাকবে। আবার কোম্পানি কখনো বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা বিক্রি করে দেওয়া হতে পারে। এ অবস্থায় তার যে মূল্য দাঁড়ায় তা থেকে কোম্পানির বিভিন্ন দায়-দেনা পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার সবটাই শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য।

মি. জামাল প্রাইমারি শেয়ার ক্রয় করার উপরিউক্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করবেন। তাই বলা যায়, মি. জামাল উক্ত শেয়ার ক্রয় করে লাভবান হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ দুই বন্ধু জাফর ও মোস্তাফা ফারুকী। দুজনই শেয়ার ব্যবসার সাথে জড়িত। কোনো কোম্পানি বাজারে প্রথম যে শেয়ার ছাড়ে তার ব্যবসা করে জাফর। আর মোস্তাফা ফারুকী ব্যবসা করে প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা যখন তাদের শেয়ার বিক্রয় করে তখন ঐ শেয়ার ক্রয় করে এবং পরবর্তীতে বেশি দামে বিক্রি চেষ্টা করে। তবে দুজনই শেয়ার ব্যবসা বুঝে এবং এই ব্যবসা থেকে নিজেরা অর্থ উপার্জন করে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে কত সালে এসইসি গঠিত হয়? ১

খ. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে অর্থায়ন কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জাফর ও মোস্তাফা ফারুকীর শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যায়ন কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে এসইসি বা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করা হয়।

খ কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের সবটাই ব্যয় না করে কিছু অংশ সঞ্চয় করা হয়। একেই বলা হয় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়।

ভবিষ্যতে কারবার সম্প্রসারণ, কলকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, গবেষণা কার্য পরিচালনা, নতুন উদ্ভাবিত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে মালিকরা এ সঞ্চয় ব্যবহার করে। সাধারণত অবণ্টিত মুনাফা, কারবারের জন্য অবচয়-সঞ্চিতি, শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হিসেবে পরিচিত।

গ জাফর ও মোস্তফা ফারুকীর ক্রীত শেয়ারটি হলো যথাক্রমে প্রাথমিক শেয়ার এবং মাধ্যমিক শেয়ার। নিচে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো—

প্রথমত, বাজারে প্রথম যে শেয়ার ছাড়া হয় তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে। অন্যদিকে, প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হলে তাকে মাধ্যমিক শেয়ার বলে।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানি নিজেই জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শেয়ার বিক্রি করে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক শেয়ার 'শেয়ারবাজারের' মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

তৃতীয়ত, ফেস ভেল্যুর (Face Value) ভিত্তিতে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। অন্যদিকে, শেয়ার বাজারের প্রতিদিন শেয়ারের দাম ওঠা নামা করে যার ফলে বাজার দামে মাধ্যমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়।

চতুর্থত, স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার হাউসে বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব খোলার মাধ্যমে একজন নাগরিক প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করতে আবেদন করতে পারেন। অন্যদিকে, বিও হিসাবধারী যে কেউ মাধ্যমিক শেয়ার ক্রয় করতে পারেন।

পঞ্চমত, প্রাথমিক শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার লটের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি হয়। অন্যদিকে, মাধ্যমিক শেয়ার লটারির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় না।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজারটি হলো শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ। নিচে শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যায়ন করা হলো—

ব্যবসায় পুঁজি যোগানের মাধ্যম বা উপায় হলো শেয়ার বা ঋণপত্র। মূলধন বাজারের যে অংশে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার বা ইকুইটি কেনা-বেচা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলা হয়।

উদ্দীপকের দুই বন্ধু জাফর ও মোস্তাফা ফারুকী শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। মূলত মূলধন বাজারের একটি অংশ হলো শেয়ার বাজার। এ বাজারে যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশে শেয়ার বিক্রি করে। বিনিয়োগকারীরা শেয়ার থেকে লভ্যাংশ পাওয়া বা কেনা-বেচার মাধ্যমে লাভ করার উদ্দেশে সেসব শেয়ার ক্রয় করে। প্রতিটি শেয়ার একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের হয়; তবে যেকোনো দ্রব্যের মতো শেয়ারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে তার বাজার দাম নির্ধারিত হয়। যেসব কোম্পানির সুনাম আছে এবং যেগুলো বছর শেষে অধিক স্টক ডিভিডেন্ড বা ক্যাশ ডিভিডেন্ড বা উভয়ই বেশি পরিমাণে প্রদান করে সেগুলোর চাহিদা বেশি হওয়ায় তার বাজার দামও বেশি হয়। প্রত্যেক দেশে একাধিক শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ থাকতে পারে। শেয়ার বাজার একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে কাজ করে এবং পৃথক সত্তার অধিকারী হয়। এ বাজারের নিজস্ব কোনো শেয়ার থাকে না, এটি কেবল তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ারের বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কোম্পানিসমূহ সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে। প্রতিটি শেয়ার বাজারের দুটি অংশ থাকে; যথা— প্রাইমারি শেয়ার বাজার ও সেকেন্ডারি শেয়ার বাজার। তবে শেয়ার বাজারের কার্যক্রম মূলত সেকেন্ডারি শেয়ারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সেকেন্ডারি বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজার কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান দালাল (Broker) হিসেবে কাজ করে। এরা নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে তাদের মক্কেলদের পক্ষে শেয়ার কেনা-বেচা করে।

কোনো দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, শিল্পজ কাঁচামাল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপনের জন্য শিল্প পুঁজি গঠন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের শেয়ার বাজার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেশের শিল্পোন্নয়নে অর্থায়নের সর্বোৎকৃষ্ট উৎসই হলো শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৬: অর্থায়ন

১৯২. ডা. পাল গান্ধি জি আশ্রম নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন যেখানে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা দেওয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের অর্থায়ন হয়ে থাকে? (প্রয়োগ)
ক ব্যবসায় অর্থায়ন খ বেসরকারি অর্থায়ন
গ ব্যক্তিগত অর্থায়ন ঘ অব্যবসায় অর্থায়ন **ঘ**

১৯৩. অর্থসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ কৃষি ব্যাংক
গ এনজিও ঘ আত্মীয়-স্বজন **ক**

১৯৪. ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানি কী ধরনের অর্থায়নের প্রতিষ্ঠান? (অনুধাবন)
ক বিনিয়োগ ব্যাংক প্রতিষ্ঠান
খ ইজারা প্রতিষ্ঠান
গ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান
ঘ বিমা প্রতিষ্ঠান **খ**

১৯৫. সিকিউরিটি প্রধানত কত প্রকার? (জ্ঞান)
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার **ক**

১৯৬. মধ্যমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস কোনটি?
ক ক্ষুদ্র ঋণ
খ বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান
গ ক্রেতা হতে অগ্রিম গ্রহণ
ঘ প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ **খ**

১৯৭. মি. হাসান নতুন ব্যবসায় স্থাপন করেছেন। তিনি দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন? (প্রয়োগ)
ক স্বল্পমেয়াদি খ মধ্যমমেয়াদি
গ লিজিং ঘ নিজস্ব তহবিল **ক**

১৯৮. বাংলাদেশে অর্থায়নের উৎস হিসেবে কোন সালে বিনিয়োগ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৪ সালে
গ ১৯৭৬ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে **গ**

১৯৯. শেয়ার বাজার শব্দটি কোন দেশের অর্থনীতির প্রচলিত ধারণা? (জ্ঞান)
ক ব্রিটিশ অর্থনীতি
খ আমেরিকান অর্থনীতি
গ রাশিয়ান অর্থনীতি
ঘ ইতালির অর্থনীতি **ক**

২০০. কোম্পানির আইন অনুসারে কারা কোম্পানির প্রকৃত মালিক? (জ্ঞান)
ক পরিচালকগণ খ শেয়ার হোল্ডারগণ
গ বন্ডের মালিকগণ ঘ উদ্যোক্তাগণ **খ**

২০১. শেয়ারকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ৪ ভাগে ঘ ৫ ভাগে **ক**

২০২. IPO কী? (জ্ঞান)
ক Initial Potential Offering
খ Initial Public Offering
গ Internal Public Offering
ঘ Initial Public Owners **খ**

২০৩. ফেস ভেল্যুর ভিত্তিতে কোন শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়? (জ্ঞান)
ক প্রেফারেন্স শেয়ার খ বোনাস শেয়ার
গ প্রাইমারি শেয়ার ঘ সেকেন্ডারি শেয়ার **গ**

২০৪. কোন শেয়ারের ঝুঁকি অনেক কম থাকে? (জ্ঞান)
ক প্রেফারেন্স শেয়ারে খ সাধারণ শেয়ারে
গ সেকেন্ডারি শেয়ারে ঘ বোনাস শেয়ারে **ক**

২০৫. কোন শেয়ারের মালিকরা রাইট শেয়ার ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে? (জ্ঞান)
ক প্রাইমারি শেয়ার খ সেকেন্ডারি শেয়ার
গ বোনাস শেয়ার ঘ অগ্রাধিকার শেয়ার **খ**

২০৬. শেয়ার কী ধরনের পণ্য? (জ্ঞান)
ক শিল্প পণ্য খ আর্থিক পণ্য
গ বিক্রীত পণ্য ঘ IPO পণ্য **খ**

২০৭. কোনটিকে প্রাথমিক গণ প্রস্তাব বলা হয়? (জ্ঞান)
ক BOকে খ শেয়ারকে
গ IPOকে ঘ প্রসপেক্টাসকে **গ**

২০৮. স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত সদস্যবৃন্দ যারা এ বাজারে কেনাবেচা করে তাদেরকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক শেয়ার হোল্ডার খ বিনিয়োগকারী
গ ইস্যুকারী ঘ ব্রোকার **ঘ**

২০৯. কোম্পানির ভোটাধিকার পায় কে? (জ্ঞান)
ক বন্ডের মালিক
খ অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিক
গ প্রাইমারি শেয়ারের মালিক
ঘ ডিবেঞ্চারের মালিক **গ**

২১০. লাভজনক কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা কী পেয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক সুদ খ মুনাফা
গ লভ্যাংশ ঘ ক্ষতির অংশ **গ**

২১১. 'স্টক ডিভিডেন্ট' এর অপর নাম কী? (জ্ঞান)
ক নগদ লভ্যাংশ খ বোনাস লভ্যাংশ
গ বোনাস শেয়ার ঘ রাইট শেয়ার **গ**

২১২. কোম্পানি তার গৃহীত ঋণের কথা স্বীকার করে ঋণদাতাকে যে দলিল প্রদান করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক শেয়ার খ বন্ড
গ জামানত ঘ বন্ধক **খ**

২১৩. কোনটি জামানতযুক্ত বন্ড? (জ্ঞান)
ক আয় বন্ড খ মর্টগেজ বন্ড
গ কর্পোরেট বন্ড ঘ ট্রেজারি বন্ড **খ**

২১৪. কোন বন্ডের গায়ে নির্দিষ্ট সুদের হার, পরিপক্ব সময়, বাহ্যিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকে? (জ্ঞান)
ক আয় বন্ড খ জাঙ্ক বন্ড
গ কুপন বন্ড ঘ জিরো কুপন বন্ড **গ**

২১৫. কোন বন্ডে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি? (জ্ঞান)
ক জাঙ্ক বন্ড খ কুপন বন্ড
গ জিরো কুপন বন্ড ঘ আয় বন্ড **ক**

Teachingbd.com

২১৬. মি. রনি 'সানমুন লি.'-এর নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ডের মালিক। কোম্পানিটি অবসানের সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে মি. রনি কোম্পানি থেকে কী দাবি করবেন? (প্রয়োগ)
ক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুদ
খ প্রথম দাবিদার হিসেবে সম্পত্তি
গ প্রথম দাবিদার হিসেবে মূলধন
ঘ কোম্পানির পরিচালনা — খ

২১৭. যারা বন্ড বাজারে ছাড়ে তাদেরকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ঋণদাতা খ ঋণগ্রহীতা
গ ঋণমালিক ঘ বন্ড মালিক — খ

২১৮. ১৯৫৪ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ঢাকায় খ নারায়ণগঞ্জে
গ চট্টগ্রামে ঘ সাভারে — খ

২১৯. অর্থায়নের উপাদানগুলো হলো—
i. আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
ii. মুনাফা বণ্টন iii. অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২২০. দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস ব্যবহার করা হয় —— (অনুধাবন)
i. ভূমি ক্রয়ে
ii. দালান-কোঠা ক্রয়ে
iii. যন্ত্রপাতি ক্রয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২২১. অর্থায়নের সিকিউরিটিসমূহ হলো —— (অনুধাবন)
i. বন্ড
ii. প্রাইজবন্ড
iii. শেয়ার সার্টিফিকেট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২২২. পুঁজিবাজার গঠিত হয় —— (অনুধাবন)
i. বিমা কোম্পানিকে নিয়ে
ii. ইস্যু হাউজকে নিয়ে
iii. স্টক এক্সচেঞ্জকে নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২২৩. শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ
ii. প্রতিটির জন্য সুদ দিতে হয়
iii. হস্তান্তরযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

২২৪. প্রাইমারি শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো —— (অনুধাবন)
i. এর মালিকরা ভোটদানের অধিকার রাখে
ii. কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে
iii. সীমাবদ্ধ দায় থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২২৫. বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ হলো—— (অনুধাবন)
i. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ
ii. সিলেট স্টক এক্সচেঞ্জ
iii. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

২২৬. শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার বাজার ভূমিকা পালন করে —— (অনুধাবন)
i. সঞ্চয় বৃদ্ধিতে
ii. বিদেশি পুঁজির বিকল্প তহবিল সৃষ্টিতে
iii. পর্যাপ্ত পুঁজির যোগানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৭ ও ২২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দি বার্ড কোম্পানি লি. বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য যৌথ মূলধনি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তারা শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহ করে। প্রতিবছর মুনাফার একটি অংশ কেটে রেখে ব্যবসায়ে পুনঃবিনিয়োগ করে। এতে কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি আরও মজবুত হয়।

২২৭. দি বার্ড কোম্পানি লি. মুনাফার যে অংশ কেটে রেখে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে তাকে কী বলে? (প্রয়োগ)
ক সাধারণ সঞ্চিতি খ মূলধন সঞ্চিতি
গ অবণ্টিত মুনাফা ঘ কুঋণ সঞ্চিতি — গ

২২৮. দি বার্ড কোম্পানি লি. উক্ত আর্থিক পণ্যাদি বিক্রি করে তহবিল সংগ্রহ করে —— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য
ii. স্বল্পমেয়াদে ব্যবহারের জন্য
iii. স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৯ ও ২৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব রাফি একজন শেয়ার ব্যবসায়ী। সেকেন্ডারি মার্কেটে তিনি শেয়ার কেনা-বেচা করেন। সাম্প্রতিককালে শেয়ার বাজারে অব্যাহত দরপতনের কারণে তিনি বিকল্প হিসেবে প্রতিটির মূল্য একই হয়ে থাকে এমন একটি মার্কেটের পণ্য ক্রয় করেন।

২২৯. জনাব রাফি কোন মার্কেটের পণ্য ক্রয় করেন? (প্রয়োগ)
ক ডিবেঞ্চার মার্কেট খ বন্ড মার্কেট
গ মূলধন মার্কেট ঘ শেয়ার মার্কেট — ঘ

২৩০. জনাব রাফি যে কারণে উক্ত মার্কেটের পণ্য ক্রয় করেন—— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়
ii. হস্তান্তরযোগ্য
iii. অবসায়নের সময় দাবি করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, iiও iii — ঘ

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৭: মুদ্রাস্ফীতি

প্রশ্ন ▶১ ইদানীং বাজারে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে নানা ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই যা নেতিবাচক। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আর্থিক ও রাজস্ব নীতিসহ বিভিন্ন ধরনের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে। *[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৮; অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মজুতদার ও চোরাচালান ক্ষতিকর কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অর্থনীতির যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের কোনো একক পদ্ধতি যথেষ্ট কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য ন্যূনতম সুদের হারই হলো ব্যাংক হার।

খ একটি গতিশীল অর্থনীতির জন্য মজুতদার ও চোরাচালান ক্ষতিকর। কারণ—

মজুতদার একটি দেশের উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ অংশ যোগান না দিয়ে জমিয়ে বা মজুত করে রাখে। এতে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় যা সাধারণ জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, চোরাচালানের ফলে দেশ থেকে মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়ে যায়। অথচ এই মূল্যবান সম্পদ বৈধভাবে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা যেত।

গ উদ্দীপকে অর্থনীতির যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলো মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং দামস্তর বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ আগে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারত বর্তমানে তা পারে না। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে তাদের জীবননির্বাহ করা কষ্টকর হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষ সবসময়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মানুষের কার্যকর চাহিদা কমে যাওয়ায় বিনিয়োগও বাড়তে পারে না। উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতির ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রকৃত আয়ও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সম্প্রতি দেশটির বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত বাড়ছে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। যার ফলে অর্থনীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি তথা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মূলত তিনটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে। যথা— আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এগুলোর মধ্যে কোনো একক পদ্ধতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কি না তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রার প্রচলন হ্রাস, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। এভাবে আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতির অধীনে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সরকারি ব্যয় হ্রাস, কর হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ, সরকারি ঋণ গ্রহণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি।

আবার, আর্থিক ও রাজস্ব নীতি ছাড়াও আরও কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো হলো— উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি বৃদ্ধি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও খোলা বাজারে বিক্রয়, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। তবে এই সকল নীতিগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির ওপর।

উপরের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো একক পদ্ধতি কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও তা যথেষ্ট নয়। তাই আর্থিক, রাজস্ব ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিত্রয়ের মধ্যে সমন্বয় দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶২ করিম সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। ২০১৫ সালে সরকার বেতন প্রায় দ্বিগুণ করায় তিনি খুব খুশি। বাজারে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে উৎপাদন শ্রমিকগণ আন্দোলন করে তাদের মজুরি বাড়িয়ে নেন। বাজারে চাহিদা বেশি থাকায় কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। ফলে করিম সাহেবের মন খারাপ হয়ে যায়। অন্যদিকে, সরকার পণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ, উৎপাদকদের ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। এখন করিম সাহেবের মতো লোকেরা ও বিক্রেতাগণ সবাই বিদ্যমান অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বাজারে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে উদ্দীপকের গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট শৌখিন এবং আমোদপ্রিয়। তাই এখানে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন— বিয়ে, জন্মদিন, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি করে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সরকার অনেক সময় অনুৎপাদনশীল খাত অর্থাৎ পার্ক, স্টেডিয়াম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে না ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো—

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি: সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেমন— অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়, উদার ঋণ নীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি। উদ্দীপকে যোগান স্থির থেকে চাহিদা বেশি থাকায় কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায় ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

https://teachingbd24.com

ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি: ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেমন: অসন্তোষের ফলে হরতাল, ধর্মঘটের কারণে উৎপাদন হ্রাস, বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি, সরকারের পরোক্ষ কর বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি, বাজারে একচেটিয়া মালিকানার প্রভাব সক্রিয় থাকলে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। উদ্দীপকে শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে মজুরি বেড়ে যায় এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়। ফলে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

ঘ উদ্দীপকে সরকার বাজারে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে পণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ, উৎপাদকের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্য খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছে যা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। নিচে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হলো—

পণ্যদ্রব্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে সরকার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, ঘাটতি ব্যয় কমানো, দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, কঠিন আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, অপ্রয়োজনীয় বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে সম্পদ অধিক উৎপাদনশীল বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তরের দ্বারা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা হ্রাস করা যায়।

২. সরকার আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. সরকার ফটকা বাজার ও ফটকা কারবারিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস করতে পারে। এছাড়া মজুতদারি ও চোরাকারবারি রোধ করতে পারলেও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

৪. ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক কিস্তির সংখ্যা কম, কিস্তির সংখ্যা বেশি নির্ধারণ করতে বলবে। এর ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

৫. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে রাজধানী ও বন্দরের মধ্যে শক্তিশালী পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হবে না, দামস্তর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

উদ্দীপকে সরকার তার গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও উপরিউল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে পণ্যদ্রব্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩ মিসেস অ্যাঞ্জিলিনা 'A' দেশের নাগরিক। তার LED TV এবং এয়ার কন্ডিশনার (AC) প্রয়োজন। বাজারে গিয়ে দেখেন, LED TV সেটের দাম ২০১৫ সালে ছিল ১০৫০ ডলার, যা ২০১৬ সালে দাঁড়ায় ১২০০ ডলারে এবং AC এর দাম একই সময়ে ১১০০ ডলার থেকে ১২৫০ ডলার হয়। তিনি আরও দেখেন, বাজারে অন্যান্য পণ্যের দামও ক্রমাগত বেড়ে চলছে। অ্যাঞ্জিলিনার দেশের নিম্ন আয়ের লোকজন, শ্রমিক শ্রেণি ও সরকার এ বিষয়ে উৎকণ্ঠায় আছে। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়'।— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার দামসূচক ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলো দ্রব্যের গড় দামের সাথে অপর একটি সময়ে ওই দ্রব্যগুলোর গড় দামের তুলনায় শতকরা পরিবর্তনের হার প্রকাশ করাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো—

ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) বলে। মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয়ের জন্য নিচে উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে একটি সূচি তৈরি করা হলো—

সময়	২০১৫		২০১৬	p_0q_0	p_nq_0
দ্রব্য	দাম (p_0)	পরিমাণ (q_0)	দাম (p_n)		
LEDTV	১০৫০	১	১২০০	১০৫০	১২০০
AC	১১০০	১	১২৫০	১১০০	১২৫০
				Σp_0q_0 = ২১৫০	Σp_nq_0 = ২৪৫০

ল্যাসপিয়ার্সের সূত্রানুসারে,

$$CPI(P_0P_n) = \frac{\Sigma p_nq_0}{\Sigma p_0q_0} \times ১০০ = \frac{২৪৫০}{২১৫০} \times ১০০ = ১১৩.৯৫$$

সুতরাং, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার (১১৩.৯৫ − ১০০) = ১৩.৯৫%।

অর্থাৎ, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় ১৩.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অ্যাঞ্জিলিনার দেশে নিম্ন আয়ের মানুষ, শ্রমিক শ্রেণি ও সরকারের ওপর মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নিচে এসব শ্রেণির ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো—

নিম্ন আয়ের লোকজনের ওপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিম্ন আয়ের লোকেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দাম বৃদ্ধির ফলে তারা একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান আরও নিম্ন হয়ে যায়।

শ্রমিক শ্রেণির ওপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক শ্রেণির মজুরি আনুপাতিক হারে বাড়ে না। তাই মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকারের ওপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধির দরুন রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির সময় জনজীবনে অসন্তোষের কারণে দেশে সুশাসন ব্যাহত হয়।

উপর্যুক্ত কারণে অ্যাঞ্জিলিনার দেশে নিম্ন আয়ের লোকজন, শ্রমিক শ্রেণি ও সরকার উৎকণ্ঠায় আছে।

প্রশ্ন ▶৪ 'X' দেশে ১৯৯৮ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১১৫ এবং ১৯৯৯ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৫০ হয়। দেশটির সরকার এ সমস্যা মোকাবিলায় অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীর জন্য সুফল বয়ে আনে।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'X' দেশে ১৯৯৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল? ৩

ঘ. 'X' দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্নতার কারণে উৎপাদনের ওপর এর প্রভাব বিভিন্ন হয়। মুদ্রাস্ফীতি স্বল্প মাত্রার হলে তা উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনীতিতে দামস্তর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় লাভের আশায় উৎপাদন বাড়ায়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। তাই বলা যায়, 'মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীর জন্য সুফল বয়ে আনে।'

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপক অনুযায়ী, 'X' দেশে ১৯৯৮ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১১৫ এবং ১৯৯৯ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৫০ হয়। এ অবস্থায় ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হলো—

ভোক্তার দামসূচক (CPI) $= \frac{\sum P_n Q_n}{\sum P_o Q_o} \times ১০০$

এখানে, P_n = চলতি বছরের মূল্য,
Q_n = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
P_o = ভিত্তি বছরের মূল্য,
Q_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
$\sum$ = সমষ্টি।

সুতরাং, ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) $= \frac{১৫০}{১১৫} \times ১০০ = ১৩০.৪৩$

সাধারণত ভিত্তি বছরের মূল্য ১০০ ধরা হয়, উপরের তথ্য অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (১৩০.৪৩ − ১০০)= ৩০.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ 'X' দেশে ১৯৯৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩০.৪৩%।

ঘ 'X' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চর্তুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি।

অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। কেননা 'X' দেশের সরকারকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়াতে হয়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ব্যাংক হার বৃদ্ধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি: দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি না করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই 'X' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন কর আরোপ ও বিদ্যমান করগুলোর হার বৃদ্ধি করে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমাতে পারে। তখন সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দামস্তর কমবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম উপায় হলো কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সব খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদন বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে এবং তা দ্রব্য ও সেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করবে। কলাকৌশলের উন্নয়ন, অধিক প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদের বরাদ্দকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

সুতরাং, 'X' দেশের সরকার কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপরিউক্ত ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির ওপর।

প্রশ্ন ▶৫

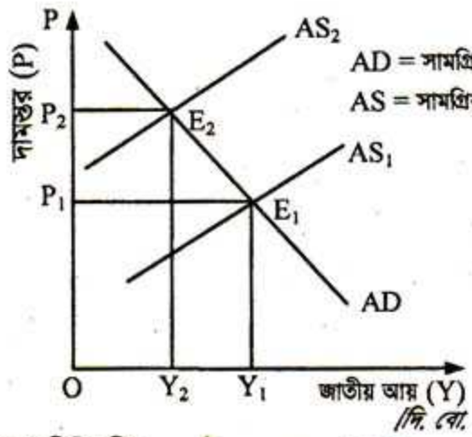

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. 'অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়।

খ অতিরিক্ত সংসারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। দেশে বিভিন্ন অনুন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রায়ই তার আয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করে ফেলে। এ অত্যধিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে স্বল্প সময়েই সরকারকে অতিরিক্ত নোট ছাপাতে হয় কিংবা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ চিত্রে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

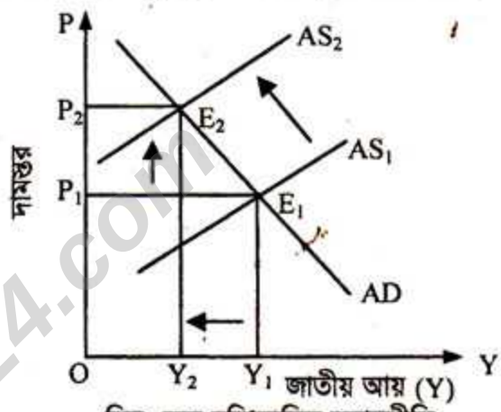

চিত্র: ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

চিত্রে, ভূমি (OY) অক্ষে জাতীয় আয় ও লম্ব (OP) অক্ষে দামস্তর নির্দেশ করা হয়েছে। উপকরণের দামবৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদির কারণে সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরের মাধ্যমে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। চিত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তথা E_1 বিন্দুতে AD = AS_1 হওয়ায় Y_1 আয়স্তরে P_1 দাম নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক যোগান হ্রাসের ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 থেকে AS_2 হওয়ায় E_1E_2 পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান হ্রাস পায়। ফলে P_1 থেকে P_2-তে দাম বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক যোগান হ্রাসের কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে একে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে AD রেখা ডানদিকে উপরে স্থানান্তরিত হবে।

অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা (AD) বৃদ্ধির কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। সাধারণত ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে।

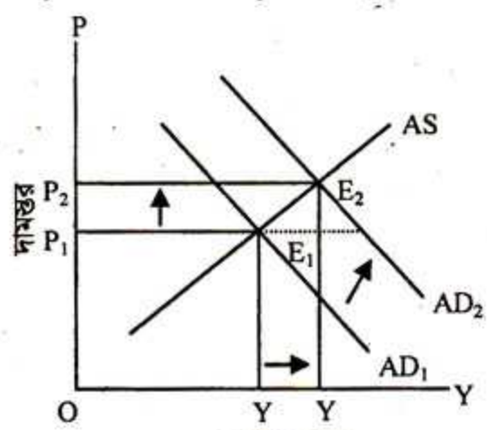

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

Teachingbd24.com

চিত্রে, ভূমি (OY) অক্ষে জাতীয় আয় ও লম্ব (OP) অক্ষে দামস্তর নির্দেশ করা হয়েছে। E_1 বিন্দুতে $AD_1 = AS$ এর মাধ্যমে প্রাথমিক ভারসাম্য অর্জিত হয়। ফলে P_1 দামস্তরে Y_1 জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে AD_1 থেকে AD_2 হয় ফলে E_1E_2 পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। $AD_2 = AS$ হওয়ায় E_2 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির আয় Y_1 থেকে Y_2 হয় এবং দামস্তর P_1 থেকে P_2 বৃদ্ধি পায়। এভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের কারণে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ভাতা বাবদ সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে জিনিসপত্রের দাম ও জীবনযাত্রার ব্যয়ভার। ফলশ্রুতিতে ভূমিহীন কৃষক, বেকার, গরিব জনসাধারণ ও সীমিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি অর্থনীতির কোন বিষয়কে নির্দেশ করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কীরূপ হবে— আলোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূচক সংখ্যা হলো একটি সংখ্যাবাচক গড় পদ্ধতি, যা অর্থের মূল্য পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

খ অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে যায়। এটি বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, বাজারে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে একই পণ্য পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণে বাড়লে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার তুলনায় দামস্তর বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। এভাবে বাজারে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি অর্থনীতির চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য (AD) রেখা ডান দিকে স্থান পরিবর্তন করে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ এর ফলে দামস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

উদ্দীপকে জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের ফলে বেতন ভাতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, আর সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। ফলে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে। কারণ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে তা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে আয় ও সম্পদের বণ্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির ঋণাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে আয়বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরো ধনী ও গরিবেরা আরো গরিব হতে থাকে। এতে এক শ্রেণির লোক লাভবান আর অন্য শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। এছাড়া সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকেও হিমশিম খেতে হয়। অন্যদিকে, সরকারি চাকরিজীবী, ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণি, শিল্পপতি সমাজে এরা লাভবান হতে থাকে। এর ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়। স্থির আয়ের জনগণ যেমন- বেসরকারি চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একই সমাজের দুইমুখী অবস্থান কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এতে সামগ্রিকভাবে সকলে লাভবান হয় না। ফলে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারি বেতন বৃদ্ধি পায় বলে সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করে। কিন্তু এতে শুধু একশ্রেণি লাভবান হচ্ছে। অপরদিকে, ভূমিহীন কৃষক, বেকার, গরিব জনসাধারণ, স্থির বা সীমিত আয়ের লোকদের জীবননির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কাম্য নয়। দেশের বেশির ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত হয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে। বাকি সিংহভাগ জনসাধারণ মানবেতর জীবননির্বাহ করে। দেশের এই বিপুল পরিমাণ জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না। এটি উন্নয়নের পরিপন্থী।

প্রশ্ন ▶ ৭ সরকার বিগত বছরগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক ও নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধি করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভারসহ বড় বড় অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলশ্রুতিতে নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন চাপে পড়ছে। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সাথে অর্থের মূল্যের কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের চাপ নিরসনের জন্য তুমি কোন ধরনের সমাধান সুপারিশ করবে?— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্য মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মুদ্রাস্ফীতির সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে।

দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ে তখন দামস্তর বাড়ে। দামস্তরের সাথে মুদ্রার মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। কাজেই দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ে তখন দামস্তর বাড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমে যায়। আবার মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা কমলে অর্থাৎ দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়বে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি ব্যয় বৃদ্ধিজনতি মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে পরিচিত।

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক যোগান (AS) হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনতি মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation) বলে। এ মুদ্রাস্ফীতি নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—

চিত্রে AD, ASo ও AS_1 হলো যথাক্রমে সামগ্রিক চাহিদা রেখা, প্রাথমিক সামগ্রিক যোগান রেখা এবং পরিবর্তিত সামগ্রিক যোগান রেখা। প্রাথমিক অবস্থায় E_o বিন্দুতে AD রেখা ASo রেখাকে ছেদ করায় Y_o আয়স্তরে Po দামস্তর নির্ধারিত হয়। এখন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে AS_1 রেখা AD রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় নতুন আয়স্তর Y_1 এ দামস্তর P_1 নির্ধারিত হয়।

Teachingbd24.com

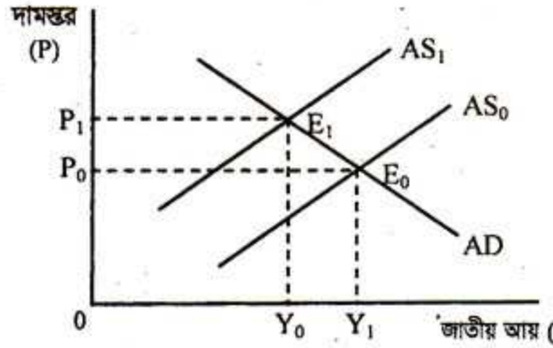

এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির দরুন যোগান হ্রাসের কারণে দামস্তর P_0 থেকে P_1 তে বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ সামগ্রিক যোগান হ্রাসের কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে একে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ উদ্দীপকে যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতির বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে পরিচিত। সরকার বিগত বছরগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। এদিকে কলকারখানায় শ্রমিকদের মজুরিও অনেক বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এর দরুন সমাজের নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন চাপের মধ্যে পড়েছে। তাদের চাপ নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা যায়—

১. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়। কাজেই এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমাতে পারে।

২. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো উল্লেখযোগ্য হারে মজুরি বৃদ্ধি। সাধারণত শ্রমিক সংঘের প্রবল চাপের দরুন এমনটি ঘটে। তাই সরকারের উচিত, শ্রমিক সংঘগুলোকে তাদের মজুরি বৃদ্ধির অযৌক্তিক দাবিগুলো সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রয়োজনে মজুরির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়া।

৩. হঠাৎ করে উৎপাদন হ্রাস পেলেও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। তাই এরূপ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৪. জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলেও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। তাই সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

৫. পরোক্ষ কর বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন যোগায়। তাই তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরোক্ষ করহার হ্রাস করা প্রয়োজন।

উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ওপর চাপ কমানো যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮

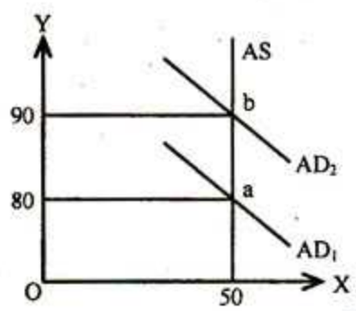

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. রপ্তানি বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

কোনো দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস বা আয় বৃদ্ধি ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

গ উল্লিখিত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ab বা ১০ একক।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, X-অক্ষ বরাবর দ্রব্যের পরিমাণ ও Y অক্ষ বরাবর দাম বা দামস্তর দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক চাহিদা (AD_1) এবং যোগান (AS) রেখা a বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেখানে দামস্তর ৮০ একক। পরবর্তীতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে AD_2 ও AS রেখা b বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে দাম নির্ধারিত হয় ৯০ একক। এক্ষেত্রে দামস্তর হলো (৯০-৮০) বা ১০ একক। যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো ১০ একক।

ঘ প্রদত্ত চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ:

১. **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সে অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. **অর্থের যোগান বৃদ্ধি:** অর্থের যোগান বাড়লে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৩. **ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি:** দেশে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়।

৪. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দেশের দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলো হলো ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদার ঋণ নীতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে গরিব, নিম্নবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের মানুষ। অপরদিকে, লাভবান হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা।

[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ভোক্তার মূল্যসূচক কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থায় সমাজের ওপর প্রভাবসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গরিব, নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষের ভোগান্তি থেকে উত্তরণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার মূল্যসূচক বা CPI বলে।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বাংলাদেশে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতি সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ওপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে গরিব, নিম্নবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের লোকেরা সংখ্যায় বেশি। বিগত বছরগুলোতে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগতভাবে বাড়লেও তাদের আয় তেমন বাড়েনি। এ জন্য একদিকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কম ক্রয় করতে হচ্ছে; অন্যদিকে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি তথা জীবনমান উন্নত করে এমন অনেক দ্রব্য ও সেবার ভোগ বাদ দিতে হচ্ছে। এসবের ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানে ক্রমাবনতি ঘটছে। তারা দুঃখ, কষ্ট ও হতাশার মধ্যে জীবনযাপন করছে।

বাংলাদেশে যারা সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত তারা যে দামে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ক্রয় করছে তার চেয়ে অনেক বেশি দামে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাদি বিক্রয় করছে। ফলে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দরুন তারা লাভবান হচ্ছে। তাছাড়া, ব্যবসায়ী শ্রেণি দ্রব্যাদি কম দামে ক্রয় করে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে অনেক বেশি দামে বিক্রয় করছে। বিদ্যমান এ মুদ্রাস্ফীতির জন্য তারাও যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

যারা ফটকা কারবারের সাথে জড়িত তারা কম দামে মালামাল ক্রয় করে মজুত করছে; পরে সুযোগ মতো বেশি দামে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। তাই সব মিলিয়ে লাভবান হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে চলমান মুদ্রাস্ফীতি গরিব, নিম্নবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের মানুষদেরকে বিরূপভাবে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে অনুকূলভাবে প্রভাবিত করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত গরিব, নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষেরা চলমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির শিকার; তাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। এ শ্রেণির মানুষদেরকে ভোগান্তি থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. দেশে বিদ্যমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম উপায় হলো কৃষি, শিল্পসহ সব খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন তথা যোগান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে তা তখন বর্ধিত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। সে অবস্থায় দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেলে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে বাংলাদেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য তাই উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন।

৩. অর্থ ও ঋণের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি বাংলাদেশে চলমান মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। তাই মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার করতে হলে বাংলাদেশে ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রার যোগান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. বাংলাদেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারার্থে বিদ্যমান আর্থিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হবে। এর অধীনে পরোক্ষ করের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ করের আওতা ও হার বৃদ্ধি, অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫. সরকার ফটকা বাজার ও ফটকা কারবারিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস করতে পারে। এছাড়া মজুতদারি ও চোরাকারবারি রোধ করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে কার্যকর করলে দেশে বিরাজমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষদের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

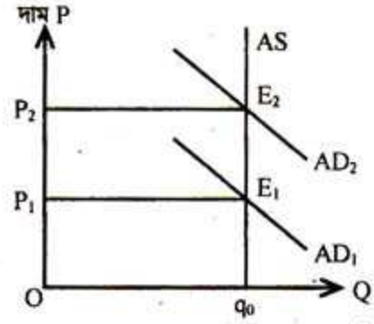

[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, আর্থিক নীতি দামস্তর P_2 থেকে P_1 এ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা দামকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা দামের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণ হলো— শ্রমিক সংঘসমূহের দাবির প্রেক্ষিতে মজুরি এতটা বৃদ্ধি, যা তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া, একচেটিয়া কারবারিরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তাদের দ্রব্যের যোগান লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে দিলে এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যাপকভাবে পরোক্ষ কর আরোপের দরুন দামস্তর বাড়লে জনসাধারণ বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হয়; তখন স্থির আয়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ বলে গণ্য হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে। দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তিত হওয়ায় এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের কিছু কারণ রয়েছে; নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ– বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন— শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদ কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৪. রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের জন্য উপরিউল্লিখিত কারণগুলো দায়ী।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে তা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে পরিচিত। এ মুদ্রাস্ফীতি কেবল আর্থিক নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

https://teachingbd24.com

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অধীনে ব্যাংক হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি, খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে। কিন্তু কখনো কখনো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হয় না। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে ঋণগ্রহীতাদের ওপর। মুদ্রাস্ফীতির সময় তারা অধিক ঋণ নিতে গেলে তবেই এ ব্যবস্থা কার্যকর হয় ও দামস্তর কম ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আর্থিক নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট না হলে সরকার রাজস্ব নীতিরও আশ্রয় নেয়। রাজস্ব নীতির মধ্যে সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতির আশ্রয় গ্রহণ সত্ত্বেও কখনো কখনো সরকারকে এসবের সাথে কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়। এগুলো হলো: দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, আমদানি বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তন হলে অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল আর্থিক নীতির প্রয়োগই যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

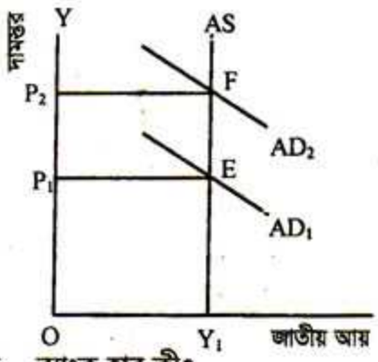

[চা.বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ? ২

গ. উল্লিখিত চিত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে AD_1 স্থানান্তরিত হয়ে AD_2 হওয়ায় অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়ছে বলে তুমি মনে করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হার বলতে এমন একটি বাট্টার হারকে বোঝায়, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ ধার দেয়।

খ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ তা সরাসরি বলা যায় না। কারণ, মৃদু ও সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা অর্থনীতিতে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করে।

আবার অতিরিক্ত হারে মুদ্রাস্ফীতি সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতিকে অভিশাপ বলা যায়।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম উৎস হলো সামগ্রিক চাহিদা বা AD বৃদ্ধি। সমাজে সাধারণত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে AD বাড়ে। সামগ্রিক যোগান AS প্রদত্ত অবস্থায় AD বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে; ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়।

১. অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তাই জনগণ অধিক খরচে উৎসাহী হয়ে পড়ে। ফলে তাদের ভোগ ব্যয় বেড়ে যায় এবং সঞ্চয় কমে যায়। এ ছাড়াও অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যায় এবং জনগণ সঞ্চয়ে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি শুধু সঞ্চয়ের স্পৃহাই কমায় না, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও (ability to save) কমায়।

২. মুদ্রাস্ফীতি স্বর্ণ, জুয়েলারি, রিয়েল এস্টেট, বাড়ি তৈরি প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহী করে। এ ধরনের অনুৎপাদনশীল সম্পদ অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় না।

৩. মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল হলো এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মানকে আরও নিচে নামিয়ে দেয়। এ কারণে প্রায়শই বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি হলো এক নম্বর শত্রু। মুদ্রাস্ফীতির কারণে গরিব জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা (basic need) পূরণ করতে পারে না বলে নিম্নতম জীবননির্বাহী স্তরও বজায় রাখতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ১২ হাবিব একজন গ্রাম্য কৃষক। তুষার সে গ্রামের গ্রাম্য মহাজন। হাবিব তার কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকেন। ২০১৪ সালে হাবিব প্রতিমণ আলু ৬০০ টাকা দরে ও প্রতিমণ ধান ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করেছিলেন। ২০১৫ সালে বাজারে আলু ও ধানের দাম একটু বেশি ছিল। তিনি আলু প্রতিমণ ৯০০ টাকা দরে ও ধান প্রতিমণ ৬০০ টাকায় বিক্রি করেন। বেশি দামে আলু ও ধান বিক্রি করতে পেরে হাবিব খুব খুশি। কিন্তু তুষারের মন বেশ খারাপ। *[রা.বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সূচক সংখ্যা কাকে বলে? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থের যোগানের পরিবর্তন আবশ্যক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১৪ সালের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে অর্থের যোগান কমানো।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অর্থের যোগান পরিবর্তন করে যে নীতি গ্রহণ করে তা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি নামে পরিচিত। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হলে অর্থের পরিমাণ কমানো প্রয়োজন। অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক ঋণ, সরকারি ব্যয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদেশ থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ, টাকা ছাপানো ইত্যাদি কমাতে হবে। কারণ ব্যাংক ঋণ অর্থের পরিমাণ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে, ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা ব্যবহার করে ২০১৪ সালের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা যায়—

	ভিত্তি বছর: ২০১৪ সাল		হিসাবি বছর: ২০১৫ সাল	
দ্রব্য	দ্রব্যের দাম (P_o)	হার $\frac{p_n}{p_o} \times 100$	দ্রব্যের দাম (Pn)	হার $\frac{p_n}{p_o} \times 100$
আলু	৬০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৬০০}{৬০০} \times ১০০ =$ ১০০	৯০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৯০০}{৬০০} \times ১০০ =$ ১৫০
ধান	৪০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৪০০}{৪০০} \times ১০০ =$ ১০০	৬০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৬০০}{৪০০} \times ১০০ =$ ১৫০

Teachingbd24.com

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ২০১৪ সালের মূল্যসূচক সংখ্যা ১০০। ২০১৫ সালের এ সংখ্যা হলো ১৫০। এ থেকে বোঝায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সালের দামস্তর (১৫০–২০০) = ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ৫০% হারে হ্রাস পেয়েছে।

ঘ মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষক হাবিব লাভবান হবে। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য মহাজন তুষার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিচে তাদের মনোভাব ভিন্নরকম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো–

দামস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উপকরণের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় কৃষিপণ্যের মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষিপণ্যের মূল্য তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে সচ্ছল কৃষকরা লাভবান হলেও দরিদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাওনাদার বা ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফিরে পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

পক্ষান্তরে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদাররা লাভবান হয়। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনার অর্থ পরিশোধ করতে পারে।

উদ্দীপকের হাবিব ও তুষারের মধ্যে এই একই প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে। হাবিব মুদ্রাস্ফীতির সময় তার উৎপাদিত পণ্যের দাম পূর্বের চেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করেই তুষারের ঋণ পরিশোধ করেছেন। এতে করে তুষার তার নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওনা ফেরত পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ উন্নয়নশীল দেশগুলো দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাজারে পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হয়। *[দি. বো. ২০১৬ ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. সীমিত আয়ের মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কিরূপ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো বাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। কারণ তাদের আয়ের সীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট আয়ের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়লে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান এবং ভোগব্যয় কমে যায়। এ ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি চলমান অবস্থায় দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিচে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

১. উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়ায় দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে।

২. বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন তেমন না বাড়ায় এবং নির্বাহকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল দ্রুত প্রাপ্ত না হওয়ায় দামস্তর বেড়ে চলেছে।

৩. উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়টি দেশের মূল্যস্ফীতির একটি কারণ।

৪. উন্নয়নশীল দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে উন্নয়নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'A' একটি দরিদ্র দেশ। 'A' দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্রয় করে। ২০১০ সালে 'A' দেশে প্রতি লিটার তেলের দাম ছিল ৬০ টাকা। পরবর্তী বছর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং 'A' দেশের সরকারকে প্রতি লিটার জ্বালানি তেল ৯০ টাকা করে কিনতে হয়। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি তেল আমদানি করে। এতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। *[কু. বো. ২০১৬ ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির ওপর মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির প্রভাব বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপক হতে ২০১১ সালে 'A' দেশের জ্বালানি তেলের মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করো। ৩

ঘ. 'A' দেশের সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি তৈরিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে করো? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়লে দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। আর অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এভাবেই মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলে।

গ উদ্দীপক অনুসারে ভোক্তার দামসূচক ব্যবহার করে 'A' দেশের ২০১১ সালের জ্বালানি তেলের মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করা যায়। এজন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করে নির্ণয় করতে পারি। মুদ্রাস্ফীতির হার (২০১১ সাল)

$$= \frac{\text{চলতি বছরের দামস্তর (২০১১)} - \text{গত বছরের দামস্তর (২০১০)}}{\text{গত বছরের দামস্তর (২০১০)}} \times ১০০$$

https://teachingbd24.com

২০১০ সালের জ্বালানি তেলের দাম ছিল ৬০ টাকা এবং ২০১১ সালের জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ টাকা। তাহলে ২০১১ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার কত হবে তা নির্ণয় করি:

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার (২০১১ সাল)} = \frac{৯০-৬০}{৬০} \times ১০০$$

$$= \frac{৩০}{৬০} \times ১০০ = \frac{৩০০০}{৬০} = ৫০\%।$$

সুতরাং, 'A' দেশে ২০১১ সালে জ্বালানি তেলের মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৫০%।

ঘ 'A' দেশের সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমদানিকৃত খনিজ তেল, দেশে উৎপাদিত গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বগামী হওয়ায় 'A' দেশে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। উৎপাদনের উপকরণ বিশেষ করে কাঁচামাল ও শ্রম ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ার মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে ব্যয় প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। আধুনিককালে সরকারকে বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। এর ফলে সরকারকে একদিকে ভর্তুকি দিয়ে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী আমদানি করতে হয়। অন্যদিকে, বিভিন্ন আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে অর্থ সংস্থান করতে হয়। যেমন— পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির দাম বাড়লে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

সরকার ব্যাপক হারে পণ্যসামগ্রীর ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে মূল্যস্তর বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। এভাবে 'A' দেশের সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি তৈরিতে ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সালাম সাহেব 'X' দেশে বাস করেন। তার দেশের ২০১০ এবং ২০১৪ সালের বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্যদ্রব্য	২০১০ সাল		২০১৪ সালের
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	দাম (টাকা)
চাল	৩০	৩৫	৩৮
গম	২৮	১০	৩২
চিনি	৩৫	৫	৪৩
বিবিধ	২০	১২	২৪

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদের হার, নগদ রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি এবং পরোক্ষ করের হার কমিয়ে দেয়। *[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সময়ে করদাতা লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পেয়ে যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে করদাতারা লাভবান হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় করদাতা লাভবান হন। দামস্তর বৃদ্ধির ফলে করদাতারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে কর পরিশোধ করতে পারে বলে করদাতা লাভবান হয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ অর্থের আকারে কর প্রদান করায় করদাতাদের প্রকৃত ভার কম হয়।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের ভোক্তার মূল্য সূচক নির্ণয় করা হলো—

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (২০১০)			চলতি বছর (২০১৪)	
	পরিমাণ (Q_0)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (Pn)	ব্যয় (PnQ_0)
চাল	৩৫	৩০	১০৫০	৩৮	১৩৩০
গম	১০	২৮	২৮০	৩২	৩২০
চিনি	৫	৩৫	১৭৫	৪৩	২১৫
বিবিধ	১২	২০	২৪০	২৪	২৮৮
মোট ব্যয়	$\Sigma P_0Q_0 = ১৭৪৫$			$\Sigma PnQ_0 = ২১৫৩$	

সুতরাং ভিত্তি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$= \frac{\Sigma P_0Q_0}{\Sigma P_0Q_0} \times ১০০ = \frac{১৭৪৫}{১৭৪৫} \times ১০০$$

$$= ১০০$$

চলতি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$= \frac{\Sigma PnQ_0}{\Sigma P_0Q_0} \times ১০০ = \frac{২১৫৩}{১৭৪৫} \times ১০০$$

$$= ১২৩.৩৮$$

এক্ষেত্রে দামস্তর ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে (১২৩.৩৮–১০০) = ২৩.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২৩.৩৮%।

ঘ সালাম সাহেবের দেশে অর্থাৎ 'X' দেশটিতে সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কর্তৃক অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অন্তর্গত মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন সরাসরি হ্রাস করতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। তাছাড়া ঋণের রেশনিং, ঋণের বরাদ্দকরণ, জামিনের প্রান্তিক হার পরিবর্তন, ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সরাসরি আদেশ প্রদান, নৈতিক চাপ, প্ররোচনা ইত্যাদি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর্থিক নীতি প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুদ্রাস্ফীতি সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমস্যা সমস্যা সৃষ্টি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ জন্য কোনো অবস্থাতেই এটি কাম্য নয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের যথাযথ কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'A' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। এর ফলে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় সরকার নিম্ন আয়ের লোকদের খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তি সহজ করতে সারা দেশে খোলা বাজারে সুলভমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় শুরু করে। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ভোক্তার মূল্যসূচক বলতে কী বোঝায়? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতারা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক কোন কোন কারণ বিদ্যমান আছে? –সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে কতটা সহায়ক বলে তুমি মনে কর? ৪

Teachingbd24.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দামসূচক বা CPI বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঋণদাতার ফেরত প্রাপ্ত অর্থের মূল্য আগের চেয়ে কম হয়।এ জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ 'A' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'A' দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সহায়ক কারণগুলো হলো।

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য তাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজার ব্যবস্থা বা দাম প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ করে না। এতে করে মনোপলি ক্ষমতার সৃষ্টি হয় এবং দামস্তর বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

চতুর্থত, বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন- শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

ঘ উদ্দীপকের দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক বলে আমি মনে করি। এ ধরনের কার্যক্রমকে সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দামের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে; সাথে সাথে ঐসব দ্রব্য রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আবার খোলা বাজারে বাজার দাম থেকে কম দামে এসব দ্রব্য বিক্রয় করলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানো যায়।

২. চাহিদার তুলনায় অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান কম হলে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ে। তাই এ মাত্রা কমানোর জন্য দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রয়োজন।

৩. মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্রমবর্ধমান দামস্তরের সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত লাভ করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের একাংশ ফটকা কারবারে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে দামস্তর আরও বাড়ে। কাজেই এ কারবার নিয়ন্ত্রণ করলে দামস্তর হ্রাস পায় ও মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ডতা কমে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ নজরুল সাহেব বাজার থেকে ফিরে বিরক্তির সুরে তার সহকর্মীকে বলতে লাগলেন, আর বলবেন না ভাই, গত বছর সবজি ও মাছ প্রতি কেজি ১০ ও ২০০ টাকায় কিনেছি। এবার তা আর সম্ভব হচ্ছে না। এই দেখুন না, সবজি ও মাছ প্রতি কেজি কিনলাম ২০ টাকা ও ৩০০ টাকা দরে। *[ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. ভোক্তার দামসূচক কী? ১

খ. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সবজি ও মাছের দামের ভিত্তিতে বর্তমান বছরের ভোক্তার দামসূচক নির্ণয় করে দেখাও। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি'—বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) পদ্ধতি বলে।

খ দেশে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

একটি অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাস ইত্যাদির কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

গ ভোক্তারা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের পাইকারি দামে কত ব্যয় হতো এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হয় তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দামসূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি। নিচে উদ্দীপকের তথ্যের সাহায্যে ভোক্তার দামসূচক নির্ণয় করা হলো:

ভোগ্যদ্রব্যের নাম	ভিত্তি বছর (০)			চলতি বছর (n)	
	পরিমাণ (Q_0)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
সবজি (কেজি)	১	১০	১০	২০	২০
মাছ (কেজি)	১	২০০	২০০	৩০০	৩০০
মোট ব্যয়	$\sum P_0Q_0 = ২১০$			$\sum P_nQ_0 = ৩২০$	

সুতরাং, চলতি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_nQ_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{৩২০}{২১০} \times ১০০$$

$$= ১৫২$$

তাহলে ভিত্তি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_0Q_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{২১০}{২১০} \times ১০০$$

$$= ১০০$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (১৫২ − ১০০) = ৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৫২%।

ঘ সৃজনশীল ১৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮

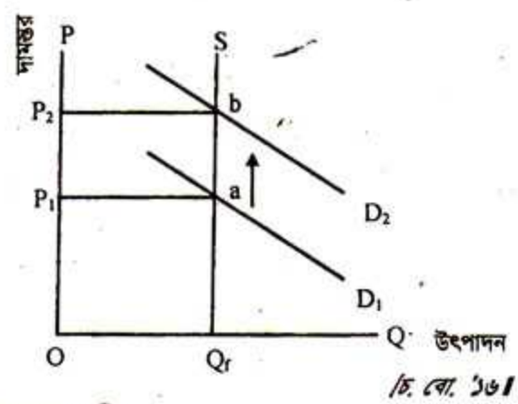

[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেলে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে? ২

গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে? আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্যকোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ বেড়ে 'ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' ঘটবে।

শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের দরকষাকষি ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা না বাড়লেও মজুরি বাড়বে। যা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে।

গ চিত্রে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ফলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ/উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। Q_fS নির্দিষ্ট পরিমাণ যোগান যা স্থির এবং D_1ও D_2হলো চাহিদা রেখা। যোগান স্থির অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D_1ও D_2 হলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং P_1 থেকে বেড়ে দাঁড়ায় P_2। সুতরাং, এক্ষেত্রে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় ab পরিমাণ।

ঘ উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেমন–

অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়াতে হয়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার।

ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ: অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত ঋণের যোগান হ্রাস করে সরকার মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় হলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাহলে খাদ্যসহ সব রকম দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত চাহিদা হ্রাস পাবে এবং মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা কমবে।

সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস করতে পারে। বিভিন্ন আমানতি হিসেবে সুদের হার কিছুটা বৃদ্ধি করে মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আয় তুলে নিয়ে স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব।

আমদানি বৃদ্ধি: অভ্যন্তরীণ ঘাটতি মেটানো জন্য সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এত করে দেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯

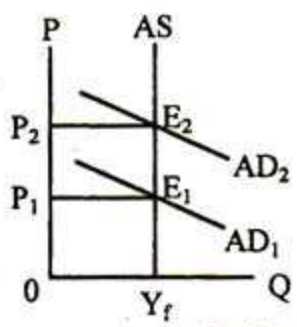

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. ভোক্তার মূল্য সূচক কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয় — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে দ্রব্যের দাম P_1 থেকে P_2 হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার মূল্যসূচক বা CPI বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য তাই মুদ্রাস্ফীতি সবসময় খারাপ নয়।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে। দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তিত হওয়ায় এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের কিছু কারণ রয়েছে; নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ– বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন— শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদ কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এ জন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৪. রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের জন্য উপরিউল্লিখিত কারণগুলো দায়ী।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ও রাজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও সরকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। যেমন- দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি দেশে উৎপাদন কম হলে চাহিদার তুলনায় যোগান কম হয় বলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো মজুরি বৃদ্ধি। তাই সরকার মজুরি নিয়ন্ত্রণ করলে চাহিদার হ্রাস দরুণ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

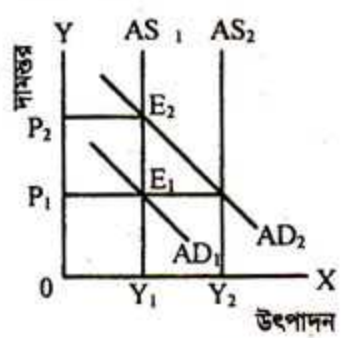

চিত্র: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

https://teachingbd24.com

উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, চাহিদা (AD_2) যোগান বৃদ্ধি করে AS_2 করা হলে দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আবার, মজুরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাহিদা হ্রাস করে তথা AD_2 থেকে AD_1 করা হলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই বলা যায়, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ২০

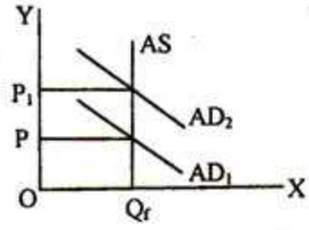

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. সূচকসংখ্যা কী? ১

খ. উৎপাদনকারীর ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কী প্রকাশ করছে তার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো ভূমিকা আছে কি — মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা দামকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা দামের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচকসংখ্যা বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্নতার কারণে উৎপাদনের ওপর এর প্রভাব বিভিন্ন হয়। মুদ্রাস্ফীতি স্বল্প মাত্রার হলে তা উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনীতিতে দামস্তর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় লাভের আশায় উৎপাদন বাড়ায়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে। দাম P থেকে P_1-তে পরিবর্তিত হওয়ায় এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। চিত্রে দাম P থেকে P_1-তে পরিবর্তনের কিছু কারণ রয়েছে; নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন— শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদ কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৪. রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের জন্য উপরি কারণগুলো দায়ী।

ঘ উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়ায়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার। অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনী উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত ঋণের যোগান হ্রাস করে সরকার মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

আবার চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় হলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাহলে খাদ্যসহ সব রকম দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত চাহিদা হ্রাস পাবে এবং মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা কমবে। এছাড়া চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয় উদ্বুদ্ধ করে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস করতে পারে। বিভিন্ন আমনতি হিসাবে সুদের হার কিছুটা বৃদ্ধি করে মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আয় তুলে নিয়ে স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব।

অভ্যন্তরীণ ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এতে করে দেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১ A একটি উন্নয়নশীল দেশ। উক্ত দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। এর ফলে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. আকস্মিকভাবে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে অল্প সময় পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলে তাকে কি মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে? ২

গ. A দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? এর কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিস্থিতির জন্য জনজীবনে কী প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক যোগান হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ আকস্মিকভাবে কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে অল্প সময় পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না। কারণ এতে অর্থের মূল্যের ক্রমাগত হ্রাস পায় না।

সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলতে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধিকে বোঝায়। অর্থাৎ, দ্রব্যসামগ্রীর যোগান না বেড়ে অর্থের যোগান বাড়লে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা তথা অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পায়। তাই হঠাৎ করে দাম বেড়ে তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলে অর্থের মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয় না বলে, একে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত A দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি হলো মুদ্রাস্ফীতি। নিচে এর কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।

https://teachingbd24.com

উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়লে দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করে। তাছাড়া, ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থানের জন্য সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পায় তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উন্নয়নশীল 'A' দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করে। আবার, অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে A দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তাই বলা যায়, সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ও কৃত্রিম সংকটের কারণে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি তথা মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিচে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণত একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সাধারণ ভোক্তা, স্থির আয়ের মানুষ, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উৎপাদক ও ঋণগ্রহীতা উপকৃত হয়। তাই মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি অর্থনীতির জন্য কাম্য হলেও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনে দুর্ভোগ তৈরি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, A দেশে মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান থাকায় কিছু ব্যবসায়ী লাভবান হলেও সাধারণ জনগণ চরম দুর্ভোগে পড়ে। কারণ দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তাকে উচ্চদামে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়।

আবার, মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের লোকেরা বেশি অর্থ ব্যয় করেও পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে। এতে তাদের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। অন্যদিকে, দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণির পূর্বের চেয়ে বেশি মুনাফা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক। তাই উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনীতিতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বজায় রাখতে পারলে জনজীবনে এর সুফল পড়তে পারে; অন্যথায় তা শুধু দুর্ভোগই বয়ে আনবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর:

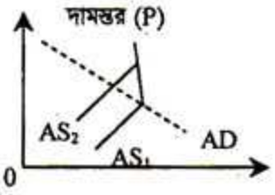

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন গতির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে— তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্বনীতি ও প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ অর্থের প্রচলন গতি পণ্যের দাম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অর্থের প্রচলন গতি বলতে নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে এক একক অর্থের হস্তান্তরিত হওয়ার সংখ্যা বোঝায়। অর্থের প্রচলন গতি, মজুরি দেয়ার প্রথার ওপর নির্ভরশীল। মজুরি প্রদান যত বেশি ঘন ঘন হবে অর্থের প্রচলন গতি তত বাড়বে। স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতি এবং ঋণপত্রের প্রচলন গতি স্থির থাকে। ফলে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সে হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হতে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে দামস্তরও অর্ধেক হবে। আবার, দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

গ চিত্রে যোগান বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

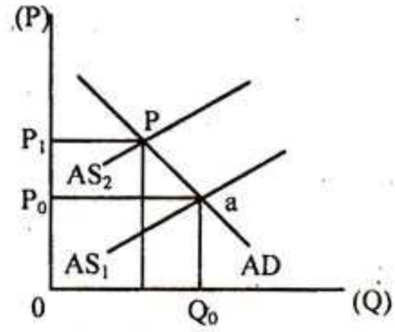

ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রকৃত উৎপাদন (Q) ও লম্ব অক্ষের দামস্তর (P), AS সামগ্রিক যোগান রেখা ও AD সামগ্রিক চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা (AD) স্থির থেকে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পেয়ে As_1 থেকে As_2 হলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় OP_1 থেকে Op_1 তথা যোগান মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় P_0P_1 পরিমাণ। এক্ষেত্রে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় যোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

তাই উদ্দীপকের চিত্রটিকে যোগান বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা যায়।

ঘ মুদ্রাস্ফীতি চিত্রে ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার তার রাজস্বনীতির হাতিয়ারসমূহের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কার্যক্রমও গ্রহণ করতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতির অধীনে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ সকরতে পারে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে জনগণের হাতের টাকা হ্রাস, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস এবং সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সাময়িক বন্ধ বা হ্রাস, ভর্তুকি প্রত্যাহার, সরকারি ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

আবার, সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্বনীতির পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কার্যক্রমও ভূমিকা রাখতে পারে। এগুলো হলো- খাদ্যঘাটতি হ্রাস, ঘাটতি ব্যয় কমানো, দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, রেশনিং বা ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, কঠিন আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে সম্পদ অধিক উৎপাদনশীল বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তর, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয়ী আমানতের অংশবিশেষ এবং মুদ্রা বাতিল ঘোষণা প্রভৃতি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অতএব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের রাজস্বনীতির মতো প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের ভূমিকাও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ড. রেজাউল করিম সাহেব X দেশে বাস করেন। উক্ত দেশে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের কেজিপ্রতি দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	ভিত্তি বছর ২০১৪		চলতি বছর ২০১৭
	পরিমাণ (Qo) কেজি/লিটার	দাম (Po) এককপ্রতি	এককপ্রতি দাম (Pn)
চাল	৪০	৪০	৬০
ডাল	১২	১০০	১২০
আটা	১৫	২৫	৩৫

দেশটির সরকার ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের সুদের হার, নগদ রিজার্ভের পরিমাণ ও পরোক্ষ করের পরিমাণ পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. রপ্তানি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে? ২

Teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের আলোকে X দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

কোনো দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস বা আয় বৃদ্ধি ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

গ ধরি, ভিত্তিবছর ২০১৪ = ০, চলতি বছর ২০১৭+ = n, দাম = P, পরিমাণ = Q_0। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে X দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা নির্ণয় করি।

ভোগ্যদ্রব্যের নাম	P_0	P_n	Q_0	P_nQ_0	P_0Q_0
চাল	৪০	৬০	৪০	২৪০০	১৬০০
ডাল	১০০	১২০	১২	১৪৪০	১২০০
আটা	২৫	৩৫	১৫	৫২৫	৩৭৫
				ΣP_nQ_0 = ৪৩৬৫	ΣP_0Q_0 = ৩১৭৫

∴ ২০১৪ সালের প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা

$$CPI = OP_n = \frac{\Sigma P_nQ_0}{\Sigma P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{৪৩৬৫}{৩১৭৫} \times ১০০$$

$$= ১৩৭.৪৮$$

সুতরাং ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে (১৩৭.৪৮ − ১০০) = ৩৭.৪৮%। অর্থাৎ বিবেচ্য বছরে মূল্যস্ফীতির হার = ৩৭.৪৮%।

ঘ উদ্দীপকে X দেশটিতে সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে।

দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকৃত অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অন্তর্গত মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে।

তাছাড়া ঋণের রেশনিং, ঋণের বরাদ্দকরণ, ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সরকারি আদেশ প্রদান, নৈতিক চাপ, প্ররোচনা ইত্যাদি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে আর্থিক নীতি প্রয়োগ ঘটালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মূল্যস্ফীতি সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত করে। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এজন্য কোনো অবস্থাতেই এটি কাম্য নয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে X দেশটি আর্থিক নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায়ে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ A দেশে ২০১৭-এর তুলনায় ২০১৮-তে দ্রব্যের দাম নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্রব্য	২০১৭	২০১৮
চাল	৫০	৬০
গম	৩৫	৩৯
সবজি	২০	২৫

মনে করা হচ্ছে উৎপাদন হ্রাসই এর কারণ। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে দ্রব্য তিনটির মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি"—ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঋণদাতার ফেরত প্রাপ্ত অর্থের মূল্য আগের চেয়ে কম হয়। এ জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকের দ্রব্য তিনটি হচ্ছে চাল, গম ও সবজি। দ্রব্য তিনটির মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো-

ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দ্রব্যমূল্য কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার শতকরা হার পরিমাপকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে। মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় এর জন্য নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করা হয়।

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{\text{চলতি বছরের দাম} - \text{গত বছরের দাম}}{\text{গত বছরে দাম}} \times ১০০$$

উদ্দীপকের সূচিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে চালের দাম যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ৬০ টাকা, গমের দাম যথাক্রমে ৩৫ টাকা ও ৩৯ টাকা এবং সবজির দাম যথাক্রমে ২০ টাকা ও ২৫ টাকা।

$$\therefore \text{২০১৮ সালে চালের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{৬০ - ৫০}{৫০} \times ১০০$$

$$= ২০\%$$

$$\therefore \text{২০১৮ সালে গমের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{৩৯ - ৩৫}{৩৫} \times ১০০$$

$$= ১১.৪৩\%$$

$$\therefore \text{২০১৮ সালে সবজির মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{২৫ - ২০}{২০} \times ১০০$$

$$= ২০\%$$

ঘ উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি বলেই আমি মনে করি।

উদ্দীপকের সূচিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের উৎপাদিত কৃষিজাত কয়েকটি পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে এবং উৎপাদন হ্রাসকেই এর কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন হ্রাসই একটি দেশের মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন কারণেই মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। নিচে এর কারণগুলো আলোচনা করা হলো-

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়ায় দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায়

Teachingbd24.com

তা দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন তেমন না বাড়ায় এবং নির্বাহকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল দ্রুত প্রাপ্ত না হওয়ায় দামস্তর বেড়ে চলেছে। **তৃতীয়ত,** উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়টি দেশের মূল্যস্ফীতির একটি কারণ। **চতুর্থত,** উন্নয়নশীল দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে উন্নয়নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, "উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি"—বক্তব্যটি পুরোপুরি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫

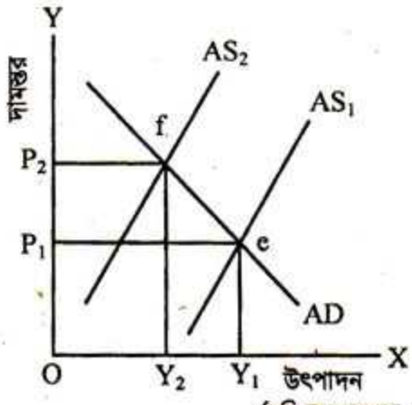

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. মুদ্রা সংকোচন কী? ১

খ. কীভাবে ব্যাংক ঋণের প্রসার মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির জন্য দায়ী? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যদি AD বৃদ্ধি পায় তবে উদ্দীপকের চিত্রের কোন ধরনের পরিবর্তন হবে। তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে দামস্তরের ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতাকে মুদ্রাসংকোচন বলে।

খ ব্যাংক ঋণের সাথে মুদ্রাস্ফীতির সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থের যোগান বৃদ্ধি। যখন ব্যাংকসমূহ অধিক হারে ঋণ প্রদান করে তখন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। আর অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে সে অনুযায়ী যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না পায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মিসেস অর্পা 'Z' দেশের নাগরিক, তার ছোট মেয়ে ২০১৯ এইচএসসি পরীক্ষার্থী। মেয়ের জন্য টেস্ট পেপার কিনতে দাম দেখে তিনি অবাক হলেন। কারণ বড় মেয়ে যখন ২০১০ এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল তখন টেস্ট পেপারের দাম ছিল ৫০০ টাকা, কিন্তু বর্তমান টেস্ট পেপারের দাম ১৫০০ টাকা। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে উভয় বছরের দামসূচক বের করে অর্থের মূল্য নির্ধারণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের টেস্ট পেপারের মুদ্রাস্ফীতির হার কত? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো দ্রব্যের গড় দামের সাথে অপর একটি সময়ে ওই দ্রব্যগুলোর গড় দামের তুলনায় শতকরা পরিবর্তনের হার প্রকাশ করাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কোনো দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলে তার দাম বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত এ অবস্থা বিরাজ করলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তাই যদি কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ অর্থনীতির সকল খাতের উৎপাদন বাড়ে তাহলে চাহিদা পূরণে অনেকটা সক্ষম হবে এবং দামস্তরের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী 'Z' দেশে ২০১০ সালে টেস্ট পেপারের দাম ছিল ৫০০ টাকা এবং ২০১৯ সালে টেস্ট পেপারের দাম বেড়ে হয় ১৫০০ টাকা। এ অবস্থায় উভয় ক্ষেত্রে দামসূচক হলো—

২০১৯ সালের ভোক্তার দামসূচক (CPI) $= \frac{\Sigma PnQo}{\Sigma PoQo} \times ১০০$; যেখানে Pn = চলতি বছরের মূল্য, Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ, Po, ভিত্তি বছরের মূল্য।

সুতরাং $\frac{১৫০০}{৫০০} \times ১০০ = ৩০০$

আবার ২০১০ সালের ভোক্তার দামসূচক $= \frac{\Sigma P_0Qo}{\Sigma P_0Qo} \times ১০০$;

বা $\frac{৫০০}{৫০০} \times ১০০ = ১০০$

এক্ষেত্রে দামস্তর (৩০০ - ১০০) = ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দামসূচক অনুসারে বলা যায়, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ২০০% ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য এই সময়ের ব্যবধানে ২০০% কমেছে।

ঘ উদ্দীপকে ২০১০ ও ২০১৯ সালের ব্যবধানে টেস্ট পেপারের দাম বেড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা হয়েছে। এখানে ২০১৯ সালে ভোক্তার দামসূচক $= \frac{\Sigma PnQo}{\Sigma P_0Qo} \times ১০০$;

বা $\frac{১৫০০}{৫০০} \times ১০০ = ৩০০$, সাধারণত ভিত্তি বছরের দামাস্তর ১০০ ধরা হয়। সুতরাং উদ্দীপকে ভোক্তার মূল্যসূচক (৩০০-১০০) = ২০০ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ "Z" দেশে ২০১৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২০০%।

উদ্দীপকে "Z" দেশে অতি উচ্চহারের মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে ভোক্তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে অনেক দ্রব্য চলে যাবে। যার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে নেমে যাবে। উচ্চ হারের মুদ্রাস্ফীতির কারণে স্থির আয়ের লোকের প্রকৃত আয় অনেক কমে গিয়ে তাদের ব্যক্তিজীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ডেকে আনবে।

অধিক হারের মুদ্রাস্ফীতির কারণে জনগণের হাতের অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায় বলে তারা অধিক খরচ করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের ভোগ ব্যয় বেড়ে যাবে এবং সঞ্চয় কমে যাবে। আর সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগের পরিমাণও কমে যাবে যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটাই ভেঙে পড়বে। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশীয় পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ে যার ফলে রপ্তানি হ্রাস পায়। অন্যদিকে দেশীয় ক্রেতারা আমদানিকৃত দ্রব্য সস্তায় পায় বলে আমদানি বাড়ে। এতে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায় এবং লেনদেন ঘাটতি দেখা যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় 'z' দেশে অতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি থাকায় এই দেশটির অর্থনীতির ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ একটি দেশের ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	২০১৭ সাল		২০১৮ সাল
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	দাম (টাকা)
আটা	৪০	৩৫	৪৫
আলু	২০	২০	২৫
লবণ	৩৫	১০	৪০
বিবিধ	২০	১২	২৪

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের হার, নগদ রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং পরোক্ষ করের হার কমিয়ে দেয়।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. "মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়" বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দেশটির ভোক্তার সূচক (CPI) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগকারীরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পণ্যের দাম বেশি হয়। তাই এ সময় কৃষকশ্রেণি, বিশেষ করে ধনী কৃষকেরা লাভবান হয়। মজুতদার, কালোবাজারি ও ফটকা কারবারি মুদ্রাস্ফীতির সময় পণ্য মজুত করে এগুলোর দাম বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ অর্থের আকারে কর প্রদান করায় করদাতাদের প্রকৃত ভার কম হয়। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশটির ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় করা হলো-

দুটি সময়ের ব্যবধানে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা পরিমাপের জন্য যে সূচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয় তাকে মূল্যসূচক সংখ্যা বলে। আর ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI - Consumer's Price Index) বলে। ল্যাপিয়ার্সের $\frac{\Sigma p_n q_0}{\Sigma p_0 q_0} \times 100$ সূত্রটি ব্যবহার করে CPI নির্ণয় করা হয়।

প্রথমে, ভিত্তি বছর ২০১৭ = 0, চলতি বছর ২০১৮ = n, দাম = p এবং পরিমাণ = q ধরে উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ল্যাপিয়ার্সের মূল্যসূচক সংখ্যা নির্ণয় করি:

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (২০১৭ সাল)			চলতি বছর (২০১৮ সাল)	
	পরিমাণ (q_0)	দাম (p_0)	ব্যয় (p_0q_0)	দাম (p_n)	ব্যয় (p_nq_0)
আটা	৩৫	৪০	১৪০০	৪৫	১৪৭৫
আলু	২০	২০	৪০০	২৫	৫০০
লবণ	১০	৩৫	৩৫০	৪০	৪০০
বিবিধ	১২	২০	২৪০	২৪	২৮৮
মোট ব্যয়	$\Sigma p_0q_0 = ২৩৯০$			$\Sigma p_nq_0 = ২৭৬৩$	

সুতরাং ভিত্তি বছরে (২০১৭) ভোক্তার মূল্যসূচক,

$$CPI = \frac{\Sigma p_0q_0}{\Sigma p_0q_0} \times ১০০ = \frac{২৩৯০}{২৩৯০} \times ১০০ = ১০০$$

এবং চলতি বছরে (২০১৮) ভোক্তার মূল্যসূচক,

$$CPI = \frac{\Sigma p_nq_0}{\Sigma p_0q_0} \times ১০০$$
$$= \frac{২৭৬৩}{২৩৯০} \times ১০০$$
$$= ১১৫.৬১$$

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নিচের সূচিটি লক্ষ কর:

দ্রব্য	২০০০ সালে দাম	২০০০ সালে পরিমাণ	২০১৭ সালে দাম	২০১৭ সালে পরিমাণ
চাল	২০	১০	৩৫	১৫
তৈল	৫০	৫	৮০	৭

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. অর্থের যোগান কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের মূল্যসূচক নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো বর্ণনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্রব্যের যোগান যে অনুপাতে বৃদ্ধি না পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে অর্থের যোগান হ্রাসে দেশে সরকার আর্থিক নীতির প্রয়োগ ঘটাতে পারে।

গ উদ্দীপক হতে ফিশারের মূল্যসূচক নির্ণয় করা হলো-

ফিশারের আদর্শ দামসূচক $I_n = \sqrt{\frac{\Sigma Po.\ Qo}{\Sigma Po.\ Qo} \times \frac{\Sigma Pn.\ Qn}{\Sigma Po.\ Qn}} \times ১০০$

এখানে, P_o = চলতি বছরের দাম,
Q_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্য,
P_n = চলতি বছরের দাম,
Q_n = চলতি বছরের দ্রব্য

উদ্দীপকের সূচি অনুসারে,

দ্রব্য	দামস		পরিমাণ		PoQo	PnQo	PnQn	PoQn
	Po (২০০০)	Pn (২০১৭)	Qo (২০০০)	Qn (২০১৭)				
চাল	২০	৩৫	১০	১৫	২০০	৩৫০	৫২৫	৩০০
তেল	৫০	৮০	৫	৭	২৫০	৪০০	৫৬০	৩৫০
					$\Sigma PoQo = ৪৫০$	$\Sigma PnQo = ৭৫০$	$\Sigma PnQn = ১০৮৫$	$\Sigma PoQn = ৬৫০$

$$\therefore \text{ফিশারের দামসূচক সংখ্যা } oIn = \sqrt{\frac{\Sigma Po.\ Qo}{\Sigma Po.\ Qo} \times \frac{\Sigma Pn.\ Qn}{\Sigma Po.\ Qn}} \times ১০০$$
$$= \sqrt{\frac{৭৫০}{৪৫০} \times \frac{১০৮৫}{৬৫০}} \times ১০০$$
$$= \sqrt{১.৬৭ \times ১.৬৭} \times ১০০$$
$$= \sqrt{২.৭৮} \times ১০০$$
$$= ১.৬৭ \times ১০০$$
$$= ১৬৭$$

এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ = (১৬৭-১০০)
= ৬৭%

সুতরাং ভিত্তি বছর ২০০০ এর তুলনায় চলতি বছর ২০১৭ সালে দাম স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৭%

https://teachingbd24.com

ঘ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর্থিক নীতি, রাজস্বনীতি ও প্রত্যক্ষ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অধীনে ব্যাংক হার বৃদ্ধি, নগর জমার অনুপাত বৃদ্ধি, খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে। কিন্তু কখনো কখনো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব ব্যবস্থা পুরোপুরি, কার্যকর হয় না। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে ঋণগ্রহীতাদের ওপর। মুদ্রাস্ফীতির সময় তারা অধিক ঋণ নিতে গেলে তবেই এ অবস্থা কার্যকর হয়। দামস্তর কম হয় ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আর্থিক নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট না হলে সরকার রাজস্ব নীতিরও আশ্রয় নেয়, এগুলো হলো দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং মজুরি নিয়ন্ত্রণ আমদানি বৃদ্ধি, ফটকা করার নিয়ন্ত্রণ। এছাড়া মজুদদারি ও চোরাকারবারিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয়।

সুতরাং এসব পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে একটি দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়। তবে এককভাবে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সব পদ্ধতিগুলোই একত্রে ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

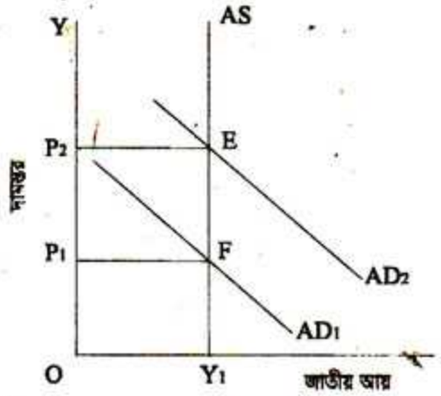

[উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. "অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়" – ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ দেশে বিভিন্ন অনুন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রায়ই তার আয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করে ফেলে। এ অত্যধিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে স্বল্প সময়েই সরকারকে অতিরিক্ত নোট ছাপাতে হয় কিংবা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে।

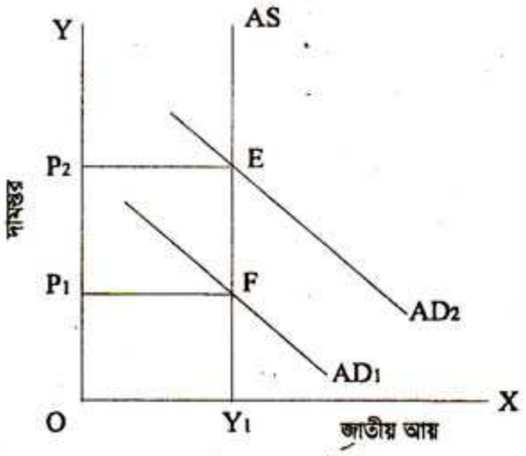

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে (OY) দামস্তর দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরের কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তথা E বিন্দুতে $AD_1 = AS$ হওয়ায় Y_1 আয়স্তরে P_1 দাম নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2 হওয়ায় EF পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে দামাস্তর P_1 থেকে P_2-তে দাম বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD আরও ডান দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং দামস্তর আরও বাড়বে।

সামাজিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি চাপের অন্যতম উৎস হলো সামগ্রিক চাহিদার AD বৃদ্ধি। সমাজে সাধারণত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে AD বাড়ে। সামগ্রিক যোগান AS প্রদত্ত অবস্থায় AD বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির চাপের এ উৎসটির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

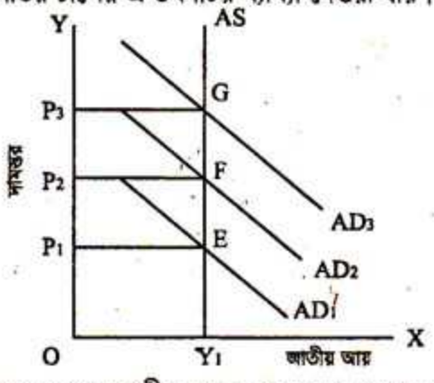

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে (OY) দামাস্তর পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে AD ও AS হলো যথাক্রমে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান রেখা। চিত্রে AS প্রদত্ত অবস্থায় প্রথম দিকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে AD_1 রেখা AD_2-তে স্থানান্তরিত হওয়ার দামস্তর P_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_2 হয়। এরপর যদি সামগ্রিক চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে AD রেখা AD_3-তে স্থানান্তরিত হবে। যেখানে দামস্তর আরও বেশি বা P_3 হবে। সুতরাং বলা যায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রের সামগ্রিক চাহিদা রেখা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন ভারসাম্য বিন্দু G এবং নতুন দামস্তর P_3 হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সেলিম গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। লেখাপড়া কম জানে। সে শুধু বোঝে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ল না কমল। পণ্যসামগ্রীর দাম যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন সেলিম ও তার আশপাশের মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে এবং বুঝতে পারে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে এবং দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবাই এ পরিস্থিতির উন্নতি চায়। তাই সরকারের উচিত মুদ্রাস্ফীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ৭]

Teachingbd24.com

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. ভোক্তার মূল্যসূচক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষ কী ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয় উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের কী করণীয় বলে তুমি মনে কর— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ যে সূচকের মাধ্যমে ভোক্তার দাম বা ব্যয় দেখানো হয় তাকে ভোক্তার দামসূচক বলে।

ভোক্তা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের খুচরা দামে কত ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দামসূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মূলত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি।

গ মুদ্রাস্ফীতির সময় সেলিমের মতো সীমিত আয়ের মানুষদের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

সমাজের সীমিত আয়ের মানুষগুলো মুদ্রাস্ফীতির ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে। চাইলেই আয় বাড়ানো যায় না। কিন্তু এ সময় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দামের সাথে পাল্লা দিয়ে আয় না বাড়ায় অর্থাৎ একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। এতে তাদের ভোগব্যয় ও জীবনযাত্রার মানও কমে যায়।

মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হলো এটি উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে জীবনযাত্রার মান এতটাই কমিয়ে দেয় যে সে দেশের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কাজেই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সীমিত আয়ের মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, যা উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।

ঘ মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে তা অনুসরণ অনুসরণ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতি অধীনে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-সরকারি ব্যয় হ্রাস, জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাসের উদ্দেশ্য বিদ্যমান কর হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ, ক্রেতা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমানোর জন্য সরকারি ঋণ গ্রহণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি। রাজস্ব নীতির সফল প্রয়োগ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতি ছাড়াও আরও কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো হলো-উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি বৃদ্ধি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও খোলা বাজারে বিক্রয়, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। পরিশেষে বলা যায় যে, আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶৩১ হাবিব একজন গ্রাম্য কৃষক। তুষার সে গ্রামের মহাজন। হাবিব তার কৃষিকাজ পরচালনার জন্য অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকেন। ২০১৪ সালে হাবিব প্রতি মণ আলু ৬০০ টাকা দরে ও প্রতি মণ ধান ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করেছিল। ২০১৫ সালে বাজারে দাম একটু বেশি। সে আলু প্রতি মণ ৯০০ টাকা দরে ও ধান প্রতি মণ ৬০০ টাকায় বিক্রি করেন। বেশি দামে আলু ও ধান বিক্রি করতে পেরে হাবিব খুব খুশি। কিন্তু তুষারের মন বেশ খারাপ।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৭]

ক. কৃষি উপকরণ কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থের যোগানের পরিবর্তন আবশ্যক— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ২০১৪-এর ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার উদ্দীপক হতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলকে একত্রে কৃষি উপকরণ বলা হয়।

খ অর্থের যোগান কমানোই হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অর্থের যোগান পরিবর্তন করে যে নীতি গ্রহণ করে তা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি নামে পরিচিত। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হলে অর্থের পরিমাণ কমাতে হবে। অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক ঋণ, সরকারি ব্যয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদেশ থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ, টাকা ছাপানো ইত্যাদি কমাতে হবে। কারণ ব্যাংক ঋণ অর্থের পরিমাণ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে, ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা ব্যবহার করে ২০১৪ সালের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা যায়—

	ভিত্তি বছর: ২০১৪ সাল		হিসাবি বছর: ২০১৫ সাল	
দ্রব্য	দ্রব্যের দাম (P_o)	হার $\frac{p_n}{p_o} \times 100$	দ্রব্যের দাম (Pn)	হার $\frac{p_n}{p_o} \times 100$
আলু	৬০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৬০০}{৬০০} \times ১০০ = ১০০$	৯০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৯০০}{৬০০} \times ১০০ = ১৫০$
ধান	৪০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৪০০}{৪০০} \times ১০০ = ১০০$	৬০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৬০০}{৪০০} \times ১০০ = ১৫০$

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ২০১৪ সালের মূল্যসূচক সংখ্যা ১০০। ২০১৫ সালের এ সংখ্যা হলো ১৫০। এ থেকে বোঝায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সালের দামস্তর (১৫০–২০০) = ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ৫০% হারে হ্রাস পেয়েছে।

ঘ মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষক হাবিব লাভবান হবে। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য মহাজন তুষার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিচে তাদের মনোভাব ভিন্নরকম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

দামস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উপকরণের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় কৃষিপণ্যের মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষিপণ্যের মূল্য তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে সচ্ছল কৃষকরা লাভবান হলেও দরিদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাওনাদার বা ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফিরে পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

Teachingbd24.com

পক্ষান্তরে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদাররা লাভবান হয়। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনার অর্থ পরিশোধ করতে পারে।

উদ্দীপকের হাবিব ও তুষারের মধ্যে এই একই প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে। হাবিব মুদ্রাস্ফীতির সময় তার উৎপাদিত পণ্যের দাম পূর্বের চেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করেই তুষারের ঋণ পরিশোধ করেছেন। এতে করে তুষার তার নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওনা ফেরত পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ A ও B যথাক্রমে শিল্পনির্ভর ও কৃষিনির্ভর দেশ। A দেশে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতি কেজি চাল, লবণ ও পিঁয়াজের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩০ টাকা, ২২ টাকা ও ১৫ টাকা। B দেশে ওই একই বছরে একই পণ্যের দাম ছিল যথাক্রমে ৪০ টাকা, ২৫ টাকা ও ২০ টাকা। ২০১৫ সালে A দেশে উক্ত পণ্যের দাম যথাক্রমে ৩২ টাকা, ২৩ টাকা ও ১৮ টাকা হলেও B দেশে যথাক্রমে ৫৮ টাকা, ৩২ টাকা ও ৪৮ টাকা হয়। A দেশে উভয় বছরে উক্ত দ্রব্য ভোগের পরিমাণ স্থির এবং তা যথাক্রমে ৮ একক, ৫ একক ও ৩ একক হলেও B দেশে দেশে ১ম বছরে ৬ একক, ৪ একক ও ৩ একক হলেও ২য় বছরে তা যথাক্রমে ৮ একক, ৬ একক ও ৪ একক হয়।

[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির দুটি হাতিয়ার উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে A দেশের মুদ্রস্ফীতি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে A দেশের মুদ্রস্ফীতির প্রভাব কি একই রকম হবে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির দুটি হাতিয়ার হলো ব্যাংক হার বৃদ্ধি ও ঋণপত্র বিক্রয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

তাছাড়া সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের নিকট খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে। যার ফলে জনগণের হাতে তার নগদ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী A দেশে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকা, লবণের কেজি ২২ টাকা, পিঁয়াজের কেজি ১৫ টাকা ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে 'X' দেশে উক্ত পণ্যের দাম যথাক্রমে ৩২ টাকা, ২৩ টাকা এবং ১৮ টাকা হয়। এ অবস্থায় ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি হলো-

ভোক্তার দাম সূচক (CPI) $= \frac{\sum Pn\ Qn}{\sum Po\ Qo} \times ১০০$

এখানে, Pn = চলতি বছরের মূল্য, Qn = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
Po = ভিত্তি বছরের মূল্য, Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
$\sum$ = সমষ্টি।

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর			চলতি বছর	
	পরিমাণ (Qo.)	দাম (Po) একক প্রতি	ব্যয় (PoQo)	দাম (Pn) একক প্রতি Pn	ব্যয় (PnQo)
চাল	৮	৩০	২৪০	৩২	২৬৫
লবণ	৫	২২	১১০	২৩	১১৫
পিঁয়াজ	৩	১৫	৪৫	১৮	৫৪
মোট ব্যয়			$\sum Po\ Qo = ৩৯৫$		$\sum PnQo = ৪২৫$

উপরের সারণি অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) $= \frac{৪২৫}{৩৯৫} \times ১০০$
$= ১০৭.৫৯$
$= ১০৭$

সাধারণত ভিত্তি বছরের মূল্য ১০০ ধরা হয় উপরের সারণি অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (১০৭-১০০) = ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ A দেশে মুদ্রাস্ফীতি হার হলো ৭%।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব একই রকম হবে না। কারণ-

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে B দেশে প্রতি কেজি চাল, লবণ এবং পিঁয়াজের দাম ছিল যথাক্রমে ৪০ টাকা, ২৫ টাকা এবং ২০ টাকা। কিন্তু ২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে হয় ৫৮ টাকা, ৩২ টাকা এবং ৪৮ টাকা । 'Y' দেশে প্রথম বছরে দ্রব্য ভোগের পরিমাণ ৬, ৪, ৩ হলেও দ্বিতীয় বছরে ৮, ৬, ৪ একক হয়। এক্ষেত্রে B দেশটিতে ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি হলো:

ভোক্তার দামসূচক (CPI) $= \frac{\sum Pn\ Qn}{\sum Po\ Qo} \times ১০০$ এখানে, Pn = চলতি বছরের মূল্য, Qn = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ Po = ভিত্তি বছরের মূল্য, Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ $\sum$ = সমষ্টি।

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর			চলতি বছর	
	পরিমাণ (Qo)	দাম (Po) একক প্রতি	ব্যয় (Po Qo)	দাম (Pn) একক প্রতি	ব্যয় (PnQo)
চাল	৬	৪০	২৪০	৮	৪৪৬
লবণ	৪	২৫	১০০	৬	১৯২
পিঁয়াজ	৩	২০	৬০	৪	১৯২
মোট ব্যয়			$\sum Po\ Qo = ৪০০$		$\sum PnQo = ৮৪৮$

উপরের সারণি অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) $= \frac{৮৪৮}{৪০০} \times ১০০$
$= ২১২$

সাধারণত ভিত্তি বছরের মূল্য ১০০ ধরা হয়, উপরের সারণি অনুযায়ী ভোক্তার মূল্যসূচক (২১২-১০০) = ১১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ B দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ১১২%। A দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ৭% এবং B দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ১১২%।

এক্ষেত্রে A দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার কম থাকায় এর প্রভাব পড়বে মৃদু। অপরদিকে B দেশটিতে অধিক মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি থাকায় ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায়, দেশ দুটিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব একই রকম না।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সেলিম গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। লেখাপড়াও কম জানে। সে তত্ত্ব কথাও খুব বেশি বোঝেনা। সে শুধু বোঝে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ল না কমল। পণ্য সামগ্রীর দাম যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন সেলিম ও তার আশপাশের মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে এবং তখন বুঝতে পারে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে এবং দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবাই এ পরিস্থিতির উন্নতি চায়। তাই সরকারের উচিত মুদ্রাস্ফীতি রোধে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. ভোক্তার মূল্যসূচক বলতে কী বোঝ? ২

গ. সেলিমের মতে মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষ কী ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়? ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের কী করণীয় বলে তুমি মনে কর? ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি দামের আকস্মিক বা অস্থায়ী বৃদ্ধি নয়, বরং দামস্তরের অব্যাহত ও ক্রমাগত বৃদ্ধিই হলো মুদ্রাস্ফীতি।

Teachingbd24.com

খ যে সূচকের মাধ্যমে ভোক্তার দাম বা ব্যয় দেখানো হয় তাকে ভোক্তার দামসূচক বলে।

ভোক্তা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের খুচরা দামে কত ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দামসূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মূলত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি।

গ মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায় বলে মানুষের জীবনযাত্রার মান কমে যায়।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ও দামস্তর বাড়ে। আবার মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ আগে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারত বর্তমানে তা পারে না। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে তাদের জীবন নির্বাহ করা কষ্টকর হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষ সবসময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া উচ্চাহারে দাম বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে তাদের কার্যকর চাহিদা কমে যাওয়ায় বিনিয়োগও বাড়তে পারে না। উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতির ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যায়।

উদ্দীপকের সেলিম দেখে দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে তার এবং তার আশপাশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সে বুঝতে পারে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। এ পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায়, মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে জীবনযাত্রার মানও কমে যায়।

ঘ সৃজনশীল ৩০ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

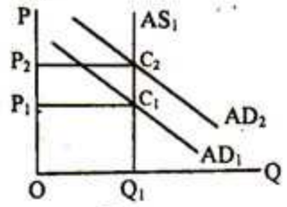

চিত্র: ১

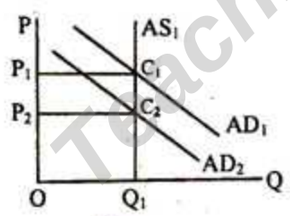

চিত্র: ২

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ২]

ক. Excise Duties কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি কষ্টকর, কিন্তু মুদ্রাসংকোচন অযৌক্তিক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র (১) এবং চিত্র (২) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি রোধে আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে আবগারি শুল্ক বা Excise Duties বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতি এমন এক অবস্থা প্রকাশ করে যখন সাধারণ দামস্তর ক্রমাগতভাবে বাড়ে। অন্যদিকে মুদ্রাসংকোচন হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দামস্তর ক্রমাগতভাবে কমে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারলে সমাজের আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এজন্য অনেকেই মৃদু বর্ধনশীল মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে মুদ্রাসংকোচনের সময় দেশে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থা চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয়, মুদ্রাস্ফীতি কষ্টকর হলেও মুদ্রাসংকোচন অযৌক্তিক।

গ উদ্দীপকে চিত্র-১ দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি এবং চিত্র-২ দ্বারা মুদ্রাসংকোচন বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

ভোগ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। চিত্র-১ এ দেখা যায়, সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে AD_2 হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায় C_1C_2 বা P_1P_2 পরিমাণ। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলে $P_1P_2C_2C_1$।

অন্যদিকে দেশে যখন দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা মুদ্রার যোগান কম হয় এবং মূল্যস্তর অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকে তখন তাকে মুদ্রাসংকোচন বলে। চিত্র-২ এ দেখা যায়, সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে হ্রাস পেয়ে AD_2 হলে দামস্তরও হ্রাস পায় P_1P_2 বা C_1C_2 পরিমাণ। এক্ষেত্রে মুদ্রাসংকোচন পরিমাণ হলো $P_2P_1C_1C_2$।

সুতরা যোগান স্থির থেকে চাহিদার বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি এবং চাহিদা হ্রাসের ফলে দামস্তর হ্রাস পেলে মুদ্রাসংকোচন ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি তথা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এই পরিস্থিতি রোধে আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক নীতি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংকহার পরিবর্তন করে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাংকহার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয় ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ব্যাংকহার হ্রাস করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে দেয় যার ফলে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এর্ব মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন ও ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে থাকে। সরকার অতিরিক্ত ব্যয় করলে মুদ্রাস্ফীতি বেশি হয় আর ব্যয় না করলে বা কম করলে মুদ্রাসংকোচন হয়। এজন্য সরকার সরকারি ব্যায়ের পরিমাণ পরিবর্তন, কর হারের পরিমাণ পরিবর্তন সরকারি ঋণের পরিমাণের পরিবর্তন এবং সঞ্চয়ের হারের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

দেশের সার্বিক আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারকে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এজন সরকার এসব আর্থিকনীতি ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মি. 'X' সাহেব 'ক' দেশে বসবাস করেন। তার দেশের ২০১২ সালের বিভিন্ন ভোগ দ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	২০১২		২০১৮
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	দাম (টাকা)
চাল	৩০	৩৫	৩৮
গম	২৮	১০	৩২
চিনি	৩৫	৫	৪৩
বিবিধ	২০	১২	২৪

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের হার, নগর রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং পরোক্ষ করে হার কমিয়ে দেয়। *[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

Teachingbd24.com

ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সময়ে করদাতা লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোক 'ক' দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ দামস্তর বৃদ্ধির ফলে করদাতারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে কর পরিশোধ করতে পারে বলে করদাতা লাভবান হয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ অর্থের আকারে কর প্রদান করায় কর দাতাদের প্রকৃত ভার কম হয়।

গ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 'ক' দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করা হলো-

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (২০১২)			চলতি বছর (২০১৮)	
	পরিমাণ (Qo)	দাম (Po)	ব্যয় (Po Qo)	দাম (Pn)	ব্যয় (PnQo)
চাল	৩৫	৩০	১০৫০	৩৮	১৩৩০
গম	১০	২৮	২৮০	৩২	৩২০
চিনি	৫	৩৫	১৭৫	৪৩	২১৫
বিবিধ	১২	২০	২৪০	২৪	২৮৮
মোট ব্যয়	$\sum Po\,Qo = ১৭৪৫$			$\sum PnQo = ২১৫৩$	

ভিত্তি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$(CPI) = \frac{PnQo}{PoQo} \times ১০০ = \frac{১৭৪৫}{১৭৪৫} \times ১০০ = ১০০$$

চলতি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum PoQo}{\sum PoQo} \times ১০০$$

$$= \frac{২১৫৩}{১৭৪৫} \times ১০০ = ১২৩.৩৮$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (১২৩.৩৮ − ১০০) = ২৩.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২৩.৩৮%।

ঘ মি. 'X' সাহেবের 'ক' দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে পারে।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কর্তৃক অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অন্তর্গত মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন সরাসরি হ্রাস করতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নহদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। তাছাড়া ঋণের রেশনিং, ঋণের বরাদ্দকরণ, জামিনের প্রান্তিক হার পরিবর্তন, ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সরাসরি আদেশ প্রদান, নৈতিক চাপ, প্ররোচনা ইত্যাদি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুদ্রাস্ফীতি সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত ও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ জন্য কোনো অবস্থাতেই এটি কাম্য নয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে, ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাজারে পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা সত্ত্বে নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এ জন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সময় করদাতার ওপর কী প্রভাব পড়ে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। কারণ তাদের আয়ের সীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট আয়ের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়লে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান এবং ভোগব্যয় কমে যায়। এছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি অবস্থায় দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭

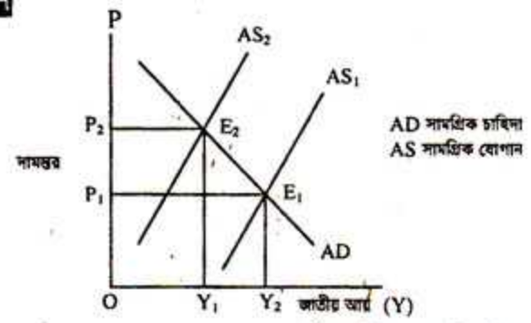

[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রাস্ফীতির হার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়"— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দ্রব্যমূল্য কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার শতকরা হার পরিমাপকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৮ 'ক' দেশে ২০০৫ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১২৫ এবং ২০০৬ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৮০ হয়। দেশটির সরকার এ সমস্যা মোকাবিলায় অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীর জন্য সুফল বয়ে আনে।'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' দেশে ২০০৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল? ৩

ঘ. 'ক' দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের খরচ বা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে খরচ বা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগকারীরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পণ্যের দাম বেশি হয়। তাই এ সময় কৃষকশ্রেণি বিশেষ করে ধনী কৃষক লাভবান হয়। মজুতদার, কালোবাজারি ও ফটকা কারবারি মুদ্রাস্ফীতির সময় পণ্য মজুত করে এগুলোর দাম বৃদ্ধি করে এবং মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

গ নিচে উদ্দীপকের ২০০৫ সাল ও ২০০৬ সালের ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো—

দ্রব্যসেবার যোগান স্থির অবস্থায়, সাধারণ মূল্যস্তর বা দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। অপরদিকে একটি সময়কাল থেকে অন্য একটি সময়কালে মূল্যসূচকের শতাংশিক বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উদ্দীপক অনুযায়ী 'ক' দেশে ২০০৫ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১২৫ এবং ২০০৬ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে হয় ১৮০। এ অবস্থায় ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে ২০০৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার নিচের সূত্রটির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতির হার $= \frac{P_{02}-P_{01}}{P_{01}} \times ১০০\%$

এখানে, P_{02} = চলতি বছরের মূল্যসূচক এবং P_{01} = পূর্ববর্তী বছরের মূল্যসূচক।

সুতরাং নির্ণেয় মুদ্রাস্ফীতির হার $= \frac{১৮০ - ১২৫}{১২৫} \times ১০০ = ৪৪\%$।

ঘ 'ক' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চর্তুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি।

অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। কেননা 'X' দেশের সরকারকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়াতে হয়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ব্যাংক হার বৃদ্ধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি: দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি না করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই 'X' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন কর আরোপ ও বিদ্যমান করগুলোর হার বৃদ্ধি করে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমাতে পারে। তখন সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দামস্তর কমবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম উপায় হলো কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সব খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদন বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে এবং তা দ্রব্য ও সেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করবে। কলাকৌশলের উন্নয়ন, অধিক প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদের বরাদ্দকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

সুতরাং, 'X' দেশের সরকার কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপরিউক্ত ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির ওপর।

প্রশ্ন ▶ ৩৯

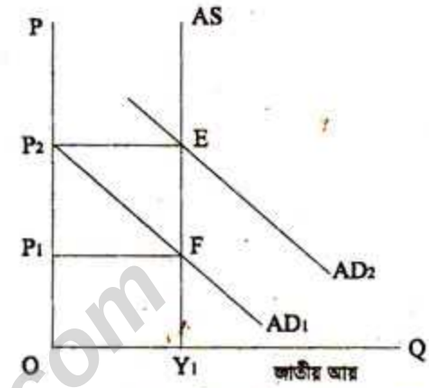

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. ব্যাংক হার কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে? ২

গ. চিত্রটি কী নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য ন্যূনতম সুদের হার হলো ব্যাংক ঋণ।

খ মুদ্রাস্ফীতি নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে ক্রমেই ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণিগত বিরোধ ও অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরি বৃদ্ধির দাবি ওঠে। এতে করে শ্রমিক মালিক বিরোধ প্রকট হয় এবং সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতি সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধারণা নির্দেশ করছে।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকালে ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। দেশের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উদ্দীপকের চিত্রে সামগ্রিক যোগান বা AS রেখা স্থির থেকে চাহিদা রেখা AD থেকে AD_1 হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে P_1 থেকে P_2 হওয়াতে $P_1EF_1P_2$ পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। একটি অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, সুদের হার হ্রাস ইত্যাদি কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

Teachingbd24.com

ঘ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে AD_1 রেখা ডানদিকে উপরে স্থানান্তরিত হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। সাধারণত ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সুদের হার হ্রাস পাওয়ার কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে।

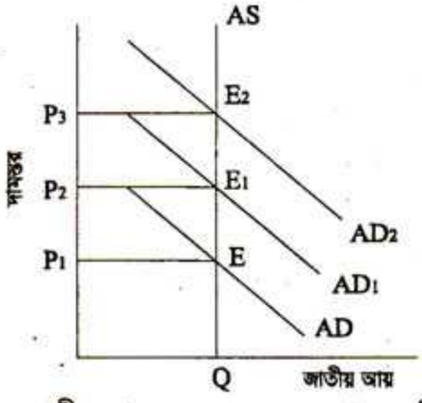

চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর নির্দেশ হয়েছে। প্রাথমিক সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা E বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেকানে দামস্তর P_1। যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 হওয়াতে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল P_1 এবং মুদ্রাস্ফীতি পরিমাণ ছিল $P_1P_2E_1E_2$এখন, সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা স্থির রেখে চাহিদা যদি আরও বৃদ্ধি পায় এবং নতুন চাহিদা রেখা AD_2 হলে দামস্তর ও P_2 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_3 হবে। দামস্তর বৃদ্ধি কারণে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাবে এবং $P_2EE_2P_3$ পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা রেখা AD_1 ডানদিকে উপরে স্থানান্তরিত হবে এবং এর নতুন অবস্থান হবে AD_2। চাহিদা রেখার এই স্থানান্তর দরুন দামস্তর পূর্বের তুলনা P_2P_3 পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই দামস্তর বৃদ্ধি হেতু মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির পরিমাণ $P_2E_1E_2P_3$ হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মি. ফারুক একটি বেসরকারি অফিসে নির্ধারিত বেতনে চাকরি করেন। তিনি গত বছর যে মাছ ও সবজি প্রতি কেজি যথাক্রমে ২০০ এবং ১০ টাকায় কিনেছিলেন এ বছর তা যথাক্রমে ৩০০ এবং ২০ টাকা দরে ক্রয় করতে হচ্ছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. CPI কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতারা লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হন- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার দামসূচক নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ উল্লেখ করে এর সমাধানে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CPI-Consumer Price Index হলো ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্য বা দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতি।

খ মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঋণদাতার ফেরত প্রাপ্ত অর্থের মূল্য আগের চেয়ে কম হয় মূলত উক্ত কারণেই ঋণদাতারা মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে মি. ফারুকের দামসূচক নির্ণয় করা যায়।

উদ্দীপকের মি. ফারুক একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার বেতন পূর্ব নির্ধারিত। তিনি গত বছর যে মাছ ও সবজি কেজি প্রতি যথাক্রমে ২০০ ও ১০ টাকা দরে কিনতে পারতেন, এ বছর তা যথাক্রমে ৩০০ ও ২০ টাকা দরে ক্রয় করতে হচ্ছে। উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে একটি সূচি তৈরি করা হলো-

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (গত বছর)			চলতি বছর (এ বছর)	
	পরিমাণ (Q)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
মাছ	১ কেজি	২০০	২০০	৩০০	৩০০
সবজি	১ কেজি	১০	১০	২০	২০
মোট ব্যয়	$\sum P_0Q_0 = ২১০$			$\sum P_nQ_0 = ৩২০$	

সুতরাং উপরের সূচির আলোকে গত বছরের তুলনায় এ বছরে ভোক্তার দামসূচক

$$(CPI) = \frac{P_nQ_0}{P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{৩২০}{২১০} \times ১০০$$

$$= ১৫২.৩৮\%।$$

এক্ষেত্রে দামস্তর গত বছরের তুলনায় এ বছর (১৫২.৩৮ - ১০০) বা ৫২.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৫২.৩৮%।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ উল্লেখপূর্বক এর সমাধানে আমার মতামত ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে দেশের অতীতের তুলনায় দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন অনেক বাড়লেও তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে অতিরিক্ত চাহিদা দামস্তর বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছে।

উদ্দীপকের মি. ফারুক একটি বেসরকারি অফিসে নির্ধারিত বেতনে চাকরি করেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই সরকার বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ও কলকারখানার কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন ভাতা ও মজুরি দফায় দফায় বাড়িয়েছে। কিন্তু প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে আনুপাতিকভাবে দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ফলে সবকিছুর দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে তথা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার জন্য নানা উপায় গ্রহণ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন তার আর্থিক নীতি হাতিয়ারসমূহ প্রয়োগ করতে পারে তেমনি সরকারও রাজস্বনীতির হাতিয়ারগুলো প্রয়োগ করতে পারে তেমনি সরকার ও রাজস্বনীতির হাতিয়ারগুলো প্রয়োগ করতে পারে। আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ রিজার্ভের অনুপাতের পরিবর্তন, ঋণের রেশনিং, বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা সংশোধিত করা যায়। এমতাবস্থায় বেসরকারি ভোগ ও বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস হেতু সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে মূল্যস্তর ও হ্রাস পায়। অপরদিকে সরকারি রাজস্বনীতির মাধ্যমে, যেমন- সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণপত্র বিক্রয়, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস, সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সাময়িক বন্ধ বা হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, আমদানি বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উপরিউক্ত মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির মতো ভয়াবহ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১

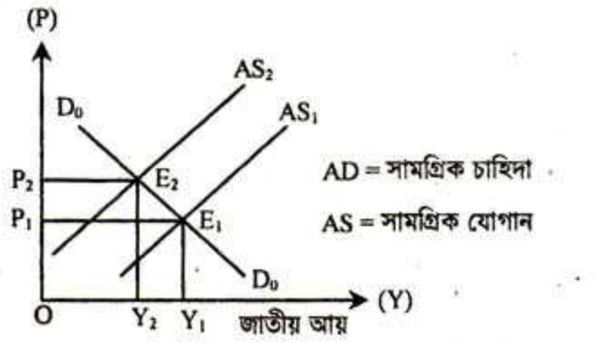

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উৎপাদন খরচ বাড়লে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুদ্ধ, বন্যা, মহামারি, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকার যদি মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করলে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থাৎ, মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হলো ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি।

খ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস দ্রব্যমূল্য হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণত উৎপাদনের উপকরণের ব্যয় বাড়লে বাজার দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এখন যদি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, তাহলে দ্রব্যের দাম কম হবে। ফলশ্রুতিতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই বলা যায়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উৎপাদন ব্যয় বাড়লে দেশে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

উৎপাদন ক্ষেত্রে নানা কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। যেমন- শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের দরকষাকষি ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা না বাড়লেও মজুরি বাড়ে। এজন্য উৎপাদন খরচ বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এছাড়া, সরকার ব্যাপক হারে পণ্যসামগ্রীর ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে মূল্যস্তর বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস দরুন দেশে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। আবার, শ্রমিকসংঘ মালিক পক্ষের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে ন্যায়সঙ্গত নয় এমন ধরনের মজুরি বাড়াতে পারে। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পেয়েও মজুরি বাড়লে খরচ তাড়িত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

অর্থনীতির দুর্বল ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা চাহিদা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন সমান হারে বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য তাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। তাই পরিশেষে বলা যায়, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে খাদ্যের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু খাদ্যের দাম বেড়েই চলেছে। এতে সাধারণ মানুষ ও খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. Hyper Inflation কী? ১

খ. কৃষক শ্রেণির ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাস্ফীতির পরিচয় দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তোমার সুপারিশ কী? ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যস্তর যদি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে Hyper Inflation বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় ধনী কৃষকরা লাভবান হলেও প্রান্তিক, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির সময় বাজারে বেশি দামে বিক্রয় করার মতো কৃষিজাত দ্রব্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিকট তেমন উদ্বৃত্ত থাকে না। এর ফলে এ সকল কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ধনী কৃষক শ্রেণি তাদের উদ্বৃত্ত দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে।

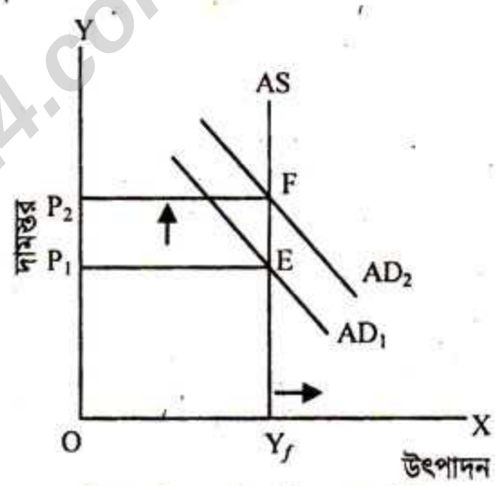

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভোগ বৃদ্ধিও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দেশে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যা চিত্রে AD_1 থেকে AD_2 হয়। ফলশ্রুতিতে দামস্তর P_1 থেকে বেড়ে P_2 হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত চাহিদার ব্যয় মেটানোর জন্য অর্থের যোগান বৃদ্ধি। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস দরুন উৎপাদন কম হচ্ছে। অথচ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও উন্নত বীজ ও সার ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ উৎপাদন বাড়লে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে দাম হ্রাস পাবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো যায়

Teachingbd24.com

এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি না করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই বাংলাদেশ সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন কর আরোপ ও বিদ্যমান করগুলোর হার বৃদ্ধি করে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমাতে পারে। তখন সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দামস্তর কমবে। তাই বলা যায়, উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ▶৪৩ সালাম সাহেব ২০১৭ সালে প্রতি কেজি চাল, আটা ও আলু যথাক্রমে ৪৫, ৩২ ও ২৫ টাকায় ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু ঘাটতি বাজেট ব্যয় নির্বাহে ও অতিরিক্ত অর্থের যোগান বৃদ্ধির কারণে ২০১৮ সালে একই দ্রব্যগুলো তিনি যথাক্রমে ৪৮, ৩৫ ও ২৮ টাকায় ক্রয় করতে বাধ্য হন। *[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল | প্রশ্ন নং ১]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. CPI পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট বিষয়টি কারণগুলো কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর এবং তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ নিচে উদ্দীপকের ২০১৭ সাল ও ২০১৮ সালের দামস্তরের তথ্যের আলোকে ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো:

ভোগ্যদ্রব্যের নাম (কেজি)	ভিত্তি বছর (২০১৭)			চলতি বছর (২০১৮)	
	পরিমাণ (Q_0)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
চাল	১	৪৫	৪৫	৪৮	৪৮
আটা	১	৩২	৩২	৩৫	৩৫
আলু	১	২৫	২৫	২৮	২৮
মোট ব্যয়	$\sum P_0Q_0 = ১০২$			$\sum P_nQ_0 = ১১১$	

সুতরাং, চলতি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_nQ_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০; = \frac{১১১}{১০২} \times ১০০ = ১০৮.৮২$$

তাহলে, ভিত্তি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_0Q_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০; = \frac{১০২}{১০২} \times ১০০ = ১০০$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (১০৮.৮২ − ১০০) = ৮.৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৮.৮২%।

ঘ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিচে এর কারণগুলো আলোচনা করা হলো–

১. উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়ায় দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে।

২. বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন তেমন না বাড়ায় এবং নির্বাহকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল দ্রুত প্রাপ্ত না হওয়ায় দামস্তর বেড়ে চলেছে।

৩. উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়টি দেশের মূল্যস্ফীতির একটি কারণ।

৪. উন্নয়নশীল দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে উন্নয়নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

প্রশ্ন ▶৪৪

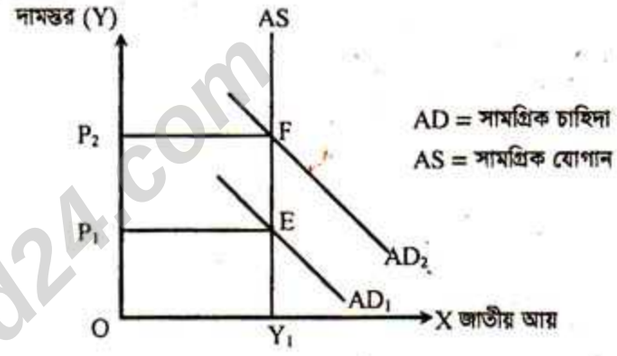

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৮]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে, তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য।

দামস্তর ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তা সহনীয় পর্যায়ে থাকলে তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে, যা সাধারণত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উজ্জীবিত করে।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ।

গ উল্লিখিত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ab বা ১০ একক।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, X-অক্ষ বরাবর দ্রব্যের পরিমাণ ও Y অক্ষ বরাবর দাম বা দামস্তর দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক চাহিদা (AD_1) এবং যোগান (AS) রেখা a বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেখানে দামস্তর ৮০ একক। পরবর্তীতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে AD_2 ও AS রেখা b বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে দাম

Teachingbd24.com

নির্ধারিত হয় ৯০ একক। এক্ষেত্রে দামস্তর হলো (৯০-৮০) বা ১০ একক, যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো ১০ একক।

ঘ প্রদত্ত চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি: সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সে অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থের যোগান বৃদ্ধি: অর্থের যোগান বাড়লে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি: দেশে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়।

চতুর্থত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দেশের দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলো হলো ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদার ঋণ নীতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বৈঠকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ সম্পর্কিত এক সভায় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, "দেশে ব্যাংক ঋণ যে অনুপাতে বেড়েছে ওই অনুপাতে দ্রব্য উৎপাদন বাড়েনি। ভোগ ও বিনিময় ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি এবং ঘাটতি ব্যয়ের কারণে মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।" তিনি সভায় মুদ্রাস্ফীতির ধরন ও বাস্তবচিত্র তুলে ধরায় চেষ্টা করেন। এ বাস্তবচিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি সভা কক্ষের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে কিছু দ্রব্যের দামের সরলসূচক সংখ্যা প্রকাশ করেন। এগুলো হলো– চাল, গম, ডাল, তৈল ও চিনি। *[স্কলারস হোম, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৮; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. CPI-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মুদ্রাস্ফীতির যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের উক্তিতে দেয়া যোগানের অপর্যাপ্ততার কারণে যে মুদ্রাস্ফীতির দেখা দেয় তার বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CPI-এর পূর্ণরূপ হলো— Consumar Price Index

খ মুদ্রাস্ফীতি প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে ক্রমেই ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণিগত বিরোধ ও অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।

জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরি বৃদ্ধির দাবি ওঠে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রকট হয় এবং সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতি সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বর্ধিত চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো উল্লেখ করেছেন।

কোনো দেশে বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় আর্থিক আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বেশি পরিমাণ অর্থ কম পরিমাণ দ্রব্যাধির পেছনে ধাবিত হয় বলে দামস্তর বাড়ে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব মূলত দ্রব্যসামগ্রীর বর্ধিত চাহিদা ও অবর্ধিত যোগান মুদ্রাস্ফীতির প্রধান দুটি কারণ হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মুদ্রাস্ফীতির জন্য যে কারণগুলোর উল্লেখ করেছেন তা মূলত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন— অর্থ ও ঋণের যোগান বৃদ্ধি; সরকার কর্তৃক চালুকৃত অর্থ, ব্যাংকে ঋণের প্রসার এবং অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে এবং সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ভোগ ও বিনিময় ব্যয় বৃদ্ধি; ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভোগ্য ও বিনিময়সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্বল্পকালে সে তুলনায় উৎপাদন বাড়ে না। ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি; সমাজে মোট ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ে। অতীত সঞ্চয়ের ব্যবহার, বর্তমান বঞ্চয় হ্রাস, ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, কর হ্রাস ইত্যাদি কারণে সমাজের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়তে পারে।

ঘাটতি ব্যয়; সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে দেশের ভেতর অথবা বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ, অতিরিক্ত মুদ্রা চালু ইত্যাদি পদ্ধতি দ্বারা ঘাটতি ব্যয় পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ ও ঋণের যোগান বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। কিন্তু স্বল্পকালে সে তুলনায় উৎপাদন বাড়ে না বলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দেয়া উক্তিতে যোগানের অপর্যাপ্ততার জন্য যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে একটি চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বিশ্লেষণ করা হলো—

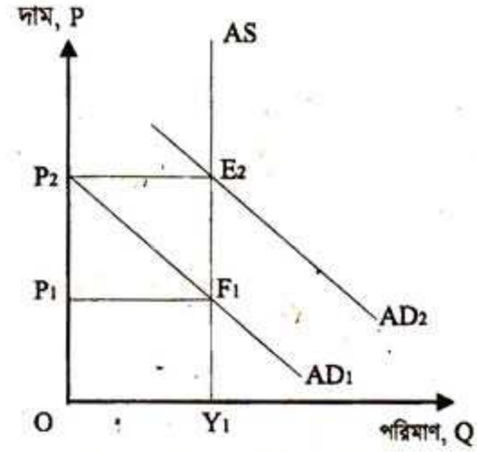

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

উপরের চিত্রে, ভূমি-অক্ষে যোগান a এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর, p নির্দেশিত হয়েছে। সামগ্রিক যোগান রেখা As স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2 হলে অর্থাৎ চাহিদা বাড়লে দামও P_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_2 হবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হবে $P_1E_1E_2P_2$, যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

অর্থাৎ, সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো সামগ্রিক চাহিদা এবং যোগানের অপর্যাপ্ততা। সমাজে সাধারণত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক যোগান স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদা বাড়লে দামস্তর বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪৬ উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাজারে পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়। *[ভা. আবুল রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. রপ্তানি বৃদ্ধি কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

কোনো দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস বা আয় বৃদ্ধি ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

গ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৭ উদ্দীপকটি লক্ষ কর:

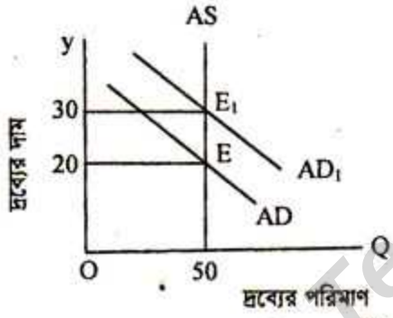

[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ কেন? ২

গ. চিত্র অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণ হলো— শ্রমিক সংঘসমূহের দাবির প্রেক্ষিতে মজুরি এতটা বৃদ্ধি হয়, যা তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া, একচেটিয়া কারবারিরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তাদের দ্রব্যের যোগান লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে দিলে এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যাপকভাবে পরোক্ষ কর আরোপের দরুন দামস্তর বাড়লে জনসাধারণ বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হয়; তখন স্থির আয়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ বলে গণ্য হয়।

গ উল্লিখিত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ab বা ১০ একক।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, X-অক্ষ বরাবর দ্রব্যের পরিমাণ ও Y অক্ষ বরাবর দাম বা দামস্তর দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক চাহিদা (AD_1) এবং যোগান (AS) রেখা a বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেখানে দামস্তর ৮০ একক। পরবর্তীতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে AD_2 ও AS রেখা b বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে দাম নির্ধারিত হয় ৯০ একক। এক্ষেত্রে দামস্তর হলো (৯০-৮০) বা ১০ একক। যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো ১০ একক।

ঘ প্রদত্ত চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

কোনো দেশে বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় আর্থিক আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বেশি পরিমাণ অর্থ কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয় বলে দামস্তর বাড়ে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব মূলত যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি; সরাসরি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সে অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। দ্বিতীয়, অর্থের যোগান বৃদ্ধি; সরকার কর্তৃক চালুকৃত অর্থ, ব্যাংকঋণের প্রসার এবং অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে এবং সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তৃতীয়, ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি; অতীত সঞ্চয়ের ব্যবহার, বর্তমান সঞ্চয় হ্রাস, ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, কর হ্রাস ইত্যাদি কারণে সমাজে ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জনগণের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। এই অতিরিক্ত চাহিদা দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। চতুর্থত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি; জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দেশে দ্রব্যের দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। পঞ্চমত, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি; ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভোগ্য ও বিনিয়োগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্বল্পকালে সে তুলনায় উৎপাদন বাড়ে না। ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

উপরের কারণগুলো ছাড়াও চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলো হলো ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি ব্যয় বৃদ্ধি, উদার ঋণ ইত্যাদি। মূলত উল্লিখিত কারণগুলোই চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে থাকে।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-৭: মুদ্রাস্ফীতি

২৩১. সাধারণত দেশে যখন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়, তখন কোনটি বাড়ে? (জ্ঞান)
ক দ্রব্যের উৎপাদন খ সেবার উৎপাদন
গ কার্যকর চাহিদা ঘ সমৃদ্ধ অর্থনীতি **গ**

২৩২. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্য বা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কী হয়? (অনুধাবন)
ক ক্রমশ বৃদ্ধি পায় খ ক্রমশ হ্রাস পায়
গ অপরিবর্তিত থাকে ঘ শূন্যে নেমে আসে **খ**

২৩৩. 'মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি অবস্থা যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায়'– এটি কার উক্তি? (জ্ঞান)
ক ক্রাউথার খ কুলবর্ন
গ পিগু ঘ লর্ড কিনস **ক**

২৩৪. সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়লে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতিতে দেখা যায়? (অনুধাবন)
ক মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত খ ঋণ বৃদ্ধিজনিত
গ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ঘ উৎপাদন ব্যয়জনিত **ক**

২৩৫. উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধির ফলে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়? (জ্ঞান)
ক ব্যয় প্ররোচিত খ আয় প্ররোচিত
গ চাহিদা প্ররোচিত ঘ যোগান প্ররোচিত **ক**

২৩৬. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (Low inflation) এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)
ক মুদ্রাস্ফীতি ধীরগতিসম্পন্ন
খ মুদ্রাস্ফীতি দ্রুতগতিসম্পন্ন
গ দ্রব্যমূল্য অতি দ্রুত বাড়ে
ঘ আয় দ্রুত বাড়ে **ক**

২৩৭. উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতিতে দ্রব্যমূল্য কীভাবে বাড়ে? (অনুধাবন)
ক ধীরে ধীরে খ মৃদু গতিতে
গ সবচেয়ে দ্রুত গতিতে
ঘ খুব দ্রুত গতিতে **ঘ**

২৩৮. কার মতে, দমিত মুদ্রাস্ফীতি উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে খারাপ? (জ্ঞান)
ক লর্ড কিনস খ মিল্টন ফ্রিডম্যান
গ ক্রাউথার ঘ পিগু **খ**

২৩৯. ভোক্তার মূল্যসূচক পরিমাপে কোন দ্রব্য বিবেচনা করা হয়? (জ্ঞান)
ক সকল দ্রব্য খ সকল দ্রব্য ও সেবা
গ আমদানিকৃত দ্রব্য ঘ নির্দিষ্ট দ্রব্যগুচ্ছ **ঘ**

২৪০. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে CPI এর পূর্ণ শব্দ কী?
ক Consumer's Price Index
খ Consmption Price Index
গ Consmption Production Index
ঘ Consumer Profit Index **ক**

২৪১. দামস্তর বৃদ্ধি পেলে কোনটি ঘটে? (জ্ঞান)
ক অর্থের মূল্য কমে খ অর্থের মূল্য বাড়ে
গ যোগান বাড়ে ঘ অর্থ প্রবাহ কমে **ক**

২৪২. ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক উৎপাদকের মূল্যসূচক
খ অব্যক্ত অবমূল্যায়ন সূচক
গ ভোক্তার দাম সূচক
ঘ মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক **গ**

২৪৩. মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা কোনটি? (জ্ঞান)
ক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ খ টাকা নিয়ন্ত্রণ
গ মুদ্রা সংকোচন ঘ আয় সংকোচন **গ**

২৪৪. 'অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও ব্যয়ের হ্রাসকে মুদ্রা সংকোচন বলে'- কার উক্তি? (জ্ঞান)
ক ক্রাউথার খ হট্রে
গ পিগু ঘ স্যামুয়েলসন **ঘ**

২৪৫. করজনিত মুদ্রাস্ফীতি কীসের ওপর নির্ভর করে? (অনুধাবন)
ক কর সঞ্চালন হার খ আয় বৃদ্ধি
গ করের প্রকারভেদ ঘ ভর্তুকির **ক**

২৪৬. ঘাটতি ব্যয় পূরণের জন্য সরকার সাধারণত কী করে থাকে? (জ্ঞান)
ক মুদ্রা প্রত্যাহার খ শুল্ক হ্রাস
গ মুদ্রা সৃষ্টি ঘ মুদ্রা সংকোচন **গ**

২৪৭. কর হ্রাস করলে জনগণের আয়ে কী প্রভাব দেখা যায়? (অনুধাবন)
ক ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস খ মুদ্রা সংকোচন
গ ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি
ঘ ব্যয় হ্রাস **গ**

২৪৮. সমাজে ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধির কারণ নয় কোনটি? (জ্ঞান)
ক অতীত সঞ্চয়ের ব্যবহার
খ মজুরি বৃদ্ধি
গ কর বৃদ্ধি ঘ ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি **গ**

২৪৯. মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কোনটি?
ক অর্থের যোগান হ্রাস খ অর্থের যোগান বৃদ্ধি
গ সরকারি ব্যয় হ্রাস
ঘ ব্যাংক ঋণ সংকোচন **খ**

২৫০. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণগ্রহীতার ওপর কী প্রভাব পড়ে? (জ্ঞান)
ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় খ প্রভাব নেই
গ লাভবান হয় ঘ নেতিবাচক প্রভাব **গ**

২৫১. মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক ২ ভাগে খ ৪ ভাগে
গ ৩ ভাগে ঘ ৫ ভাগে **খ**

২৫২. মুদ্রাস্ফীতি খুচরা বিক্রেতার আয়ে কী পরিবর্তন আনে? (জ্ঞান)
ক আয় বাড়ে খ কমে যায়
গ অপরিবর্তিত থাকে ঘ অর্ধেক হয় **গ**

২৫৩. বাংলাদেশে কোন ধরনের নিয়োগ অবস্থা বিরাজমান? (অনুধাবন)
ক পূর্ণ নিয়োগ খ সম্পূর্ণ নিয়োগ
গ অপূর্ণ নিয়োগ ঘ কোনোটিই নয় **গ**

২৫৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সুদের হার খ মুদ্রাস্ফীতি
গ ব্যাংক হার ঘ কলমানি **গ**

Teachingbd.com

২৫৫. জনগণের ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ কমে কখন? (জ্ঞান)
ক করের হার হ্রাস হলে
খ করের হার বাড়ালে
গ অর্থের যোগান বাড়ালে
ঘ কর রহিতকরণে
খ

২৫৬. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ কোনটি? (জ্ঞান)
ক খাদ্য ঘাটতি খ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
গ আমদানি বৃদ্ধি ঘ প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধি
ক

২৫৭. একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে কমে যায়— (অনুধাবন)
i. অর্থের ক্রয়ক্ষমতা
ii. অর্থের তুলনায় দ্রব্যের যোগান
iii. মানুষের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

২৫৮. চাহিদা প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ হলো— (অনুধাবন)
i. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
ii. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি
iii. মুদ্রা সংকোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

২৫৯. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. দামস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকে
ii. অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে
iii. অধিক অর্থ দিয়ে স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

২৬০. মুদ্রা সংকোচনের ফলে— (অনুধাবন)
i. উৎপাদন হ্রাস পায়
ii. আয় হ্রাস পায়
iii. বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

২৬১. কারণভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি অন্তর্ভুক্ত হলো— (অনুধাবন)
i. ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি
ii. পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি
iii. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

২৬২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক— (অনুধাবন)
i. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি
ii. উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি
iii. সহনীয় মুদ্রাস্ফীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

২৬৩. মুদ্রাস্ফীতিতে বিনিয়োগকারীরা যেসব খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়, সেগুলো হলো— (অনুধাবন)
i. জুয়েলারি ব্যবসা ii. রিয়েল এস্টেট
iii. অনুৎপাদনশীল খাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৪ ও ২৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. রফিক জনতা ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, দেশে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদান করছে। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় দেশে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিয়েছে।

২৬৪. উদ্দীপকটিতে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ঋণজনিত খ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
গ অর্থজনিত ঘ মজুরি বৃদ্ধিজনিত
ক

২৬৫. দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থের মজুদ বৃদ্ধি পায়
ii. ঋণদান বৃদ্ধি পায়
iii. অর্থের মজুদ হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৬ ও ২৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আজাদ একটি পত্রিকায় দেখলেন যে, চলতি বাজার মূল্যে বাংলাদেশে ২০০০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। মানুষের আয় উক্ত সময়ে ২২০০ কোটি টাকা। সরকার কর বাবদ ২০০ কোটি টাকা আদায় করল।

২৬৬. মি. আজাদ কোন পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করতে পারবেন? (প্রয়োগ)
ক মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক
খ অব্যক্ত অবমূল্যায়ন সূচক
গ ল্যাসপিয়ারের সূত্র ঘ প্যাশের সূত্র
ক

২৬৭. মি. আজাদ উক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক শূন্য
ii. মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক ২০০ কোটি
iii. মোট ব্যয়যোগ্য আয় ২০০০ কোটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৮ ও ২৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাসুম একটি সরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করেন। সেখানে একটি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এ বছর বাজেটে মাসুমের বেতন বেড়েছে ১,০০০ টাকা। বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার তিনি খুব খুশি।

২৬৮. মাসুমের বেতন বৃদ্ধিতে অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব পড়বে? (প্রয়োগ)
ক উৎপাদন বাড়বে খ মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে
গ অর্থের যোগান বাড়বে
ঘ কোনো প্রভাব পড়বে না
গ

২৬৯. মাসুমের বেতন বৃদ্ধির কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মাসুমের সততা
ii. ট্রেডইউনিয়নের প্রভাব
iii. সরকারি নিয়ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii
খ

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৮: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

প্রশ্ন ▶১ আবহমানকাল ধরেই বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ। প্রতি বছর দেশটি রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি করে থাকে। অতি সম্প্রতি দেশটি প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি বেশ কিছু অপ্রচলিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। তাছাড়া রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শুল্ক রেয়াত, জ্বালানির মূল্য হ্রাস, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তম— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবা প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাধারণত, উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল হলে দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, বৈদেশিক দাতা সংস্থা বা দেশগুলো তাদের ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন কঠিন শর্তারোপ করে। এর ফলে পরনির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। তাই স্পষ্টতই বলা যায়, বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বাণিজ্যই অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হলো—

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানির মূল্য অপেক্ষা রপ্তানি মূল্য কম হলে লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা দেয়। আর এই ঘাটতি দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যেমন— প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি উদারীকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে প্রতি বছর রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বা লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এই ঘাটতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন— উৎপাদন বৃদ্ধি, শুল্ক রেয়াত, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি। কাজেই বলা যায়, উপরের পদক্ষেপসমূহ উক্ত ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

ঘ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মূল্যায়ন করা হলো—

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ এবং তা দ্রুত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের রপ্তানি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

সরকার রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শুল্ক অব্যাহতি দেয়। এছাড়া আবগারি শুল্কও প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদান, রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ, স্কিম প্রবর্তন, এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সে বিশেষ সুবিধা প্রদান, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞান, উন্নত কলাকৌশল ইত্যাদির উপরও যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

তাছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ স্কিম' প্রবর্তন করে। এ স্কিমের আওতায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে রপ্তানিকারকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ স্কিমটি চালু হওয়ায় ঋণের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলো পর্যাপ্ত।

প্রশ্ন ▶২ মি. আরিফ বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি তথ্য জানার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইট দেখেন। তিনি সেখানে দেখতে পারেন যে, বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে সার্ভে করাচ্ছে। রপ্তানিকারকদের আয়কর সুবিধা, রপ্তানি ঋণ ও কর অবকাশ সুবিধা দিচ্ছে। এর ফলে পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, জুতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। তিনি আরও জানতে পারেন যে, প্রচলিত পণ্যের চেয়ে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১

খ. উদ্বৃত্ত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে কীভাবে ভূমিকা রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

খ উদ্বৃত্ত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

কোনো দেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা ইত্যাদির জন্য কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। ফলে যে দেশটি যে দ্রব্যটি বেশি উৎপাদন করে সেই দ্রব্যটির উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করে বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য অন্য কোনো দেশ হতে আমদানি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে সস্তা শ্রমের প্রাচুর্যতা থাকায় গার্মেন্টিস শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের তৈরি পোশাক নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এর বিনিময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল শিল্প প্রধান দেশ থেকে আমদানি করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্বৃত্ত পণ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

https://teachingbd24.com

গ বাংলাদেশে যেসব পণ্যসামগ্রী দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে, সেগুলোকে প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলে। অন্যদিকে, কিছু দিন পূর্বেও যেসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হয়, তাকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা তৈরি করা হলো—

বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা:

প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ	অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
১. পাট	১. তৈরি ও হোসিয়ারি পণ্য
২. পাটজাত দ্রব্য	২. হিমায়িত খাদ্য
৩. চা	৩. শাকসবজি
৪. চামড়া	৪. ফলমূল
	৫. জুতা

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

১. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাবলি দ্রুত সমাধান এবং রপ্তানি সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানিসংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বেসরকারি খাতকে রপ্তানি ক্ষেত্রে অধিকতর সুসংগঠিত করার মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেও কাজ করছে।

২. দেশের রপ্তানি উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার দেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে একটি স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশনে উন্নীত করে।

৩. বিদেশে আমাদের দ্রব্যের আরও অধিক এবং উত্তম বাজার খুঁজে বের করার জন্য রপ্তানি উন্নয়নর ব্যুরো ইতোমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর সার্ভে সম্পন্ন করেছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য ছাড়াও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের আয়ের ওপর সরকার আয়কর রিবেটের সুবিধা প্রদান করছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার রপ্তানিকারকদের স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য ঋণের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রপ্তানি ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও রপ্তানিপণ্য বলতে হাতেগোনা কয়েকটি ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশে রপ্তানিক্ষেত্রে কিছু নতুন পণ্য যুক্ত হয়। তৈরি পোশাক এমনই একটি পণ্য। কাঁচামাল প্রাপ্তি, শ্রমিকের মজুরি, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদি সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটির ভূমিকা বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে উল্লেখযোগ্য। যদি আমরা আইটেম সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রম অসন্তোষ দূর এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে পারি, তবে আমাদের তৈরি পোশাক বিশ্ব বাজারে ১ম স্থান দখল করবে। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. 'বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য ভালো।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি পণ্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও ভৌগোলিক বিশেষীকরণ।

তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যে পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায়, সে দেশ সেই পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করবে। আর, যে পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা কম সেই পণ্য আমদানি করবে। এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। আর বাণিজ্য না হলে বাধ্য হয়ে বেশি খরচে পণ্যটি উৎপাদন করতে হয়। এতে সম্পদের অপচয় হয়। তাই বলা যায়, একেবারে বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য হওয়া ভালো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক। এই পণ্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **কাঁচামালের অভাব:** তৈরি পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত না হওয়ায় আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মতো কাঁচামাল না পাওয়া ও বেশি দামে ক্রয় ইত্যাদির কারণে ব্যবসায়ীরা সমস্যার সম্মুখীন হন।

২. **প্রতিকূল কর্মপরিবেশ:** বাংলাদেশের অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে কাজের প্রতিকূল পরিবেশ লক্ষ করা যায়। যেমন— অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বীকৃত কর্মসময় অনুসরণ না করা ইত্যাদি। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৩. **শ্রমিক অসন্তোষ:** এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি তুলনামূলক অনেক কম হয়ে থাকে। এ জন্য শ্রমিকরা প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি, কর্মসময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ধর্মঘট, ভাঙচুরে লিপ্ত থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির ওপর আঘাত হানে।

উপর্যুক্ত সমস্যা ছাড়াও তৈরি পোশাক শিল্পে মূলধনের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।

ঘ দ্রুত বিকাশমান শিল্প হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই এই খাত থেকে আসে। এই শিল্পের প্রতি যত্নশীল হলে রপ্তানি আয় আরো বাড়বে।

বাংলাদেশ হতে তৈরি পোশাক শিল্পের মাত্র ১০-১২টি আইটেম রপ্তানি করা হয়। এই আইটেমের সংখ্যা বাড়ানো হলে রপ্তানি আয় আরো বাড়বে। আবার, কর্ম পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা গেলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নত হবে। এতে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

যেকোনো ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রণোদনা ও উদার শিল্পনীতির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাছাড়া, সরকার সব সময় এখাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে আগ্রহী, যা অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় ঋণ সহজলভ্য হলে উদ্যোক্তারা বেশি উৎসাহী হবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাড়বে। তাছাড়া বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হলে এই শিল্পের আরো প্রসার ঘটবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প।

প্রশ্ন ▶৪ বান্দরবানে প্রচুর আনারস উৎপাদন হয়। উৎপাদিত আনারসের মান যথেষ্ট ভালো। ব্যবসায়ীরা এ আনারস চট্টগ্রামের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। আবার সিলেটে ভালো মানের প্রচুর চা উৎপাদন হয়। উৎপাদিত চায়ের আমেরিকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশের কয়েকটি আমদানি দ্রব্যের নাম লেখ। ১

খ. 'বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চা এর বাণিজ্যকে কী নামে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আনারস এবং চা এর বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যসামগ্রী হলো– ভোজ্য তেল, গম, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, সার, ক্লিংকার, সুতা, ভারী যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, কৃষি যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি।

খ বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প। ফলে এখানে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারও নিম্ন। তাই এদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। বৈদেশিক সাহায্য এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় সাময়িকভাবে ব্যাপক সহায়তা করে থাকে। এ কারণে বলা যায়, 'বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যক।'

গ উদ্দীপকে চা এর বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামে অভিহিত করা যায়।

দুই বা ততোধিক দেশ যখন দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের সাথে আমেরিকা বা পৃথিবীর যেকোনো দেশের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যায়। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা ভোগ প্রভৃতি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সিলেটে ভালো মানের প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চায়ের আমেরিকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই চা আমেরিকার বাজারে বিক্রি করে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বাংলাদেশের সাথে আমেরিকায় চায়ের এই বাণিজ্য আন্তর্জাতিকভাবেই হয়ে থাকে। তাই চায়ের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যেতে পারে।

ঘ বান্দরবানের আনারস চট্টগ্রামের বাজারে বিক্রি হলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হবে। অন্যদিকে, সিলেটের চা আমেরিকার বাজারে বিক্রি হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হবে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি এক হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতার পার্থক্য, পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা, পৃথক বাজারব্যবস্থা, পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ, পৃথক বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মুদ্রা ও ব্যাংকব্যবস্থা একই রকম। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে মুদ্রা রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের মধ্যে একই ধরনের কর ব্যবস্থা, আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি বিদ্যমান থাকায় কোনো সমস্যা হয় না। অপরদিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজ দেশের মধ্যে পরিবহন ব্যয় খুব একটা প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে পরিবহন ব্যয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কারণ দূরত্ব অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই সরকার বিদ্যমান, ফলে কোনো সমস্যা হয় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক জাতীয় সরকার, ফলে পৃথক ও স্বাধীন বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। এ কারণে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৫ মৎস্যজীবী কায়েস। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনি মৎস্য চাষ করেন। বিল ইজারা নেন। এ ছাড়াও বর্ষা মৌসুমে নদীতে ও হাওরে প্রচুর মাছ শিকার করেন। সব মাছ বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। ফলে অবিক্রীত প্রচুর মাছ শুঁটকি করে রাখেন। কারণ তিনি জানেন বিদেশে শুঁটকি মাছের প্রচুর চাহিদা এবং দামও ভালো। তাই কায়েস মজুদকৃত শুঁটকি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব কায়েসের উৎপাদিত শুঁটকি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ থেকে এরূপ আর কী ধরনের পণ্য রপ্তানি করা যায়? আলোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক সাহায্য হলো একদেশ কর্তৃক অন্যদেশের জন্য সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে অর্থ সম্পদ ও কারিগরি সহায়তা।

খ পৃথিবীর কোনো দেশের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার জন্য একদেশ অন্যদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এজন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের পার্থক্য হেতু কোনো বিশেষ দেশ, বিশেষ পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে এবং আপেক্ষিকভাবে যা উৎপাদনে অসুবিধা সে দ্রব্য আমদানি করে। যেমন— বাংলাদেশ চীনে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে সে দেশ থেকে কাপড় আমদানি করলে বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

গ জনাব কায়েসের উৎপাদিত শুঁটকি অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করলে তা প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে।

যে সকল দ্রব্য কিছুকাল আগেও রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি করা হয় তাকে অপ্রচলিত দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। অপ্রচলিত দ্রব্য হিসেবে হিমায়িত খাদ্য একটি প্রধান রপ্তানিজাত দ্রব্য। বাংলাদেশ হতে টাটকা ও লোনামাছ, হিমায়িত গলদা চিংড়ি, হিমায়িত ইলিশ, ব্যাঙের পা এবং বিভিন্ন মাছের শুঁটকি রপ্তানি করা হয়। এসব দ্রব্য সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ইতালি, ভারত, হল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে রপ্তানি করা হয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাত হতে অর্জিত আয় যথাক্রমে ৫৩৬ ও ৩৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জনাব কায়েসের উৎপাদিত শুঁটকি অ-প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে জনাব কায়েস একজন মৎস্যজীবী এবং বর্ষায় তিনি প্রচুর মাছ শিকার করেন যার সবটুকু বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রচুর মাছ অবিক্রীত থেকে যায়, যা তিনি শুঁটকি হিসেবে সংরক্ষণ করেন। বিদেশে শুঁটকির চাহিদা ও দাম ভালো হওয়ায় জনাব কায়েস মজুদকৃত শুঁটকি বিদেশে রপ্তানি করে তার অবিক্রীত মাছের লোকসানকে মুনাফায় রূপান্তর করেন। জনাব কায়েসের মতো অন্যান্য মৎস্যজীবীরাও যদি শুঁটকি উৎপাদন ও রপ্তানি করে তাহলে এ খাত আরো সম্প্রসারিত হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘ বাংলাদেশ থেকে এরূপ আরও অনেক অপ্রচলিত দ্রব্য আছে যা রপ্তানি করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

অপ্রচলিত পণ্য বলতে সে সকল পণ্য বা সেবাকে বোঝায় যেগুলো কিছুকাল আগেও রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি করা হয়। এ সকল সম্ভাবনাময় খাতগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিচে আলোচনা করা হলো:

তৈরি পোশাক: মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাংলাদেশি পোশাকের চাহিদা অনেক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে আয় ৯৫৬৩ মিলিয়ন ডলার।

https://teachingbd24.com

হোসিয়ারি দ্রব্য বা নিটওয়্যার: হোসিয়ারি দ্রব্য যেমন: গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, সুতি পায়জামা, টাইড্স ইত্যাদি।

হস্তশিল্পজাত দ্রব্য: বিভিন্ন প্রকার কুটিরশিল্প ও শৌখিন দ্রব্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসব দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।

রাসায়নিক দ্রব্য: বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কিছু পরিমাণ পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সার এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

এছাড়াও আরও কিছু কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য রয়েছে যেগুলো অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। প্রচলিত রপ্তানি পণ্যের পাশাপাশি এই পণ্যগুলোও যদি সমান গুরুত্বের সাথে উৎপাদন ও রপ্তানি করা হয় তাহলে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, প্রচলিত রপ্তানি পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও আমাদের আরো যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এগুলো রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে তা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৬ নব্বই দশকের শেষ দিকে বিশ্বায়ন ধারণার সাথে আমাদের পরিচিতি ঘটে। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে BIMSTEC, ASEAN, SAPTA, EU গড়ে তুলেছে। যেখানে পুঁজি, শ্রম ও পণ্যের অবাধ প্রবাহ লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. আমদানি কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২

গ. বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশ অন্যদেশের পণ্য ও সেবা ক্রয় করে তাকে আমদানি বলে।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বায়ন হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যেখানে বিশ্ব আন্তঃসম্পর্কিত এবং আন্তঃযোগাযোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অন্যান্য অংশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতাই হচ্ছে বিশ্বায়ন। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অবাধে একদেশ থেকে অন্যদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে শ্রম চলাচল করতে পারে বিধায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের অবাধ প্রবাহ ঘটে। পুঁজি বা মূলধনের অবাধ প্রবাহ বিশ্বায়নের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতার পথ সম্প্রসারিত করেছে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রসার, তথ্য ও প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নয়ন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, বাণিজ্য উদারীকরণ ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, আমাদের দেশে বিশ্বায়ন ধারণার সঙ্গে পরিচয় ঘটে নব্বই দশকের শেষ দিকে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশসমূহ স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে BIMSTEC, ASEAN, SAPTA, EU এর মতো বেশকিছু আন্তর্জাতিক জোট গঠন করে। ফলে এ সকল অঞ্চলে পুঁজি, শ্রম ও পণ্যের অবাধ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, যা এদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথে পরিচালিত করে। এতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ উন্নত দেশের কাছ থেকে অনেক সুবিধা লাভ করে থাকে। এভাবে বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বিশ্বায়নের ফলে পুঁজি, শ্রম ও উপকরণের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান এদেশের উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করায় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অনেক এগিয়ে গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক সুবিধা অর্জন করেছে। ফলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। অন্যদিকে, বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় পণ্যের বাজার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কমমূল্যে বিদেশি দ্রব্যের সরবরাহ বেশি থাকায় মানুষ দেশীয় পণ্যের ব্যবহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে দেশে আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে ও রপ্তানি কমে যাচ্ছে, যা বাণিজ্য শর্তকে প্রতিকূলতার দিকে ধাবিত করছে। এর ফলে সমাজে আয় বৈষম্য ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনকে ব্যাহত করছে। তাছাড়া মেধাপাচার, অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের কুপ্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা দেশ ও জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশও ASEAN, SAPTA এর মতো একাধিক আন্তর্জাতিক জোটের সদস্যপদ লাভ করে। এতে পুঁজি, শ্রম ও পণ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে বেশকিছু নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ করা যায়। ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং, বিশ্বায়ন বাংলাদেশে আশীর্বাদ ও অভিশাপ উভয়ই বয়ে এনেছে। তবে এ দেশের অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাবই বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৭ নিম্নে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি তথ্য প্রদান করা হলো—

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	প্রাথমিক দ্রব্য রপ্তানি	শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি
২০১০-১১	১৩১৬	২১৬১২
২০১১-১২	১২৬৭	২৩০৩৫
২০১২-১৩	১৩১০	২৫৭১৭

[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ স্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের গতিধারার ওপর মন্তব্য করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার ভিত্তিতে বাংলাদেশে বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে তার সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ অতি-প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে এবং তা দ্বারা শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালও যন্ত্রপাতি আমদানি করতে পারে। এ বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ অনুৎপাদিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, আধুনিক কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি করতে পারে। এসব বিভিন্ন সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের প্রাথমিক দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) স্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে নিচে দেখা হলো—

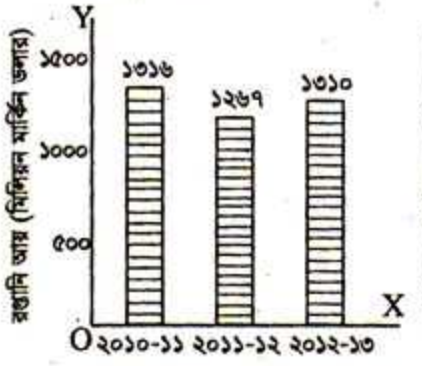

চিত্র: প্রাথমিক দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়

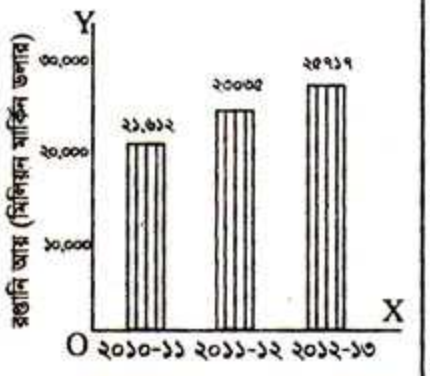

চিত্র: শিল্পজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়

ঘ প্রদত্ত উদ্দীপকে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের প্রাথমিক দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়ের কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিচে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের গতিধারার ওপর মন্তব্য করা হলো—

বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে দু'শ্রেণিভুক্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়; যথা— প্রাথমিক দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য। এর মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রয়েছে। প্রদত্ত তথ্য মতে, রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অবদান ৯০ শতাংশের বেশি।

ধীর গতি হলেও আমাদের রপ্তানি আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে মোট রপ্তানি হয়েছিল ২২৯২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭০২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাই ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় প্রায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। স্বল্পকালের ব্যবধানে এ বৃদ্ধি রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশ করে।

উদ্দীপকের তথ্য থেকে জানা যায়, রপ্তানি বাণিজ্যে প্রাথমিক দ্রব্যের অবদান সময়ান্তরে তেমন একটা বাড়া-কমা না করলেও শিল্পজাত দ্রব্যের অবদান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল ২১৬১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৭১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শতকরা হিসেবে এ বৃদ্ধি হলো প্রায় ১৯ শতাংশ।

উদ্দীপকের তথ্য থেকে আরো জানা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক দ্রব্যের রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ সালে বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পায়। ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-১৩ সালে প্রাথমিক দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয় হ্রাস পায় প্রায় ০.৪৫ শতাংশ।

প্রশ্ন ▶৮ প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও তার বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ানোর চেষ্টা করে। উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে জনশক্তি, পণ্যসামগ্রী রপ্তানির চেষ্টা করে। আবার বিভিন্ন বন্ধু-প্রতীম দেশ ও দাতাসংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১

খ. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী, দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

খ যেসব পণ্যসামগ্রী কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হতো না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হচ্ছে এসব পণ্যকে অপ্রচলিত পণ্য বলা হয়। যেমন— তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হোসিয়ারি দ্রব্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য। কৃষিজাত দ্রব্য যথা— শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন সংযোজন। এসব নতুন নতুন পণ্যসামগ্রীকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়।

গ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা— প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

প্রচলিত রপ্তানি পণ্য: বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে প্রথম থেকেই যেসব পণ্য বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকেই এদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা যায়। এ পণ্যের মধ্যে কয়েকটি কৃষিপণ্য এবং বেশিরভাগই কৃষিনির্ভর শিল্পদ্রব্য। যেমন—

১. কাঁচাপাট, ২. পাটজাত দ্রব্য, ৩. চা, ৪. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, ৫. কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, ৬. নেপথালিন, ফার্নেস তেল ও বিটুমিন প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য: সাম্প্রতিককালে যেসব পণ্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সংযোজিত হয়েছে বা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলোকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়।

বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ১. তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, ২. হিমায়িত খাদ্য, ৩. জুতা, ৪. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, ৫. কৃষিপণ্য যেমন- শাকসবজি ও ফলমূল, ৬. রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত দ্রব্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ আরো কিছুসংখ্যক নতুন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের মধ্যে কিছু প্রাথমিক পণ্য এবং কিছু শিল্পজাত দ্রব্য রয়েছে। অপ্রচলিত অন্যান্য এ ধরনের দ্রব্যাদির মধ্যে গুড়, দিয়াশলাই, পার্টেক্স, রেয়ন, প্রকৌশল সামগ্রী, সিরামিক, বই-পুস্তক ও সাময়িকী, ফিচার ফিল্ম প্রভৃতি প্রধান।

ঘ বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা খুবই ব্যাপক। কিন্তু কোনো দেশের বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কেননা বৈদেশিক সাহায্যের যেমন সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে।

বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের সময় দাতা দেশ ও দাতা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের কঠিন শর্ত আরোপ করে থাকে। আর এসব শর্ত সবসময় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শুভ নাও হতে পারে। বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। আর এর ফলে একটি দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের উৎস হিসেবে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের মধ্যে যেসব সমস্যার আশঙ্কা থাকে সেগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সহজেই এড়ানো সম্ভব। এ জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল দেশসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে। প্রত্যেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তার রপ্তানি পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এতে দেশের অর্থনীতি যেমন প্রভাবমুক্ত থাকবে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ▶৯ মি. হাবিব নোয়াখালী জেলার একজন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি। সে কাজের সন্ধানে দুবাই যায়। একদিন সে একটি শপিংমলে প্রাণ আচার, চানাচুর ও RFL এর পণ্যসামগ্রী দেখে আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু তা সামান্য মাত্র। শপিংমলের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী চীন, জাপান, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের। দোকানদার হাবিবকে বলেন যে, তোমার দেশের উৎপাদিত পণ্যের মান নিম্ন, পরিবহন সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য আমরা কম পণ্য আমদানি করি।

[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

https://teachingbd24.com

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান দুটি পার্থক্য লেখ। ২
গ. শপিংমলে হাবিবের দেশের পণ্য কম হওয়ার কারণ কী? ৩
ঘ. উদ্দীপকে হাবিবের দেশের বেশি পণ্যসামগ্রী শপিংমলে দেখতে হলে কী করা প্রয়োজন? ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্যহেতু বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এ ধরনের কোনো বাধা থাকে না।

২. বিভিন্ন দেশের মধ্যে সরকারি বাধা-নিষেধ, শুল্ক, কর, বৈদেশিক বিনিময় হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে বলে বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এরূপ সরকারি বিধি-নিষেধের পার্থক্য না থাকায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে জটিলতা থাকে না।

গ বাংলাদেশের হাবিব দুবাই- এর শপিংমলে কেনাকাটা করতে গিয়ে সেখানে বাংলাদেশের প্রাণ ও RFL কোম্পানির পণ্যসমাগ্রী দেখে পুলকিত হয়। তবে সে লক্ষ করে, সেখানে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের পণ্যসামগ্রীর তুলনায় তার নিজ দেশের পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ অনেক কম। দুবাই-এর শপিংমলে হাবিবের দেশের পণ্যসামগ্রী কম হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

পণ্যের নিম্নমান: বাংলাদেশের অধিকাংশ রপ্তানি পণ্য নিম্নমানের। নিম্নমানের কাঁচামাল, অদক্ষ শ্রমিক, পুরাতন প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদি কারণে এখানকার কলকারাখানায় উৎপাদিত পণ্য হয় নিম্নমানের। তাছাড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের অভাবেও তার মানের অবনতি ঘটে। এসব পণ্য বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশের উন্নতমানের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না এবং ক্রেতা হারায়।

পরিবহন সমস্যা: সাধারণভাবেই বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত, ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। আর রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো বিস্তৃত ও প্রকট। অন্যান্য দেশের জাহাজ সংস্থার তুলনায় আমাদের জাতীয় জাহাজ চলাচল সংস্থা 'বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন' দুর্বল ও অদক্ষ। এ কারণে রপ্তানি পণ্যের পরিবহনের জন্য আমাদেরকে বিদেশি জাহাজ কোম্পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। পরিবহনের অসুবিধার জন্য অনেক সময় বিদেশি ক্রেতাদেরকে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা যায় না।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা দরকার। বাংলাদেশে বহু বছর যাবৎ রাজনৈতিক হানাহানি, হরতাল, জ্বালাও, পোড়াও আন্দোলন ইত্যাদি চলে আসছে। এ পরিস্থিতিতে শিল্পোৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। অনেক সময় বিদেশি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী, পণ্য সময়মতো পাঠানো যায় না।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিদেশের বাজারে এ দেশের পণ্যের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে কম।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, বিদেশের বাজারে হাবিবের দেশের তথা বাংলাদেশের পণ্যের পরিমাণ বেশ কম। বিদেশের বাজারে এদেশের পণ্য বেশি পরিমাণে প্রেরণ করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. বিদেশে আমাদের রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে রপ্তানি পণ্যের পরিবহণ ও বন্দরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ সকল প্রকার অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন দরকার। এ উদ্দেশ্যে নতুন কন্টেইনার বন্দর নির্মাণসহ চট্টগ্রাম ও খুলনার বন্দরের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা আরো সম্প্রসারণ আবশ্যক।

২. অন্য দেশের জাহাজের ওপর নির্ভর রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা অনিশ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের নিজস্ব জাহাজ চলাচল সংস্থা তথা 'বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনকে' আরো শক্তিশালী ও বাণিজ্যিক জাহাজের বহর সম্প্রসারিত করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের অধিকাংশের গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। সুতরাং, রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বাড়াতে হলে দক্ষ শ্রমিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. রপ্তানি পণ্যের দাম কম রাখার জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হ্রাস, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর রেয়াত, ট্যাক্স হলিডে সুবিধা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৫. আমাদের কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হলে পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমনটি হলে বিদেশি ক্রেতারা তাদের চাহিদামাফিক পণ্য ক্রয় করতে পারবে।

৬. রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত শিল্প মেলায় এদেশের পণ্যের প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আমাদের কূটনৈতিক মিশনগুলোও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

উপরের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে। তখন বিদেশের শপিংমলগুলোতে হাবিবের দেশ তথা বাংলাদেশের পণ্য বেশি পরিমাণে দেখা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য

ক্রমিক নং	পণ্য	২০১২-১৩ (কোটি টাকা)	২০১৩-১৪ (কোটি টাকা)
১	চা	২	৪
২	তৈরি পোশাক	১১০৪০	১২৪৪২
৩	হস্তশিল্পজাত পণ্য	৬	৮

[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ২নং সারিতে উল্লিখিত পণ্যটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, ৩নং সারিতে উল্লিখিত খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী, দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ২নং সারণিতে উল্লিখিত পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক। বর্তমানে এটি হলো আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য। আমাদের দেশে পণ্যটির তথা পোশাক শিল্পের অর্থনৈতিক অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প। এ শিল্পে প্রায় ১.৫ কোটি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র নারীরা এ শিল্পে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুযোগ পেয়েছে। পোশাক শিল্প দেশে একদল দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলেছে। দেশে শিল্পবান্ধব পরিবেশ ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি ভালো থাকলে এ উদ্যোক্তা শ্রেণি দেশের শিল্পায়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারবে।

পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে দেশে অন্যান্য সহায়ক শিল্প যেমন সুতা, কার্টন, পলিব্যাগ, লেভেল, গামটেপ, প্যাকিং ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছে। পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সাথে সাথে এসব ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প (পশ্চাৎ সংযোগ

https://teachingbd24.com

শিল্প) এর দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এছাড়া পোশাক শিল্পের শ্রমিকের জন্য বাড়তি খাদ্য, বস্ত্রসহ বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দেশে অনেক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী কারখানা গড়ে উঠে যেগুলো উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সাহায্য করছে। তাছাড়া পোশাক শিল্পের জন্য বর্তমানে যে বিপুল পরিমাণ কাপড় আমদানি করা হয়, ভবিষ্যতে তা দেশেই উৎপাদন করলে বস্ত্র শিল্পেরও উন্নয়ন ঘটবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ২নং সারণিতে উল্লিখিত পণ্যটির যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপক অনুসারে ৩নং সারণিতে উল্লিখিত খাতটির হলো কুটিরশিল্প খাত। হস্তশিল্পজাত পণ্য এ খাতের উৎপাদিত পণ্য। এটি বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এমন ধারণার সপক্ষে নিচে কিছু যুক্তি তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশের শিল্পখাতে কুটিরশিল্প একটি অত্যন্ত পরিচিত শিল্প। এ দেশের অর্থনীতিতে এ শিল্পে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। কুটিরশিল্প স্বল্প মূলধন, সহজলভ্য কাঁচামাল ও সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা স্ব-উদ্যোগে গৃহেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ দেশে তাই বেশিরভাগ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমেই করা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশ হলো বেশি শ্রমশক্তি ও স্বল্প পুঁজির দেশ। এ প্রেক্ষিতে এখানে স্বল্প পুঁজির বিনিয়োগ দ্বারা কুটিরশিল্প স্থাপন সুবিধাজনক।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বেকার সমস্যা। দেশের বিপুল বেকার জনশক্তিকে কুটির শিল্পের মাধ্যমে তাদের ঘরে বসেই কাজের ব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রচুর লোক ছদ্মবেশী বেকার, মৌসুমি বেকার হিসেবে নিয়োজিত আছে। এসব বেকারকে সহজেই কুটির শিল্পে নিয়োগ করা যায়। অন্যদিকে আমাদের দেশে পল্লি অঞ্চলে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে; এগুলো কুটিরশিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া দেশের বৃহৎ শিল্পের অনেক পরিত্যক্ত উপজাত দ্রব্যাদি কুটিরশিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ৩নং সারণিতে উল্লিখিত খাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত।

প্রশ্ন ▶ ১১ পলাশ সাহেব একজন ICT বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি দেশে বেড়াতে এসেছেন। গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি লক্ষ করলেন গ্রামের অবস্থা আর পূর্বের মতো নেই। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। রঙিন টিভি ও ডিস-লাইন এসেছে। মানুষ চায়ের দোকানে বসে চা-পানের সাথে সাথে টিভির বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের আচার-অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাচ্ছে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. 'বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক সমমুখী'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের কী কী পরিবর্তন হয়েছে বলে পলাশ সাহেব মনে করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, সমাজে বিশ্বায়নের প্রায়োগিক ভিত্তি আছে কি না? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কমিউনিকেশন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর সাহায্যে দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ সম্ভব হচ্ছে। দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির যত প্রসার ঘটছে ততই বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের প্রসার ঘটছে এবং বিশ্বে জ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এসবই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলছে। সুতরাং বলা যায়, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক সমমুখী।

গ বিশ্বায়নের কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও ইতিবাচক দিকই বেশি। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ ঘটছে। বাণিজ্য উদারীকরণ ও বাজার উন্মুক্ত হচ্ছে। এ অবস্থা আমাদের দেশসহ পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের চাল-চলন, জীবনযাত্রা, চিন্তা-ভাবনা, চিত্তবিনোদন বদলে দিচ্ছে। পরিবর্তনের এ ছোঁয়া দেশের সুদূরের গ্রামগুলোতেও লেগেছে। বিশ্বায়নের ফলে এ পরিবর্তন অনেক বছর পরে দেশে ফিরে আসা পলাশ সাহেবের চোখে লেগেছে।

গ্রামের পথ চলতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেন, যে গ্রাম একসময় রাতের অন্ধকারে ডুবে যেত, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় মানুষ কোনোরকমে তার রাতের কাজ-কর্ম করত, সে গ্রাম এখন রাতে বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। আবার পঞ্চাশের দশকের রেডিওর স্থান দখল করেছে ঝকঝকে রঙিন টেলিভিশন। ডিস লাইনের বদৌলতে এখন বিশ্বের চিত্তবিনোদনের ভাণ্ডার গ্রামের মানুষের কাছেও উন্মুক্ত।

পলাশ সাহেবের দেখা গ্রামে এখন মেঠোপথে মোটরসাইকেল চলে, মাঠে পাওয়ারটিলার দ্বারা জমি চাষ হয়, নদী-নালা থেকে সেঁউত-ঝুড়ির সাহায্যে পানিসেচ না করে শ্যালো ও ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে পানি সেচ দেওয়া হয়। এখন কৃষক ঘরে বসেই তার কম্পিউটারের সাহায্যে কৃষি-উৎপাদন ও কৃষি সম্পর্কিত সর্বশেষ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারছে। বিশ্বায়নের হাত ধরেই এ পরিবর্তন এসেছে।

সুতরাং বলা যায়, পলাশ সাহেব মনে করেন বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সমাজের উপরিউল্লিখিত পরিবর্তনগুলো ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী পলাশ সাহেবের গ্রামীণ সমাজে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গ্রামে এখন বিদ্যুৎ এসেছে, রঙিন টিভি ও ডিস লাইন চিত্তবিনোদনের ধরন বদলিয়ে দিয়েছে। সবই বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিক যাকে বিশ্বায়নের প্রায়োগিক ভিত্তি বলা যায়।

অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে। পলাশ সাহেব যে সমাজে বসবাস করেন তার সকল সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও গতিদ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত। বহু বছর পর দেশে আগত পলাশ সাহেবের গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন, রঙিন টিভি ও ডিস লাইন স্থান দখল করে নিয়েছে। আধুনিকতার এসবই বিশ্বায়নের প্রায়োগিক দিক। সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তি খাতের প্রসার, সরকারি আয়-ব্যয়ের সমন্বয়, বাণিজ্য উদারীকরণ, ভুর্তকি প্রদান, শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি কর্মসূচি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলেছে। ফলে ধীরে হলেও বাংলাদেশের বাজার বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব প্রকাশ করছে।

বিশ্বায়নের ফলেই বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি এদেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশি শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে দেশি শিল্পের পণ্যসমূহের মান আন্তর্জাতিক মানের মতো উন্নত হচ্ছে। বিদেশের দেখাদেখি উন্নত কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের কৃষিপণ্যের মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশ ক'বছর ধরে কিছু কিছু কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছে; প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে আসছে।

সুতরাং বলা যায়, পলাশ সাহেবের সমাজে বিশ্বায়নের প্রায়োগিক ভিত্তি আছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ আলম সাহেব ঢাকা থেকে তৈরি পোশাক ক্রয় করে কুমিল্লার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। তার বন্ধু জামাল সাহেব ভারত থেকে পেঁয়াজ, রসুন ক্রয় করে বাংলাদেশে বিক্রয় করেন। আর বাংলাদেশ থেকে শাকসবজি ও হিমায়িত মাছ সৌদি আরবে বিক্রয় করেন।

[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯]

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. 'রপ্তানি শুল্ক হ্রাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে আলম সাহেবের ব্যবসাকে কোন বাণিজ্য বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলম সাহেবের ব্যবসায়ের সাথে জামাল সাহেবের ব্যবসার কী পার্থক্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হয়। এছাড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এভাবে রপ্তানি শুল্ক হ্রাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের আলম সাহেবের ব্যবসাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়। কেননা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল তার নিজ জনগণের প্রয়োজনীয় সবরকম দ্রব্য সুবিধাজনক খরচে উৎপাদন করতে পারে না। অঞ্চলটি যেসব দ্রব্য কম খরচে উৎপাদন করতে পারে সেগুলো ভোগের পর উদ্বৃত্ত অংশ অন্য অঞ্চলে বিক্রয় করে এমন সব দ্রব্য সেখান থেকে ক্রয় করে যা নিজ অঞ্চলে উৎপাদন করতে খরচ বেশি হয়। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চল বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে।

সুতরাং, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংজ্ঞায় বলা যায়, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার লেনদেনকে অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বলে। যেমন- আলম সাহেব ঢাকা থেকে তৈরি পোশাক এনে কুমিল্লায় বিক্রয় করেন, তেমনি দেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর এবং অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে যেরূপ বাণিজ্য চলে তাকেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এ বাণিজ্য অভিন্ন মুদ্রা ও সরকারি বিধি-বিধান এবং প্রায় একই ধরনের বাজারব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের অধীনে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রপ্তানি আয় মিলিয়ন ডলারে:

পণ্যের ধরন	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
প্রচলিত পণ্য	১৯৪৩	১৮৮৪	২১০২
অপ্রচলিত পণ্য	২০৬৬০	২২০২৫	২৪৩৩৫

নাজিম স্যার অর্থনীতি ক্লাসে টেবিলটি উপস্থাপন করেন। তিনি আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে অনেক আলোচনা করলেন। আলোচনাকালে তিনি ছাত্রদের জানান, বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈচিত্র্য এসেছে। রপ্তানিক্ষেত্রে প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আমাদের পণ্যের প্রকৃতি পরিবর্তনের সাথে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে অর্থনৈতিক খাত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটা অর্থনীতির জন্য একটি ভালো দিক।

[রা.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্য আমাদের পরনির্ভরশীল করে তোলে — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির ওপর উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্য কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নাজিম স্যারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা দেশ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে না। কারণ দাতা দেশ সাহায্য গ্রহীতা দেশের জন্য এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করেন যাতে দাতা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়, নিজেদের তৈরি মূলধন দ্রব্য বিক্রি এবং উপদেষ্টার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রহীতা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন হয়। এ ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের সুদের হার বেশি। তাই বছরের পর বছর ঋণ গ্রহণের ফলে ঋণগ্রহীতা দেশের ঋণ ও সুদের হার অনেক ক্ষেত্রে অপরিশোধ্য থাকে, যা পরিশোধের জন্য আবার নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তাই বৈদেশিক সাহায্য দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

গ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা— প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

প্রচলিত রপ্তানি পণ্য: বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে প্রথম থেকেই যেসব পণ্য বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকেই এদেশের প্রচলিত পণ্য বলা যায়। এ পণ্যের মধ্যে কয়েকটি কৃষিপণ্য এবং বেশিরভাগই কৃষিনির্ভর শিল্পদ্রব্য। যেমন—

১. কাঁচাপাট, ২. পাটজাত দ্রব্য, ৩. চা, ৪. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, ৫. কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, ৬. নেপথা, ফার্নেস তেল ও বিটুমিন প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যসমূহ: সাম্প্রতিক কালে যেসব পণ্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সংযোজিত হয়েছে বা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলোকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়।

বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ১. তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, ২. হিমায়িত খাদ্য, ৩. জুতা, ৪. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, ৫. কৃষিপণ্য যেমন- শাকসবজি ও ফলমূল, ৬. রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত দ্রব্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ আরো কিছুসংখ্যক নতুন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি করে। এসব পণ্যের মধ্যে কিছু প্রাথমিক পণ্য এবং কিছু শিল্পজাত দ্রব্য রয়েছে। অপ্রচলিত অন্যান্য এ ধরনের দ্রব্যাদির মধ্যে গুড়, দিয়াশলাই, পার্টেক্স, রেয়ন, প্রকৌশল সামগ্রী, সিরামিক টেবিল ওয়্যার, বই-পুস্তক ও সাময়িকী, ফিচার ফিল্ম প্রভৃতি প্রধান।

ঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। নিচে নাজিম স্যারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো—

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানির ফলে নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর উত্তম ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হবে। আবার, কোনো দেশ কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করতে না পারলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্যদেশ থেকে তা আমদানি করে ভোগ করতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিবছরই খাদ্য ঘাটতি থাকে। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দ্রব্য উৎপন্ন করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় এসব দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও পরিচালনায় দক্ষতা লাভ করতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে জরুরি অবস্থা দেখা দিলে অন্যদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে অতি সহজেই এরূপ সঙ্কট মোকাবিলা করতে পারে।

নিজাম স্যারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ১৪ বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব হওয়াতে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, কারিগরি জ্ঞান, শিল্পঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে ওষুধ, প্লাস্টিক সামগ্রীসহ বহু পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ১

খ. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলো কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে? ৩

ঘ. দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রচলিত রপ্তানি পণ্য: কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, নেপথালিন, ফার্নেস তেল ও বিটুমিন প্রভৃতি।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য: তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, জুতা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিপণ্য যেমন- শাকসবজি ও ফলমূল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে এসব শিল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া এসব শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম হ্রাস করা হয়েছে। আবার, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত কলাকৌশল ও কারিগরি জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি করে দেশের কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব দূর করা হচ্ছে।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার রপ্তানিকারকদেরকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে শিল্প ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য ঋণের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ স্কিম' প্রবর্তন করে। এ স্কিমের আওতায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে রপ্তানিকারকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ স্কিমটি চালু হওয়ায় ঋণের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়েছে।

ঘ রপ্তানি সম্প্রসারণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যেমন—

রপ্তানি বহুমুখীকরণ: এ যাবৎ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের একক বৃহত্তম রপ্তানি খাত হলো তৈরি পোশাক যা থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগ আসে। এ তৈরি পোশাকের পাশাপাশি পাটজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, চামড়াজাত পণ্য, রাসায়নিক সার, পাদুকা, সিরামিক দ্রব্য, চিংড়ি, খেলনা প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাজার সম্প্রসারণ: বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির সিংহভাগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে হয়। এ সীমিত সংখ্যক দেশগুলোর পাশাপাশি ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

রপ্তানি পণ্যের মান উন্নয়ন: বাংলাদেশের কতিপয় রপ্তানি পণ্যের উপযুক্ত মান নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে আপত্তি থাকায় ঐসব পণ্য যথাযথ দাম পায় না। সুতরাং, আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রম নিয়োগ করা দরকার। প্রতিষ্ঠিত শিল্পে পণ্যের মান উন্নয়ন কঠিন কিছু নয়।

রপ্তানি দ্রব্যের প্রচার: সরকার তথা রপ্তানিকারকগণ রপ্তানিজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা করতে পারে। এতে রপ্তানিজাত দ্রব্যের প্রসার ঘটে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'A' দেশ তার নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রয়-বিক্রয় করে। 'B' দেশ তার উৎপাদিত পণ্য নিজ দেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারে বিক্রয় করে এবং অন্য দেশের পণ্য নিজ দেশের জন্য ক্রয় করে। ফলে 'B' দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং ভোক্তারাও বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, টাটকা ফল ইত্যাদি বাংলাদেশের কোন ধরনের রপ্তানি পণ্য এবং কেন? ২

গ. A ও B দেশের বাণিজ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের বাণিজ্যের গুরুত্ব কতটুকু বলে তুমি মনে কর? ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, টাটকা ফল ইত্যাদি বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

যেসব পণ্যসামগ্রী কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হতো না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হচ্ছে সেসব পণ্যকে সাধারণভাবে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। যেমন— তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হোসিয়ারি দ্রব্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি।

গ A ও B দেশের বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে।

A দেশের বাণিজ্য হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অন্যদিকে, B দেশের বাণিজ্য হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। নিচে উভয় বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো—

১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।

২.অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কোনো ভিন্নতা নেই। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির ভিন্নতা রয়েছে।

৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনজনিত কারণে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা থাকে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনজনিত কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পরিবহণ ও বিমা ব্যয়ের তেমন পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবহণ ও বিমা ব্যয়ের অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

৫. একটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অবাধে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ আরোপিত হয় বলে বাণিজ্য অবাধে চলতে পারে না।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যয় সংস্থান করা সম্ভব হয় না। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলো তার অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত বা অবাধ বাণিজ্য পরিচালিত হলে দেশের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এর ফলে তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায় সে দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, একটি দেশ সকল প্রকার দ্রব্য সমান পারদর্শিতার সাথে উৎপাদন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে দেশ-বিদেশে উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়।

https://teachingbd24.com

চতুর্থত, কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটা দেশ তার প্রয়োজনীয় অনুৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজেই বিদেশ হতে সংগ্রহ করতে পারে। যেমন: তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাট উৎপাদিত হয় না। অপরপক্ষে, বাংলাদেশে তেল উৎপাদন না হলেও প্রচুর পাট জন্মে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ তেল এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো পাট আমদানি করতে পারে।

পঞ্চমত, যেসব দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করা ব্যয়বহুল তা কম দামে অন্য কোনো দেশ হতে ক্রয় করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ নিজের দেশের ব্যয়বহুল দ্রব্য উৎপাদন না করে তা কম দামে বিদেশ হতে আমদানি করে দেশীয় মূলধনের সংস্থান করতে পারে।

ষষ্ঠত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বা অন্য কোনো দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হয়। এভাবে একটি দেশ তার উদ্বৃত্ত পণ্যকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আবদুর রহমান বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড়। তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় মেলবোর্নের একটি শপিং মলে পোশাক কিনতে গিয়ে দেখেন যে সেখানে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত পোশাকই সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় এবং দামে সস্তা। এছাড়াও তিনি পুরো শপিংমলে বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরনের পণ্য দেখতে পান। তিনি খুব খুশি হন এবং মনে মনে ভাবেন বাংলাদেশ শুধু পণ্য আমদানি করে না রপ্তানিও করে। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য অপ্রচলিত শিল্পজাত পণ্যগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাণিজ্যের কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্য রপ্তানির বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে মনে কর? ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ সৃজনশীল ১৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

স্বাধীন ও সার্বভৌম দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বৈধভাবে বাণিজ্য সংঘটিত হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমবিভাগ ও ভৌগোলিক বিশেষীকরণ। ভৌগোলিক বিশেষীকরণের ওপর ভিত্তি করেই মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠেছে। এ বাণিজ্যে আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী কোনো দেশ বিশেষ দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করে থাকে। এর ফলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

আবার, এক দেশের দ্রব্যসামগ্রী অন্য দেশে প্রবেশের মাধ্যমে এবং উক্ত দ্রব্যের বাজার বিশ্ববাজারে প্রসারিত হয় এবং অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুযোগ পাওয়া যায়। দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এতে মূলধনের গতিশীলতা বাড়ে। আর যে সকল পণ্য নিজ দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বেশি থাকে যেসব দ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য আমদানি করা হয়। তাই বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন রপ্তানি করা হয়, তেমনি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যও আমদানি করে ভোগ করা যায়।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। তাই দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি তথা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হলে অর্থনীতির লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূর হবে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যে ভাগ করা হয়েছে। প্রচলিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে কাঁচাপাট, চা, চামড়া, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও কাগজজাত দ্রব্য, ন্যপথালিন, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন ইত্যাদি। অন্যদিকে, অপ্রচলিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি ও ফলমূল, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, জুতা, সিরামিক সামগ্রী, পেট্রোলিয়াম উপজাত, দিয়াশলাই, গুড়, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ইত্যাদি। এসব পণ্যসমূহের মধ্যে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তাছাড়া দেশটিতে খাদ্য ঘাটতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। দেশের অভ্যন্তরে এসব উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হলে দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন বাড়বে, নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন হবে, মূলধনের গতিশীলতা বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে। অপরদিকে, রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে আমদানি ব্যয়ের ঘাটতি কমবে এবং লেনদেন ভারসাম্যে অনুকূল অবস্থা বিরাজ করবে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক শিল্পের চাহিদা অনেক বেশি থাকায় এ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব সালমান 'Y' দেশে বসবাস করেন। দেশটির পণ্য রপ্তানি আয়ের সারণি নিম্নরূপ:

পণ্য	মোট রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১. কাঁচাপাট	২৬৬
২. হিমায়িত খাদ্য	৫৯৮
৩. পাটজাত পণ্য	৭০১
৪. চামড়া	৩৩০
৫. চা	৩
৬. তৈরি পোশাক	৯৬০৩
৭. রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩
৮. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫

রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে দেশটির সরকার নতুন বাজার অনুসন্ধান, বাণিজ্য মেলার আয়োজন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক অফিস খোলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. সরকারি নীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি একই? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'Y' দেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি কর। ৩

ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ মূল্যায়ন কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ সরকারি নীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কোনো ভিন্নতা নেই, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর দেশের সরকারের সম্পূর্ণ প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সরকারি নীতির ভিন্নতা রয়েছে। কারণ, এরূপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু দেশ অংশগ্রহণ করে। ফলে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও উদ্দেশ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে একই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজস্বনীতি একই রকম। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা ভিন্ন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'Y' দেশের রপ্তানি পণ্যের সাথে বাংলাদেশের প্রচলিত পণ্যগুলো হলো: কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চা। অন্যদিকে, অপ্রচলিত দ্রব্যগুলো হলো: তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য। নিচে প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত পণ্য রপ্তানি করছে তা প্রচলিত রপ্তানি পণ্য। এ পণ্যের বৈশিষ্ট্য হলো আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্য নিয়মিত রপ্তানি করা হয় এবং বিশ্ববাজারে এসব পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এ পণ্যগুলোর মধ্যে কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি। আর এগুলো হতে প্রতি বছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

কিছুদিন পূর্বেও যেসব পণ্য বাংলাদেশ হতে রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু সম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হয় তাই মূলত অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য। যেমন, উদ্দীপকের তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি। সাম্প্রতিক হিসেবে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে অপ্রচলিত দ্রব্যের অবদান শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি। অতএব, 'Y' দেশের পণ্যের তালিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের তালিকাকে নির্দেশ করা হয়।

ঘ রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ এবং তা দ্রুত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের রপ্তানি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শুল্ক অব্যাহতি দেয়। এছাড়াও আবগারি শুল্কও প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদান, রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ, স্কিম প্রবর্তন, এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সে বিশেষ সুবিধা প্রদান, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

উপরিউক্ত সরকারি ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'B' দেশ কয়েক দশক আগেও পাট, পাটজাত দ্রব্য,চামড়া, চা, নিউজপ্রিন্ট কাগজ ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করতো। কিন্তু বর্তমানে দেশটির শাকসবজি, হিমায়িত মাছ, তৈরি পোশাক, তাজা ফুল, মৌসুমি ফল, পান, সুপারি, মশলা, হোসিয়ারি দ্রব্য ও হস্তশিল্পের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া 'B' দেশের সরকার বেশ কয়েকটি 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল' গড়ে তুলছে। ইতোমধ্যে সেখানে বেশ কয়েকটি বড় বড় দেশি ও বিদেশি কোম্পানি বৃহদায়তনে উৎপাদন করছে। *[ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়? ১

খ. দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে B দেশের অপ্রচলিত ও প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকারের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কিরূপ ভূমিকা রাখবে? — বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো দ্রব্য বা সেবা বিনিময় হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ প্রাপ্তি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি কারণে কোনো দেশ কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন সুবিধা ভোগ করতে পারে। এতে ঐ দ্রব্যটির প্রাচুর্যতা দেখা দেবে। আবার ঐ একই কারণে অন্য কোনো দেশ ঐ বিশেষ দ্রব্যটি উৎপাদনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। ফলে ঐ দ্রব্যটি কম উৎপাদন হবে অথচ চাহিদা অধিক হতে পারে। সুতরাং, ২য় দেশটি ১ম দেশ থেকে ঐ দ্রব্যটি আমদানি করবে। তথা দেশ দুটির মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হবে।

গ কোনো দেশ যে সকল পণ্যসামগ্রী দীর্ঘকাল ধরে রপ্তানি করে থাকে সে সকল পণ্যসামগ্রীকে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য আর যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি করে আসছে তাদেরকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। নিচে উদ্দীপকের আলোকে 'B' দেশটির অপ্রচলিত ও প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা তৈরি করা হলো—

'B' দেশে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দ্রব্যসমূহের তালিকা:

প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ	অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
১. পাট	১. শাকসবজি
২. পাটজাত দ্রব্য	২. হিমায়িত মাছ
৩. চামড়া	৩. তৈরি পোশাক
৪. চা	৪. তাজা ফুল
৫. নিউজপ্রিন্ট কাগজ	৫. মৌসুমি ফল
	৬. পান ও সুপারি
	৭. মসলা
	৮. হোসিয়ারি দ্রব্য
	৯. হস্তশিল্প

ঘ উদ্দীপকে সরকারের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ 'B' দেশটির রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো—

বিশ্ববাজারে 'B' দেশটির উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বেশ কয়েকটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) গড়ে তুলছে। যা দেশটির রপ্তানি বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করবে। দেশটিতে দেশি ও বিদেশি কোম্পানি বৃহদায়তনে উৎপাদন করছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবার, দেশটি EPZ গড়ে তোলায় পণ্য উৎপাদনে বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করবে। এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং অধিক মুনাফা অর্জিত হবে। এতে উৎপাদক নতুন পণ্য উৎপাদন বা পণ্যের মান উন্নত করবে। এতে করে 'B' দেশটির পণ্যের চাহিদা বহির্বিশ্বে আরও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে 'B' দেশটির GDP-ও বাড়বে। এর ফলে দেশটির জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। EPZ গড়ে ওঠায় দেশটির উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়বে এবং কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়বে। ফলে শ্রমিকরা দক্ষতার সাথে কাজ করবে। যাতে উৎপাদন বেশি হবে ও পণ্যটির বাজার বিস্তৃতি হবে। EPZ গড়ে ওঠায় মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশটির সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'B' দেশের সরকারের বেশ কয়েকটি EPZ গড়ে তোলার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় একজন বক্তা আশা প্রকাশ করলেন, বাংলাদেশ অচিরেই খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হবে। তিনি বললেন, এদেশে প্রায় ১৮.৭৫ লক্ষ একর জমি এখনও অনাবাদি রয়েছে। বক্তব্যে তিনি নিম্নের তথ্যও তুলে ধরলেন:

অর্থবছর	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	খাদ্যশস্য আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন)
২০০৮-২০০৯	৩২৯	৩০
২০০৯-২০১০	৩৪১	১৮

[ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১]

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব কেমন? ২

গ. বক্তার প্রদত্ত তথ্য স্তম্ভচিত্র এঁকে দেখাও। ৩

ঘ. তুমি কি বক্তার আশাবাদের সাথে একমত? প্রদত্ত তথ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

https://teachingbd24.com

খ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
বিশ্বায়নের ফলে প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। এতে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক যুগে তথা বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্ব একটি বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে বিশ্বের যেকোনো ব্যক্তি, জাতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এতে করে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটছে। তবে বিশ্বায়নের ফলে কিছু অপসংস্কৃতিরও বিস্তার লক্ষ করা যায়। তবে তা নির্ভর করে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগসমূহ আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর।

গ নিচে বক্তার প্রদত্ত তথ্যের আলোকে স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করা হলো—

অর্থবছর	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	খাদ্যশস্য আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন)
২০০৮-২০০৯	৩২৯	৩০
২০০৯-২০১০	৩৪১	১৮

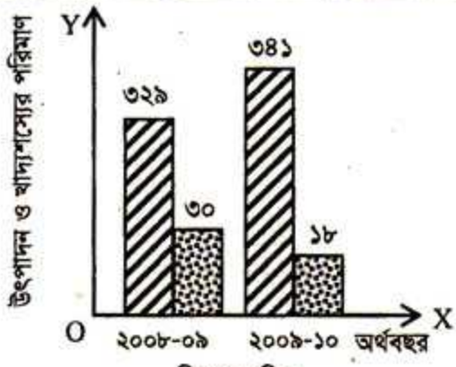

চিত্র: স্তম্ভচিত্র

স্তম্ভচিত্রে OX অক্ষে অর্থবছর এবং OY অক্ষে আমদানি ও উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

ঘ 'বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় একজন বক্তা আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ অচিরেই খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হবে। আমি বক্তার আশাবাদের সাথে একমত। নিচে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে আশাবাদের পক্ষে যুক্তি দেখানো হলো—
কোনো দেশ যখন নিজ চাহিদা পূরণ করে কোনো পণ্য উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারে, তখন সেই দেশটি চাহিদার অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করবে। প্রদত্ত তথ্যে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩২৯ লক্ষ মেট্রিক টন। চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম হওয়ায় আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই আমদানির পরিমাণ কমে ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন হয়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে খাদ্য আমদানির পরিমাণ আরও কমবে অথবা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হবে। আবার উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তা আরও উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশে প্রায় ১৮.৭৫ লক্ষ একর জমি অনাবাদি রয়েছে। এখন এই অনাবাদি জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা হলে স্বভাবতই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি বজায় থাকলে কৃষিখাতে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক, জৈব প্রযুক্তি, আইসিটির ব্যবহার উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। ফলে, আশা করা যায়, বাংলাদেশ খাদ্যশস্য আমদানি না করে বরং রপ্তানি করতে পারে।
উপরিউক্ত তথ্যভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকের উল্লিখিত বক্তার সুরে বলা যায়, বাংলাদেশ অচিরেই খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶২০ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১
১৬২০৪.৬৫	২২৯২৪.৩৮	২৩৭৩৮	৩৩৬৫৮

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক

[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২
গ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে কিরূপ ভারসাম্য বিরাজ করছে? কেন? ৩
ঘ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য তুমি কোন ধরনের নীতিকে সমর্থন করবে? কেন? ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক দেশ যখন দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ—
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ এসব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবে যেগুলো উৎপাদনে তুলনামূলক খরচ কম এবং তার বিনিময়ে এমন সব দ্রব্য আমদানি করতে পারবে যার উৎপাদন খরচ বেশি। অন্যদিকে, বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দ্রুত শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। কিন্তু এর জন্য শিল্পের যেসব কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা এখনও বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না। একমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই এগুলো আমদানি করে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাত্তের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় বেড়েছে অনেক বেশি। এ অবস্থা বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করছে।
বাংলাদেশ স্বল্পসংখ্যক পণ্য রপ্তানি এবং অধিকসংখ্যক পণ্য আমদানি করে। স্বভাবতই রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় অনেক বেশি। এজন্য বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে।
বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০০৯-২০১০ সালে ছিল ১৬২০৪.৬৫ যা বেড়ে ২০১০-২০১১ সালে দাঁড়ায় ২২,৯২৪.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার, আমদানি ব্যয় ২০০৯-২০১০ সালে ২৩৭৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১০-২০১১ তে দাঁড়ায় ৩৩৬৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয়ও বাড়ছে। কিন্তু এ রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয় অপেক্ষা খুবই কম। তাই বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর হয় না।
উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে বলা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে।

ঘ উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্যকেও সমর্থন করব। নিম্নে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—
১. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে অনেক ক্ষেত্রে ঋণদানকারী দেশ থেকে উচ্চ মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা স্বাধীনভাবে তুলনামূলক কম দামে বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো মানের পণ্য সামগ্রী আমদানি করা যায়।
২. বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর- নির্ভরশীল জাতি কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হয়, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল জাতি কর্ম বিমুখ হয়ে পড়ে।
৩. দেশ যদি দাতাদের ওপর নির্ভর না করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিদেশি প্রভাবমুক্ত থাকে। এতে করে গণতান্ত্রিক চর্চা, সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের বিশেষীকরণের ওপর জোরারোপ করা হয়।
উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য বাংলাদেশকে শর্তযুক্ত ঋণ কম গ্রহণ করতে হবে। সে সাথে গৃহীত বৈদেশিক সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তথা রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি: (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

আয়/ব্যয়	২০০৯-১০	২০১০-১১
পণ্য রপ্তানি বাবদ আয়	১৬২০৪.৬৫	২২৯২৪.৩৮
পণ্য আমদানি বাবদ ব্যয়	২৩৭৩৮.০০	৩৩৬৫৮.০০

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবধান কমানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্য নাকি বৈদেশিক বাণিজ্য কোনটি উত্তম? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক সাহায্য হলো একদেশ কর্তৃক অন্যদেশের জন্য সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে অর্থ সম্পদ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্যহেতু বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এ ধরনের কোনো বাধা থাকে না।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে সরকারি বাধা-নিষেধ, শুল্ক, কর, বৈদেশিক বিনিময় হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে বলে বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এরূপ সরকারি বিধি-নিষেধের পার্থক্য না থাকায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে জটিলতা থাকে না। তাই বলা যায়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাপ গ্রহণ করে নিচে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করা হলো।

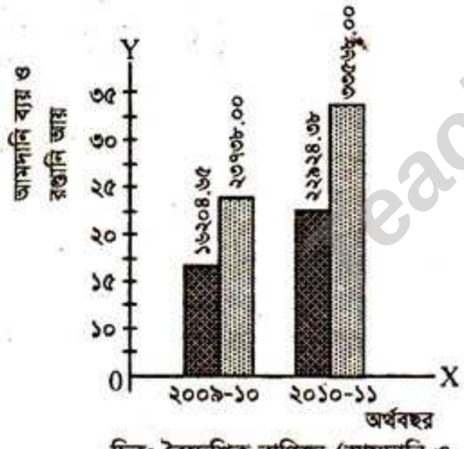

চিত্র: বৈদেশিক বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) স্তম্ভচিত্র

উপরের চিত্রের OX অক্ষে সময় (অর্থবছর) এবং OY অক্ষে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় দেখানো হয়েছে। চিত্রের চিহ্নিত স্তম্ভ দ্বারা রপ্তানি আয় এবং চিহ্নিত স্তম্ভ দ্বারা আমদানি ব্যয় নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা খুবই ব্যাপক। কিন্তু কোনো দেশের বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কেননা বৈদেশিক সাহায্যের যেমন সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে।

বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের সময় দাতা দেশ ও দাতা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের কঠিন শর্ত আরোপ করে থাকে। আর এসব শর্ত সবসময় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শুভ নাও হতে পারে। বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। আর এর ফলে একটি দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের উৎস হিসেবে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কারণ, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের মধ্যে যেসব সমস্যার আশঙ্কা থাকে সেগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সহজেই এড়ানো সম্ভব। এ জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল দেশসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। প্রত্যেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তার রপ্তানি পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এতে দেশের অর্থনীতি যেমন প্রভাবমুক্ত থাকবে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ বর্তমান বিশ্বে সম্পদের তারতম্যের কারণে প্রতিটি দেশ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে। এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর দেওয়া বিভিন্ন প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলো বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। তবে সে ক্ষেত্রে তারা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি সাহায্য গ্রহণকারী দেশটির ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবা প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্যহেতু বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এ ধরনের কোনো বাধা থাকে না।

২. বিভিন্ন দেশের মধ্যে সরকারি বাধা-নিষেধ, শুল্ক, কর, বৈদেশিক বিনিময় হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে বলে বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এরূপ সরকারি বিধি-নিষেধের পার্থক্য না থাকায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে জটিলতা থাকে না।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং মূলধন স্বল্পতার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে। এ ধরনের দেশে রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি আয় বেশি থাকে। অর্থাৎ অনুন্নত ও উন্নয়শীল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানিনির্ভর।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বর্তমান বিশ্বে সম্পদের তারতম্যের দরুন প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর হয়। এ ধরনের বাণিজ্য হতে কম-বেশি প্রতিটি রাষ্ট্র লাভবান হলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রতিকূল শর্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকে। তাছাড়া এই দেশগুলো শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে, কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে কৃষিপণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপন হলেও মূলধনী পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় লেনদেন ভারসাম্যে সর্বদা ঘাটতি বিরাজ করে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নত দেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ সৃজনশীল ২১ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৩ "থাকব নাক বন্ধ ঘরে..... বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে"— কবি নজরুলের এই ইচ্ছা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কেননা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের পুঁজি প্রযুক্তির অবাধ বাণিজ্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতি সামাজিক সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের বিশ্বব্যাপী অবাধ বিনিময়ের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জনমানুষের মধ্যে এক সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। ফলে আমদানি রপ্তানিতে পরিবর্তন এসেছে। এর প্রভাবে অর্থনৈতিক খাত সম্প্রসারিত হচ্ছে যা অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক দিক। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১

খ. আমদানি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য নষ্ট করে— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে ধারণার আলোচনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি কি শুধু সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সুবিধাই প্রদান করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

খ আমদানি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

সাধারণত দৃশ্যমান রপ্তানি আয় ও দৃশ্যমান আমদানি ব্যয় সমান হলে তাকে ভারসাম্য বাণিজ্য বলে। এ অবস্থায় আমদানি বৃদ্ধি পেলে আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের চেয়ে বেশি হয়। এর ফলে প্রতিকূল ভারসাম্য অর্জিত হয়। তাই বলা যায়, আমদানি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

গ উদ্দীপকে বিশ্বায়নের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীলতাই হচ্ছে বিশ্বায়ন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধনসহ পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ, বিনিয়োগের আন্তর্জাতিকীকরণ, বাজার উন্মুক্তকরণ এবং সীমানাবিহীন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই বিশ্বায়ন হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যেখানে বিশ্ব ক্রমবর্ধমান আন্তঃসম্পর্কিত ও আন্তঃসংযোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের পুঁজি ও প্রযুক্তির অবাধ বাণিজ্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবাধ বিনিময়ের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বিশ্বায়ন ধারণাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশ্বায়নের বহুমুখী সুবিধা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

বিশ্বায়নের ফলে পুঁজি, শ্রম ও উপকরণের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে স্থাপনের ফলে যেমন এ সকল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বহুজাতিক কোম্পানির উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বায়নের এ সকল সুবিধার সাথে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন- বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি ও শিল্প হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বিশ্বায়নের ফলে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক খাত সম্প্রসারিত হয়েছে। যা মূলত বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিক। কিন্তু এর নেতিবাচক দিক হচ্ছে দেশ দুর্বল ও শিশু শিল্পের ক্ষতিসাধন এবং দেশীয় সংস্কৃতিতে বিদেশি অপসংস্কৃতির আগ্রাসন।

আবার, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় পণ্যের বাজার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কম মূল্যে বিদেশি দ্রব্যের সরবরাহ বেশি থাকায় মানুষ দেশীয় পণ্যের ব্যবহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে দেশে আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে ও রপ্তানি কমে যাচ্ছে, যা বাণিজ্য শর্তকে প্রতিকূলতার দিকে ধাবিত করছে। এর ফলে সমাজে আয়বৈষম্য ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনকে ব্যাহত করছে। তাছাড়া মেধাপাচার, অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের কুপ্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা দেশ ও জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই বলা যায়, বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বের মানুষকে শুধু সুবিধাই প্রদান করছে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও প্রদান করছে।

প্রশ্ন ▶২৪ বিশ্বায়ন মানে অধিক বিনিয়োগ, অধিক উৎপাদন, অধিক কর্মসংস্থান, অধিক রপ্তানি ও জীবনের মানোন্নয়ন। বর্তমান সময়ের বাণিজ্য যুদ্ধ ও বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নানা মেরুকরণের ফলে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। বাংলাদেশ কাঁচাপাট, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, জুতা, সিরামিক সামগ্রী এবং ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিনসহ নানা প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে আসছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য ব্যবস্থায় আরও উন্নয়নের জন্য বাজার সার্ভে, শুল্ক রেয়াত, আয়কর সুবিধাসহ নানারূপ সুবিধা প্রদান করছে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আমদানি কী? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য কীভাবে প্রয়োজনীয়? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এ দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের যে উপায় চিহ্নিত হয়েছে, এর সাথে তুমি আর কি কোনো উপায় সুপারিশ করবে? আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এদেশের রপ্তানি পণ্যের অধিকাংশই শিল্পদ্রব্য। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যসমূহ।

বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে প্রথম থেকেই যেসব পণ্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকেই এদেশের প্রচলিত পণ্য বলা যায়। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচাপাট, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন প্রভৃতি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে— তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, জুতা এবং সিরামিক সামগ্রী। উদ্দীপকের এসব প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ দ্বারা এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে।

তবে বিগত প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্যের চেয়ে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের বিশ্ব চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে। সাম্প্রতিক হিসেবে বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে অপ্রচলিত পণ্যের অবদান শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগেরও বেশি।

ঘ উদ্দীপকে সরকার দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতিতে বাজার সার্ভে, শুল্ক রেয়াত, আয়কর সুবিধাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহদানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর এবং রপ্তানিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। বিদেশে আমাদের দ্রব্যের জন্য আরও অধিক এবং উত্তম বাজার খুঁজে বের করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইতোমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর সার্ভে সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়াও পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য ছাড়াও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের ওপর সরকার আয়কর রিবেটের সুবিধা প্রদান করছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

https://teachingbd24.com

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে দেশের রপ্তানি উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার যেসব উপায় গ্রহণ করেছে কেবল সেগুলোই যথেষ্ট নয়। এর সাথে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পুনর্গঠন, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হ্রাস, আমদানি নীতি উদারীকরণ, ট্যাক্স হলিডে, আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদান, পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল গঠন প্রভৃতি নিশ্চিত করা গেলে এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হবে।

উপর্যুক্ত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৫ বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব হওয়াতে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, কারিগরি জ্ঞান, শিল্পঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে ঔষধ, প্লাস্টিক সামগ্রীসহ বহু পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বুঝ? ১

খ. রপ্তানি হ্রাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নষ্ট করে—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কিরূপ ভূমিকা পালন করছে? ৩

ঘ. দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?—তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশীয় সীমানার ভেতরে সাধারণত একই দেশের অধিবাসী এবং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তার আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্যের ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। রপ্তানি হ্রাস উক্ত ভারসাম্য বিনষ্ট করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নষ্ট করে।

যদি কোনো দেশে রপ্তানি হ্রাস পায় অন্যদিকে আমদানি বাড়তে থাকে তাহলে সে দেশের আমদানি-রপ্তানি ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে থাকবে। এ অবস্থায় উক্ত দেশে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায় রপ্তানি হ্রাস একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নষ্ট করে।

গ সৃজনশীল ১৪ নং এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪ নং এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ বান্দরবানে প্রচুর আনারস উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত আনারসের মান যথেষ্ট ভালো। ব্যবসায়ীরা এ আনারস চট্টগ্রামের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। আবার সিলেটে প্রচুর ভালো মানের চা উৎপন্ন হয়। আমেরিকায় উৎপাদিত চায়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

[হলিক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. কেন বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকের চায়ের বাণিজ্যের গুরুত্ব নির্দেশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চা ও আনারসের বাণিজ্য কি একই ধরনের? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাধারণত, উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল হলে দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, বৈদেশিক দাতা সংস্থা বা দেশগুলো তাদের ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন কঠিন শর্তারোপ করে। এর ফলে পরনির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। তাই স্পষ্টতই বলা যায়, বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বাণিজ্যই অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকের চায়ের বাণিজ্যিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামে অভিহিত করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দুই বা ততোধিক দেশ যখন দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন— বাংলাদেশের সাথে আমেরিকা বা পৃথিবীর যেকোনো দেশের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যায়। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা ভোগ প্রভৃতি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগ, উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানির সুযোগ, কমমূল্যের পণ্য ক্রয়ের সুযোগ, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদকের দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সিলেটে ভালো মানের প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চায়ের আমেরিকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই চা আমেরিকার বাজারে বিক্রি করে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার চায়ের এই বাণিজ্য আন্তর্জাতিকভাবেই হয়ে থাকে। তাই চায়ের বাণিজ্যিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যেতে পারে। আর উভয় দেশের তথা বাংলাদেশ ও আমেরিকার অর্থনীতিতে এ বাণিজ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
২০১০-২০১০	২০১০-২০১১	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১
১৬২০৪.৬৫	২২৯২৪.৩৮	২৩৭৩৮	৩৩৬৫৮

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. 'রপ্তানি শুল্ক হ্রাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কীরূপ ভারসাম্য বিরাজ করছে? কেন? ৩

ঘ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য তুমি কোন ধরনের নীতিকে সমর্থক করবে? কেন? ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে যে ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে তাকেই বৈদেশিক সাহায্য বলে।

খ রপ্তানি শুল্ক একটি পরোক্ষ কর যা দেশের রপ্তানি সামগ্রীর ওপর আরোপ ও আদায় করা হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য অনেক সময় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শুল্ক অব্যাহতি দেয়া হয়। এছাড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এভাবে রপ্তানি শুল্ক হ্রাস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাত্তের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় বেড়েছে অনেক বেশি। এ অবস্থা বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশ স্বল্পসংখ্যক পণ্য রপ্তানি এবং অধিকসংখ্যক পণ্য আমদানি করে। স্বভাবতই রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় অনেক বেশি। এজন্য বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে।

Teachingbd24.com

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০০৯-২০১০ সালে ছিল ১৬২০৪.৬৫ যা বেড়ে ২০১০-২০১১ সালে দাঁড়ায় ২২,৯২৪.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার, আমদানি ব্যয় ২০০৯-২০১০ সালে ২৩৭৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১০-২০১১ তে দাঁড়ায় ৩৩৬৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয়ও বাড়ছে। কিন্তু এ রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয় অপেক্ষা খুবই কম। তাই বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর হয় না।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে বলা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে।

ঘ উল্লিখিত তথ্যের আলোকে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের মধ্যে ব্যবধান। কমানোর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি আমি বৈদেশিক সাহায্যকেও সমর্থন করব।

দুই বা ততোধিক দেশ যখন আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় বৈদেশিক বাণিজ্য। অপরদিকে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ বা দান সুবিধাকে বলা হয় বৈদেশিক সাহায্য। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সাথে বৈদেশিক সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে অনেক ক্ষেত্রে ঋণদানকারী দেশ থেকে উচ্চ মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা স্বাধীনভাবে তুলনামূলক কম দামে বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো মানের পণ্যসামগ্রী আমদানি করা যায়। কিন্তু বিশ্বের উন্নয়নকারী বা অল্প উন্নত দেশসমূহ যখন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। তখন এসব দেশ রপ্তানির মাধ্যমে পর্যাপ্ত দেশজ সম্পদ বাড়াতে পারে না। উপরন্তু আমদানি ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধিতে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়। আয়ের তুলনায় ব্যয়ের ব্যবধান বেড়ে যায়। এর ফলে এই ব্যবধান হ্রাস করার জন্য ওইসব দেশ বিভিন্ন ঋণদাতা সংস্থা ও দেশের নিকট থেকে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য সহজ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD) বা বিশ্বব্যাংক, ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), ১৯৬৬ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কম-বেশি পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান কমাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সাথে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ সুবিধার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বাংলাদেশে শ্রমের সহজলভ্যতার কারণে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্পে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এ খাতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তবে বিদেশি বিভিন্ন ক্রিয়াশীল প্রতিপক্ষের কারণে আমাদেরকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাই সরকারের উচিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ বৃহৎ খাতটির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে অন্য খাতগুলোকে গুরুত্ব দেয়া। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বাণিজ্য শ্রেয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ কী কী? ৩

ঘ. বাংলাদেশের অপ্রচলিত দ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য বেশির ভাগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাধারণত, উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অধিক নির্ভরশীল হলে দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া বৈদেশিক ঋণের ওপর বিভিন্ন শর্তারোপ থাকায় পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। তাই স্পষ্ট বলা যায়, বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বাণিজ্যই অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প। বর্তমানে এ শিল্পটি অভ্যন্তরীণ অসুবিধা ও বিশ্বায়নের কারণে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ খাত হলো তৈরি পোশাক। কিন্তু এ পণ্যটির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। যেমন, তৈরি পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত না হওয়ায় আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মতো কাঁচামাল পাওয়া যায় না অথবা বেশি দামে তা ক্রয় করতে হচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আবার অধিকাংশ পোশাক কারখানাগুলোর শ্রমিকদেরকে আলো বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একসঙ্গে গাদাগাদি করে কাজ করতে হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের নিকট থেকে G.S.P সুবিধা প্রাপ্তির পরও ২০০৫ সাল থেকে অবাধ বাণিজ্য চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে বৃহৎ বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য চাহিদা সৃষ্টিকারী দেশ ও অঞ্চল বাংলাদেশকে তীব্র প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়। এতে দেশের বৃহৎ রপ্তানি পণ্যটি বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি সম্প্রসারণমূলক শিল্প হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ঘ বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ হলো তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সার ও রসায়নিক দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী প্রভৃতি। এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে এসব অপ্রচলিত পণ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো-

বাংলাদেশে কিছু দিন পূর্বেও যেসব পণ্য রপ্তানি করা হতো না কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হয় তা মূলত অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য। এ যাবৎ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় গুটিকয়েক পণ্যের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের এক বৃহত্তম খাত হলো তৈরি পোশাক, যা থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ ভাগ আসে। এ তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চিংড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক সার, পাদুকা; সিরামিক প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকায় এসব পণ্যের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। এগুলোও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির সিংহভাগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে হয়। এ সীমিত সংখ্যক দেশগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও যদি রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা যায় তবে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। এর ফলে দেশটিতে খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব, প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য লাঘব হবে। আবার দেশের অভ্যন্তরে এসব উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হলে দেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন বাড়বে, নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে, মূলধনের গতিশীলতা বাড়বে, কর্মস্থান বাড়বে।

উপরের আলোনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রচলিত দ্রব্যের চাহিদা বেশি থাকায় এসব দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে অপ্রচলিত দ্রব্যের গুরুত্ব অনেক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। বিশ্বায়নের যুগে প্রচুর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয়ে খুব দ্রুত দেশটিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা ও সঠিক তত্ত্বাবধান। *[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

https://teachingbd24.com

ক. কুটির শিল্পের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. বৈদেশিক সাহায্যের ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের তুলনামূলক সুবিধা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন, সহজলভ্য কাঁচামাল ও ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত শিল্প হলো কুটির শিল্প।

খ কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশে বিদেশ থেকে যে ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে তাকেই বৈদেশিক সাহায্য বলা হয়।
অর্থাৎ কোনো দেশ অন্য দেশ বা বিদেশি সংস্থা থেকে স্বাভাবিক কিংবা জরুরি প্রয়োজনে যে অর্থ বা সম্পদ (মূলধনী দ্রব্য) শর্তহীন কিংবা শর্তযুক্তভাবে গ্রহণ করে তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

গ বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।
দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেওয়ার জন্য দাতা দেশ ও সংস্থা থেকে শর্তহীন ও শর্তযুক্তভাবে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ করে তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বিমুখী। কাজেই দুটি দেশের সমঝোতার ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক সাহায্য মূলত একমুখী। এক্ষেত্রে দাতা দেশ সাহায্য গ্রহণকারী দেশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা শর্ত চাপিয়ে দেয়।
বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কারণ অর্থনৈতিক। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দু'দেশে ভিন্ন হলেই তাদের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক সাহায্যের কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য হতে ভিন্ন। কারণ শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয় রাজনৈতিক ও মানবিক কারণেও বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ হয়ে থাকে।

ঘ একটি দেশের উন্নয়নের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এবং দাতাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তি এ দুটির মধ্যে কোনটি তুলনামূলক সুবিধা বেশি তা নিচে আলোচনা করা হলো—
বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় সরকার যদি বৈদেশিক বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। ফলে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে অর্থ ব্যয় করতে হয় না।
বৈদেশিক বাণিজ্য দেশের অভ্যন্তরে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব উদ্যোক্তা অব্যাহতভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে নিজেদের পণ্যসমূহের বৈদেশিক বাজার অন্বেষণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রাপ্তি, অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার ইত্যাদি ঘটে থাকে। ফলে একটি দেশ দ্রুত আত্মনির্ভরশীল হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। ফলে সেখানে বাড়তি বিনিয়োগ তথা মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য তখন বাধ্য হয়েই বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তা না হলে সংশ্লিষ্ট দেশটির উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। আত্মনির্ভরতা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতার নামে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্য পরিহার করা যথার্থ নয়। বৈদেশিক সাহায্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে নিজস্ব পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি, কূটনৈতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিনিময়, বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়। তাই সর্বদা বৈদেশিক সাহায্য কোনো ভালো বিষয় হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বলাকা এক্সপোর্ট হাউস বহু বছর ধরে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। তবে সাম্প্রতিককালে ফার্মটি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পাচ্ছে। প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে ফার্মটির এ ব্যবসায়ে টিকে থাকা কঠিন হবে। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশের কোন পণ্যের রপ্তানি থেকে সবচেয়ে বেশি আয় হয়? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন সংঘটিত হয়? ২
গ. বলাকা এক্সপোর্ট হাউস সাম্প্রতিককালে রপ্তানিপণ্য ও তার বাজারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফার্মটির ব্যবসায়ে টিকে থাকতে হলে যা যা করতে হবে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি আয় হয়।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বলাকা এক্সপোর্ট হাউস সাম্প্রতিককালে রপ্তানি পণ্য ও তার বাজারের ক্ষেত্রে বিভন্ন পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করছে।
প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে এ যাবৎ প্রধানত তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হতো। কিন্তু এখন রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যে দ্রব্যগুলো এতোদিন রপ্তানি করা হতো এখন তার পাশাপাশি কম্পিউটার, সফটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও চামড়াজাত দ্রব্য, খেলনা ইত্যাদিও রপ্তানি করা হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, এতোদিন বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে চলতো। কিন্তু ইদানীং রপ্তানি দ্রব্যাদির বাজার বিস্তৃত হচ্ছে। এখন ঐসব ছাড়াও ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।
তৃতীয়ত, আজকাল বাণিজ্য করা ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়ছে; রপ্তানির ওপর আমদানিকারক দেশগুলোর বিভিন্ন শর্ত আরোপের দরুন এমনটি হচ্ছে; যেমন– চিংড়ি মাছ প্রক্রিয়াকরণে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার শর্ত আরোপ।
চতুর্থত, বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মানুষের রুচি ও ফ্যাশন বদলাচ্ছে। এ অবস্থায় রপ্তানিজাত দ্রব্যগুলোর মান চাহিদামাফিক না হওয়ায় সেগুলোর বাজার হারানোর আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। বলাকা এক্সপোর্ট হাউজে সম্প্রতিকালে রপ্তানি পণ্য ও তার বাজারে ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিবর্তনগুলো লক্ষ করছে।

ঘ পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাজারে ব্যবসায়ে টিকে থাকতে হলে বলাকা এক্সপোর্ট হাউজকে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

১. পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর ফলে পুরাতন গ্রাহকদের যেমন ধরে রাখা যাবে তেমনি গ্রাহকও পাওয়া যাবে।
২. বিশ্বব্যাপী ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে ভারত, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও বাজার অনুসন্ধান করতে হবে।
৩. বিশ্ব বাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নব্য ক্রেতারা যেসব শর্তে ব্যবসা করতে চায় সেগুলো মেনে ব্যবসা করার চেষ্টা করতে হবে।
৪. বিদেশি বাজার ধরে রাখতে ও তা সম্প্রসারিত করতে হলে মানসম্মত পণ্যাদি রপ্তানির ব্যবস্থা করতে হবে। এমনটি হলে ভালো দাম পাওয়া যাবে এবং ব্যবসা লাভজনক হবে।
৫. সফলতার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে হলে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ, কর-প্রত্যর্পণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ্য।
৬. বাজার টিকসই করতে হলে নিয়মিত আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। নিজ উদ্যোগে পৃথিবীর দেশে দেশে রপ্তানি দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে ফার্মটির পক্ষে ব্যবসায়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩১ 'ক' দেশ আগে শুধু একই ধরনের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করতো। এখন বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য রপ্তানি করে। নিজের দেশে অনেক শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে বিদেশ থেকে বড় বড় মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ছোটবড় সকল ব্যবসায়ীদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বিশ্বায়নের দুটি নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারার সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারার অসম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে— কথাটির সাথে তুমি কি একমত? এ পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবা প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ বিশ্বায়নের ফলে পুঁজিবাদের সূত্রপাট ঘটে যা সমাজে আয়বৈষম্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একটি দেশের মোট সম্পদের শতকরা ৯০ ভাগই কুক্ষিগত হয় গুটিকয়েক লোকজনের হাতে আর বাকি ১০ ভাগ থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নিকট। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ বৃদ্ধি পায়। এতে ধনীরা আরো ধনী ও গরিবরা আরো গরিব হয়।

আবার বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সৃষ্টি হচ্ছে। বিদেশি অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায় দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরির্তন আনা হয়েছে যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবর্তনের ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতীতে বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল থাকলেও সম্প্রতি এদেশের রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হলো তৈরি পোশাক। এ ছাড়াও কিছু কিছু অপ্রচলিত পণ্য যেমন— ফল, শাক-সবজি, পান-সুপারি, তামাক, মসলা, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি বাণিজ্যে যুক্ত রয়েছে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য রপ্তানি ছাড়াও বিলাসদ্রব্যের আমদানি হ্রাস, বৈদেশিক বাণিজ্য বিকেন্দ্রীকরণ, বাজার বিস্তার, দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি, ওয়েজ অবর্নার স্কিমের প্রচলন প্রভৃতি কার্যক্রম এদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশ রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি পরিবর্তনের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারাকে সম্পূর্ণ চিত্রায়িত করতে পারেনি।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অতীতের তুলনায় সমৃদ্ধ ও গতিশীল হলেও এখনও এর কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমাদের দেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এর ফলে আমাদের বিদেশি পরিবহন সেবার সাহায্য নিতে হয় যা পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি করে রপ্তানি আয় হ্রাস করে। অনেক সময় বিদেশি ক্রেতাদের সময়মতো পণ্য সরবরাহ করাও সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ রপ্তানি পণ্যের কাঁচামালই বিদেশ থেকে চড়া মূল্যে আমদানি করতে হয়। এতে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় বাণিজ্যিক লাভ অনেক কমে যায়। এ ছাড়াও রপ্তানি বাজারের সংকীর্ণতা, দক্ষ জনশক্তি ও উন্নত প্রযুক্তির অভাব প্রশাসনিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি বাধার জন্য এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেও কতিপয় বাধা-বিপত্তির কারণে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে মন্থরগতি বিরাজ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আংশিক বা অসম্পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶৩২ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উভয়ই মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তবে মুদ্রা, ব্যাংক ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যয়, বাজার অবস্থা ইত্যাদির ভিন্নতা এ দুই বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি একচেটিয়া বাজার প্রতিরোধ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির দুটি উপায় লেখ। ২

গ. মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের সীমানার ভিতরে সাধারণত একই দেশের অধিবাসী এবং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির দুটি উপায় হলো উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের মনোন্নয়ন করা।

উৎপাদন বৃদ্ধি: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য প্রথম ও প্রধান উপায় হলো রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো। রপ্তানিযোগ্য প্রচলিত দ্রব্য ও অপ্রচলিত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণে বাড়াতে পারলে সহজে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত হবে।

রপ্তানি পণ্যের মনোন্নয়ন: পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস, আইটেম বৃদ্ধি বা শ্রেণিবিন্যাস বিষয়গুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পণ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন। গুণগত মান ঠিক থাকলেই কেবল উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে রপ্তানি সম্প্রসারণ হতে পারে।

গ মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র দেশীয় তথা একই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশীয় মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তা দ্বারা দেনা-পাওনা মেটানো যায় না। সেক্ষেত্রে প্রথমে দেশীয় মুদ্রার সাথে বাণিজ্যরত দেশগুলোর মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করতে হয়। কাজেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দ্রব্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় বাবদ দেনা-পাওনা যত সহজে মেটানো যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তা করা যায় না।

ব্যাংক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতেও এ দুধরনের বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। দেশের ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে অভিন্ন ব্যাংকিং নিয়ম-নীতি অনুসৃত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ সুবিধা ভোগ করা যায় না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই ব্যাংকিং নিয়ম-নীতি এবং পৃথক মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি থাকে। এসব নীতির ভিন্নতা ব্যাংকিং কার্যক্রমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বাণিজ্যরত দেশগুলোর ব্যবসায়ীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের ব্যাংকিং নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত থাকা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক লেনদেনের নিষ্পত্তি ঝামেলাপূর্ণ, শ্লথ ও সময়-ক্ষেপণকারী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বলা যায়, দেশভেদে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের চেয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা কঠিন হয়।

ঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানি করা হয়। ফলে নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর উত্তম ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়। এভাবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। আবার, কোনো দেশ কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করতে না পারলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্যদেশ থেকে তা আমদানি করে ভোগ করতে পারে।

https://teachingbd24.com

বাংলাদেশে প্রতিবছরই খাদ্য ঘাটতি থাকে। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দ্রব্য উৎপন্ন করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় এসব দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও বাণিজ্য পরিচালনায় দক্ষতা লাভ করতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে জরুরি অবস্থা দেখা দিলে অন্যদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে অতি সহজেই এরূপ সঙ্কট মোকাবিলা করতে পারে।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহদানের জন্য রপ্তানিকারকদের আয়কর সুবিধা, রপ্তানি ঋণ, শুল্ক রেয়াত ও কর অবকাশ সুবিধা দিচ্ছে। এতে পাট, পাটতাজদ্রব্য, চা, চামড়া, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে অপ্রচলিত দ্রব্যের অবদান শতকরা প্রায় ৮০ ভাগেরও বেশি। উল্লেখ্য যে, রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহদানের জন্য সরকার সর্বোচ্চ সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি ট্রফি, সনদ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলা হয়? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্য আমাদের পরনির্ভরশীল করে তোলে– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানিপণ্য বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের রপ্তানি কাঠামোতে বৈচিত্র্য এনেছে– উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ রপ্তানি বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করছে– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

খ বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

বৈদেশিক সাহায্যগ্রহীতা দেশ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে না। কারণ দাতা দেশ সাহায্য গ্রহীতা দেশের জন্য এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে যাতে দাতা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়, নিজেদের তৈরি মূলধন দ্রব্য বিক্রি এবং উপদেষ্টার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন হয়। এ ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের সুদের হার বেশি। তাই বছরের পর বছর ঋণ গ্রহণের ফলে ঋণগ্রহীতা দেশের ঋণ ও সুদের হার অনেক ক্ষেত্রে অপরিশোধ্য থাকে, যা পরিশোধের জন্য আবার নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তাই বৈদেশিক সাহায্য দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

গ প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের রপ্তানি কাঠামোতে যে বৈচিত্র্য এনেছে উদ্দীপকের আলোকে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে প্রথম থেকেই যেসব পণ্য রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকে এদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা যায়। এসব পণ্যের মধ্যে কয়েকটি কৃষিপণ্য এবং বেশিরভাগই কৃষিনির্ভর শিল্পদ্রব্য। কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, কাগজ, ফার্নেস ও বিটুমিন প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য। আর সাম্প্রতিককালে যেসব দ্রব্য বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যে সংযোজিত হয়েছে সেগুলোকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, জুতা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, শাকসবজি ও ফলমূল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান।

প্রথমদিকে বাংলাদেশ শুধু প্রচলিত পণ্য রপ্তানি করত। এসব পণ্যের ক্রেতা মুষ্টিমেয় বলে রপ্তানি আয় কম হচ্ছিল। কিন্তু অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি শুরুর পর থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নয়নের হাওয়া লেগেছে। কেননা এসব পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় পণ্য প্রদান করতে পারছে, যার ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে।

ঘ রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের এই বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ রপ্তানি বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করেছে।

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ এবং তা দ্রুত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের রপ্তানি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শুল্ক অব্যাহতি দেয়। এ ছাড়াও আবগারি শুল্কও প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদান, রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ, স্কিম প্রবর্তন, এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সে বিশেষ সুবিধা, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

উপরিউক্ত সরকারি ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশের একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বাণিজ্য হলেও বহির্বিশ্বের সাথে কোনোরূপ বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। অপর দিকে 'B' দেশ বহির্বিশ্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে বাণিজ্য সম্পর্কে জড়িত। 'B' দেশের মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান 'A' দেশ অপেক্ষা উন্নত।

[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বৈদেশিক বাণিজ্য কী? ১

খ. বাংলাদেশ কোন ধরনের মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে? ২

গ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের বাণিজ্যের ধরনের পার্থক্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'A' দেশ অপেক্ষা 'B' দেশের মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে বাণিজ্যের কী কী ভূমিকা থাকতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

খ বাংলাদেশ মূলত কৃষিখাতের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে।

একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে। বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষি ও শিল্প খাতের প্রয়োজনে নানান ধরনের মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ভারী যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, কলকব্জা, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রধান।

গ 'A' দেশে অভ্যন্তরীণ এবং 'B' দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিদ্যমান।

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি এক হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতার পার্থক্য, পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা, পৃথক বাজারব্যবস্থা, পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ, পৃথক বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মুদ্রা ও ব্যাংকব্যবস্থা একই রকম। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে মুদ্রা রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের মধ্যে একই ধরনের কর ব্যবস্থা, আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি বিদ্যমান থাকায় কোনো সমস্যা হয় না। অপরদিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

Teachingbd24.com

তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজ দেশের মধ্যে পরিবহণ ব্যয় খুব একটা প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে পরিবহণ ব্যয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কারণ দূরত্ব অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই সরকার বিদ্যমান, ফলে কোনো সমস্যা হয় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক জাতীয় সরকার, ফলে পৃথক ও স্বাধীন বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। এ কারণে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।
পঞ্চমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

ঘ কোনো দেশের মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে 'A' দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অপেক্ষা 'B' দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এর সাহায্যে দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হয়।
উদ্দীপকের "A" দেশটি মূলত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যনির্ভর। বহির্বিশ্বের সাথে উক্ত দেশটির কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। অপরদিকে 'B' দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আমদানি করার মাধ্যমে 'B' দেশ তার প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে 'B' দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। বিশেষ কিছু দ্রব্য নিজেরা উৎপাদন করতে না পারলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে 'B' দেশ সেইসব দ্রব্য অন্যদেশ থেকে আমদানি করার মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনীয় ভোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে। দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে সেই ঘাটতি পূরণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে 'B' দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব থাকলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তার 'B' দেশ সেই অভাব দূর করে শিল্পোন্নয়নে গতির সঞ্চার করতে পারে যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সাথে সাথে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকের 'A' দেশ অপেক্ষা 'B' দেশের মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ কবির সাহেব ঢাকা থেকে তৈরি পোশাক ক্রয় করে রাজশাহীর স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। তার বন্ধু জামাল সাহেব ভারত থেকে পেঁয়াজ, রসুন ক্রয় করে বাংলাদেশে বিক্রয় করেন। আর বাংলাদেশে থেকে শাক-সবজি ও হিমায়িত মাছ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. কেন আমদানি করতে হয়? ২
গ. উদ্দীপকের কবির সাহেবের ব্যবসা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, কবির সাহেব ও জামাল সাহেবের ব্যবসায় কোনো ভিন্নতা আছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কম হলে তখন আমদানি করতে হয়।
কোনো দেশ বা দেশের ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে আনলে তখন তাকে বলা হয় আমদানি (Import)। কোনো দেশ যখন তার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী দ্রব্য নিজে উৎপাদন করতে পারে না বা প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদন করে তখন তাকে বিদেশ থেকে সেই পণ্যদ্রব্য আমদানি করে প্রয়োজন মেটাতে হয়।

গ ধরন অনুযায়ী উদ্দীপকের কবির সাহেবের ব্যবসায়িকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা যায়।
একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার লেনদেনকে অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বলে। এ বাণিজ্য অভিন্ন মুদ্রা ও সরকারি বিধি-বিধান এবং প্রায় একই ধরনের বাজার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের অধীনে সম্পন্ন হয়ে থাকে।
উদ্দীপকের কবির সাহেব ঢাকা থেকে তৈরি পোশাক ক্রয় করেন। পরে সেই ক্রয়কৃত পোশাক তিনি রাজশাহীর স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন. তাকে ধরন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা চলে। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল তার নিজ জনগণের প্রয়োজনীয় সব রকম দ্রব্য সুবিধাজনক খরচে উৎপাদন করতে পারে না। অঞ্চলটি কম খরচে যেসব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে সেগুলো নিজস্ব ভোগের পর উদ্বৃত্ত অংশ অন্য অঞ্চলে বিক্রয় করে এবং এমন সব দ্রব্য সেখান থেকে ক্রয় করে যা নিজ অঞ্চলে উৎপাদন করতে খরচ বেশি হয়। এভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চল বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকের কবির সাহেবের ব্যবসায় ও জামাল সাহেবের ব্যবসায়ের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।
কবির সাহেবের ঢাকা থেকে পোশাক ক্রয় করে রাজশাহীর বাজারে বিক্রয় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অন্যদিকে, জামাল সাহেবের ভারত থেকে পণ্য নিয়ে এসে বাংলাদেশে বিক্রয় এবং বাংলাদেশের পণ্য মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এ দু'ধরনের বাণিজ্যের মূল ভিত্তি এক হলেও উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা পার্থক্য, পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা, পৃথক বাজার ব্যবস্থা, পৃথক অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি কারণে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।
প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মুদ্রা ও ব্যাংকব্যবস্থা একই রকম। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে মুদ্রা রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের মধ্যে একই কর ব্যবস্থা, আর্থিক ও রাজস্ব নীতি বিদ্যমান থাকায় কোনো সমস্যা হয় না। অপরদিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বিধায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় খুব একটা প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য পরিবহন করতে হয় বলে পরিবহন ব্যয় বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই সরকার বিদ্যমান, ফলে সমস্যা হয় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক জাতীয় সরকার পৃথক ও স্বাধীন বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। এ কারণে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। পঞ্চমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি কোনোভাবে প্রভাব ফেলে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।
উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কবির সাহেব ও জামান সাহেবের ব্যবসায় তথা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় নিম্নরূপ:

Indicator/অর্থবছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
রপ্তানি (মিলিয়ন টাকা)	২,৯৭০,৮৫৭	৩,৩৩০,২৯৫
আমদানি (মিলিয়ন টাকা)	৪,০০৪,৫৬১	৫,২৭৬,০০৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (উন্নয়ন মেলা-২০১৮) *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ১
খ. 'জিএসপি'— সুবিধা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে কীরূপ ভারসাম্য বিরাজ করছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য তুমি কোন ধরনের নীতিকে সমর্থন করবে? কেন? ৪

https://teachingbd24.com

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ জিএসপি হলো জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স। পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বে শুল্কমুক্ত অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়াকেই জিএসপি বলে।

শুল্কমুক্ত অগ্রাধিকার থাকলে যে দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয় যে দেশে কোনো প্রকার ভ্যাট, ট্যাক্স দিতে হয় না। এজন্য বায়ারদের অর্থ কম খরচ হয়। এতে করে তারা বেশি দামে পোশাক কিনতে ইচ্ছুক থাকে। এতে পোশাক রপ্তানিকারকের বেশি লাভ হয়। সাধারণত বিদেশি বায়াররা ওই সব দেশ হতেই পোশাক কিনে, যেসব দেশে জিএসপি সুবিধা আছে। তাই বলা যায়, জিএসপি সুবিধা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাত্তের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় অনেক বেশি বেড়েছে। এ অবস্থা বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশ স্বল্পসংখ্যক পণ্য রপ্তানি এবং অধিকসংখ্যক পণ্য আমদানি করে। স্বভাবতই রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় অনেক বেশি। এজন্য বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০০৯-২০১০ সালে ছিল ১৬২০৪.৬৫ যা বেড়ে ২০১০-২০১১ সালে দাঁড়ায় ২২,৯২৪.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার, আমদানি ব্যয় ২০০৯-২০১০ সালে ২৩৭৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১০-২০১১ তে দাঁড়ায় ৩৩৬৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয়ও বাড়ছে। কিন্তু এ রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয় অপেক্ষা খুবই কম। তাই বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর হয় না।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে বলা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে।

ঘ উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্যকেও সমর্থন করব। নিম্নে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

১. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে অনেক ক্ষেত্রে ঋণদানকারী দেশ থেকে উচ্চ মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা স্বাধীনভাবে তুলনামূলক কম দামে বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো মানের পণ্যসামগ্রী আমদানি করা যায়।

২. বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর- নির্ভরশীল জাতি কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যোগী হয়, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল জাতি কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

৩. দেশ যদি দাতাদের ওপর নির্ভর না করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিদেশি প্রভাবমুক্ত থাকে। এতে করে গণতান্ত্রিক চর্চা, সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের বিশেষীকরণের ওপর জোরারোপ করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ ব্যবধান কমানোর জন্য বাংলাদেশকে শর্তযুক্ত ঋণ কম গ্রহণ করতে হবে। সে সাথে গৃহীত বৈদেশিক সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তথা রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ 'X' ও 'Y' দুটি দেশ। 'X' দেশের একটি অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে বাণিজ্য সংঘটিত হলেও বহির্বিশ্বের সাথে কোনোরূপ বাণিজ্য সম্পর্ক নেই। অপরদিকে 'Y' দেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কে জড়িত। 'Y' দেশের মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান 'X' দেশ অপেক্ষা উন্নত। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অবাধ বাণিজ্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দ্রব্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'X' ও 'Y' দেশের বাণিজ্যের পার্থক্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' দেশের বাণিজ্যের গুরুত্ব কতটুকু বলে তুমি মনে কর? ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি কোনোরূপ বিধি-নিষেধ না থাকে, তবে তাকে অবাধ বাণিজ্য বলে।

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দ্রব্যের রপ্তানির মাধ্যমে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

কোনো দেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা ইত্যাদির জন্য কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। ফলে যে দেশটি যে দ্রব্যটি বেশি উৎপাদন করে সেই দ্রব্যটির উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করে বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য অন্য কোনো দেশ হতে আমদানি করে। এর ফলে বাণিজ্যে লিপ্ত উভয় দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।

গ সৃজনশীল ৩৪ নং এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' দেশের বাণিজ্য তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের জাতীয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে ভূমিকা রাখে। যেমন- দেশের উদ্বৃত্ত শ্রম, দ্রব্য ও সেবা নষ্ট না করে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় যা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, X দেশটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং Y দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত। এজন্য 'Y' দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করে উন্নয়ন সাধন করে। তাই 'X' দেশের চেয়ে 'Y' দেশে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত।

আবার, কোনো দেশ কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করতে না পারলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্যদেশ থেকে তা আমদানি করে ভোগ করতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিবছরই খাদ্য ঘাটতি থাকে। এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দ্রব্য উৎপন্ন করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় এসব দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও পরিচালনায় দক্ষতা লাভ করতে পারে।

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রভৃতি কারণে জরুরি অবস্থা দেখা দিলে অন্যদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করে অতি সহজেই এরূপ সংকট মোকাবিলা করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮

দেশ	কৃষিজ দ্রব্য	শিল্পজাত দ্রব্য	উৎপাদনের অনুপাত
A	২০	১০	২:১
B	১০	২০	১:২

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]

ক. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানার দৈর্ঘ্য কত? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তম— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে A ও B দেশের মধ্যে দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে কী ধরনের বাণিজ্য সংঘটিত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. A দেশ কৃষিনির্ভর এবং B দেশ শিল্পনির্ভর কী কী কারণে হতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

https://teachingbd24.com

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫৮২ মাইল বা ৪১৫৬ কি.মি।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাধারণত, উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল হলে দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, বৈদেশিক দাতা সংস্থা বা দেশগুলো তাদের ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন কঠিন শর্তারোপ করে। এর ফলে পরনির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। তাই স্পষ্টতই বলা যায়, বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বাণিজ্যই অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকে দুটি দেশের মধ্যে X দেশ কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করবে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করবে। আর, Y দেশ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে কৃষিজাত দ্রব্য আমদানি করবে। এতে দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলো দুই বা ততোধিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের আদান-প্রদান। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো দেশ এর ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে অবস্থিত অন্য কোনো দেশ বা একাধিক দেশের সঙ্গে যদি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের আদান-প্রদান করে তবে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে যেমন তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়, তেমনি কোনো অঞ্চল বা দেশও তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না। তাই একটি দেশের কোনো অঞ্চলকে বা দেশকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চল বা অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে দেশে যেসব দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণাদি সহজলভ্য সে দেশ কেবল সেসব দ্রব্যই উৎপাদন ও রপ্তানি করে। আবার কোনো দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণাদি দুষ্প্রাপ্য হলে সে দেশ সেই দ্রব্য আমদানি করে। এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে, X দেশটি কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি সুবিধা পায় আর Y দেশটি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে বেশি সুবিধা পায়। সে কারণে X দেশ Y দেশে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। সুতরাং, দুটি দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

ঘ উদ্দীপকের A দেশের কৃষি-নির্ভরতা ও B দেশের শিল্পনির্ভরতার কারণ নিচে আলোচনা কার হলো-

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য। প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলোর প্রাপ্তিতে পার্থক্য থাকে। কোনো দেশে ভূমি ও শ্রমশক্তি বেশি অথচ মূলধন সামগ্রী কম। আবার কোনো দেশে মূলধন পর্যাপ্ত থাকলেও শ্রমের যোগান সীমিত। এ কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। উৎপাদনের উপকরণ সহজলভ্যতা অথবা সুপ্রাপ্যতার কারণেই সেগুলোর দাম কম-বেশি হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্য ঘটে। এ অবস্থায় এক একটি দেশ এক একরকম দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা ভোগ করে। ফলে একটি দেশ ঐ দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করবে যার উৎপাদনে দেশটির আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা আছে। পক্ষান্তরে সেসব দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করবে যেগুলো নিজদেশে উৎপাদনে তার আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা নেই বা ব্যয় অসুবিধা রয়েছে।

উদ্দীপকের A দেশটিতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের অনুপাত ২ ঃ ১। অর্থাৎ ২ একক এবং কৃষিপণ্য উৎপাদন করলে শিল্পপণ্য উৎপাদিত হয় ১ একক। তাই দেশটিকে কৃষিনির্ভর দেশ বলা যায়। অপরদিকে B দেশটিতে ১ একক কৃষিপণ্য উৎপাদন হলে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন হয় ২ একক। এক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের অনুপাত ১ ঃ ২। অর্থাৎ B দেশটি শিল্পনির্ভর দেশ। ব্যয় সুবিধার তারতম্যই A ও B দেশের কৃষি ও শিল্পনির্ভরতার কারণ। এ ছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাতে, জনগণের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলোও দুটি দেশের দু'ধরনের পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য দায়ী। এর কারণ হচ্ছে মানুষের জীবিকা অর্জন, ভোগ, বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে। পরিবেশের তারতম্যের কারণেই কোনো দেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি আবার কোনো দেশে শিল্প। কোনো অঞ্চলের মানুষ কর্মঠ, প্রগতিশীল আবার কোনো অঞ্চলের মানুষ অলস প্রকৃতি ও অনুন্নত। সাধারণত কর্মঠ ও প্রগতিশীল মানুষের দেশ শিল্পনির্ভর ও অলস প্রকৃতির মানুষের দেশ কৃষিনির্ভর হয়।

উপরের আলোচনায় A দেশের কৃষিনির্ভরতা ও B দেশের শিল্পনির্ভরতার কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলবে	
দুটি দ্রব্যের লেনদেন হবে	
শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ	
উৎপাদন ব্যয় সর্বদা স্থির থাকবে	
পরিবহণ ব্যয় শূন্য	
অবাধ বাণিজ্য চালু থাকবে	
বাণিজ্যরত দেশগুলোর জাতীয় সম্পদ স্থির থাকবে।	

[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]

ক. লেনদেনের ভারসাম্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ২

গ. ছকে বিবৃত তথ্যসমূহ কী নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত তত্ত্বটি আধুনিক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা কীভাবে সমালোচিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের জনগণের সাথে অন্যান্য দেশের জনগণের সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেনের সুবিন্যস্ত হিসাবকেই ওই দেশের লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়।

খ যেকোনো দেশের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে শ্রম, মূলধন এবং সেবার আদান-প্রদান ঘটে। এর ফলে ভোক্তা তাদের চাহিদা মতো পণ্য বা সেবা সহজেই পেতে পারে।

কোনো দেশ যদি তার অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের ঘাটতিতে থাকে তখন সেই দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উক্ত পণ্যের ঘাটতি মোচন করতে পারে। যেমন— আন্তর্জাতিক বাজার বা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেলাই মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মোবাইল ফোন আমদানি করে ভোগ করতে পারে। আবার একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট, চা, তৈরি পোশাক আমদানি করে তাদের চাহিদা মোচন করে।

গ উদ্দীপকের ছকে বর্ণিত তথ্যসমূহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব বা তুলনামূলক খরচ তত্ত্বকে নির্দেশ করে।

আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের মূলনীতি হলো, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে পারবে যদি সে চরমভাবে অন্য দেশের তুলনায় দ্রব্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ হয়। অপরপক্ষে যদিও একটি দেশ দ্রব্য উৎপাদনে অন্য সকল দেশের তুলনায় কম দক্ষ হয় তবুও সে অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য করবে। এ তত্ত্বের মূলনীতি অনুযায়ী একটি দেশ ওই সকল দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ন করবে এবং রপ্তানি করবে যে সকল দ্রব্য সে তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে।

Teachingbd24.com

আপেক্ষিক সুবিধা (প্রতি একক শ্রমে উৎপাদন)		
পাটজাত দ্রব্য	বাংলাদেশ	ভারত
	৪	৪
প্রসাধনী দ্রব্য	২	১২

উপরের ছকটিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারত প্রযুক্তিগত এমন উন্নয়ন করেছে যে, তারা এখন এক একক শ্রমে ৪টি পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম। একই শ্রম দিয়ে আবার ভারত ১২টি প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। এমন অবস্থায় দুটি পণ্য উৎপাদনেই ভারত বাংলাদেশের তুলনায় চরম সুবিধার আছে। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে ভারতের জন্য প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দেয়া বেশি সুবিধাজনক। আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী ভারত প্রসাধনী দ্রব্য এবং বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দিলে দুই দেশেরই মোট উৎপাদন বাড়বে এবং বাণিজ্যের মধ্যদিয়ে দুই দেশই লাভবান হবে। অর্থাৎ আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের বিষয়টি এভাবে সারসংক্ষেপ করা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সবগুলো দেশই লাভবান হবে যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, তুলনামূলক কম খরচে যেসব দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব সেগুলো বিশেষীকরণ ও রপ্তানি করে এবং আপেক্ষিক সুবিধা যেগুলো নেই সেগুলো অর্থাৎ সেগুলো উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি খরচ পড়ে সেগুলো যদি আমদানি করে।

ঘ উদ্দীপকের তত্ত্বটি তথা তুলনামূলক সুবিধা বা তুলনামূলক খরচ তত্ত্বটি আধুনিক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের মতে, যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের সূচনা হয় এবং ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ অর্থনীতিবিদের হাতে পরিমার্জিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব বলা হয়। রিকার্ডো প্রণীত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বটি ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, যা পরবর্তীতে হেবারলার এলি হেকশা ও তার ছাত্র বার্টল ওলিন প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা সমালোচিত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্বটি সমালোচনা নিম্নরূপ:

১. সমজাতীয় শ্রম অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদনশীলতা এক হতে পারে না।
২. এ তত্ত্বে উৎপাদনে সমানুপাতিক বিধি কল্পনা করা হয়েছে। বাস্তবে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান হতে পারে।
৩. পরিবহন ব্যয় কখনও শূন্য হতে পারে না।
৪. দুই দেশ ও কেবল দুই দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য নাও হতে পারে।
৫. সর্বদা অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করে না।
৬. একটি দেশের সম্পদ কখনও স্থির হতে পারে না।
৭. তত্ত্বে বলা হয়েছে উৎপাদনের উপাদানসমূহ দেশের মধ্যে গতিশীল হলেও আন্তর্জাতিকভাবে তা গতিশীল।
৮. চাহিদার দিক উপক্ষিত করা হয়েছে যদিও যোগানের ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪০ বাংলাদেশ একটি আমদানিনির্ভর দেশ। প্রতিবছর দেশটি রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি করে থাকে। সম্প্রতি দশটি প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি বেশ কিছু অপ্রচলিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। তাছাড়া রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শুল্ক রেয়াত, জ্বালানির মূল্য হ্রাস, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করছে। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবা প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ সৃজনশীল ২৮ নং এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হলো—

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানির মূল্য অপেক্ষা রপ্তানি মূল্য কম হলে লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা দেয়। আর এই ঘাটতি দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যেমন— প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি উদারীকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে প্রতি বছর রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বা লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এই ঘাটতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন— উৎপাদন বৃদ্ধি, শুল্ক রেয়াত, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি। কাজেই বলা যায়, উপরের পদক্ষেপসমূহ উক্ত ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

ঘ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথাযথ।

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ এবং তা দ্রুত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের রপ্তানি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

সরকার রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শুল্ক অব্যাহতি দেয়। এছাড়া আবগারি শুল্কও প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে ঋণ প্রদান, রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ, স্কিম প্রবর্তন, এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্সে বিশেষ সুবিধা প্রদান, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞান, উন্নত কলাকৌশল ইত্যাদির ওপরও যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

তাছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ স্কিম' প্রবর্তন করে। এ স্কিমের আওতায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে রপ্তানিকারকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ স্কিমটি চালু হওয়ায় ঋণের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলো পর্যাপ্ত।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৮: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

২৭০. বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ভিত্তি কোনটি? (জ্ঞান)
ক অর্থায়ন খ শিল্প
গ বাণিজ্য ঘ অর্থব্যবস্থা **গ**

২৭১. কোনটি বাণিজ্যের প্রসারিত রূপ? (জ্ঞান)
ক ব্যবসায় খ রপ্তানি বাণিজ্য
গ আমদানি বাণিজ্য ঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য **ঘ**

২৭২. কোন বাণিজ্যে বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির কল্যাণ অর্জনই মূল লক্ষ্য? (অনুধাবন)
ক অভ্যন্তরীন বাণিজ্য খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
গ সংরক্ষিত বাণিজ্য ঘ রপ্তানি বাণিজ্য **খ**

২৭৩. যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো রূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় না তাকে কোন বাণিজ্য বলে? (জ্ঞান)
ক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ সংরক্ষিত বাণিজ্য
গ বৈদেশিক বাণিজ্য ঘ অবাধ বাণিজ্য **ঘ**

২৭৪. আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধার জন্য কোনটি ঘটে? (অনুধাবন)
ক বাণিজ্য জোট খ প্রতিকূল বাণিজ্য
গ অনুকূল বাণিজ্য ঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য **ঘ**

২৭৫. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ কোন ধরনের বাণিজ্যের প্রবক্তা? (জ্ঞান)
ক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ বৈদেশিক বাণিজ্য
গ মুক্ত বাণিজ্য ঘ সংরক্ষণ বাণিজ্য **গ**

২৭৬. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়? (অনুধাবন)
ক কাঁচামাল আমদানি না করা
খ অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য
গ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি
ঘ মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য **খ**

২৭৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষেত্রে দ্রব্যের ওপর কোন শুল্ক আরোপ করা হয়? (জ্ঞান)
ক আবগারি শুল্ক খ আমদানি শুল্ক
গ রপ্তানি শুল্ক ঘ বাণিজ্য শুল্ক **ঘ**

২৭৮. কোনটি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার? (জ্ঞান)
ক ইউরোপীয় ইউনিয়ন খ যুক্তরাষ্ট্র
গ যুক্তরাজ্য ঘ চীন **খ**

২৭৯. কোনটি বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের বৃহৎ বাজার? (জ্ঞান)
ক ইউরোপীয় ইউনিয়ন
খ যুক্তরাষ্ট্র
গ যুক্তরাজ্য ঘ চীন **ঘ**

২৮০. পূর্বে বাংলাদেশ বিদেশে কোন ধরনের দ্রব্য রপ্তানি করত? (জ্ঞান)
ক ভোগ্যপণ্য খ মূলধনীপণ্য
গ কাঁচামাল ঘ হস্তাশিল্পপণ্য **গ**

২৮১. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে কোন খাতের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রয়েছে? (অনুধাবন)
ক সরকারি খাতে খ বস্ত্র খাতে
গ বেসরকারি খাতে ঘ ব্যক্তি খাতে **গ**

২৮২. কোনটি আমদানিকৃত শিল্প পণ্য? (জ্ঞান)
ক কলকব্জা খ লৌহ
গ স্টেপেল ফাইবার ঘ ইস্পাত **গ**

২৮৩. একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয় করলে তাকে কী বলে?(জ্ঞান)
ক আমদানি খ রপ্তানি
গ আমদানি বাণিজ্য ঘ রপ্তানি বাণিজ্য **ক**

২৮৪. যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশ অন্য দেশের পণ্য ও সেবা ক্রয় করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক আমদানি খ রপ্তানি
গ আমদানি বাণিজ্য ঘ রপ্তানি বাণিজ্য **গ**

২৮৫. বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ জন পরিবহন ও প্রাইভেট কার রয়েছে। এগুলোর জ্বালানি হিসেবে প্রতি বছর সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে কোনটি আমদানি করে? (প্রয়োগ)
ক পেট্রোলিয়াম শিল্পসামগ্রী
খ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম
গ স্টেপল ফাইবার ঘ ক্লিংকার **খ**

২৮৬. কাঁচাপাট উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের কত তম দেশ?(জ্ঞান)
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **খ**

২৮৭. কোন প্রতিষ্ঠান পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে? (অনুধাবন)
ক পাট অধিদপ্তর খ পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়
গ বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন
ঘ বিজেএমই **গ**

২৮৮. সেল ইস্টার্ন পেট্রোলিয়াম লি. কোম্পানি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক চট্টগ্রামে খ ইসলামাবাদ
গ সিঙ্গাপুরে ঘ দিল্লি **গ**

২৮৯. বিটুমিন কী? (জ্ঞান)
ক এক ধরনের মবিল খ এক ধরনের পেট্রোল
গ এক ধরনের পিচ ঘ এক ধরনের পাথর **গ**

২৯০. কোনটি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার?(জ্ঞান)
ক যুক্তরাষ্ট্র খ জার্মানি
গ যুক্তরাজ্য ঘ ফ্রান্স **ক**

২৯১. HR গ্রুপ প্রতি বছর শার্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড়, বিছানার চাদর, জিন্স প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করে। এগুলো কোন ধরনের অপ্রচলিত পণ্য? (প্রয়োগ)
ক নিটওয়্যার খ তৈরি পোশাক
গ হোম টেক্সটাইল ঘ হোসিয়ারি পণ্য **গ**

Teachingbd.com

২৯২. বিশ্বব্যাংকের মতে, ১৯৮০ দশক থেকে যে সব দ্রব্য প্রতি বছর রপ্তানি করা হয় সেগুলোকে কোন ধরনের পণ্য বলা হবে? (অনুধাবন)
ক প্রচলিত পণ্য খ অপ্রচলিত পণ্য
গ গার্মেন্টিস পণ্য ঘ হোসিয়ারি পণ্য **খ**

২৯৩. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে কোনটি উৎপাদনের কোনো বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান ছিল না? (জ্ঞান)
ক কাগজ খ সিমেন্ট
গ জুতা ঘ পাট **গ**

২৯৪. বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের মধ্যে চা-এর স্থান কত তম?(জ্ঞান)
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয়
গ চতুর্থ ঘ পঞ্চম **ক**

২৯৫. শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক কোন পুরস্কার দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ক প্রধানমন্ত্রী ট্রফি খ রাষ্ট্রপতি ট্রফি
গ বাণিজ্য ট্রফি
ঘ একটি সনদপত্র গোল্ড মেডেল **খ**

২৯৬. Globalization শব্দটির পৃথিবীতে প্রথম শুরু হয় কোন দশকে? (জ্ঞান)
ক পঞ্চাশের দশকে খ ষাটের দশকে
গ সত্তরের দশকে ঘ আশির দশকে **খ**

২৯৭. বিশ্বায়ন সম্পর্কে 'Introduction to Globalization' গ্রন্থটি কে লিখেছেন? (জ্ঞান)
ক এন্থনি গিডেন্স খ স্যাক
গ রোনাল্ড রবার্টসন ঘ মার্টিন আলব্রো **ঘ**

২৯৮. বিশ্বায়ন ধারণাটি মূলত 'গ্লোবাল ভিলেজের' ধারণা থেকে উদ্ভব—কে বলেছেন? (জ্ঞান)
ক মার্টিন এলকে খ অনিটা রডিস
গ মার্শাল ম্যাকলোহান ঘ গিলবার্ট **গ**

২৯৯. কোন দেশ অন্য কোনো সংস্থা থেকে শর্ত ব্যতীত আর্থিক বা অনার্থিক সাহায্য গ্রহণ করলে তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক দান খ মঞ্জুরি
গ ঋণ ঘ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ **খ**

৩০০. বাংলাদেশ সরকারের আমদানি হ্রাসের উল্লেখযোগ্য দিক হলো-(অনুধাবন)
i. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন
ii. বিলাস দ্রব্য আমদানি নিষেধ
iii. অপ্রয়োজনীয় আমদানির ওপর অধিক শুল্ক ধার্য
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, রর ও iii **খ**

৩০১. বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খনিজ তেল ও পেট্রোলিয়াম শোধন করে— (অনুধাবন)
i. ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড
ii. সেল ইস্টার্ন পেট্রোলিয়াম লি. কোম্পানি
iii. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লি.
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩০২. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মুখ্য উদ্দেশ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যাপক প্রচার
ii. বাজার অনুসন্ধান
iii. পণ্যের মান উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩০৩. সাধারণত বিশ্বায়ন বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
i. তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণকে
ii. মানুষের সুসম্পর্ককে
iii. গ্লোবাল ভিলেজকে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৪ ও ৩০৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ড. কাইয়ুম প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি গবেষণা করে দেখেছেন এখন বাংলা থেকে চাল, সুতি বস্ত্র, পান, সুপারি, তুলা প্রভৃতি রপ্তানি হতো। তখন বিদেশি বণিকেরা এদেশের হস্তশিল্প জাত পণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করত।

৩০৪. ড. কাইয়ুমের তথ্য মতে, আগে যেসব পণ্য রপ্তানি করা হতো সেগুলো থেকে বর্তমানে কোনটি সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়?(প্রয়োগ)
ক চাল খ সুতি বস্ত্র
গ তুলা ঘ পানসুপারি **গ**

৩০৫. উদ্দীপকের তথ্য মতে, কোন পণ্যটি বর্তমানে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য? (জ্ঞান)
ক চাল খ তুলা
গ বস্ত্র ঘ হস্তশিল্পজাত দ্রব্য **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৬ ও ৩০৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী বললেন, পৃথিবী এখন একটি বৃহৎ গ্রামে পরিণত হয়েছে। এর ফলে আমরা সহজে হাতের কাছে অনেক জিনিস পাই— তবে এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

৩০৬. বাণিজ্য মন্ত্রী বৃহৎগ্রাম বলতে কী বুঝিয়েছেন? (প্রয়োগ)
ক বিশ্ব গ্রাম খ বিশ্বায়ন
গ বাজার উন্মুক্তকরণ ঘ পণ্যের গতিশীলতা **খ**

৩০৭. উক্ত বিষয়েমন্ত্রী সর্তক করেছেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে
ii. বহুজাতিক কোম্পানির প্রাধান্য সম্পর্কে
iii. পণ্যের মূল্য হ্রাসকরণে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৯: সরকারি অর্থব্যবস্থা

প্রশ্ন ▶১ বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে প্রচুর ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় সরকারকে বিভিন্ন উৎস যেমন— নতুন মুদ্রা সৃষ্টি, অতিরিক্ত করারোপ, সরকারি তহবিল গঠন ইত্যাদি হতে অর্থসংস্থান করতে হয়। তবে অর্থসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ঋণ গ্রহণ। গৃহীত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে তা দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। *[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. পরোক্ষ কর কী? ১

খ. দিনদিন সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি অর্থসংস্থানের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার না হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে— তুমি কি এই ধারণার সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের ভার বা বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়, তাকে পরোক্ষ কর বলে।

খ দিনদিন সরকারের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারি কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা, দেশরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলে। বর্তমানে প্রতিটি দেশের সরকার কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বা সচেষ্ট। এজন্য সরকার মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি অর্থসংস্থানের পদ্ধতিগুলো হলো নতুন মুদ্রা সৃষ্টি, অতিরিক্ত করারোপ ও সরকারি তহবিল গঠন। নিচে সরকারি অর্থ সংস্থানের উক্ত পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

নতুন মুদ্রা সৃষ্টি: সরকার অনেক সময় নতুন নোট ছাপিয়ে তার ব্যয় নির্বাহ করে। অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ বা আয় দ্বারা ব্যয় মিটানো সম্ভব না হলে সরকার অতিরিক্ত কাগজি মুদ্রা ছাপাতে পারে।

অতিরিক্ত করারোপ: সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। অনেক সময় উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে সরকার স্বাভাবিক কর ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত কর আরোপ করে থাকে। একেই অতিরিক্ত করারোপ বলে।

সরকারি তহবিল গঠন: সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনা, ভবিষ্যৎ অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা তথা তহবিল গঠন করে। এই সরকারি তহবিল থেকেও অনেক সময় সরকার তার ব্যয় নির্বাহ করে।

ঘ সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হলে ঋণের ভার অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তা পূরণের জন্য সরকার দেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অথবা বিদেশ হতে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে সরকারি ঋণ বলে। সাধারণত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেটে ঘাটতিপূরণ প্রভৃতি কারণে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এই ঋণের সঠিক ব্যবহার না হলে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অথচ সরকারি ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত উভয় ভার দেশের জনগণের উপর বর্তায়। এতে দেশে আয় বৈষম্য দেখা দেয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সরকার তার অর্থসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ঋণের ভার জনগণের নিকট কম অনুভূত হয়। কিন্তু ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হলে ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। যা দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করবে। তাছাড়া, সরকারি ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। যা মানুষের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস করে। এর ফলশ্রুতিতে দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পাবে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

প্রশ্ন ▶২ ফরিদ স্যার অর্থনীতির ক্লাসে সরকারের আয়-ব্যয় আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলেন, সরকার দেশ পরিচালনায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এসব অর্থ সংগ্রহে সরকার আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি কর, বিক্রয় কর আরোপ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। প্রয়োজনে নতুন টাকা ছাপিয়ে অর্থের ব্যবস্থা করে। বৃহৎ আকারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সরকার আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠানের শর্ত পূরণ খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই উন্নয়ন কার্যক্রম ধীর গতিতে বাস্তবায়ন হয়। অথচ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন হচ্ছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় কীভাবে কর্মসংস্থান ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস উত্তম।— উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে আবগারি শুল্ক বলে।

খ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানারূপ বাস্তবায়নে অনেক অর্থ ব্যয় করে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যেমন নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি হয়, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মনে করা যাক, সরকার কোনো স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করল। এখন ওই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। সুতরাং, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কর রাজস্ব ছাড়াও সরকারের রাজস্বের অন্য উৎসটি হলো কর বহির্ভূত রাজস্ব। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

সরকার কর ছাড়াও বিভিন্ন সুবিধা বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। এসব আয়কে কর বহির্ভূত রাজস্ব বলে। যেমন— প্রশাসনিক ফি, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ, নোট ছাপানো, ডাক বিভাগ, রেলওয়ে ইত্যাদি। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশ সরকার ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থানের জন্য কর ছাড়াও বিভিন্ন খাত হতে আয় করে থাকে। অর্থাৎ সরকার কর রাজস্ব ছাড়াও কর বহির্ভূত রাজস্ব হতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণত কর বহির্ভূত রাজস্বকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

https://teachingbd24.com

ক. প্রশাসনিক রাজস্ব: প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করে তাকে 'প্রশাসনিক রাজস্ব' বলা হয়। যেমন- কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জরিমানা, বাজেয়াপ্তকরণ, নোট ছাপানো, ক্ষতিপূরণ, সাহায্য ও অনুদান ইত্যাদি।

খ. বাণিজ্যিক রাজস্ব: সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বাণিজ্যিক আয়। সরকার অনেক সময় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক বিত্তিতে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান হলো— ডাক বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, রেলওয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

ঘ 'উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস উত্তম'— কথাটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

সরকার নিজ দেশের জনগণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। পক্ষান্তরে, বিদেশি সংস্থা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে। তবে ঋণের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে সমাজের এক শ্রেণির হাত থেকে অর্থ অন্য শ্রেণির নিকট স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার থাকে না। শুধু প্রকৃত ভার আছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের দ্বারা এক দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, অন্য দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ঋণ পরিশোধে সমাজকে আর্থিক ও প্রকৃত ভার উভয়ই বহন করতে হয়।

অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যক। বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ঋণ শর্তমুক্ত। তাছাড়া, সরকার দেশি ঋণ গ্রহণে বা সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ প্রদানে কোনো দেশ বা সংস্থাকে বাধ্য করা যায় না।

উপরের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস হিসেবে বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৩ মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করে। কিন্তু যেকোনো দেশের সরকার ব্যয় অনুসারে আয় করে। সরকার আয়কর, সম্পদ কর, ফি, মুনাফা কর, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, VAT, আবগারি শুল্ক, লাইসেন্স ফি, উত্তরাধিকার কর, জরিমানা, ডাক, রাষ্ট্রীয় কারখানা ইত্যাদি উৎস হতে আয় করে থাকে। যদি এসব উৎসের আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান না হয় তবে ঘাটতি অর্থায়নের অংশ হিসেবে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নেয়। যদিও এ দুটো উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১

খ. 'প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসগুলোর কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘাটতি অর্থায়নের উৎস দুটির তুলনাপূর্বক, কোনটি অধিকতর কার্যকর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকেই সরকারি ব্যয় বলে।

খ প্রত্যক্ষ করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় না বলে এ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় তাকেই যদি করের বোঝা বহন করতে হয় তাহলে উক্ত করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ, এ করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। যেমন— আয়কর, ভূমিকর, সম্পদকর ইত্যাদি। এ সকল করের ভার সরাসরি করদাতাকেই বহন করতে হয়। এজন্যই এ সকল কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

গ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে। নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসগুলোর কর ও কর-বহির্ভূত (অ-কর) রাজস্ব চিহ্নিত করা হলো—

সাধারণত সরকারি আয়ের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. কর রাজস্ব এবং ২. কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কোনো প্রকার সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে সাধারণ স্বার্থে সরকারকে সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। এই কর থেকে যে আয় হয়, তাকে কর রাজস্ব বলে। আবার, সরকার কর ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে যে আয় করে তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে।

উদ্দীপকে কর রাজস্বের উৎসগুলো হলো— আয়কর, সম্পদ কর, মুনাফা কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক ও উত্তরাধিকার কর। অন্যদিকে, কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসগুলো হলো— ফি, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ডাক ও রাষ্ট্রীয় কারখানা।

ঘ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা না গেলে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। নিচে এই দুটি উৎসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সরকার দেশের জনগণ বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। অন্যদিকে, সরকার যদি বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে, তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ স্বেচ্ছামূলক। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে দেশের এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তরিত হয়। তাই এ ঋণের কোনো আর্থিক ভার নেই; শুধু প্রকৃত ভার আছে। অপরদিকে, বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত উভয় ভারই রয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও ঋণের শর্ত, ঋণ পরিশোধের সময় ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিবেচনা করে দেখা যায়, বৈদেশিক ঋণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৪ 'X' দেশের সরকার বর্তমান অর্থবছরে একটি নতুন কর আরোপ করেছে। এই করের করঘাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে। অর্থাৎ, এই করের করভার অন্যের ওপর চাপানো যায়। তাছাড়া সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের জনগণ এবং আমেরিকা থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সরকারি আয় কী? ১

খ. 'সরকারি ঋণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক আরোপিত করটি কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকারি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার তার সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে।

Teachingbd24.com

খ যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। আয়ের স্বাভাবিক উৎস থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা যায় না। তাই ঋণ নিয়ে সরকার জরুরি প্রয়োজন মেটায়। যেমন— বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে বলা হয়, 'সরকারি ঋণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা'।

গ উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক আরোপিত করটি হলো পরোক্ষ কর।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ, যে করের করঘাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে তার করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়, তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।

পরোক্ষ করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, মাদক শুল্ক প্রভৃতি। বাংলাদেশে কর রাজস্বের বেশির ভাগই পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। পরোক্ষ কর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে প্রদান করতে হয়। তাই করদাতারা এর বোঝা অনুভব করতে পারে না। এজন্য এ করকে জনপ্রিয় কর বলা হয়। পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না। পরোক্ষ কর ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকে প্রদান করতে হয়। তাই এ করের ভিত্তি খুবই বিস্তৃত।

ঘ উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের জনগণ এবং আমেরিকা থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছে। দেশের জনগণ থেকে ঋণ গ্রহণ অভ্যন্তরীণ উৎস; অপরদিকে, আমেরিকা থেকে ঋণ গ্রহণ বৈদেশিক উৎস।

সরকারি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ উত্তম বলে আমি মনে করি। বিষয়টি নিচে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ সংগ্রহ করা সহজ। কারণ, সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচনা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক উৎসগুলোকে বাধ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণপূর্বক ব্যবহার করতে হয়। যা অর্থনীতির জন্য অনেক সময় উপকারী হওয়ার চেয়ে অপকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবহারের কোনো শর্তের মোকাবিলায় করতে হয় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক জিনিসের প্রাপ্তির বিনিময়ে প্রদান আছে। তাই ঋণ গ্রহণ করলে পরিশোধও করতে হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকারকে নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ ও রৌপ্য আবশ্যক। চতুর্থত, ঋণের মেয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করলে বৈদেশিক উৎস, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বেশি সুবিধাজনক। কেননা বৈদেশিক ঋণ সবসময় দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মওকুফও করা হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ ঋণ সচরাচর স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে এবং তা মওকুফের ঘটনাও বিরল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সরকারি ঋণের দুটি উৎসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় বিষয়টি ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস সুবিধাজনক এবং বৈদেশিক উৎস অসুবিধাজনক। তাই যেকোনো দেশের সরকারকে বৈদেশিক উৎসের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶৫ শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের প্রশ্ন ছিল, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কী? শিক্ষক বললেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, নানা রকম ফি প্রভৃতি উৎস থেকে সরকার আয় করে এবং ব্যয় নির্বাহ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন নোট প্রচলন করে।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. পরোক্ষ কর কী? ১

খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর বিবরণ দাও। ৩

ঘ. সরকারের ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহের অসুবিধা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে।

খ আয়কর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরোপ করা হয় উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই এর সম্পূর্ণ ভার বহন করতে হয়। তাই আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

যে সকল করের ভার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি বহন করে এবং ইচ্ছা করলেই ওই করের ভার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপাতে পারে না সে সকল করকে সাধারণত প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। আয়করকেও প্রত্যক্ষ কর বলা যায়। কারণ, এই কর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে আরোপ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই এই কর পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে করের বোঝা অন্য কারো ওপর চাপানো যায় না। তাই আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর বিবরণ দেয়া হলো:

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর: সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। যে সকল করের ভার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজে বহন করে তাকে প্রত্যক্ষ কর এবং যে করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। প্রত্যক্ষ করের উৎসসমূহ হলো— আয়কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর ইত্যাদি। আর পরোক্ষ করের উৎসসমূহ হলো— মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক কর ইত্যাদি।

নানা রকমের ফি: ফি সাধারণত কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎস। সরকার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো বিশেষ ধরনের সুবিধা প্রদান করলে তার বিনিময়ে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। যেমন- রেজিস্ট্রেশন ফি, কোর্ট ফি, টোল ইত্যাদি।

সরকারি ঋণ: সরকার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এটি অ-কর রাজস্বের একটি উৎস।

নতুন নোট প্রচলন: সরকারের আদেশক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন নোট প্রচলন করে অর্থায়নে সাহায্য করে।

এভাবে সরকার তার প্রয়োজন বা ব্যয় অনুযায়ী, বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে থাকে। যখন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত অর্থায়ন সম্ভব হয় না তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঘ সরকার তার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তাকে সরকারি ঋণ বলে। উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত ঘাটতি বাজেট পরিলক্ষিত হয়, ফলে সরকার ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। এ সকল ঋণ পরিশোধের তথা ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১. সরকার ঋণকে অর্থ সংগ্রহের সহজ উৎসরূপে ব্যবহার করার জন্য প্রলোভিত হতে পারে।
২. এ ঋণ অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে।
৩. সরকারি ঋণের পরিমাণ বেশি হলে সমাজে আয় ও ধন বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।
৪. ঋণের প্রকৃত ভার দেশবাসীকেই বহন করতে হয় এবং জাতীয় আয়ের একাংশ সুদ হিসেবে চলে যায়।
৫. এ ঋণের ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ে।
৬. দাতা দেশের শর্ত পূরণ করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়তে হয়।

https://teachingbd24.com

এছাড়া, দাতা দেশের শর্ত পূরণ করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছাতে যেকোনো উন্নয়নশীল দেশকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনগণ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। ফলে সরকারের পক্ষে ঋণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সরকারি ঋণ গ্রহণ ও এর ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, যা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সরকারের উচিত ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত না হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬

বাজেট

২০১৪-১৫ অর্থবছর

আয়ের খাত	কোটি টাকায়	ব্যয়ের খাত	কোটি টাকায়
১. এনবিআর নিয়ন্ত্রিত আয়	১,৪৯,৭২০	১. কৃষি, যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	৭৫,৮৩৫
২. নন-এনবিআর নিয়ন্ত্রিত আয়	৫,৫৭২	২. শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত	৬৩,০২৭
৩. কর বহির্ভূত আয়	২৭,৬৬২	৩. সাধারণ সেবা	৫৯,০১৮
৪. অভ্যন্তরীণ ঋণ	৪৩,২৭৭	৪. সুদ পরিশোধ, ভর্তুকি ও পিপিপি	৫২,৬২৬
৫. বৈদেশিক ঋণ	২৪,২৭৫		
মোট =	২,৫০,৫০৬	মোট =	২,৫০,৫০৬

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. আয়কর কী? ১

খ. সরকার ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর বহির্ভূত আয়ের উৎসগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়— উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অর্জিত আয়ের ওপর যে কর প্রদান করে তাকে আয়কর বলে।

খ সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ঋণকে সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার নিজ দেশ ও বিদেশ উভয় ক্ষেত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

গ সরকার কর ছাড়াও বিভিন্ন সুবিধা প্রদান বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। এসব আয়কে 'কর-বহির্ভূত আয়' বা 'কর-বহির্ভূত রাজস্ব' বলা হয়। কর বহির্ভূত রাজস্বকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. প্রশাসনিক রাজস্ব: প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করে তাকে 'প্রশাসনিক রাজস্ব' বলা হয়। প্রশাসনিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত খাতগুলো হলো নিম্নরূপ:

ফি: কর-বহির্ভূত রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো ফি। যেমন— কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ট্রেড লাইসেন্স ফি ইত্যাদি।

জরিমানা: সরকারের প্রশাসনিক আয়ের অন্যতম উৎস হলো জরিমানা। আইন ভঙ্গের জন্য অপরাধীর নিকট থেকে শাস্তিস্বরূপ সরকার যে অর্থ আদায় করে তাকে 'জরিমানা' বলা হয়।

বাজেয়াপ্তকরণ: সরকারের কর-বহির্ভূত আয়ের আরেকটি উৎস হলো বাজেয়াপ্তকরণ। কোনো সম্পত্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী না থাকলে সরকার আইনের মাধ্যমে সে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে এবং তা থেকে রাজস্ব লাভ করে।

বিবিধ উৎস: উপরিউক্ত উৎসগুলো ছাড়াও আরো অনেক উৎস হতে সরকার আয় করে থাকে। এগুলো হলো: ১. নোট ছাপানো ২. স্বেচ্ছামূলক দান ৩. ক্ষতিপূরণ ৪. বিদেশি সাহায্য ও অনুদান প্রভৃতি।

খ. বাণিজ্যিক রাজস্ব: সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বাণিজ্যিক আয়। সরকার অনেক সময় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান হলো ডাকবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, রেলওয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

ঘ বাজেটে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হওয়ায় বলা যায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, মুনাফা অর্জন নয়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় এদেশের অর্থনীতি খুব বেশি সমৃদ্ধি নয়। সরকারের আয়ের খাতগুলো খুব সীমিত হওয়ায় প্রায়ই ঘাটতি বাজেট পরিলক্ষিত হয়। এ ঘাটতি মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণগ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা খুব কঠোর না হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয় না। তাছাড়া এদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন রকম উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে যাদের প্রকল্প ব্যয়ও কম নয়। আবার কৃষি, যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সরকারি ঋণের সুদ বাবদ প্রতিবছর সরকারকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয় যা অর্জিত আয়ের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এমতাবস্থায় সরকারের মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ সরকার নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের তথ্যানুসারে বলা যায়, সরকার উন্নয়নশীল খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি, যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭৫,৮৩৫ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করে। তাছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়নে ৬৩,০২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। এ সকল খাত হতে সরকার খুব বেশি লাভবান হতে পারে না। তবুও এ সকল খাতের উন্নয়নে সরকার পর্যাপ্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে দেখা যায় মোট ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হয়। সেক্ষেত্রে সরকার ঋণ গ্রহণ করে বাজেটে ভারসাম্য আনে। ফলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট আয় ২,৫০,৫০৬ ও মোট ব্যয় ২,৫০,৫০৬ অর্থাৎ উভয়ই সমান হয়। এক্ষেত্রে মুনাফা লাভের কোনো সুযোগ থাকে না।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ সরকার মুনাফা অর্জনের জন্য নয় বরং জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যয় করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৭ প্রফেসর সনৎ স্যার বাজেট বিষয়ক একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখছিলেন, এমন সময় একজন শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, স্যার, রাষ্ট্র পরিচালনার এত বিশাল পরিমাণ অর্থ সরকার কোথা থেকে পায়? এর জবাবে স্যার বললেন, সরকার জনগণকে নানারকম সেবা দিয়ে ফি গ্রহণ করে, জনগণের বাড়তি আয়ের ওপর কর ধার্য করে, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর (VAT) আরোপ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র থেকে সাহায্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এসব করার পরও অর্থের সংকুলান না হলে সরকার নতুন নোট প্রচলন করে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আয়কর কী? ১

খ. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে সরকারি আয়ের উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের সর্বশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব পড়বে?— ব্যাখ্যা করো। ৪

Teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক আর্থিক বছরের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের ওপর সরাসরি যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে।

খ পরোক্ষ কর বলতে ওই করকে বোঝায় যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে। অন্যকথায়, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যার ওপর কর ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে তা প্রদান করলেও পরে বর্ধিত দামের মাধ্যমে তা ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে। মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে করদাতা তার ওপর আরোপিত কর প্রদান করলেও পরে বর্ধিত দামের মাধ্যমে তা ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে। এজন্য এ করকে পরোক্ষ কর বলা হয়।

গ প্রদত্ত উদ্দীপকে সরকারি আয়ের বিভিন্ন উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে নিচে সরকারি আয়ের একটি তালিকা তৈরি করা হলো—

১. ফি
২. আয়কর
৩. মূল্য সংযোজন কর
৪. বৈদেশিক সাহায্য
৫. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ
৬. নতুন নোট ছাপানো।

১. সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধাদানের বদলে তার কাছ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত হারে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। ২. একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক আর্থিক বছরে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের ওপর সরাসরি ধার্যকৃত করই হলো আয়কর। ৩. কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বাজার দাম এবং ওই পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ব্যয়ের পার্থক্যকে মূল্য সংযোজন বলে; এর ওপর যে হারে কর আদায় করা হয় তাই হলো মূল্য সংযোজন কর। ৪. বিদেশি কোনো ব্যক্তি, এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও অনুদান সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস। ৫. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্পহার সুদে গৃহীত ঋণ হলো সরকারি আয়ের উৎস। ৬. সরকার বাড়তি ব্যয় নির্বাহের জন্য কখনো কখনো নোট ছাপায়, যা তার আয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ব্যয় নির্বাহের সর্বশেষ উপায় বা ব্যবস্থা হলো নতুন কাগজি নোট ছাপানো। আধুনিককালে পৃথিবীর সকল দেশের সরকার নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে। আয়ের চিরাচরিত উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সবসময় যথেষ্ট হয় না। তখন বাধ্য হয়েই সরকারকে নতুন কাগজি নোট ছাপাতে হয়।

উন্নয়নের জন্য বাড়তি ব্যয় মেটানো বা যেকোনো উদ্দেশ্যেই সরকার নতুন নোট ছাপাক না কেন, তার প্রভাব পড়ে দেশের মোট অর্থের যোগানের ওপর। নতুন নোট ছাপিয়ে বাড়তি ব্যয় নির্বাহের ফলে মজুরি, বেতন, খাজনা, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি আকারে জনসাধারণের আয় বাড়ে। প্রকারান্তরে তা জাতীয় আয় বাড়ায়। তবে এ পন্থায় সরকারি ব্যয় মেটানোর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে দেশে বিদ্যমান দামস্তরের ওপর। নতুন নোট ছাপিয়ে বিনিয়োগ বাড়লে তার দরুন অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়; কিন্তু এর সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ে না। এ অবস্থায় বাড়তি চাহিদা মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বৃদ্ধি করে জনদুর্ভোগ বাড়ায়।

তবে সরকারের বাড়তি ব্যয়ভার বহনের জন্য নতুন নোট ছাপানোর পদ্ধতি দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটালেও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে তা সহায়তা করে। মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ার কারণে মুনাফা বাড়লে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে ওঠে, যা পরিণামে উৎপাদন বাড়ায়।

তাই বাড়তি নোট ছাপানোর পাশাপাশি যদি অধিক পরিমাণে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনেরও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তবে সে অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। শুধু তাই-ই নয়, সরকারের হাতের এই বাড়তি অর্থ যদি ব্যয়বহুল ও অতি-প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের জন্য ব্যয় করা হয়, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের সর্বশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অর্থনীতির ওপর সুপ্রভাব পড়ে।

প্রশ্ন ▶ ৮

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. মূসক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে ধাপে যে মূল্য সংযোজন ঘটে তার ওপর আরোপিত করকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বলে।

যেমন— একজন কৃষক একটি গাছ লাগিয়ে গাছ বিক্রির মাধ্যমে ৫,০০০ টাকা আয় করেন। এক্ষেত্রে কৃষকের মূল্য সংযোজন ৫,০০০ টাকা। এখন মিল মালিক এ গাছকে চেরাই করে কাঠ বানিয়ে বিক্রয় করে ৭,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হলো ২,০০০ টাকা। সংযোজিত এসব মূল্যের ওপর কর আরোপ করা হলে যে কর পাওয়া যাবে তাই মূল্য সংযোজন কর মূসক।

গ বাংলাদেশ সরকার কর এবং কর বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় করে তাকে রাজস্ব আয় বলে। রাজস্ব আয়ের উৎসগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ক. কর রাজস্ব খ. কর বহির্ভূত আয়।

ক. কর রাজস্ব: সরকারি আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো কর রাজস্ব। কর রাজস্ব আয়ের উৎসগুলো হলো—

১. মূল্য সংযোজন কর: মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় একটি নির্ধারিত হারে কোনো দ্রব্যের মোট বিক্রয়ের ওপর কর হিসাব করে ওই দ্রব্যের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে কেবল নিট অর্থ মূল্য সংযোজন কর হিসেবে প্রদান করা হয়।
২. আমদানি শুল্ক: যেসব দ্রব্য আমদানি হয় সেসব দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আমদানি শুল্ক বলে।
৩. আবগারি শুল্ক: দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলে।
৪. আয় ও মুনাফার ওপর কর: দেশের জনগণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মুনাফার ওপর যে কর ধার্য হয় তা বাংলাদেশ সরকারের একটি আয়ের উৎস।
৫. ভূমি রাজস্ব: ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূমি ভোগ দখলের জন্য যে রাজস্ব সরকারকে প্রদান করা হয় তাই হলো ভূমি রাজস্ব।
৬. অন্যান্য কর ও শুল্ক: উপরিউক্ত কর ছাড়াও অন্যান্য কর যেমন— প্রমোদ কর, দান কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, বিজ্ঞাপন কর, পেট্রোল ও গ্যাসের ওপর শুল্ক ইত্যাদি থেকে সরকার প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে।

খ. কর বহির্ভূত আয়: কর রাজস্ব ছাড়াও কর বহির্ভূত আয় সরকারি আয়ের অন্যতম একটি উৎস। কর বহির্ভূত আয়ের উৎসগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো—

১. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ফি: বিভিন্ন দলিলপত্র তৈরি, মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র ইত্যাদির জন্য ফি প্রদান করে স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজপত্র ক্রয় করতে হয়। এর ফলে সরকারের প্রচুর আয় হয়।
২. মাদক শুল্ক: মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ওপর কর ধার্য করে বাংলাদেশ সরকার আয় করে থাকে।
৩. যানবাহন কর: বাংলাদেশ সরকার মোটর গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর ধার্য করে বেশ কিছু আয় করে।

https://teachingbd24.com

ঘ প্রথমত, কেইনসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে প্রতিটি দেশের সরকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষুধ সরবরাহ, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অবসর ভাতা, বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদান, শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রভৃতি কল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য সরকার প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। যা সামগ্রিক জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনসহ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিককালে সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য সরকারকে দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে ব্যয়ের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, শিল্প বিপ্লব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রায় সকল দেশেই শহরাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে। মানুষ হচ্ছে শহরমুখী। ফলে শহরাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৯ শিপলু বিদেশে বসবাস করে। সে দেশের সরকার জনগণের নিকট থেকে উচ্চ হারে কর আদায় করে এবং সেই দেশের আয়ের প্রধান খাত কর। দেশটি উন্নত না হওয়ায় প্রতি বছর অন্য দেশ থেকে অনুদান ও ঋণ গ্রহণ করে। দেশটি সামান্য-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী অন্য দেশে রপ্তানিও করে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কর কত প্রকার ও কী কী? ১

খ. সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সরকারের আয়ের খাতসমূহ কী কী? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সাথে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের খাতের মিল আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর দুই প্রকার। যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর।

খ সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; যথা— কর ও কর-বহির্ভূত উৎস।

কর প্রধানত দুই প্রকার; যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। আয়কর, সম্পত্তি কর, দান কর ইত্যাদি হলো প্রত্যক্ষ কর; অন্যদিকে মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি হলো পরোক্ষ কর। কর-বহির্ভূত আয়ের উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসগুলো হলো: ফি, বাণিজ্যিক আয়, সরকারি সম্পদ থেকে আয়, জরিমানা, সরকারি ঋণ, নতুন নোট ছাপানো, বিশেষ বাজেয়াপ্তকরণ, দান ও অনুদান ইত্যাদি।

গ কোনো দেশে সরকারি আয়ের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। তবে উদ্দীপকে দেখা যায়, শিপলু বর্তমান যে দেশে গিয়ে বাস করছে সেখানে সরকারি আয়ের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটিতে সরকারি আয়ের উৎসমূহের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

১. **কর:** কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি বা উপকারের আশা না করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু শর্তাধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাই হলো কর। এ কর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে রয়েছে আয়কর, সম্পত্তি কর, সম্পদ কর, দান কর, মূলধনী কর, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি। আর পরোক্ষ করের মধ্যে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি। দেশটির সরকার উচ্চ হারে বিভিন্ন কর আদায় করে বিপুল অর্থ আয় করে।

২. **অনুদান:** কতগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য এক দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে যে অর্থ সাহায্য করে তাই হলো অনুদান। অনুদান বাবদ উদ্দীপকের দেশটি অনেক অর্থ আয় করে।

৩. **ঋণ:** উদ্দীপকের দেশটির সরকার ব্যয় মেটানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণ, ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

৪. **রপ্তানি আয়:** উদ্দীপকের দেশটি থেকে যেসব দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয় তার ওপর শুল্ক আরোপ করেও সরকার কিছু অর্থ আয় করে।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির সরকারের আয়ের উৎসগুলোর সাথে বাংলাদেশের সরকারের আয়ের উৎসগুলোর মিল আছে কি না তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো বাংলাদেশের সরকারেরও আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। বাংলাদেশ সরকার দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে তার আয়ের সিংহভাগ অর্জন করে। সরকার প্রত্যক্ষ কর হিসেবে জনগণের আয় ও কোম্পানির মুনাফার ওপর আয়কর ধার্য করে প্রচুর অর্থ আয় করে।

উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো বাংলাদেশ সরকারও দ্রব্য ও সেবাকর্মের ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করে অর্থ আয় করে। সরকারের আরোপিত প্রধান পরোক্ষ করগুলো হলো— মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক। এছাড়া সরকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, যানবাহন শুল্ক, আমোদ-প্রমোদ কর, ভোগকৃত বিদ্যুতের ওপর কর, বিদেশ ভ্রমণের ওপর কর ইত্যাদির মাধ্যমেও আয় করে থাকে।

উদ্দীপকের দেশটির মতো বাংলাদেশও উন্নত নয়। এজন্য ওই দেশের সরকারের মতো এদেশের সরকারও বিদেশ থেকে অনুদান গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকের দেশের সরকারের মতো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো রপ্তানি কর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার উদ্দীপকের দেশটির সরকারের মতো কর ও কর-বহির্ভূত উৎস থেকে আয় করে। তবে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের এমন সব উৎস রয়েছে যা উদ্দীপকের সরকারের নেই। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সরকারের আয়ের উৎসগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶১০ সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য এসব খাতের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার বৈদেশিক সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ নেয়। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের ঋণ উত্তম বলে তুমি মনে করো? ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ অতীতের তুলনায় বর্তমানে সরকারের অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয়ও অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

Teachingbd24.com

১. **শিক্ষা:** শিক্ষা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, শিক্ষা খাতে অনুদান প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সাম্প্রতিক সময়ে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুদান, স্কুল ঝরে-পড়া রোধে মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদির দরুন এ খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েই চলেছে।

২. **প্রতিরক্ষা:** চিরাচরিতভাবেই সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো প্রতিরক্ষা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক দেশেরই সরকারের দায়িত্ব। দেশ-রক্ষার জন্য আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা প্রভৃতি বাবদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের সরকার একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বর্তমানকালের সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমান সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করায় এ খাতের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঘ উদ্দীপকে যে দু'ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তা হলো: অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ। এ দুধরনের ঋণের কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। নিচে এ উৎস দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো:

সরকারের পক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করা সহজ; কারণ সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচনা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে সুবিধাজনক। অভ্যন্তরীণ ঋণ নিতে গেলে সরকারকে কোনো শর্তের মোকাবিলা করতে হয় না। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে তা বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণ করেই ব্যবহার করা যায়। ফলে অনেক সময় ঋণের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা আবশ্যক হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ সুবিধাজনক।

উপরিউল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ উত্তম।

অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণ দেশে বিনিয়োগ, নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে। এ বর্দ্ধিত আয় দ্বারাই পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। কিন্তু বিদেশি ঋণ সুদ-আসলসহ পরিশোধ করতে হয় যা দেশের বাইরে চলে যায় ও আয় সৃষ্টিতে অবদান রাখে না। এটি আসলে জাতীয় আয় হ্রাস করে। তাই বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করাই উত্তম বলে মত দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ অর্থনীতি ক্লাসের এক ছাত্র শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, স্যার, সরকার অনেক টাকা আয় করে। এত টাকা সরকার কী করে? শিক্ষক উত্তরে বললেন, সরকার তার প্রশাসনিক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্র আবার প্রশ্ন করে যদি সরকারের টাকা না থাকে তাহলে কাজ কীভাবে করে? শিক্ষক বললেন, সরকারের আয় দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব না হলে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকে। *[রা.বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন শিক্ষার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বৈদেশিক উৎস অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক? যুক্তি দেখাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা না করে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তি সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যেকোনো জাতির প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। একমাত্র শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমেই জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

জ্ঞানই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ, যার প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান নয়। সেই জন্য প্রতিবছর শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোন্নয়ন, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তির সংখ্যা এবং হার বৃদ্ধি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন এবং উন্নয়নের গতিধারাকে টেকসই করার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়।

গ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। তবে বর্তমান সময়ে এসে সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণসহ অবকাঠামো নির্মাণকল্পে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা ও বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনেক সময় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্যোগে কৃষিজ ও অন্যান্য সম্পদের উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার রাজস্ব প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করতে পারে না। তাছাড়া রাজস্ব আয় দ্বারা এ ধরনের ব্যয় নির্বাহ করা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই, জরুরি অবস্থা যখন মোকাবিলা করতে পারে না তখন সরকার এরকম অবস্থা উত্তরণের জন্য অধিক ঋণ গ্রহণ করে ব্যয় বৃদ্ধি করে। সাম্প্রতিককালে সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। এজন্য সরকারকে দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

উপরিউক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রতি বছর অধিক ব্যয় বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।

ঘ সরকার নিজ দেশের জনগণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। পক্ষান্তরে, বিদেশি সংস্থা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে। তবে ঋণের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক। নিচে আমার যুক্তির পেছনের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো—

অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে অর্থ সমাজের এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির নিকট স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার থাকে না। শুধু প্রকৃত ভার আছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের দ্বারা এক দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, অন্য দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ঋণ পরিশোধে সমাজকে আর্থিক ও প্রকৃত ভার উভয়ই বহন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ করা

https://teachingbd24.com

বা ছাপানো নোট দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যক। বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা যায়। অভ্যন্তরীণ ঋণ শর্তমুক্ত। বৈদেশিক ঋণ যথেষ্ট শর্তযুক্ত। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে উচ্চ মূল্যের উৎপাদন ক্রয়, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক নির্দেশনামা মেনে চলতে হয়।

সরকার দেশি ঋণ গ্রহণে বা সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ প্রদানে কোনো দেশ বা সংস্থাকে বাধ্য করা যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি বলতে পারি যে, বৈদেশিক উৎস অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত সরকারি ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১২ অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ প্রতি বছরই এরূপ ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে আসছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের ব্যয়ের তুলনায় আয় সীমিত। ফলে দেশি-বিদেশি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলছে। এমতাবস্থায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী করের আওতা তথা আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব সংসদে পেশ করেন।

[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. সরকার কেন ঋণ গ্রহণ করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের উৎসগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারের আয়-ব্যয়ের খাতগুলো বিশ্লেষণ করে, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবনার বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ সৃজনশীল ৬ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের উৎসগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–১. অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ২. বৈদেশিক উৎস।

অভ্যন্তরীণ উৎস: কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করে এবং তা সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ শেষ উৎসস্থল। সরকার বিভিন্ন বন্ড, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। সরকার জরুরি প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিতে পারে। বাংলাদেশ সরকার সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ও সার্টিফিকেট বিক্রয় করে জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা ঋণ সংগ্রহ করে থাকে।

বৈদেশিক উৎস: সরকার বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সরকার দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি সমস্যা দূরীকরণের জন্য স্বল্পমেয়াদি এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। উপরিউক্ত উৎস থেকে, বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনে দেশের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী করের আওতা তথা আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব সংসদে পেশ করেন। করের খাতগুলো হলো–

মূল্য সংযোজন কর: মাননীয় অর্থমন্ত্রী মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। এটি সরকারের আয়ের প্রধান উৎসে পরিণত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

আমদানি শুল্ক: আমদানি শুল্ক সরকারের আয়ের অন্যতম একটি উৎস। সাম্প্রতিককালে আমদানির পরিমাণ অনেক বাড়ায় এ উৎস থেকে আয় বাড়ানোর জন্য মাননীয় মন্ত্রী প্রস্তাব করেন।

আবগারি শুল্ক: দেশে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ওপর যেমন– চা, চিনি, তামাক, সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, স্পিরিট, ওষুধ প্রভৃতির ওপর আবগারি শুল্ক বাড়ানো যায়।

আয় ও মুনাফার ওপর কর: যাদের বার্ষিক আয় ২.২০ লক্ষ টাকার অধিক তাদের ওপর প্রগতিশীল হারে আয় কর ধার্য করা যায়। তাছাড়া কোম্পানির আয়ের ওপরও আয় কর ধার্য করা যায়।

সম্পূরক শুল্ক: কিছু কিছু দ্রব্যসামগ্রীর ওপর আমদানি বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরেও অতিরিক্ত কর আরোপ করার কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেন।

অন্যান্য কর ও শুল্ক: উপরিউক্ত শুল্ক ও কর ছাড়াও সরকার আরও কিছু কর ও শুল্ক থেকে আয় করতে পারে। এগুলোর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ কর, সম্পত্তির কর, ভোগকৃত বিদ্যুতের ওপর কর, পেট্রোল ও গ্যাসের ওপর কর, বিদেশ ভ্রমণের ওপর কর, সেচ কাজ ও যন্ত্রপাতির ওপর কর ইত্যাদি প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ১৩ কবির সাহেব দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করছেন। সম্প্রতি ১৫ বছর পর দেশে বেড়াতে এসে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তবে এই উন্নয়নের পেছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা কোন কোন উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে তা তাকে ভাবিয়ে তোলে। বিষয়টি তিনি তার বন্ধু অর্ণবের সাথে আলাপ করেন এবং জানতে পারেন এদেশের নাগরিকরা এখন অনেক সচেতন। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব ছাড়াও সরকারের কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের অর্জিত অর্থ ও দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ, সাহায্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণ এর তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।

খ যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যার ওপর কর ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন করলেও শেষ পর্যন্ত করের চূড়ান্ত ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। যেমন- VAT। এ কর উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারকদের ওপর আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে করের প্রাথমিকভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহন করলেও চূড়ান্তভার ভোক্তাকে বহন করতে হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সাথে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য হতে যেসব আয় সংগৃহীত হয় তা সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বিশেষ ধরনের আদায় এবং বিবিধ উৎস। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয় যদি সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারি আয়ের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ধনী দেশ ও বন্ধু দেশ।

প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি কর রাজস্ব বাবদ অর্জিত হয়। কর ছাড়াও সরকার অন্য যেসব উৎস থেকে আয় অর্জন করে তা কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রশাসনিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক রাজস্ব নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভবান হলে সরকার ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ ধরনের অর্থ আদায় করে থাকে। এছাড়াও সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার হতে কর, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

https://teachingbd24.com

ঘ সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করেছে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট দেখা দিবে। ফলে বেসরকারি খাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার, ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান যেমন– বিমা কোম্পানি, লিজিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল সীমিত হলে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে।

তবে সরকার যদি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে মূলধনী খাতের জন্য ঋণগ্রহণ করে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অর্থবাজার অস্থিতিশীল হতে পারে।

পক্ষান্তরে সরকারের বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, কম সুদ ও দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র যদি দেশের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ঋণ অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না। বরং অর্থনীতির উপকার হয়। বিপরীত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণই শ্রেয়। কারণ, উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে উৎপাদন, আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ শাহনূর রহমান একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। তিনি যে বেতন ও ভাতাদি পান তার ওপর নির্ধারিত হারে কর প্রদান করেন। অন্যদিকে, একজন সাধারণ মানুষও সরকারকে বিভিন্নভাবে কর প্রদান করছেন। এভাবে সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের নিকট থেকে ও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। *[চি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ কী কী? ২

গ. শাহনূর রহমান যে কর প্রদান করেন তা সমাজে বিদ্যমান আয় বৈষম্য কীভাবে হ্রাস করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের প্রদত্ত কর ও শাহনূর রহমানের প্রদত্ত করের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো–

প্রত্যক্ষ কর: প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হলো- আয়কর,কর্পোরেশন কর, সম্পদ কর, দানকর, মৃত্যুকর, মুনাফা কর, ব্যয়কর প্রভৃতি।

পরোক্ষ কর: পরোক্ষ করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, মাদক শুল্ক প্রভৃতি।

গ শাহনূর রহমান তার আয়ের ওপর কর প্রদান করায় এটি আয়কর হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস পায়।

প্রতি বছর একটি দেশের সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে অর্থসংস্থানও করতে হয়। সরকারি আয়ের অন্যতম একটি উৎস হলো আয়কর। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর নির্ধারিত হারে কর ধার্য করা হয়ে থাকে। আর আয়কর হলো একটি প্রত্যক্ষ কর যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যের ওপর চাপাতে পারে না। জনসাধারণের সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার কর্তৃক আয়কর ধার্য হয় বলে সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস পায়। তাই এ কর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা এ কর থেকে সংগৃহীত অর্থ সরকার জনস্বার্থে ব্যয় করে থাকে। এর ফলে সমাজে সুষম উন্নয়ন ঘটে।

সমাজের ধনীক শ্রেণির বা প্রতিষ্ঠানের ওপর ধার্যকৃত কর আরোপ করার ফলে তাদের প্রকৃত আয় কমবে, ভোগ কমবে আবার প্রাপ্ত এ কর থেকে জনস্বার্থে ব্যয় করার ফলে দরিদ্র শ্রেণি উপকৃত হবে। তাদের ভোগ বৃদ্ধি পাবে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের প্রদত্ত কর হলো পরোক্ষ কর। অন্যদিকে শাহনূর রহমানের প্রদত্ত কর হলো আয়কর যা প্রত্যক্ষ কর হিসেবে বিবেচিত। নিচে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

১. প্রত্যক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় না। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়।

২. প্রত্যক্ষ করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার করদাতাকে বহন করতে হয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আপাতভার করদাতা বহন করলেও চূড়ান্তভার তাকে বহন করতে হয় না।

৩. প্রত্যক্ষ কর পরিশোধ কষ্টসাধ্য কারণ নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়। তাই প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর আদায় সুবিধাজনক কারণ দ্রব্য ক্রয় করলেই করের অর্থ পরিশোধ হয়ে যায়। তাই পরোক্ষ কর প্রিয়।

৪. প্রত্যক্ষ করের আওতায় শুধু ধনীদের আওতাভুক্ত করা যায় বলে এর ভিত্তি ব্যাপক নয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আওতায় ধনী-গরিব সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে এর ভিত্তি ব্যাপক হয়।

৫. প্রত্যক্ষ কর সাধারণত প্রগতিশীল হয়। পরোক্ষ কর সাধারণত অধোগতিশীল হয়।

৬. আয়কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

৭. প্রত্যক্ষ কর দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে তার দামকেও প্রভাবিত করতে পারে না। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর সরাসরি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে বলে দামকেও প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য এসব খাতের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার বৈদেশিক সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ নেয়। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সরকারি আয় কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের ঋণ উত্তম বলে তুমি মনে করো? ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে সরকারের রাজস্ব, প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প হতে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে সরকারি আয় বলে।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো হলো- শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রশাসন বিভাগ ইত্যাদি। নিচে সরকারি ব্যয়ের খাতগুলো আলোচনা করা হলো—

সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো দেশরক্ষা। সরকার দেশরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন, আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

Teachingbd24.com

সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়। কারণ- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সরকার বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে। যার ফলে এক্ষেত্রে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। সুতরাং, দেখা যায় যে, কোনো দেশের সরকারকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে যে দুই ধরনের ঋণের কথা বলা হয়েছে তা হলো অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ। নিচে এ দুই ধরনের ঋণের তুলনামূলক সুবিধা আলোচনা করা হলো—

সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা দানের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ হতে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। বৈদেশিক ঋণের উৎসে এ ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় না। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকার ঋণ গ্রহণ করলে সরকারকে কোনো শর্ত পালন করতে হয় না। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে সরকারকে অবশ্যই ঋণদাতাদের শর্ত পালনে বাধ্য থাকতে হয়।

বৈদেশিক উৎস হতে পাওয়া ঋণ দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। যার ফলে দেশে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঋণে এ অসুবিধা নেই। অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো ভার নেই। কারণ, ঋণ পরিশোধের পর সুদাসল দেশেই থেকে যায়, ঋণের অর্থ কেবল হস্তান্তর ঘটে। কিন্তু বৈদেশিক উৎস হতে গৃহীত ঋণের সুদ আসল দেশের বাহিরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে দেশ বঞ্চিত হয়। আবার, প্রায়ই লক্ষ করা যায় দাতা দেশ প্রদেয় ঋণের সাথে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়, উচ্চ সুদ পরিশোধের সময় কম এবং একাধিক ঋণের প্যাকেজ সংযুক্ত করে গ্রহীতা দেশের সার্বভৌম চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

ফলে আমার মতে, বাংলাদেশের ঋণ গ্রহণের জন্য অভ্যন্তরীণ মাধ্যমটি বেশি উত্তম বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশের সরকার প্রতি বছরই দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে তার বাজেটের আকার বৃদ্ধি করছে। এই বিশাল বাজেটের ঘাটতি ব্যয়ে অর্থসংস্থানের জন্য সরকার যেমন কর রাজস্বের ওপর নির্ভর করে তেমনি উক্ত অর্থ যথেষ্ট না হলে ঋণের উপরও নির্ভর করতে হয়। তবে অভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায় বৈদেশিক ঋণ সব সময় মঙ্গলজনক নয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উৎস ব্যতীত সরকারের রাজস্বের অন্য উৎসটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাজেটে অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে ঋণের উৎসদ্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ মূল্য সংযোজন কর (VAT) একটি পরোক্ষ কর হওয়ায় এই করের করঘাত অন্যের ওপর চাপানো যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে।

মূলত কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি দ্রব্য রূপান্তর করার ফলে যে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর VAT আরোপ করা হয়। অন্যদিকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর আয়কর ধার্য করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্বে VAT-এর চেয়ে আয়করের অবদান বেশি।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করেছে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট দেখা দিবে। ফলে বেসরকারি খাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার, ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান যেমন– বিমা কোম্পানি, লিজিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল সীমিত হলে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে।

তবে সরকার যদি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে মূলধনী খাতের জন্য ঋণগ্রহণ করে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অর্থবাজার অস্থিতিশীল হতে পারে।

পক্ষান্তরে সরকারের বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, কম সুদ ও দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র যদি দেশের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ঋণ অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না। বরং অর্থনীতির উপকার হয়। বিপরীত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণই শ্রেয়। কারণ, উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে উৎপাদন, আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সে জন্য বিভিন্ন খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকেও ঋণ নেয়। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক সুবিধার আলোকে কোনটি উত্তম বলে তুমি মনে করো? ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা না করে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তি সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ পরোক্ষ কর বলতে ওই করকে বোঝায় যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে। অন্যকথায়, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যার ওপর কর ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে তা প্রদান করলেও পরে বর্ধিত দামের মাধ্যমে তা ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে। মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে করদাতা তার ওপর আরোপিত কর প্রদান করলেও পরে বর্ধিত দামের মাধ্যমে তা ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করে। এজন্য এ করকে পরোক্ষ কর বলা হয়।

গ অতীতের তুলনায় বর্তমানে সরকারের অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয়ও অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

১. **শিক্ষা:** শিক্ষা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও

https://teachingbd24.com

ভাতা প্রদান, শিক্ষা খাতে অনুদান প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সাম্প্রতিক সময়ে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুদান, স্কুল ঝরে-পড়া রোধে মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদির দরুন এ খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েই চলেছে।

২. **প্রতিরক্ষা:** চিরাচরিতভাবেই সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো প্রতিরক্ষা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক দেশেরই সরকারের দায়িত্ব। দেশ-রক্ষার জন্য আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা প্রভৃতি বাবদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের সরকার একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বর্তমানকালের সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমান সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করায় এ খাতের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঘ উদ্দীপকে যে দু'ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তা হলো: অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ। এ দু'ধরনের ঋণের কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। নিচে এ উৎস দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো:

সরকারের পক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করা সহজ; কারণ সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচণা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে সুবিধাজনক। অভ্যন্তরীণ ঋণ নিতে গেলে সরকারকে কোনো শর্তের মোকাবিলা করতে হয় না। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে তা বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণ করেই ব্যবহার করা হয়। ফলে অনেক সময় ঋণের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা আবশ্যক হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ সুবিধাজনক।

উপরিউল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ উত্তম।

অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণ দেশে বিনিয়োগ, নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে। এ বর্ধিত আয় দ্বারাই পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। কিন্তু বিদেশি ঋণ সুদ-আসলসহ পরিশোধ করতে হয় যা দেশের বাইরে চলে যায় ও আয় সৃষ্টিতে অবদান রাখে না। এটি আসলে জাতীয় আয় হ্রাস করে। তাই বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করাই উত্তম বলে মত দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ অমিত একটি কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র। জুন মাসের একটি দৈনিক পত্রিকায় সে দেখতে পেল দেশের ২০১৮-১৯ সালের সরকারের আয় ব্যয়ের আগাম হিসাবের বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে দেশের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন উৎস এবং কোন কোন খাত হতে কত টাকা আয় হবে ও কত টাকা ব্যয় হবে তা উল্লেখ আছে। এতে করে যা সে বুঝতে পারল দেশে আয় ব্যয়ের ব্যবধান ঘুচানোর জন্য সরকারকে প্রতি বছর বিভিন্ন উৎসে নতুন করারোপ ও ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বাড়াতে হয়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১

খ. কোন কর জনপ্রিয় এবং কেন? ২

গ. অমিত সরকারের আয়ের যে উৎস সম্পর্কে জানতে পেরেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকার তার বাজেটের ঘাটতি মিটাবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তা কি যৌক্তিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকেই সরকারি ব্যয় বলে।

খ করদাতা পণ্য করের বোঝা অনুভব করতে পারে না বলে এটি বেশ জনপ্রিয় একটি কর।

পণ্য কর বলতে মূলত কোনো পণ্যের ওপর আরোপিত করকেই বোঝায়। যেমন- বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি কর, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি। এ ধরনের কর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে প্রদান করতে হয়। তাই করদাতা আলাদা করে এই করের ভার অনুভব করে না। এজন্যই মূলত, এই করটি জনপ্রিয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য হতে যেসব আয় সংগৃহীত হয় তা সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বিশেষ ধরনের আদায় এবং বিবিধ উৎস। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয় যদি সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারি আয়ের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ধনী দেশ ও বন্ধু দেশ।

প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি কর রাজস্ব বাবদ অর্জিত হয়। কর ছাড়াও সরকার অন্য যেসব উৎস থেকে আয় অর্জন করে তা কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রশাসনিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক রাজস্ব নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভবান হলে সরকার ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ ধরনের অর্থ আদায় করে থাকে। এছাড়াও সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার হতে কর, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার তার বাজেটের ঘাটতি মিটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করেছে। যা আমি যৌক্তিক মনে করি।

সরকার নিজ দেশের জনগণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ নেয় তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য সরকার নতুন করারোপ ও নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ উৎসের মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করা হলে সমাজের এক শ্রেণির হাত থেকে অর্থ অন্য শ্রেণির হাতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার থাকে না। শুধু প্রকৃত ভার থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, অমিতের দেশে সরকার আয়-ব্যয়ের ব্যবধান মিটাবার জন্য নতুন করারোপ ও ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে, বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করলে জাতীয় আয়ের একাংশ সুদ হিসেবে অন্য দেশে চলে যায়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ করলে বেসরকারি বিনিয়োগে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তবে ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত অমিতের দেশের সরকার ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যবহার করায় তা যৌক্তিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯

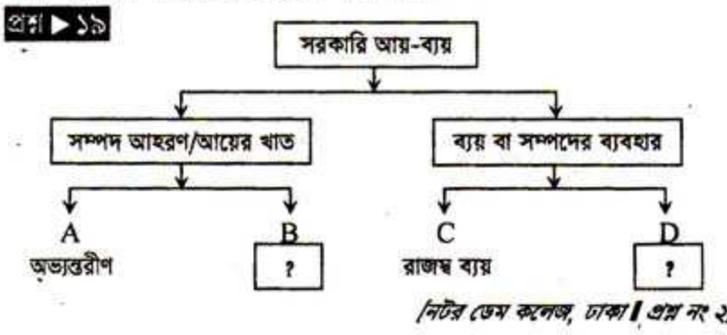

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

https://teachingbd24.com

ক. আমদানি শুল্ক কী? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতের উন্নয়ন আবশ্যক কেন?২
গ. উদ্দীপক হতে A খাতের উপাদানসমূহ কী কী? বিবরণ লেখ। ৩
ঘ. D খাতটি কী শুধু B খাতের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আমদানি শুল্ক বলা হয়।

খ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যেকোনো জাতির প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। একমাত্র শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমেই জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানব শক্তি। আর দক্ষ মানব শক্তির জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। সেই জন্য প্রতিবছর শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোন্নয়ন, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তির সংখ্যা এবং হার বৃদ্ধি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন এবং উন্নয়নের গতিধারাকে টেকসই করার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়।

গ উদ্দীপকে A খাতটি হচ্ছে সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ খাত।

দেশের জনকল্যাণ, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয় বাঁহের জন্য সরকার দু'ভাবে আয় করতে পারে। যথা- অভ্যন্তরীণ খাত ও বাহ্যিক খাত। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ খাতেকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) কর রাজস্ব (খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কর রাজস্ব হচ্ছে সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। এ আয়ের উপাদানসমূহ হচ্ছে- আয়কর ও মুনাফার ওপর কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, প্রমোদ কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর ইত্যাদি। অন্যদিকে, কর-বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হচ্ছে- ফি, বাণিজ্যিক আয়, সরকারি সম্পদ থেকে আয়, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি।

উপরিউক্ত উৎসগুলো থেকে সরকার প্রতিবছর আয় করে থাকে। কিন্তু এ আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় অনেক সময় সরকারকে বাহ্যিক উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'D' খাতটি হচ্ছে সরকারের মূলধনী ব্যয় এবং 'B' খাতটি হচ্ছে বাহ্যিক আয়। তবে সরকারের এ মূলধনী ব্যয় শুধু বাহ্যিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। কেননা সরকার মূলধনী ব্যয় মেটানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ থেকেও আয় করে থাকে।

উন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, সেচ প্রকল্প, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন, বন্দর ও বাঁধ নির্মাণ, পানিসম্পদের উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য সরকারের ব্যয়কে বোঝায়। অন্যদিকে, বৈদেশিক উৎস থেকে যেমন- বিদেশি সরকার, বিদেশি সংস্থা বা আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে সংগৃহীত অর্থ হচ্ছে সরকারের বাহ্যিক আয়।

উন্নয়নশীল দেশে মজবুত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিরাট অঙ্কের উন্নয়ন বাজেট তৈরি করে। যেমন- শিক্ষা অবকাঠামো প্রসার, চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি। এসব দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ব্যয় নির্বাহের জন্য কেবলমাত্র সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ যথেষ্ট নয়। তাই সরকারকে অনেক সময় বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মূলধনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার কেবল বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না।

প্রশ্ন ▶ ২০ আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণকর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচুর ব্যয় হয়। এছাড়া অন্যান্য চিরাচরিত খাত তো আছেই। কিন্তু সে তুলনায় রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সীমিত। এটি মোকাবিলা করা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সরকারি ব্যয় কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয় কেন আবশ্যক? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ব্যয়ের খাতগুলো কী? ৩
ঘ. উদ্দীপকে "রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সীমিত" আয় বৃদ্ধিতে সরকারের করণীয় কি? ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকেই সরকারি ব্যয় বলে।

খ কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ ও দক্ষতা বিকশিত করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয় আবশ্যক।

বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি সরকারের ব্যয়ের অন্যতম খাত হলো শিক্ষাখাত। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসার ও সেগুলোর পরিচালনা, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই বলা যায়, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যয়ের খাতগুলো হলো শিক্ষা ও প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ।

শিক্ষা সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতে ব্যয়ের ফলে দেশে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে যত দ্রুত মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায় তত দ্রুত একটি দেশ উন্নতি লাভ করে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটলে দেশে দক্ষ, কর্মঠ মানবসম্পদ বেরিয়ে আসবে এবং তারা উন্নয়নমূলক কাজে অধিক অবদান রাখবে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর অনেক মানবসম্পদ বিদেশে প্রেরণ করা হয়, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। সরকারের প্রধান ও পবিত্রতম দায়িত্ব হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। যার ফলে দেশ বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়। দেশ শত্রুমুক্ত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের অবস্থা স্থিতিশীল হলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ফলে দেশে মৃত্যুর হার হ্রাস পায়, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। আধুনিক বিশ্বের সকল দেশেই সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধিত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধির ফলে দেশে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ কমে আসে। দেশের বয়স্ক ব্যক্তিগণ পেনশন, বয়স্কভাতার মাধ্যমে জীবনযাপন করে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উন্নয়ন খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। ব্যয়ের খাতগুলো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার দেশের উন্নয়ন সাধন করে থাকে।

ঘ বাংলাদেশে সরকারকে প্রশাসনিক কার্যপরিচালনা, জনকল্যাণ সাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এ ব্যয় মেটানোর জন্য যতটা আয় করা দরকার বাংলাদেশ সরকার তা করতে পারে না। কারণ সরকারের ব্যয়ের তুলনায় আয়ের উৎসগুলো সীমিত।

https://teachingbd24.com

বাংলাদেশ সরকারের আয় তার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় সরকারের আয়ের পরিধি বাড়ানো দরকার। এ উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায় :

প্রথমত, এদেশের জনগণের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রোধ করতে পারলে সরকারের আয় বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, সরকার আয়কর ও সম্পত্তি করের হার বাড়িয়ে আয় বাড়াতে পারে।

তৃতীয়ত, গ্রামের ধনী লোকদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে আয় করের আওতায় আনলে সরকারের আয় বাড়বে।

চতুর্থত, বিলাসজাত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর উচ্চ হারে করারোপ করে সরকারি রাজস্ব বাড়ানো যায়।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতগুলোকে মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে পরিচালিত করলে সরকারের আয় বাড়বে।

ষষ্ঠত, কর বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও কর্মচারীদেরকে অপসারণ করলে সরকারের কর রাজস্ব বাড়বে।

সপ্তমত, আপ্যায়নের ওপর অধিক হারে করারোপ করে তা কঠোরভাবে আদায়ের ব্যবস্থা করলে সরকারি রাজস্ব কিছুটা হলেও বাড়তে পারে।

এভাবে দেখা যায় বিভিন্নভাবে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের পরিধি বাড়ানো যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মিস্টার নাজিমুদ্দীন মাসে ৭০ হাজার টাকা আয় করেন। এই আয়ে তিনি পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে হিমশিম খান। অথচ দেশের সরকার প্রথমে ব্যয় নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী কর বসিয়ে আয় করে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র তাই রাজস্ব আয় দ্বারা সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। তাই সরকার নোট প্রচলন করে এবং বৈদেশিক খাত থেকে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে।

[হলিক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. কেন সরকার ঋণ গ্রহণ করে? ২

গ. উদ্দীপকে কোন কোন অর্থব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার তুলনামূলক পার্থক্য নির্দেশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সরকারকে কেন হিমশিম খেতে হচ্ছে। তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।

খ সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ঋণকে সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার নিজ দেশ ও বিদেশ উভয় ক্ষেত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে ব্যক্তিগত ও সরকারি অর্থব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচে উক্ত অর্থব্যবস্থাগুলো তুলনামূলক পার্থক্য নির্দেশ করা হলো—

অর্থনীতির যে শাখায় ব্যক্তির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম আলোচনা করা হয় তাকে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা বলে। আর অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রম আলোচনা করে তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। সরকার সাধারণত ব্যয় অনুযায়ী আয় করে। আর ব্যক্তি তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করে। সরকারি আয় ব্যয়ের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন। এ জন্য সরকার মুনাফাকে প্রাধান্য না দিয়ে জনকল্যাণকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত সুবিধা ও মুনাফা অর্জন করা। এখানে জনকল্যাণ প্রাধান্য পায় না। এ ছাড়া সরকারি ঋণের ভার প্রতিটি জনগণের ওপরই পড়ে এবং এ ভার পরোক্ষ প্রকৃতির। কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণের ভার প্রধানত পরিবারের ওপর পড়ে এবং তা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির।

উপরের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত ও সরকারি অর্থব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারকে রাজস্ব আয়ের তুলনায় বেশি ব্যয় করতে হয় বলে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হয় বলে আমি মনে করি।

সরকার জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা সবসময় সরকারি ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। এ জন্য সরকার ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তার ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা করে থাকে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকার বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। জনকল্যাণমূলক এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য, সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, ঘাটতি বাজেট পূরণ করা, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ এবং সরকারি বিনিয়োগের জন্যও সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরকারের বিপুল অর্থের চাহিদার পরিবর্তে আয়ের খাত খুবই সীমিত। সরকার রাজস্ব আয়, নোট প্রচলন ও বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার চেষ্টা করে।

সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ২২ সরকারি আয়ের কয়েকটি খাত নিম্নরূপ: কোটি টাকা

খাত	১৯৯১-৯২	২০০৪-০৫	২০১৩-১৪
মূল্য সংযোজন কর	১৬৭৫	১০৬০৫	৪৫৮৭৭
আয়কর	১৩০০	৫৮৫০	৪৪৩৭০
আবগারি শুল্ক	১৩৬০	১৫০	১২০৬
ভূমি রাজস্ব	৮৫	৩২৬	৬৭৮

২০১৩-১৪ সালে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ১,৫৬,৬৭১ কোটি টাকা অথচ ২০১৩-১৪ সালের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২ লখ ২২২ কোটি টাকা। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রত্যক্ষ কর কাকে বলে? ১

খ. সরকারি ঋণের প্রধান উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে সরকারি আয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি খাত চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সরকারি আয়ই যথেষ্ট, ঋণের প্রয়োজনীয়তা নেই— মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- আয়কর, সম্পদ কর, ভ্রমণ কর ইত্যাদি।

খ সরকারি ঋণের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা।

রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দানসহ তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য বহুমুখী কাজ সম্পাদন করতে হয়। সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তখন সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বজায় রাখে। তাই বলা হয়, সরকারি ঋণের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নতি করা।

গ উদ্দীপকে সরকারি আয়ের সর্বাধিক দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো— ক. আয়কর খ. মূল্য সংযোজন কর।

আয়কর হলো সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জনগণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর ধার্য করা হয় এই কর। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এক বছরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের ওপর আরোপিত করকেই আয়কর বলা হয়। ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করযোগ্য

Teachingbd24.com

আয়ের ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করলেই নির্ধারিত হারে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর প্রদান করতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে করমুক্ত আয়ের সীমা ২,২০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি মূলত একটি প্রত্যক্ষ কর এবং যার উপর এই কর ধার্য করা হয় তাকেই করের বোঝা গ্রহণ করতে হয়। অন্য কারো উপর এ করের ভার স্থানান্তর করা যায় না। এর ফলে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব পড়ে বিধায় সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জিত হয়।

অন্যদিকে, মূল্য সংযোজন কর এক ধরনের পণ্যকর যা বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যে পার্থক্যের উপর নির্ধারিত হয় এই কর, বর্তমানে বাংলাদেশে এটি কর রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই করের বোঝা অন্যের উপর আরোপণ করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রগতিশীল হারে কর আরোপ করে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে স্বল্পহারে এবং বিলাসজাত দ্রব্যে উচ্চহারে কর আরোপ করে এ দুটি খাত সরকারি আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ আয়ের খাতগুলোর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে রাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় বিশাল ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। এজন্য তাকে ঋণও গ্রহণ করতে হয় কিন্তু সরকারি ব্যয় অপচয়মূলক হওয়ায় অনেকেই ঋণের প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন।

তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করার জন্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়বলীকে যুগোপযোগী করতে যে অর্থের প্রয়োজন তা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে শুধুমাত্র সরকারি সম্পদের মাধ্যমে এরূপ নির্মাণকাজ সম্ভব হয় না। তখন বাধ্য হয়েই সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

তাছাড়া অর্থনীতিতে আয়, নিয়োগ, উৎপাদন এবং দামস্তরের উত্থান-পতন খুব বেশি লক্ষ করা যায়। এরূপ উত্থান-পতন ঠেকাতে সরকারি ঋণ শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। মন্দাকালীন সময়ে সরকারের ঋণ গ্রহণ দ্বারা সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে বেকার সমস্যা লাঘব হতে পারে। এরূপ ঋণনীতি মন্দা এবং সমৃদ্ধি উভয় অবস্থা মোকাবিলা করতে সহায়ক। তাই সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন।

উদ্দীপকে যেহেতু ঘাটতি বাজেট পরিলক্ষিত তাই এরূপ অবস্থায় সরকারের ঋণ যদি উৎপাদনশীল খাতে নিয়োগ করা হয় তাহলে ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থান, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যা পরবর্তীতে বাজেটের ঘাটতি দূরীকরণে সাহায্য করবে। তাই কেবল সরকারি আয় নয়, সরকারি ঋণও প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মামুন স্যার অর্থনীতির ক্লাসে সরকারের আয় ব্যয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ছাত্রদের বললেন এ বছরের বাজেট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজেট। উন্নয়ন খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় এ বছর দেশে আরো বেশি করে উন্নয়ন হবে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কর কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি কীভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে? ২

গ. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকারের আয় বৃদ্ধির ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানারূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক অর্থ ব্যয় করে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যেমন নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি হয়, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মনে করা যাক, সরকার কোনো স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করল। এখন ওই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। সুতরাং, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

গ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত আয়।

সরকারি আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ উৎস হলো কর রাজস্ব। কর রাজস্ব আয়ের উৎসগুলো হলো-মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, আয় ও মুনাফার ওপর কর, ভূমি রাজস্ব। এছাড়াও রয়েছে প্রমোদ কর, দান কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, বিজ্ঞাপন কর, পেট্রোল ও গ্যাসের ওপর শুল্ক ইত্যাদি যা থেকে সরকার প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে। আবার, কর রাজস্ব ছাড়াও সরকার কর-বহির্ভূত উৎস থেকে প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ফি, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, প্রশাসনিক ফি, সুদ থেকে প্রাপ্ত আয়, প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি, অর্থনেতিক সেবা বাবদ প্রাপ্তি। সরকারের আয়ের উল্লিখিত উৎসগুলো ছাড়াও আরও কিছু উৎস রয়েছে। এগুলো হলো অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, ডাক বিভাগ, টোল ও লেভী, জরিমানা দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ, ভাড়া ও ইজারা প্রভৃতি।

সুতরাং বলা যায়, দেশের প্রশাসন পরিচালনা, দেশরক্ষা, জনকল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয়ের অর্থসংস্থানের জন্য কর ও কর বহির্ভূত উৎসগুলো থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে।

ঘ বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে প্রচুর ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। তার জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস যেমন-নতুন মুদ্রা সৃষ্টি, অতিরিক্ত করারোপ, সরকারি তহবিল গঠন ইত্যাদি হতে অর্থসংস্থান করতে হয়।

দেশের জনগণের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানসহ বহুমুখী কল্যাণকর কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলা হয়। অতীতে দেশের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। বর্তমান যুগে এসব কাজ ছাড়াও দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য সরকারকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাবার পানি সরবরাহ, কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য সরকারকে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হয়। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। আর এজন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িত অপরাধীদের বিচারের জন্য বিচারক নিয়োগ করতে হয়, এছাড়াও সরকারের প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। এসকল কাজে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এ ব্যয় মিটানোর জন্য সরকারের আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু দিন দিন সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সরকারের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সুতরাং সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সাধারণত মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করে। কিন্তু সরকার ব্যয় অনুসারে আয় করে। সরকার আয়কর, সম্পদ কর, ফি, মুনাফা কর, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, (VAT), আবগারি শুল্ক, লাইসেন্স ফি, উত্তরাধিকার কর, জরিমানা, ডাক, রাষ্ট্রীয় কারখানা ইত্যাদি উৎস হতে আয় করে থাকে। যদি এসব উৎসের আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান না হয় তবে ঘাটতি অর্থায়নের অংশ হিসেবে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নেয়। যদিও এ দুটো উৎসের সুবিধা অসুবিধা উভয়ই রয়েছে।

[রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

https://teachingbd24.com

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১
খ. "প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।" ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসগুলোর কর রাজস্ব ও অ-কর রাজস্ব চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘাটতি অর্থায়নের উৎস দুটি তুলনাপূর্বক, কোনটি অধিকতর কার্যকর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকেই সরকারি ব্যয় বলে।

খ প্রত্যক্ষ করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় না বলে এ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় তাকেই যদি করের বোঝা বহন করতে হয় তাহলে উক্ত করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ, এ করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। যেমন— আয়কর, ভূমিকর, সম্পদকর ইত্যাদি। এ সকল করের ভার সরাসরি করদাতাকেই বহন করতে হয়। এ জন্যই, এ সকল কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

গ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে। নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসগুলোর কর ও কর-বহির্ভূত (অ-কর) রাজস্ব চিহ্নিত করা হলো—

সাধারণত সরকারি আয়ের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. কর রাজস্ব এবং ২. কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কোনো প্রকার সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে সরকারকে জনগণ যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। এই কর থেকে যে আয় হয়, তাকে কর রাজস্ব বলে। আবার, সরকার কর ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে যে আয় করে তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে।

উদ্দীপকে কর রাজস্বের উৎসগুলো হলো— আয়কর, সম্পদ কর, মুনাফা কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক ও উত্তরাধিকার কর। অন্যদিকে, কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসগুলো হলো— ফি, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ডাক ও রাষ্ট্রীয় কারখানা।

ঘ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা না গেলে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। নিচে এই দুটি উৎসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সরকার দেশের জনগণ বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। অন্যদিকে, সরকার যদি বিদেশি সরকারি, সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে, তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ স্বেচ্ছামূলক। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে দেশের এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তরিত হয়। তাই এ ঋণের কোনো আর্থিক ভার নেই; শুধু প্রকৃত ভার আছে। অপরদিকে, বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত উভয় ভার রয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও ঋণের শর্ত, ঋণ পরিশোধের সময় ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিবেচনা করে দেখা যায়, বৈদেশিক ঋণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আব্দুর রহমান সাহেব 'ক' ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। তিনি যে বেতন ও ভাতাদি পান তার ওপর নির্ধারিত হারে কর প্রদান করেন। তার বন্ধু এমরান একজন ব্যবসায়ী। তিনিও তার বিক্রীত দ্রব্যের ওপর কর প্রদান করেন। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. রাজস্ব ব্যয় কী? ১
খ. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী কেবল সরকারের আয়-ব্যয় নিয়েই আলোচনা করে? ২
গ. আব্দুর রহমান যে কর প্রদান করেন তা সমাজে বিদ্যমান আয় বৈষম্য কীভাবে হ্রাস করে? ৩
ঘ. এমরানের প্রদত্ত কর কী? তার ও আব্দুর রহমানের প্রদত্ত করের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ভেতরে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা, সরকারি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, জনসাধারণকে সরকারি সেবা প্রদান, সরকারি ঋণের ওপর সুদ প্রদান প্রভৃতি কাজের জন্য সরকারের যে ব্যয় হয় তাকে রাজস্ব ব্যয় বলে।

খ সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়-ব্যয় নিয়েই আলোচনা করে না বরং সরকারি ঋণ ও আর্থিক পরিচালনা নিয়েও আলোচনা করে।

সরকারি অর্থব্যবস্থা কেবল সরকারের আয়-ব্যয় ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। এটি সরকারের আয়-ব্যয় নীতি, ঋণনীতি ও কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা করে। এছাড়াও কীভাবে বিভিন্ন খাতে উপকরণগুলোর কাঙ্ক্ষিত বরাদ্দ নিশ্চিত করে জাতীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দামস্তরের স্থিতিশীলতা তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও আয় বৈষম্য হ্রাস, দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি অর্জনে সহায়তা করে তাও সরকারি অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়।

গ আব্দুর রহমান তার আয়ের ওপর কর প্রদান করায় এটি আয়কর হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস পায়।

প্রতি বছর একটি দেশের সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে অর্থসংস্থানও করতে হয়। সরকারি আয়ের অন্যতম একটি উৎস হলো আয়কর। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর নির্ধারিত হারে কর ধার্য করা হয়ে থাকে। আর আয়কর হলো একটি প্রত্যক্ষ কর যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যের ওপর চাপাতে পারে না। জনসাধারণের সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার কর্তৃক আয়কর ধার্য হয় বলে সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস পায়। তাই এ কর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা এ কর থেকে সংগৃহীত অর্থ সরকার জনস্বার্থে ব্যয় করে থাকে। এর ফলে সমাজে সুষম উন্নয়ন ঘটে।

সমাজের ধনীক শ্রেণির বা প্রতিষ্ঠানের ওপর ধার্যকৃত কর আরোপ করার ফলে তাদের প্রকৃত আয় কমবে, ভোগ কমবে আবার প্রাপ্ত এ কর থেকে জনস্বার্থে ব্যয় করার ফলে দরিদ্র শ্রেণি উপকৃত হবে। তাদের ভোগ বৃদ্ধি পাবে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে।

ঘ এমরানের প্রদত্ত কর হলো বিক্রয় কর যা একটি পরোক্ষ কর এবং আব্দুর রহমানের প্রদত্ত করটি হলো আয়কর যা একটি প্রত্যক্ষ কর। নিচে উভয় করের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো-

১. প্রত্যক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় না। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়।
২. প্রত্যক্ষ করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার করদাতাকে বহন করতে হয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আপাতভার করদাতা বহন করলেও চূড়ান্তভার তাকে বহন করতে হয় না।
৩. প্রত্যক্ষ কর পরিশোধ কষ্টসাধ্য কারণ নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়। তাই প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর আদায় সুবিধাজনক কারণ দ্রব্য ক্রয় করলেই করের অর্থ পরিশোধ হয়ে যায়। তাই পরোক্ষ কর প্রিয়।
৪. প্রত্যক্ষ করের আওতায় শুধু ধনীদের আওতাভুক্ত করা যায় বলে এর ভিত্তি ব্যাপক নয়। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আওতায় ধনী-গরিব সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে এর ভিত্তি ব্যাপক হয়।

https://teachingbd24.com

৫. প্রত্যক্ষ কর সাধারণত প্রগতিশীল হয়। পরোক্ষ কর সাধারণত অধোগতিশীল হয়।

৬. আয়কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ। অন্যদিকে মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

৭. প্রত্যক্ষ কর দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে তার দামকেও প্রভাবিত করতে পারে না। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর সরাসরি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে বলে দামকেও প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব ছাড়াও সরকারের কর রাজস্ব ও আয়কর রাজস্বের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া প্রবাসী, বাঙালিদের অর্জিত অর্থ ও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ, সাহায্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. ঋণ এর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তর ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।

খ যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যার ওপর কর ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন করলেও শেষ পর্যন্ত করের চূড়ান্ত ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। যেমন- VAT। এ কর উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারকদের ওপর আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে করের প্রাথমিকভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহন করলেও চূড়ান্তভার ভোক্তাকে বহন করতে হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সাথে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য হতে যেসব আয় সংগৃহীত হয় তা সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বিশেষ ধরনের আদায় এবং বিবিধ উৎস। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয় যদি সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারি আয়ের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ধনী দেশ ও বন্ধু দেশ।

প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি কর রাজস্ব বাবদ অর্জিত হয়। কর ছাড়াও সরকার অন্য যেসব উৎস থেকে আয় অর্জন করে তা কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রশাসনিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক রাজস্ব নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভবান হলে সরকার ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ ধরনের অর্থ আদায় করে থাকে। এ ছাড়াও সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার হতে কর, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

ঘ সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করেছে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট দেখা দেবে। ফলে বেসরকারি খাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার, ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান যেমন– বিমা কোম্পানি, লিজিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল সীমিত হলে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে।

তবে সরকার যদি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে মূলধনী খাতের জন্য ঋণগ্রহণ করে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অর্থবাজার অস্থিতিশীল হতে পারে।

পক্ষান্তরে সরকারের বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, কম সুদ ও দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র যদি দেশের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ঋণ অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না। বরং অর্থনীতির উপকার হয়। বিপরীত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণই শ্রেয়। কারণ, উৎপাদনশীল উদ্দেশে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে উৎপাদন, আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ একটি দেশের সরকারের বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থ কর ও আয় কর রাজস্বের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে সরকারি ব্যয়ের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে যা সকল সময় অমঙ্গলজনক নয়।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. আয়কর কী সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম? ২

গ. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারি ঋণ সকল সময় অমঙ্গলজনক নয়— এ বিষয়ে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ আয়কর সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম।

আয়বর্ষে একজন করদাতার বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত আয় করযোগ্য ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করলে আয়কর আইন অনুসারে করদাতার ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। সাধারণত যাদের আয়ের পরিমাণ বেশি তারা বেশি কর প্রদান করে। সরকার এ কর জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে। এতে আয়ের বৈষম্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। আয়কর রিটার্ন জমা নেওয়ার সময় সম্পদ অর্জনের উৎস দেখাতে হয় বলে সমাজে দুর্নীতি কমে যায়। সর্বোপরি আয়কর সমাজে আয়ের ক্ষেত্রে অল্প হলেও সমতা বিধানের চেষ্টা করে।

গ উদ্দীপকে সরকারের বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে উৎসগুলোর বিবরণ দেয়া হলো:

সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সকল উৎস হতে আয় করে তাকে সরকারি আয়ের উৎস বলা হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর: সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। যে সকল কর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজে করে বহন করে কিন্তু করভার অন্যের উপর চাপাতে পারে না তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে ও যে করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। প্রত্যক্ষ করের উৎসসমূহ হলো— আয়কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর ইত্যাদি। আর পরোক্ষ করের উৎসসমূহ হলো— মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক কর ইত্যাদি।

নানা রকমের ফি: ফি সাধারণত কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎস। সরকার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো বিশেষ ধরনের সুবিধা প্রদান করলে

https://teachingbd24.com

তার বিনিময়ে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, কোর্ট ফি, টোল ইত্যাদি।

সরকারি ঋণ: সরকার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এটি অ-কর রাজস্বের একটি উৎস।

নতুন নোট প্রচলন: সরকারের আদেশক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন নোট প্রচলন করে অর্থায়নে সাহায্য করে।

এভাবে সরকার তার প্রয়োজন বা ব্যয় অনুযায়ী, বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে থাকে। যখন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত অর্থায়ন সম্ভব হয় না তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঘ সরকার তার ব্যয় নির্বাহ ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। যে কোনো ঋণ গ্রহণই অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। তবে সরকারি ঋণ সব সময় অমঙ্গলজনক নয় বলেই আমি মনে করি।

সরকারি ঋণ বলতে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণকে বুঝায়। প্রত্যেক দেশের সরকার জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু সংগ্রহীত রাজস্ব দ্বারা অনেক সময় সরকারি ব্যয় মিটানো সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকার কোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে, যাদের প্রকল্প ব্যয়ও হয় অনেক বেশি। আবার কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রতিরক্ষা ও চিকিৎসাবাবদ প্রতিবছর সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় যা অর্জিত আয়ের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এজন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে এসব জনকল্যাণমুখী ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা করে থাকে।

এছাড়া বিভিন্ন জরুরি অবস্থা যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধকালীন ব্যয় ইত্যাদি নির্বাহের জন্যও সরকার ঋণ করে থাকে। আবার অনেক সময় অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিলে সরকারকে বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনীতির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও মন্দাভাব দূরীকরণের জন্য সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

উপরের আলোচনা একথা স্পষ্ট হয় যে, সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়। তাই সরকারি ঋণ অনেক সময় দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সে জন্য এসব খাতের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এ ছাড়া সরকার বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ করে থাকে।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. সরকার ঋণ করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ সরকারকে প্রদান করে তাকে কর বলে।

খ সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ঋণকে সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার নিজ দেশ ও বিদেশ উভয় ক্ষেত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

গ অতীতের তুলনায় বর্তমানে সরকারের অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয়ও অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আজকাল সরকার বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন, দেশ পরিচালনা ইত্যাদি কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

১. শিক্ষা: শিক্ষা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, শিক্ষা খাতে অনুদান প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সাম্প্রতিক সময়ে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুদান, স্কুল ঝরে-পড়া রোধে মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদির দরুন এ খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েই চলেছে।

২. প্রতিরক্ষা: চিরাচরিতভাবেই সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো প্রতিরক্ষা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক দেশেরই সরকারের দায়িত্ব। দেশ-রক্ষার জন্য আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা প্রভৃতি বাবদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের সরকার একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা: সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বর্তমানকালের সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমান সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করায় এ খাতের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঘ উদ্দীপকে যে দু'ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তা হলো: অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ। নিচে এ উৎস দুটির তুলনামূলক সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:

সরকারের পক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করা সহজ; কারণ সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচনা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করা যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে সুবিধাজনক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ নিতে গেলে সরকারকে কোনো শর্তের মোকাবিলা করতে হয় না। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে তা বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণ করেই ব্যবহার করা যায়। ঋণের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়।

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ ও রৌপ্য আবশ্যক হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ উৎস ঋণ গ্রহণ সুবিধাজনক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব সেলিম সাহেব একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। ঋণ সম্পর্কে তার কোনো নেতিবাচক মনোভাব নেই। তাঁর মতে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্যে সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তবে শর্তমুক্ত ঋণ গ্রহণ কাম্য নয়।

[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সরকারি ঋণ কী? ১

খ. সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎসগুলো কী? ২

গ. সেলিম সাহেবের মতে, সরকার কি উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ৩

ঘ. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলো সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি সংস্থার নিকট থেকে অথবা বিদেশি সরকার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে সরকারি ঋণ বলে।

https://teachingbd24.com

খ সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের ঋৎসগুলো হলো— ব্যক্তিবর্গ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
সরকার দেশের ভেতরের বিভিন্ন উৎস থেকে যে ঋণ নেয় সেগুলো অভ্যন্তরীণ ঋণ হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার ব্যক্তিবর্গের কাছে ঋণপত্র বিক্রি করে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও সরকার ঋণ নিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের সেলিম সাহেবের মতে, দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।
সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মূলত দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল রাখার স্বার্থেই সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
উদ্দীপকের সেলিম সাহেব মনে করেন সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন পড়ে। অথচ এসব দেশে মূলধনের যথেষ্ট অভাব থাকে। এ অবস্থায় ব্যয়বহুল ও স্থায়ী সম্পদ; যেমন— রাস্তাঘাট, বাঁধ, বন্দর, সেতু, প্রভৃতি নির্মাণ করতে হলে ঋণ গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এসব কাজের জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় তা সরকারের পক্ষে করের সাহায্যে তোলা সম্ভব নয়। অনেক সময় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়ে পড়ে। তখন সরকার ঘাটতি বাজেটের সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় ঋণ গ্রহণ করে সরকার এই ঘাটতি বাজেট পূরণ করে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগহেতু আকস্মিক জরুরি প্রয়োজন, মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ, জনকল্যাণমূলক ব্যয় নির্বাহ, আয় বৈষম্য হ্রাস, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

ঘ সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলো সম্পর্কে আমার অভিমত নিম্নে ব্যক্ত করা হলো—
সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সরকার সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকেই ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো— বিদেশি সরকার, বিদেশি বেসরকারি কোম্পানি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণের সুদাসল দেশের বাইরে চলে যায়; সেক্ষেত্রে দেশ তা থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য বলা যায় যে, বৈদেশিক ঋণে আর্থিক ভার রয়েছে। এতে করে বৈদেশিক ঋণের উৎসগুলো লাভবান হয়ছে। এ ছাড়াও ঋণের বৈদেশিক উৎসের প্রকৃত ভারও রয়েছে এবং তা অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎসের ভার থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সময় জনসাধারণের ওপর কর ধার্য করলে সমাজের সকলকেই অল্প-বিস্তর দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাছাড়া বিদেশি ঋণদাতারা সুদাসলের বিনিময়ে দ্রব্য ও সেবা গ্রহণের ফলে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ হ্রাস পায়। ঋণদাতা অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থে ঋণদান করে থাকে। এর ফলে ঋণগ্রহীতা দেশে রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে, যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। তবে বৈদেশিক উৎস থেকে পাওয়া ঋণ বৈদেশিক মুদ্রায় পাওয়া যায় বলে তা দিয়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করা যায়। ঋণের বদৌলতে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কারিগর পাওয়ার সুযোগ ঘটে বলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক ঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বৈদেশিক উৎসের আর্থিক ও প্রকৃতভার উভয়ই বেশি। এ জন্য সরকারকে ঋণের বৈদেশিক উৎসের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল না হওয়াই উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৩০ জেরিন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী, সে নিয়মিত পত্রিকা পড়ে। একদিন এক পত্রিকায় বাজেট পর্যালোচনা থেকে সে সরকারের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত এবং তাতে ব্যয়ের পরিমাণ জানতে পারে। আয়ের খাতগুলোর মধ্যে ছিল— ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। অপরপক্ষে ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে ছিল, প্রতিরক্ষা, বেসামরিক প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. মূল্য সংযোজন করকে সংক্ষেপে কী বলা হয়? ১
খ. 'বড় প্রকল্প গ্রহণে বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনেক' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত করগুলোর মধ্যে কোনটি প্রত্যক্ষ কর? জাতীয় আয়ে তার অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উপর্যুক্ত আয়ের খাতগুলোই কি যথেষ্ট? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্য সংযোজন করকে সংক্ষেপে মূসক বা VAT বলে।

খ বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় যা অনেক দেশের পক্ষে মেটানো সম্ভব হয় না বলে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে।
রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বড় উন্নয়ন প্রকল্প একান্ত অপরিহার্য। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ থেকে করা সম্ভব হয় না। কারণ এসব দেশের জনগণের কর প্রদানের ক্ষমতা সীমিত। এসব দেশে কর হতে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তা দেশের শাসনসংক্রান্ত ব্যয় মিটাবার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে এর ব্যয়ভার গ্রহণের জন্য বৈদেশিক ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত করগুলোর মধ্যে ভূমি রাজস্ব হলো একটি প্রত্যক্ষ কর।
যে করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভার করদাতাদের ওপর পড়ে তাই হলো প্রত্যক্ষ কর। এ কর আরোপ করলে করদাতা করের বোঝা নিজেই বহন করে, সে কোনোভাবেই তা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারে না। ভূমির মালিক জমি ভোগ দখল করার জন্য সরকারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান করে। সরকারকে ভূমি রাজস্ব প্রদানের পর করদাতা তা কোনোভাবেই অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারে না। ভূমি রাজস্ব প্রদানের পর সে তা তোলার জন্য নিয়োজিত শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে পারে না। আবার যে দামে সে বিক্রি করে তাও ভূমি রাজস্ব দেওয়ার অজুহাতে বাড়াতে পারে না। কাজেই একবার ভূমি রাজস্ব প্রদান করলে করদাতা কোনোভাবেই তা অন্যের কাছ থেকে আদায় করতে পারে না। অন্যকথায় আরোপিত করের বোঝা করদাতা নিজেই বহন করতে বাধ্য হয়।
জাতীয় আয়ে ভূমি রাজস্ব একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে সরকার ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করায় এ খাতে রাজস্বের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

ঘ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়ের খাতগুলোই যথেষ্ট নয়। নিচে আমার মতামত বিশ্লেষণ করা হলো-
প্রদত্ত উদ্দীপকে সরকারের যেসব আয়ের খাত বলা হয়েছে, তা হলো- ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। এগুলো হলো সরকারের শুধুমাত্র কর রাজস্বের উৎস। সরকার রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রকার কর থেকে যে রাজস্ব পেয়ে থাকে তাকে তাকে কর রাজস্ব বলে। কর রাজস্বের মধ্যে আয়কর, ভূমিকর, সম্পদকর, মুনাফা কর। আবগারি শুল্ক, ভ্যাট, বাণিজ্য শুল্ক, প্রমোদ কর, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
সরকারকে তার বিশাল ব্যয় নির্বাহের জন্য শুধুমাত্র কর রাজস্বের উপর নির্ভরশীল থাকলেই হয় না। কর রাজস্ব ছাড়াও সরকার আরও বিভিন্ন উৎস হতে আয় করে থাকে। সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে প্রশাসনিক ফি যেমন- কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, জরিমানা ইত্যাদি, বাণিজ্যিক আয় যেমন-ডাক ও তার বিভাগ, রেলওয়ে বিভাগ, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, বিভিন্ন দান ও অনুদানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সরকার বিশেষ ধরনের কর আদায়ের পাশাপাশি

https://teachingbd24.com

জরিমানা, অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলন, সরকারি ঋণ এবং সরকারি সম্পত্তি থেকেও আয় করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে শুধু কর রাজস্বই যথেষ্ট নয়, সরকারের বিশাল ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্য সকল উৎস থেকেই সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা উচিত।

প্রশ্ন ▶৩১ রহমান সাহেব একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। তিনি যে বেতন ও ভাতাদি পেয়ে থাকেন তার ওপর নির্ধারিত হারে কর প্রদান করেন। অন্যদিকে, একজন সাধারণ মানুষও সরকারকে বিভিন্নভাবে কর প্রদান করে থাকে। সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য কর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. পরোক্ষ কর কী? ১

খ. সরকার কেন ঋণ করে থাকে? ২

গ. রহমান সাহেবের প্রদেয় কর কোন ধরনের কর নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারের অন্যান্য আয়ের উৎসগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের ভার বা বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে।

খ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণকে সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার নিজ দেশ ও বিদেশ উভয় ক্ষেত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের প্রদেয় কর আয় করের ধারণাকে নির্দেশ করে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরের কোনো ব্যক্তির আয়ের ওপর আরোপিত করকে আয়কর বলা হয়। ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করযোগ্য আয়ের নূন্যতম সীমা অতিক্রম করলে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর প্রদান করতে হয়।

বাংলাদেশে যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে তাদের নিকট থেকে প্রগতিশীল হারে আয়কর আদায় করা হয়। উদ্দীপকের রহমান সাহেব একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে যে বেতন ও ভাতাদি পেয়ে থাকেন তার ওপর নির্ধারিত হারে কর প্রদান করেন। তার প্রদানকৃত করটি আয়ের ধার্যকৃত, তাই তিনি সরকারকে যে কর দেন তা হলো আয়কর। সরকারি রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আয়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে করমুক্ত আয়ের সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের বার্ষিক আয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বেশি তাদের বাধ্যতামূলক আয়কর প্রদান করতে হয়। আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। অর্থাৎ যার ওপর আয়কর ধার্য করা হয় তাকেই করের বোঝা বহন করতে হয়; অন্য কারো ওপর এ করের ভার স্থানান্তর করা যায় না।

ঘ উদ্দীপকে সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে করের ধারণাটি উল্লিখিত হয়েছে। কর ছাড়াও সরকার কর বহির্ভূত বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব আয় করে থাকে।

দেশের প্রশাসন পরিচালনা, দেশরক্ষা, জনকল্যাণ সাধন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য কর ও কর বহির্ভূত উৎসগুলো থেকে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে। নিচে সরকারের আয়ের কর বহির্ভূত উৎসগুলো বিশ্লেষণ করা হলো-

সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা: সরকার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। এছাড়া সরকার বিভিন্ন অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন-চিড়িয়াখানা, পার্ক, স্টেডিয়াম প্রভৃতি থেকে কিছু অর্থ আয় করে। প্রশাসনিক ফি: জনসাধারণকে প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ফি আদায় বাবদ সরকার যথেষ্ট অর্থ আয় করে। সুদ থেকে প্রাপ্ত আয়: সরকার বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করে। এ বাবদ প্রাপ্ত সুদ থেকে কিছু আয় হয়।

প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি: সরকারি মালিকানা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বিক্রয় করে সরকার যথেষ্ট অর্থ আয় করে। অর্থনৈতিক সেবা বাবদ প্রাপ্তি: সরকার পর্যটন, ব্যাংকিং, ভ্রমণ ইত্যাদি বাবদ ও কিছু অর্থ আয় করে। সরকারি ঋণ: সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণ দেশের ভেতর থেকে বা বাহির থেকে গ্রহণ করতে পারে। সরকার বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অথবা বিদেশি কোনো সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারে। সরকারি আয়ের উল্লিখিত উৎসগুলো ছাড়াও আরও কিছু উৎস রয়েছে। এগুলো হলো অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, ডাকবিভাগ, টোল ও লেভী, জরিমানা ও বাজেয়াপ্তকরণ, ভাড়া ও ইজারা মূলধন রাজস্ব ইত্যাদি।

উপরের বিশ্লেষণ হতে সরকারি আয়ের অন্যান্য উৎস তথা কর-বহির্ভূত উৎস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶৩২ নেইমার এর দেশে সরকার বর্তমান অর্থবছরে একটি নতুন কর আরোপ করেছে। এই করের করাঘাত এবং করপাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে না। তাছাড়া সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের ব্যাংকখাত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা IMF এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. সরকার ঋণ গ্রহণ করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক আরোপিত করটি কোন প্রকৃতির ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকারি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে কোনটি উত্তম? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে আবগারি শুল্ক বলে।

খ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় অর্থের সংকুলান কম হলে সরকার ঋণ গ্রহণ করে।

সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক উৎস হতে প্রাপ্ত আয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ ঋণকে সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার নিজ দেশ ও বিদেশ উভয় ক্ষেত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক আরোপিত করটি হলো পরোক্ষ কর।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ, যে করের করঘাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে তার করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়, তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।

পরোক্ষ করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, মাদক শুল্ক প্রভৃতি। বাংলাদেশে কর রাজস্বের বেশির ভাগই পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। পরোক্ষ কর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে প্রদান করতে হয়। তাই করদাতারা এর বোঝা অনুভব করতে পারে না। এজন্য এ করকে জনপ্রিয় কর বলা হয়। পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না। পরোক্ষ কর ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকে প্রদান করতে হয়। তাই এ করের ভিত্তি খুবই বিস্তৃত।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের ব্যাংকখাত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা IMF এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। দেশের ব্যাংকখাত থেকে ঋণ গ্রহণ অভ্যন্তরীণ উৎস; অপরদিকে, IMF থেকে ঋণ গ্রহণ বৈদেশিক উৎস।

সরকারি ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ উত্তম বলে আমি মনে করি। বিষয়টি নিচে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো থেকে ঋণ সংগ্রহ করা সহজ। কারণ, সরকার জনগণকে বিভিন্ন প্ররোচণা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বা বাধ্য করে ঋণ গ্রহণ করাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক উৎসগুলোকে বাধ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে বিদেশিদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণপূর্বক ব্যবহার করতে হয়। যা অর্থনীতির জন্য অনেক সময় উপকারী হওয়ার চেয়ে অপকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবহারের কোনো শর্তের মোকাবিলা করতে হয় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক জিনিসের প্রাপ্তির বিনিময়ে প্রদান আছে। তাই ঋণ গ্রহণ করলে পরিশোধও করতে হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকারকে নতুন নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ ও রৌপ্য আবশ্যক। চতুর্থত, ঋণের মেয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করলে বৈদেশিক উৎস, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বেশি সুবিধাজনক। কেননা বৈদেশিক ঋণ সবসময় দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় মওকুফও করা হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ ঋণ সচরাচর স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে এবং তা মওকুফের ঘটনাও বিরল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সরকারি ঋণের দুটি উৎসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় বিষয়টি ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস সুবিধাজনক এবং বৈদেশিক উৎস অসুবিধাজনক। তাই যেকোনো দেশের সরকারকে বৈদেশিক উৎসের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ গ্রহণ করে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পরোক্ষ কর কাকে বলে? ১

খ. উন্নয়নশীল দেশেই সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের সরকারি ঋণের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের ঋণ উত্তম বলে তুমি মনে কর? ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের ভার বা বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায়, তাকে পরোক্ষ কর বলে।

খ জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ঘাটতি ব্যয়ের অর্থসংস্থান করতে উন্নয়নশীল দেশের সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

বর্তমানে রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দানসহ তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য বহুমুখী কাজ সম্পাদন করতে হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তথা দরিদ্র, বয়স্কদের ভাতা প্রদান, ক্রীড়া-শিক্ষার উন্নয়ন, দরিদ্র ভূমিহীনদের জীবনমান উন্নয়ন, বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা, বৃক্ষায়ন ইত্যাদি নানাবিধ কাজে সরকারকে ব্যয় করতে হয়। এসবের অর্থ সংস্থান করার জন্য উন্নয়নশীল দেশে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় সরকারকে ঋণ নিতেই হয়।

গ অতীতের তুলনায় বর্তমানে সরকারের অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয়ও অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আজকাল সরকার বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন, দেশ পরিচালনা ইত্যাদি কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

১. শিক্ষা: শিক্ষা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, শিক্ষা খাতে অনুদান প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সাম্প্রতিক সময়ে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুদান, স্কুল ঝরে-পড়া রোধে মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদির দরুন এ খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েই চলেছে।

২. প্রতিরক্ষা: চিরাচরিতভাবেই সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো প্রতিরক্ষা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক দেশেরই সরকারের দায়িত্ব। দেশ-রক্ষার জন্য আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা প্রভৃতি বাবদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের সরকার একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা: সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বর্তমানকালের সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমান সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করায় এ খাতের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে।

ঘ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা না গেলে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে। নিচে এই দুটি উৎসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সরকার দেশের জনগণ বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। অন্যদিকে, সরকার যদি বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করে, তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ স্বেচ্ছামূলক। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ আবশ্যক।

অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে দেশের এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তরিত হয়। তাই এ ঋণের কোনো আর্থিক ভার নেই; শুধু প্রকৃত ভার আছে। অপরদিকে, বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত উভয় ভার রয়েছে।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও ঋণের শর্ত, ঋণ পরিশোধের সময় ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিবেচনা করে দেখা যায়, বৈদেশিক ঋণের চেয়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সাম্প্রতিককালে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সে জন্য এসব খাতের বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে কর আদায় করে। তাছাড়া সরকারকে অনেক সময় বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, দান-অনুদান এসবের ওপরও নির্ভর করতে হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মূসক কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় কীভাবে কর্মসংস্থান ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসগুলো লেখ। ৩

ঘ. সরকার কী কী উদ্দেশে ব্যয় নির্বাহ করে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

https://teachingbd24.com

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে যে মূল্য সংযোজন ঘটে তার ওপর আরোপিত করকে মূল্য সংযোজন কর বা মূসক বলে।

খ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অনেক অর্থ ব্যয় করে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যেমন নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি হয়, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মনে করা যাক, সরকার কোনো স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করল। এখন ওই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। সুতরাং, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

গ কোনো দেশে সরকারি আয়ের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। তবে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশে সরকারি আয়ের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উৎস রয়েছে। সরকারি আয়ের উৎসমূহের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

১. **কর:** কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি বা উপকারের আশা না করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু শর্তাধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাই হলো কর। এ কর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে রয়েছে আয়কর, সম্পত্তি কর, সম্পদ কর, দান কর, মূলধনী কর, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি। আর পরোক্ষ করের মধ্যে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি। দেশটির সরকার উচ্চ হারে বিভিন্ন কর আদায় করে বিপুল অর্থ আয় করে।

২. **অনুদান:** কতগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য এক দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে যে অর্থ সাহায্য করে তাই হলো অনুদান। অনুদান বাবদ উদ্দীপকের দেশটি অনেক অর্থ আয় করে।

৩. **ঋণ:** উদ্দীপকের দেশটির সরকার ব্যয় মেটানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণ, ব্যাংক, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

ঘ সরকার শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।

অতীতের তুলনায় বর্তমানে সরকারের অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সরকারি ব্যয়ও অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

১. **শিক্ষা:** শিক্ষা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সরকারি উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, শিক্ষা খাতে অনুদান প্রভৃতি বাবদ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সাম্প্রতিক সময়ে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুদান, স্কুল ঝরে-পড়া রোধে মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদির দরুন এ খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েই চলেছে।

২. **প্রতিরক্ষা:** চিরাচরিতভাবেই সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান খাত হলো প্রতিরক্ষা। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক দেশেরই সরকারের দায়িত্ব। দেশ রক্ষার জন্য আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা প্রভৃতি বাবদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের সরকার একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বর্তমানকালের সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমান সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রসারিত করায় এ খাতের ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

[স্কলারস হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কী? ১

খ. মূসক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসমূহ চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয় বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

খ উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে ধাপে যে মূল্য সংযোজন ঘটে তার ওপর আরোপিত করকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বলে।

যেমন– একজন কৃষক একটি গাছ লাগিয়ে গাছ বিক্রির মাধ্যমে ৫,০০০ টাকা আয় করেন। এক্ষেত্রে কৃষকের মূল্য সংযোজন ৫,০০০ টাকা। এখন মিল মালিক এ গাছকে চেরাই করে কাঠ বানিয়ে বিক্রয় করে ৭,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হলো ২,০০০ টাকা। সংযোজিত এসব মূল্যের ওপর কর আরোপ করা হলে যে কর পাওয়া যাবে তাই মূল্য সংযোজন কর মূসক।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে নিচে সরকারের আয় বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো—

প্রত্যেক দেশেই সরকার তার সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু এ ব্যয় মেটানোর জন্য যতটা আয় করা দরকার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার তা করতে পারে না। কারণ সরকারের আয়ের উৎসগুলো যেমন— কর ও কর বহির্ভূত উৎস অত্যন্ত সীমিত। তাই সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর মাধ্যমে দেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের সরকারই কেইনসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। এ লক্ষ্যে জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অবসর ভাতা, বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদান, শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রভৃতি কল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং এ ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া স্বপ্নোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে অর্থ ব্যয় বাড়াতে হচ্ছে। শিল্প বিপ্লব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শহরাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে। ফরে শহরাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতিতে সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় বলে, সরকারি ব্যয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরকারের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে ব্যয়ের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় সরকারের আয় খুব একটা বাড়েনি। উদ্দীপকের দেশটির ক্ষেত্রে সরকারের আয়ের কর ও করবহির্ভূত উৎসগুলো থেকে অর্জিত অর্থ সরকারি এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নয়। এর ফলে সরকারকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ঘাটতি বাজেটের

Teachingbd24.com

মুখোমুখি হতে হয়। এই ঘাটতি বাজেট পূরণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হলে এবং দেশকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সরকারি আয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের দেশটির ব্যয়ের খাতগুলোর তুলনায় আয়ের উৎসগুলো সীমিত। সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয় মেটানোর জন্য এই আয় যথেষ্ট নয়। এছাড়া বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার স্বার্থে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বর্ধিত চাহিদা মিটিয়ে দেশকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সামিল করার জন্যে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যে সরকারের আয় বৃদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এ অবস্থায় সরকারকে তার আয় বাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন উদ্যোগ ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং আন্তরিকভাবে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রশ্ন ▶৩৬ রহিম সাহেব দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করছেন। সম্প্রতি ১৫ বছর পর দেশে বেড়াতে এসে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তবে এ উন্নয়নের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা কোন কোন উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে তা তাকে ভাবিয়ে তোলে। বিষয়টি তিনি তার বন্ধু অর্ণবের সাথে আলাপ করেন এবং জানতে পারেন এদেশের নাগরিকরা এখন অনেক সচেতন। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব ছাড়াও সরকারের কর রাজস্ব ও অকর রাজস্বের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের অর্জিত অর্থ ও দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ সাহায্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৬]

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ঋণ' এর তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।

খ কর সবার কাছেই অপ্রিয়। এজন্য যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে তার করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে যার ওপর কর ধার্য করা হয় তাকেই তা বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার করদাতার ওপরই পড়ে। করদাতা এসব করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে না। তাই প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য হতে যেসব আয় সংগৃহীত হয় তা সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বিশেষ ধরনের আদায় এবং বিবিধ উৎস। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয় যদি সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারি আয়ের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ধনী দেশ ও বন্ধু দেশ।

প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি কর রাজস্ব বাবদ অর্জিত হয়। কর ছাড়াও সরকার অন্য যেসব উৎস থেকে আয় অর্জন করে তা কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রশাসনিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক রাজস্ব নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভবান হলে সরকার ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ ধরনের অর্থ আদায় করে থাকে। এছাড়াও সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার হতে কর, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

ঘ সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করেছে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট দেখা দিবে। ফলে বেসরকারি খাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার, ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান যেমন- বিমা কোম্পানি, লিজিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল সীমিত হলে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে।

তবে সরকার যদি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে মূলধনী খাতের জন্য ঋণগ্রহণ করে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অর্থবাজার অস্থিতিশীল হতে পারে।

পক্ষান্তরে সরকারের বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, কম সুদ ও দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র যদি দেশের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ঋণ অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না। বরং অর্থনীতির উপকার হয়। বিপরীত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণই শ্রেয়। কারণ, উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে উৎপাদন, আয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶৩৭ গত ৭ জুন ২০১৮ তারিখ জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন যার আকার প্রায় ৪,৬৪৫৭৩ কোটি টাকা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ বাজেটে শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিখাতেই বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এ বাজেটে প্রায় ১,২১,২৪২ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়। এ ঘাটতি ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অনেক সময় দেশের জনগণ, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া বৈদেশিক সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ঋণ নেয়।

[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাজেট কাকে বলে? ১

খ. কর ও ফি এক নয়— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুই ধরনের ঋণের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের ঋণ উত্তম মনে কর? ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণীকেই বাজেট বলা হয়।

খ কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি বা উপকারের আশা না করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু শর্তাধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। অপরদিকে সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধা দানের বদলে তার কাছ থেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। কর ও ফি এক নয়।

কর একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। জনগণ সরকারকে কর দিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু ফি করের মতো বাধ্যতামূলক ও সুবিধাহীন নয়। কোনো ব্যক্তিকে কেবল সরকারি সুবিধা প্রদান করার জন্যই ফি আদায় করা হয়। কিন্তু কোনোরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার প্রত্যাশা না রেখেই জনগণকে কর দিতে হয়। তাই বলা যায়, কর ও ফি এক নয়।

https://teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ২৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে যে দু'ধরনের ঋণের কথা বলা হয়েছে তা হলো- অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ। এ দু'ধরনের ঋণের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণই উত্তম বলে আমি মনে করি।

সরকার নিজ দেশের জনগণ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। পক্ষান্তরে বিদেশি সংস্থা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে বৈদেশিক ঋণ বলে। ঋণের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত ঋণ বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক।

উদ্দীপকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ প্রায় ১,২১,২৪২ কোটি টাকা। যা সরকারকে অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নিয়ে পূরণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে সমাজের এক শ্রেণির হাত থেকে অর্থ অন্য শ্রেণির নিকট স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার থাকে না। শুধু প্রকৃত ভার থাকে। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের দ্বারা এক দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, অন্য দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ঋণ পরিশোধে সমাজকে আর্থিক ও প্রকৃত ভার উভয়ই বহন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে সরকার নতুন কর আরোপ বা নতুন মুদ্রা ছাপাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দেশি ঋণ বা অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহে সরকার জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বা বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ প্রদানে কোনো দেশ বা সংস্থাকে বাধ্য করা যায় না।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, বাজেট ঘাটতি পূরণে বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস হিসেবে বৈদেশিক উৎসের চেয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে প্রচুর ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় সরকারকে বিভিন্ন উৎস যেমন: নতুন মুদ্রা সৃষ্টি, অতিরিক্ত করারোপ, সরকারি তহবিল গঠন ইত্যাদি হতে অর্থসংস্থান করতে হয়। তবে অর্থসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ঋণ গ্রহণ। গৃহীত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে তা দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। *[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আয়কর কী? ১

খ. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি অর্থসংস্থানের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সরকারি ঋণের সঠিক ব্যবহার না হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে– তুমি কি এই ধারণার সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অর্জিত আয়ের ওপর যে কর প্রদান করে তাকে আয়কর বলা হয়।

খ যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। যার ওপর কর ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন করলেও শেষ পর্যন্ত করের চূড়ান্ত ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। যেমন- VAT। এ কর উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারকদের ওপর আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে করের প্রাথমিকভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহন করলেও চূড়ান্তভার ভোক্তাকে বহন করতে হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের সাথে আদায় করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না।

গ উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎসের কথা বলা হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্য হতে যেসব আয় সংগৃহীত হয় তা সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস। সরকারি আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হলো— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বিশেষ ধরনের আদায় এবং বিবিধ উৎস। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আয় যদি সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারি আয়ের বৈদেশিক উৎসগুলো হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ধনী দেশ ও বন্ধু দেশ।

প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত এবং সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি কর রাজস্ব বাবদ অর্জিত হয়। কর ছাড়াও সরকার অন্য যেসব উৎস থেকে আয় অর্জন করে তা কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রশাসনিক রাজস্ব এবং বাণিজ্যিক রাজস্ব নিয়ে গঠিত। তাছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত লাভবান হলে সরকার ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ ধরনের অর্থ আদায় করে থাকে। এছাড়াও সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সরকার হতে কর, নতুন নোট ছাপানো, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, দেশীয় উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি হতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

ঘ সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এত ঋণ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহার না করলে তা দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করেছে এরূপ ঋণ গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট দেখা দিবে। ফলে বেসরকারি খাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার, ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান যেমন– বিমা কোম্পানি, লিজিং প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের তহবিল সীমিত হলে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে।

তবে সরকার যদি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে মূলধনী খাতের জন্য ঋণগ্রহণ করে তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অর্থবাজার অস্থিতিশীল হতে পারে।

পক্ষান্তরে সরকারের বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, কম সুদ ও দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় এবং ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র যদি দেশের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ঋণ অর্থনীতিতে তেমন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না। বরং অর্থনীতির উপকার হয়। বিপরীত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সরকারি ঋণের সঠিক ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা না হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-৯: সরকারি অর্থব্যবস্থা

৩০৮. সরকারি ব্যয়কে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ৪ ভাগে ঘ ৫ ভাগে — ক

৩০৯. নিচের কোনটি হস্তান্তর ব্যয়? (জ্ঞান)
ক সরকারি ঋণের সুদ
খ যুদ্ধজনিত ব্যয়
গ মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যয়
ঘ আধা সামরিক ব্যয় — ক

৩১০. সরকারি ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব খ জনকল্যাণ সাধন
গ নির্বাচনি অঙ্গীকার ঘ দারিদ্র্য বিমোচন — খ

৩১১. কোনটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর আদায়কারী প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)
ক NBR খ BRTA
গ DFI ঘ Custom — খ

৩১২. জনস্বার্থে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন খরচের যে অংশ সরকার বহন করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক উৎপাদন ব্যয় খ অপ্রত্যাশিত ব্যয়
গ ভর্তুকি ঘ রিলিফ — গ

৩১৩. কোনটি প্রত্যক্ষ কর? (জ্ঞান)
ক বিক্রয় কর খ প্রমোদ কর
গ আবগারি কর ঘ কর্পোরেশন কর — ঘ

৩১৪. প্রত্যক্ষ করের সবচেয়ে বড় উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
ক আয়কর খ সম্পদ কর
গ ভূমি কর ঘ কর্পোরেশন কর — ক

৩১৫. কোনটি সরকারের বাণিজ্যিক আয়? (জ্ঞান)
ক রেলওয়ে খ কোর্ট ফি
গ জরিমানা ঘ বাজেয়াপ্ত — ক

৩১৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত শুল্কের মধ্যে কোনটির অবদান তুলনামূলকভাবে কম? (অনুধাবন)
ক আবগারি শুল্ক খ আমদানি শুল্ক
গ রপ্তানি শুল্ক ঘ সম্পূরক শুল্ক — গ

৩১৭. স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বিভিন্ন ধরনের ওষুধ উৎপাদন করে সরকারকে ১০ কোটি টাকা কর দিল। স্কয়ার ফার্মা কোন ধরনের কর দিল? (প্রয়োগ)
ক আবগারি শুল্ক খ রপ্তানি শুল্ক
গ বাণিজ্যিক শুল্ক ঘ VAT — ক

৩১৮. বর্তমানে বাংলাদেশে কর রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস কোনটি?
ক VAT খ Excise duty
গ Income tax ঘ Export duty — ক

৩১৯. বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বেশি আয় করে কোন উৎস থেকে?
ক আয়কর খ আমদানি শুল্ক
গ মূল্য সংযোজন কর ঘ আবগারি শুল্ক — গ

৩২০. নিচের কোন পণ্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়? (জ্ঞান)
ক স্ট্যাম্প খ আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি
গ রপ্তানিকৃত পণ্য ঘ চা, চিনি — ঘ

৩২১. Custom Duties অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক সম্পূরক শুল্ক খ আমদানি শুল্ক
গ আবগারি শুল্ক ঘ রপ্তানি শুল্ক — খ

৩২২. Excise Duties অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মাদক শুল্ক খ আবগারি শুল্ক
গ আমদানি শুল্ক ঘ সম্পূরক শুল্ক — খ

৩২৩. দিয়াশলাই ও তামাক উৎপাদনের উপর যে কর ধার্য করা হয় তা কী? (জ্ঞান)
ক মাদক শুল্ক খ বাণিজ্য শুল্ক
গ আবগারি শুল্ক ঘ মূল্য সংযোজন কর — গ

৩২৪. চা ও চিনি উৎপাদনের ওপর কোন কর ধার্য করা হয়? (জ্ঞান)
ক আবগারি শুল্ক খ বাণিজ্য শুল্ক
গ উৎপাদন কর ঘ মূল্য সংযোজন কর — ক

৩২৫. আমদানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরও অতিরিক্ত আরোপিত শুল্ককে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সম্পূরক শুল্ক খ আয়কর
গ ভ্যাট ঘ অস্বাভাবিক শুল্ক — ক

৩২৬. কোনটি বাণিজ্যিক আয়? (জ্ঞান)
ক বনভূমি থেকে আয়
খ খনিজ সম্পদ থেকে আয়
গ রেলপথ থেকে আয় ঘ কোর্ট থেকে আয় — গ

৩২৭. বাংলাদেশ সরকারের বাজেটে অর্থায়নের মূল উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
ক NBR নিয়ন্ত্রিত কর খ কর ব্যতীত প্রাপ্তি
গ অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন ঘ বৈদেশিক ঋণ — ক

৩২৮. কোনটি পরোক্ষ কর?
ক মূল্য সংযোজন কর খ রেজিস্ট্রেশন ফি
গ ভূমি রাজস্ব ঘ আয়কর — ক

৩২৯. কোন কর কর্মোদ্যম ও সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস করে? (জ্ঞান)
ক প্রত্যক্ষ কর খ পরোক্ষ কর
গ আয়কর ঘ ভূমি কর — গ

http://teachingbd.com

৩৩০. প্রতি বছর ঋণের বিপরীতে কী পরিশোধ করতে হয়? (জ্ঞান)
ক অনুদান খ সুদ
গ আসল ঘ ঋণ ও ঋণের সুদ **ঘ**

৩৩১. কোন ঋণ সমাজের ওপর কোনো ভার সৃষ্টি করে না? (জ্ঞান)
ক অভ্যন্তরীণ ঋণ খ বৈদেশিক ঋণ
গ আন্তর্জাতিক ঋণ ঘ সরকারি ঋণ **ক**

৩৩২. 'ক' দেশের সরকার ঋণ গ্রহণ করার ফলে তার দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেল? 'ক' দেশ কোন উৎস থেকে ঋণ নিয়েছিল? (প্রয়োগ)
ক অভ্যন্তরীণ উৎস খ বৈদেশিক উৎস
গ বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক **খ**

৩৩৩. কর রাজস্ব খাত গঠিত হয়— (অনুধাবন)
i. প্রত্যক্ষ কর নিয়ে ii. প্রশাসনিক কর নিয়ে
iii. পরোক্ষ কর নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৩৪. পণ্য করের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. এটি অপসারণযোগ্য
ii. এটি সমানুপাতিক
iii. এটি অধোগতিশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৩৫. করের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ— (অনুধাবন)
i. কর বাধ্যতামূলক দেয়
ii. কর প্রদানের বিনিময়ে প্রত্যক্ষ কোনোরূপ সুবিধা পাওয়া যায় না
iii. কর সরকারি আয়ের অনিশ্চিত উৎস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৩৬. সরকার বন্ডের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করতে পারে— (অনুধাবন)
i. ব্যক্তির নিকট থেকে
ii. আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে
iii. বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩৩৭ ও ৩৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রানা ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাওয়ার পথে লক্ষ করল দশজন প্রকৌশলী পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ তদারকি করছে।

৩৩৭. অনুচ্ছেদে প্রকৌশলীর বেতন-ভাতা সরকারি ব্যয়ের কোন খাতে ধরা হয়? (প্রয়োগ)
ক রাজস্ব ব্যয় খ উন্নয়ন ব্যয়
গ কেন্দ্রীয় ব্যয় ঘ উৎপাদনশীল ব্যয় **ক**

৩৩৮. পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মূলধনী ব্যয়ে ii. রাজস্ব ব্যয়ে
iii. উন্নয়নমূলক ব্যয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৯ ও ৩৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সালমা বেগম একটি বুটিক হাউজ থেকে একসেট সালোয়ার কামিজ ক্রয় করার সময় দাম পরিশোধের সময় খেয়াল করেন যে, পোশাকের গায়ে যে দাম লেখা তাকে তার চেয়ে বেশি দাম দিতে হচ্ছে।

৩৩৯. সালমা বেগমকে বেশি দাম দিতে হয় কারণ কী? (প্রয়োগ)
ক VAT খ মাদক কর
গ আয়কর ঘ ভূমি রাজস্ব **ক**

৩৪০. পোশাকটির ক্ষেত্রে আরও যে সময় VAT দিতে হয়েছে তা হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কাঁচামাল থাকা অবস্থায়
ii. চূড়ান্ত পণ্য অবস্থায়
iii. মাধ্যমিক পণ্য অবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪১ও ৩৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সেলিম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ক্যাডেট অফিসার। বর্তমানে বাংলাদেশের জলসীমার অতন্দ্রপ্রহরী। পরিবারের সদস্যরা চট্টগ্রাম নাবিক কলোনিতে বসবাস করেন। চৌকস নৌ কর্মকর্তা হিসেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনেও একবার কাজ করেছেন।

৩৪১. সেলিমের বেতন ভাতা সরকারের ব্যয়ের কোন্ খাত হতে আসে? (প্রয়োগ)
ক বেসরকারি প্রশাসন খ সামরিক খাত
গ প্রতিরক্ষা খাত
ঘ আইনশৃঙ্খলা খাত **গ**

৩৪২. প্রতিরক্ষা খাতের প্রধান ব্যয় হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বেতন ভাতা খাত
ii. আধুনিক অস্ত্র ক্রয়
iii. প্রশিক্ষণ খাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-১০: উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রশ্ন ▶১ একটি সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেকার ও খাদ্য সমস্যার সমাধান, সুষম উন্নয়ন, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে। ফলে দেশটির দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্য বেশ সফলতা পায়। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ১০; স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্র' দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে যে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি নেওয়া হয়, তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন কিছু লক্ষ্য আছে, যেগুলো স্বল্প সময়ে অর্জন করা যায় না। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার মেয়াদ ১৫ বছরের বেশি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বল্প বা মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচিই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিশ্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মূলত, একটি দেশের উন্নয়ন নির্দেশক নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাল্টন বলেন— 'ব্যাপক অর্থে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্য পূরণে একটি ব্যবস্থাপত্র তথা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে, দেশটির গৃহীত ব্যবস্থাপত্রটি হলো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র হওয়ায় জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কম হয়, ফলে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশ তার দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা অর্জন করে।

আবার, দেশটির আয় বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ হতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দরিদ্র্যদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে। কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশটির গৃহীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশ বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। 'A' দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও অনিশ্চয়তা হ্রাসের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৫-২০১৭ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'B' দেশ সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণসহ নানাবিধ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ১১; অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পা কী? ১

খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দেশের পরিকল্পনাটি কোন ধরনের? তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি আর্থিক বছরের (জুলাই-জুন) মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবধর্মান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন পরিকল্পনা।

গ উদ্দীপকের 'A' দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হলো—

স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন।

https://teachingbd24.com

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য: স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন;
২. মেয়াদভিত্তিক বা নির্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা হ্রাস;
৪. উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬. পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন।

সুতরাং উদ্দীপকের 'A' দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত যার মধ্যে উপরিল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই কিন্তু উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

উদ্দীপকের 'A' দেশের গৃহীত পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত। কারণ 'A' দেশটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন, বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও অনিশ্চয়তা হ্রাসের জন্য ২০১৫-২০১৭ বা দুই বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে, 'B' দেশটিও সময় মেয়াদের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কিন্তু এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ভিন্ন। 'B' দেশটির সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনার মেয়াদের ভিত্তিতে দুই দেশের পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার পর্যায়ভুক্ত হলেও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন— 'B' দেশটি স্বল্পমেয়াদে যে পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করেছে তা উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। কারণ বিভিন্ন দেশ দীর্ঘমেয়াদে দেশের সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, আয় বৈষম্য দূরীকরণ এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন— বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য ২০১০-২০১১ সালে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ দুই পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১'-এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এ পরিকল্পনার অধীনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ায় সম্প্রতি সরকার সর্বশেষ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার মনে করে এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরাও আশা করেছেন, এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব হবে। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভীত রচনা করে।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মেয়াদকাল উল্লেখ করো। ৩
ঘ. বিশেষজ্ঞগণের আশাবাদের আলোকে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (যেমন- ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। তাই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এজন্যই বলা হয় 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভীত রচনা করে'।

গ উদ্দীপকে রূপকল্প বা ভিশন ২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ২০১০-২০২১ সময় মেয়াদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি তথা একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ এক সাথে শুরু ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব নয় বিধায় সরকার একে দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে।

বর্তমান সরকার-২০২১ সাল (স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী) নাগাদ যে দ্রুত বিকাশশীল, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করেছে তাই হলো 'রূপকল্প-২০২১'-এর ২২টি আশাদীপ্ত লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ইত্যাদি। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সরকার ২০১০-২০২১ সময়ের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য একে দুটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে একটি হলো ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা; অপরটি হলো সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। ১ জুলাই ২০১০ সাল থেকে ৩০ জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত হলো ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সময় মেয়াদ। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সরকার সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো: ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত।

ঘ বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প-২০২১ এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকলেও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং উপযুক্ত নীতি ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব। বাংলাদেশে বাসস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা অতিরিক্ত ও জন্মহার বেশি। প্রাপ্ত সম্পদের সাথে তা দারুণভাবে অসংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যা উন্নয়নের গতিরোধ করছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো কৃষি ও শিল্প। বর্তমানে কৃষিতে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লাগলেও তা এখনো ব্যাপক হয়নি; অন্যদিকে, দেশে ভারী শিল্পের অভাবে শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর। এ অবস্থায় এ দুটি খাতের ধারাবাহিক ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যাও আয় বৈষম্যও প্রকট। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বেশ নিচু। এ প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে বেকারত্ব কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, আয় বৈষম্য কমবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু এ বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজ সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া করা সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বিশেষজ্ঞদের আশাবাদ বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ 'Y' একটি উন্নয়নশীল দেশ। গত বছর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং অপর একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৬) গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, সকল শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সকল পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদেক্ষপসমূহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোতে অধিক আমদানি ব্যয়ের কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে সবসময় প্রতিকূলতা বিরাজ করে। এক্ষেত্রে আমদানি হ্রাসের জন্য আমদানি-বিকল্প শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ আবশ্যক। তাছাড়া রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন প্রয়োজন। উভয়ক্ষেত্রে সুচিন্তিত, বাস্তবসম্মত ও কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা আবশ্যক। কারণ, কেবল পরিকল্পিত উপায়েই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব।

গ 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলো দু'ধরনের, যথা— মধ্যম মেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে পরিকল্পনাগুলোর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা কার্যকর করতে কয়েক বছর সময় লাগে। যখন সুনির্দিষ্ট কতকগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন ওই ধরনের পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনাটি একটি মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা।

২. দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রকল্প থাকে যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন। তাই দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটে কিছু অর্থনৈতিক সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। উদ্দীপকে ২০১৬-২০৩৬ বছরমেয়াদি পরিকল্পনা হলো একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। একটি দেশে পরপর কয়েকটি মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার ব্যাপ্তি ১০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে 'Y' দেশের সরকার একটি মধ্যম ও একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো ওই দেশে বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সহায়ক হবে তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

কোনো দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম উপায় হলো উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টি। মানবসম্পদ উন্নত ও দক্ষ হয়ে উঠলে তারা বিভিন্ন উপায়ে সহজেই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। এ রকম ধারণার প্রেক্ষিতে 'Y' দেশের সরকার পরিকল্পনাগুলোর মেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। তাই দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া এ শিক্ষা ও তার ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সকল ইউনিয়ন বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রথম সোপান। তাই দেশের সরকার সকল শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিত করেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে দেশে কেউ নিরক্ষর থাকবে না। দারিদ্র্য বিমোচনের সকল সক্ষম লোকের জন্য কর্মসংস্থান জরুরি। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সরকার দেশের সকল পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶৫ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা আবশ্যক। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাব বিদ্যমান। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী? ১

খ. উন্নয়ন পরিকল্পনা কীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সমস্যাবলি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

খ সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রায়শই বৈদেশিক সাহায্যের ধরন অনেক সময় দেশের জন্য অতি মাত্রার বোঝা সৃষ্টি করে। তাই প্রয়োজন হয় সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। যা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

গ পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাবের কারণে মূলত উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে গৃহীত প্রকল্পগুলোর ব্যয়ভার নিজস্ব অর্থায়ন দ্বারা করা সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশ সরকারকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে।

২. এদেশের মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা খুবই কম। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন হচ্ছে না যা বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে। বিনিয়োগ কম হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. কারিগরি শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তর করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি খুবই জরুরি।

https://teachingbd24.com

৪. সুষ্ঠু ও বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বিদেশে মেধা পাচার তথা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা চলে যাচ্ছে। যা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হুমকিস্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে উপরের সমস্যাগুলো পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এ সকল সমস্যার কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্ভুল পরিসংখ্যানের অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সমস্যা বিরাজমান থাকায় প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধান করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে:

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যাতে কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা যায়।
২. সরকারের উচিত টেকসই ও বাস্তবমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা। এতে দেশের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।
৩. সরকারকে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। ফলে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
৪. শক্তিশালী আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যেতে পারে।
৫. উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে।
৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বার্থে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে এবং পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে হবে।
৭. দেশের বিলাসবহুল খাতসমূহ সংকুচিত করে জরুরি খাতসমূহতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
৮. উপযুক্ত ও দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে নির্ভুল ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে উপরের পদক্ষেপগুলো কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এসব পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। সরকার এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶৬ বর্তমান সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কোনটি? ১
খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে? যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল হলো ২০১১-২০১৫ সাল।

খ স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যেসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প, মেয়াদকাল ২০১১-২০১৫ সাল। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা 'রূপকল্প ২০২১' কে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান রাখতে এবং দ্রুততম সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে পরিকল্পিত উপায় এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অপরিহার্য। বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সর্বাধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্প দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগোনো যায়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা কতিপয় উদ্দেশ্য অর্জনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। যেমন— উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি। এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেক শক্তিশালী করবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে ও বাণিজ্য শর্ত উন্নত হবে। উন্নয়নমূলক কাজে নারী সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে নারীরাও অর্থনীতিতে সমান অবদান রাখবে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের বিপুল জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যাবে। তাছাড়া তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়ের দেশ। বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার একটি পরিকল্পনায় দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ১৫% এ নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। দক্ষ শ্রমিকের হার ৫০% এ উন্নীত করার চেষ্টা করছে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান প্রায় ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে । এ লক্ষ্যে সরকার নতুন নতুন প্রযুক্তির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছে। *[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি অন্যতম সমস্যা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কতটুকু কার্যকর? যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব-নির্ধারিত কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ কোনো দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক তথ্য ও উপাত্ত একান্ত প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নির্ভুল না হলে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত হয় না এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের পরিমাণ, জনসংখ্যা, শ্রমশক্তি, বেকারত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য উপাত্ত প্রায়ই পাওয়া যায় না। এ জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এমজিডি (মিলেনিয়াম গোলস ডেভেলপমেন্ট)] অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ প্রণীত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন; পরিবেশবান্ধব ও অনুকূল শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি। এসব ছাড়াও টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি হলো এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সাতটি প্রধান ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো— উৎপাদন, আয় সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশলও রয়েছে; এগুলো হলো— উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক সুষম উন্নয়ন, আয় বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো—

১. নতুন নতুন প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান: ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অন্তর্গত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হবে। সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রবর্তন ইত্যাদিও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলবে।

২. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলো হলো: উপকূল এলাকাসহ দেশের সর্বত্র বনভূমি আচ্ছাদন বৃদ্ধি, দূষণমুক্ত বায়ু নিশ্চিতকরণ, নদীর পানিতে শিল্পবর্জ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ, খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধ পানিপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

৩. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ: পরিকল্পনায় সমগ্র উৎপাদন কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো: মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরে পুরুষ-নারী অনুপাত বর্তমান ১০০:৩২ থেকে ১০০:৬০ এ উন্নীতকরণ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স কাঠামোয় শিক্ষিত পুরুষ নারী অনুপাত বর্তমানের ১০০:৮৫ থেকে ১০০:১০০ তে উন্নীত করা। এর ফলে দেশে সমগ্র মানবসম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৪. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) শক্তিশালীকরণ: পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য পিপিপি শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। এর ফলে দেশের বড় বড় ও ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ মালিকানা, উদ্যোগ ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৮ সাকিব চীনে একটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। সেখানে 'X' দেশের বন্ধু টনি এর সাথে আলাপকালে টনি জানায় যে, তাদের দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে বন ও সমুদ্র। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় হচ্ছে। তাই তারা অনুন্নত। *[য. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? ১

খ. 'সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে টনি এর দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১লা জুলাই ১৯৭৮ থেকে ৩০শে জুন ১৯৮০ সাল।

খ দেশের সকল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই অর্থনীতির সকল খাতকে একত্রিত করে উন্নয়ন গতিশীল করা যায়। একমাত্র পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা নিয়োগস্তর বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করা যায়। দেশের মানবসম্পদকে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ ও উন্নয়নের জন্য কর্মোপযোগী করে তোলা যায়। সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নের সহায়ক।

গ উদ্দীপকের টনির দেশ নানা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক মতো চিহ্নিত, উত্তোলিত, ব্যবহৃত হয়নি; যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়ও ঘটেছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য টনির দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে জাতীয় উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবহার। টনির দেশে এরকম পরিকল্পনার অভাবে শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়নি।

https://teachingbd24.com

মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণের উপযোগী দ্রব্যসমূহের উৎপাদন অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বেশি হয়। তবে একথা তখনই সত্য হয় যখন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদগুলোর কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ঘটে। টনির দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সম্পদ বেশি থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর টনির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবশ্যক।

ঘ টনির দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তার সদ্ব্যবহার না ঘটায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। তাই টনির দেশকে উন্নত করতে হলে দরকার সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো—

১. টনির দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার সুষ্ঠু ও কাম্য ব্যবহার হয়নি। এ অবস্থার সুচিন্তিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সব প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ, উত্তোলন ও যথাযথ ব্যবহার সম্ভব।

২. টনির দেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো— কৃষি ও শিল্প। এ দুটি খাতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

৩. টনির দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন— দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব, ছিনতাই, সন্ত্রাস ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়।

৪. উক্ত দেশে বেকার সমস্যা প্রকট; জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। এরূপ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে ও বেকারত্ব কমবে।

৫. দেশকে উন্নত করতে হলে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন পড়ে। টনির দেশে লোক অনেক; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে তারা অদক্ষই থেকে গেছে। দেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা।

সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৯ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'ক' দেশের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দেশের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'ক' দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানে ৩১.৫% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ এনরোলমেন্ট নিশ্চিত করা, ICT এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। *[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১১; ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২০১০-২০২১ মেয়াদি পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুষম হয়। অবশ্য এর জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের নিম্নোক্ত কারণসমূহ রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশটি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির সাহায্যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে চিন্তা-ভাবনা, সম্পদ সমাবেশ ও সময় প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই বলা যায়, কেবল বাস্তবসম্মত ও সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, কৌশল ও অভিজ্ঞতা সর্বোত্তম উপায় কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তা নির্ধারণের সার্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলো একসঙ্গে অর্জন করা সম্ভব নয়; কারণ লক্ষ্যগুলোর কোনোটি কম, কোনোটি বেশি আবার কোনোটি দীর্ঘসময় নিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে দেশটিকে স্বল্প, মাধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

'ক' দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যার সদ্ব্যবহার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সম্পদগুলোর অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ উত্তোলন ও ব্যবহার এক ব্যয়বহুল, সময়-সাপেক্ষ ও জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত সময় এবং উপর্যুক্ত নীতি ও কৌশল দ্বারা সম্পদগুলোর কাম্য ব্যবহার সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ পরিকল্পনাটি হলো ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হবে এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের উচ্চহার হ্রাসের জন্য সরকার অনেক আগে থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র; বয়স্ক দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা প্রদান; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, গৃহায়ন তহবিল গঠন, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের এসব কর্মসূচি সফল হলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমবে এবং জনসাধারণের আয় বাড়বে।

দেশকে দ্রুত উন্নত করতে হলে এর মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতকরা শতভাগ এনরোলমেন্ট; সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা; বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই বিতরণ; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি; সুবিধাবঞ্চিত স্কুল-বহির্ভূত ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা ইত্যাদি। এসবের ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত শ্রমিকের যোগান বাড়লে উৎপাদন ও আয় বাড়বে।

আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্ব প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। সরকার তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখার জন্য স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

Teachingbd24.com

তাছাড়া আইসিটি শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে। এ সবই ভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হার হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।
সুতরাং বলা যায় প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হলে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব কামাল অর্থনীতির ক্লাসে বললেন, দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ওপর। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ এক থেকে পাঁচ আর্থিক বছরের মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে।

সরকার প্রতি পাঁচ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঘোষণা করে থাকে তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে উপনীত করাই এ ধরনের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

গ জনাব কামাল অর্থনীতির ক্লাসে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেন। সময়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা: স্বল্পমেয়াদি কিছু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়।

মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা: কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। যেমন, বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে আবার প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। সাধারণত ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

ঘ বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যাবলির সমাধান তথা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য দূরীকরণে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।
বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন। তাই অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা দেশের সকল অঞ্চলের জনগণ যাতে সমভাবে ভোগ করতে পারে সেজন্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমাদের অর্থনীতিতে নানা ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশের বর্তমান ভয়াবহ জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।
বাংলাদেশের প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১১ বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০১০-২০২১ এর আওতায় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং সম্প্রতি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বর্তমানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৯২ হাজার ৫ শত কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (ADP) অন্তর্গত ১২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকার আশা করছে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব। *[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সময় মেয়াদের ভিত্তিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের মনোভাবের যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ, নির্দেশমূলক পরিকল্পনার অধীনে দেশের একমাত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পূর্ব নির্ধারিত কিছু আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়।

নির্দেশমূলক পরিকল্পনায় দেশের সার্বিক উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বলে অবাধ বাজার প্রক্রিয়ার কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব সন্তোষজনক।
সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। সরকারের এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে।

i. নতুন প্রযুক্তি, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
ii. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

https://teachingbd24.com

iii. দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
iv. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি সহজীকরণ;
v. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের উপকরণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ বৃদ্ধি করে আয় বৈষম্য হ্রাস করা;
vi. সিভিল সার্ভিসকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ;
vii. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

এসব উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ইতোমধ্যেই সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার সফলতা অর্জন করেছে।

[দি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৯; রাজশাহী কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি কোন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে সুচিন্তিত কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করে তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'ভিশন-২০২১' কে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কৌশলগত নির্দেশনা ও সামগ্রিক কর্মকৌশল প্রদান করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার এই সমগ্র নীতি কাঠামো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পথনির্দেশ দান করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে সর্বমোট ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ (পরিকল্পনার আকার) প্রাক্কলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট বিনিয়োগের ২২.৮% এবং বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ আসবে, যা মোট বিনিয়োগের ৭৭.২%। পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহ করা হবে ৯০.৭% এবং বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ৯.৩%। তন্মধ্যে ০.৪ ট্রিলিয়ন টাকা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কতকগুলো মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকেই নিণীত হয়। পরিকল্পনা শেষে এসব লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে 'ভিশন-২০২১' ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'ক' দেশের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দেশের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'ক' দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনায়, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫% থেকে ১৫% এ নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতভাগ এনরোলমেন্ট নিশ্চিত করা, ICT এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। *[কু. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
খ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত রচনা করে'– বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. 'ক' দেশে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বাখ্যা করো। ৩
ঘ. ২০১০-২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সিরাজ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা। তার বন্ধু জাকির শিল্প মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। জাকির সিরাজকে প্রশ্ন করেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কি করা উচিত? উত্তরে সিরাজ বলল, শুধু কৃষি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। অর্থনীতির প্রতিটি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। অতঃপর তা অর্জনের জন্য এক, পাঁচ বা দীর্ঘ সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এসব পরিকল্পনা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। *[রা.বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
খ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যক? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়।

খ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দ্বারা জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করা, যা এই জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উন্নত জীবনযাপন করায় দরিদ্র জনগণের মৃত্যুহার হ্রাস পাবে, যা প্রকারান্তরে জন্মহারকেও কমাবে। এতে করে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

গ উদ্দীপকের আলোকে (তথা সময়ের ভিত্তিতে) উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এক বছর বা দুই বছরের জন্য করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, একটি আর্থিক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেই স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য প্রণীত হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন।

https://teachingbd24.com

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: দীর্ঘকালীন প্রেক্ষপটে কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের জন্য প্রণীত হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

ঘ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকা আবশ্যক। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ সাল সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'রূপকল্প ২০২১' পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা বিঘ্নিত হবে। কাজেই, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১১-২০১৫ সাল সময়সীমার ভিত্তিতে আরেকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় চালিকাশক্তি হিসেবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি নিশ্চিতকরণ, সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ পদ্মা সেতু নির্মাণ, ই-গভর্নেন্স চালুকরণসহ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১১-২০১৫ সালের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া আর কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি আর্থিক বছরের জন্য প্রণীত হয় বলে একে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

কোনো দেশ দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে এক বছর সময়ের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। একে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাও বলা হয়। কারণ এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণত সরকারের বার্ষিক বাজেট হিসাবের সাথে সংগতি রেখে প্রণয়ন করা হয়।

গ বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প ২০২১' নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সরকারের এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫% থেকে ১৫%-এ নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যান্য প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. সততা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।
২. ঋণ বৈষম্য হ্রাসকরণ।
৩. ICT-এর সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজড করা।
৪. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. শতভাগ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তি নিশ্চিতকরণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও অন্যান্য যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে বলে আমি মনে করি, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

জ্বালানি ও অবকাঠামোগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেতে পারে। যেমন—বিদ্যুতের উৎপাদন ২০২০ সাল নাগাদ ১৫,৪৫৭ মেগাওয়াট থেকে ১৭,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে মেট্রো ট্রেন চালু করা, জ্বালানি দক্ষতা ১৫% বাড়ানো এবং বিভিন্ন সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যেতে পারে। উৎপাদনশীল বনের আওতা ৫% বৃদ্ধি করা। শিল্প বর্জ্য নিঃসৃত হওয়ার পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনা। আইসিটি শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ। ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজকরণ। সর্বস্তরে ই-গভর্ন্যান্স চালু করা। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। কৃষি ও অ-আনুষ্ঠানিক সেবা খাত থেকে শ্রমশক্তিকে উচ্চ উৎপাদনশীল ও শিল্প খাতে স্থানান্তরকরণ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি/মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বজলার স্যার একদিন এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্লাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এমন কথা বলা যায়। *[ব. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

একটি দেশে এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। সাধারণত ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর

https://teachingbd24.com

পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কৌশলসমূহ হচ্ছে:

১. দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি;
২. কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি। পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি অবকাঠামো নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন;
৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার ও পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি খাতে সরকারি ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা;
৪. দরিদ্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। দীর্ঘমেয়াদি 'রূপকল্প-২০২১' এর মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার নেমেছে ২৭% এবং রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে সেই হার ১৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

ঘ প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি কৌশল ইত্যাদির দিক থেকে অন্য পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিছুটা ভিন্নধর্মী।

প্রথমত, ২০০২ থেকে ২০০৪, ২০০৫ থেকে ২০০৭ এবং ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অন্তবর্তী সময়ের জন্য তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (PRSP) গ্রহণ করা হয়। এ তিনটি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের অভিন্ন ও প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে কার্যকর দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামষ্টিক আঙ্গিকে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করা। কিন্তু ৩য় দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১১ থেকে ২০১৪-২০১৫) শুরু হয়। সুতরাং বিগত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতার মধ্যেই নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনা শেষে এবং লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ভিশন-২০২১ ও MDG অর্জনে সহায়তা করবে।

তৃতীয়ত, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য গৃহীত উন্নয়ন কৌশলেও কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উন্নয়ন কৌশল হলো— খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং এ প্রসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস। পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ। দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতির প্রধান লক্ষ্য ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলা যায়, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এ উন্নয়ন কৌশল অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে ছাড়িয়ে সামষ্টিক সামাজিক ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনায় নিয়েছে বলে মনে হয়। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিগত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গতানুগতিক কাঠামো থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য আংশিকভাবে হলেও দৃশ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। 'রূপকল্প-২০২১' এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ এর জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাই বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত। পরিকল্পনার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের ভিত্তিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। *[চ. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? ১
খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বিবরণ দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অন্যান্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে স্বতন্ত্র— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল— ১লা জুলাই ১৯৭৮ সাল থেকে ৩০ শে জুন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুষম হয়। অবশ্য এর জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি হলো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো—

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতা বাংলাদেশে গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল নাগাদ সরকারি ব্যয় যথাক্রমে জিডিপির ১ শতাংশ ও ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সাল নাগাদ মাধ্যমিক স্তরে ও ২০২১ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত পাঁচটি কম্পিউটারসহ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু করা, ঢাকার সকল থানায় ইলেক্ট্রনিক্স পদ্ধতিতে ডিডি এবং এফআইআর পদ্ধতি চালুকরণ। দেশে টেলিফোন সুবিধা অন্তত ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করা, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্র্যান্ড (Wi Max) প্রবর্তন করা, ব্রডব্যান্ড সেবা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সম্প্রসারণ, ভূমি তথ্যাদির ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হলো এ পরিকল্পনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের লক্ষ্যমাত্রা। উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ সৃজনশীল ১৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? ১
খ. নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' পরিকল্পনার সাথে 'খ' পরিকল্পনার পার্থক্য লেখ। ৩
ঘ. উভয় প্রকার পরিকল্পনাই একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো ২০১১-২০১৫ সাল।

খ সৃজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের 'খ' দেশের পরিকল্পনা হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। অন্যদিকে 'ক' দেশের পরিকল্পনাটি হলো দীর্ঘমেয়াদি। নিচে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো—

প্রথমত, সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশি।

চতুর্থত, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যেমন— দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যাপকতা বৃহৎ। যেমন— প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ঘ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ থাকলে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। নিচে বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছরমেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ অর্থবছর সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'রূপকল্প ২০২১' পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। কাজেই, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যক। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় পরিকল্পনাই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬টি পঞ্চবার্ষিকী ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্র্যের হার ১৫%-এ নামিয়ে আনা। (২০১০-২০১১) সালের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে কেন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়? ২

গ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে— তা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়।

ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতর নীতি-কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। তাই এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প, মেয়াদকাল ২০১১-২০১৫ সাল। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা 'রূপকল্প ২০২১' কে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়েছে। এ ছাড়াও বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে ২৩.৫% লোক বাস করে। ২০২১ সাল নাগাদ তা ১৫% এ নামিয়ে আনা হবে।

ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ায় বাংলাদেশে নতুন অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তাই পরিশেষে বলা যায়, ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট সফল হয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২০ বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০১০-২০২১ এর আওতায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) গ্রহণ করেছিল। উক্ত পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন। এর পাশাপাশি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৯২ হাজার ৫শত কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যার অন্তর্গত ১২৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার আশা করছে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভব। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা কী? ১

খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভীত রচনা করে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৩

ঘ. পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব তুমি কি এ বিষয়ে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিকল্পনার সময় অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, তাকে ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (যেমন- ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। তাই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। এজন্যই বলা হয় 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত রচনা করে'।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলোকে সময়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা: স্বল্পমেয়াদি কিছু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়।

মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা: কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। যেমন,- বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে আবার প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও বলা হয়। সাধারণত ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের উচ্চহার হ্রাসের জন্য সরকার অনেক আগে থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র; বয়স্ক দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা প্রদান; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, গৃহায়ন তহবিল গঠন, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা; একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের এসব কর্মসূচি সফল হলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমবে এবং জনসাধারণের আয় বাড়বে।

দেশকে দ্রুত উন্নত করতে হলে এর মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শতকরা শতভাগ এনরোলমেন্ট; সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা; বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই বিতরণ; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি; সুবিধাবঞ্চিত স্কুল-বহির্ভূত ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা ইত্যাদি। এসবের ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত শ্রমিকের যোগান বাড়লে উৎপাদন ও আয় বাড়বে। এছাড়াও আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সর্ব প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। সরকার তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখার জন্য স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া আইসিটি শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করছে। এ সবই ভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হার হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং বলা যায়, প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হলে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶২১ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং দেশ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। X দেশের সরকার ২০০৮ সালে ২০২১ এবং ২০৪০ সালকে টার্গেট করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর ওই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করছে। একই সময়ে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, আয়বৈষম্য এবং দরিদ্রতার মধ্যে থেকেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ১৯৯১ সালে দারিদ্র্যের হার ৪০% থেকে বর্তমানে ১৪% এ নেমে এসেছে, সাফল্য এসেছে বহু ক্ষেত্রে। গত এক দশক যাবৎ বাংলাদেশের GDP প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে। জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. বস্তুগত (Physical) পরিকল্পনা কী? ১

খ. প্রচলিত 'Golden GPA' প্রাপ্তির জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন— বুঝিয়ে দেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ চিত্রিত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে X দেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কী অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো পরিকল্পনা বস্তুগত সম্পদের ভিত্তিতে করা হয় এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলোও সেভাবে স্থির করা হয় তখন তাকে বস্তুগত পরিকল্পনা বলে।

খ প্রচলিত 'Golden GPA' প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য বর্তমান যুগকে পরিকল্পনার যুগ বলা হয়। কেননা সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত উপায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা গেলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন সম্ভব হয়। যেমন- একজন শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল করতে চায় তবে অবশ্যই তাকে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই প্রত্যাশিত ফলাফল সম্ভব হবে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ নিম্নের প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো:

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
↓
বার্ষিক পরিকল্পনা
↓
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে যেমন ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। আর এক বছর সময়সীমার মধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু দক্ষ ব্যবহার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। অন্যদিকে প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে ভেঙে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় রূপান্তর করা হয়। এরূপ পরিকল্পনায় সময়সীমা এক বছর অপেক্ষা বেশি এবং পাঁচ বছর অপেক্ষা কম সময় ধরা হয়। সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

সুতরাং X দেশের সরকার ২০২১ এবং ২০৪০ সালকে টার্গেট করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে তা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। আর এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দেশটির সরকার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। এতে করে দেশটিতে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং GDP তে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে X দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ পরিকল্পনাটি হলো (২০১০-২০২১) সাল মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা হচ্ছে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটে কিছু অর্থনৈতিক-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহুবছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের জন্য একে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। তবে এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। তাছাড়া কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে এ পরিকল্পনাটি দারিদ্র্য বিমোচন হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পর পর কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত রচিত হলেও পরিকল্পনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা উন্নয়ন পরিকল্পনারই সুফল।

সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়।

প্রশ্ন ▶২২ বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়ের দেশ। বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার একটি পরিকল্পনায় দেশে দারিদ্র্যের অনুপাত ৬.২ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩% হারে উন্নীত করার চেষ্টা চলছে, কর্মসংস্থান প্রায় ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন প্রযুক্তির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদির ওপর জোড় দিয়েছেন।

[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে?- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কতটুকু কার্যকর?—যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব-নির্ধারিত কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এমজিডি-মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস] অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১ প্রণীত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বলে পরিচিত।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন; পরিবেশবান্ধব ও অনুকূল শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি। এসব ছাড়াও টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি হলো এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সাতটি প্রধান ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো— উৎপাদন, আয় সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশলও রয়েছে; এগুলো হলো— উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক সুষম উন্নয়ন, আয় বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণমূলক উন্নয়ন পদ্ধতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সফল করার জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের আলোকে তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো—

১. নতুন নতুন প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান: ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার অন্তর্গত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হবে। সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিযোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সকল জেলায় ই-গভর্নেন্স চালু, সমগ্র দেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রবর্তন ইত্যাদিও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলবে।

https://teachingbd24.com

২. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলো হলো: উপকূল এলাকাসহ দেশের সর্বত্র বনভূমি আচ্ছাদন বৃদ্ধি, দূষণমুক্ত বায়ু নিশ্চিতকরণ, নদীর পানিতে শিল্পবর্জ্য মিশ্রণ প্রতিরোধ, খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে অবাধ পানিপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

৩. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ: পরিকল্পনায় সমগ্র উৎপাদন কর্মকাণ্ডে পুরুষের সাথে নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো: মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরে পুরুষ-নারী অনুপাত বর্তমান ১০০:৩২ থেকে ১০০:৬০ এ উন্নীতকরণ, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স কাঠামোয় শিক্ষিত পুরুষ নারী অনুপাত বর্তমানের ১০০:৮৫ থেকে ১০০:১০০ তে উন্নীত করা। এর ফলে দেশে সমগ্র মানবসম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন: ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার শতকরা ১০০ ভাগ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও মোট প্রজননের হার ২.২ শতাংশে হ্রাস করা ও জন্মনিরোধ ব্যবহার এর হার ৭২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে এবং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫. অবকাঠামোর উন্নয়ন: রাস্তাঘাট, যোগাযোগব্যবস্থা, কলকারখানার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

৬. পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশলের একটি মূল উপাদান হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ধারণা করছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিতভাবে একটি গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর সহযোগিতামূলক কৌশল অবলম্বনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা সফল করার জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩

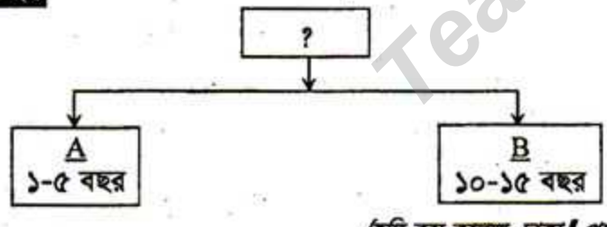

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বার্ষিক পরিকল্পনা কী? ১

খ. কেন আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়? ২

গ. উদ্দীপকের 'প্রশ্নচিহ্নিত' বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের A ও B অংশের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি আর্থিক বছরের মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে বার্ষিক পরিকল্পনা বলে।

খ অঞ্চলকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে সমাধান করার জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

যখন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়। আঞ্চলিক পরিকল্পনা দেশের ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে করা হয়। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে এরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নচিহ্নিত বিষয়টি দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিচে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো—

কোনো দেশের সীমিত সম্পদ দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুনিশ্চিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হয়। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। কেননা, মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণের উপযোগী দ্রব্যসমূহের উৎপাদন অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি হলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বেশি হয়। তবে একথা তখনই সত্য হয় যখন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদগুলোর কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ঘটে।

উপরের আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

ঘ উদ্দীপকে 'A' অংশ দ্বারা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা এবং 'B' অংশ দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নির্দেশ করা হয়েছে। নিচে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। আর দীর্ঘমেয়াদি কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ থাকে ১-৫ বছরের মধ্যে এবং এখানে ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্য দিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১৫-৩০ বছর এবং এখানে ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ বেশ জটিল। রাষ্ট্রের সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আকস্মিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অতি সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষির কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়নের মতো দীর্ঘমেয়াদে সমাধানযোগ্য কাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সর্বোপরি, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সেমিনারে সিয়াম পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনার সময় পরিকল্পনার নিম্নোক্ত তালিকা তুলে ধরলেন।

তিনি বললেন, এসব পরিকল্পনা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য গ্রহণ করা হয়। তবে সঠিক তথ্য উপাত্তের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চাভিলাস, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে এদেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উন্নয়ন পরিকল্পনার ধরন হিসেবে C পরিকল্পনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলো ছাড়াও আরও কী কী কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয় না— মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলে।

Teachingbd24.com

খ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দ্বারা জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করা, যা এই জনগোষ্ঠীর আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করবে। উন্নত জীবনযাপন করায় দরিদ্র জনগণের মৃত্যুহার হ্রাস পাবে, যা প্রকারান্তরে জন্মহারকেও কমাবে। এতে করে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

গ উদ্দীপকে 'C' পরিকল্পনা বলতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়েছে।

সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে যেমন ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। উদ্দীপকে 'C' পরিকল্পনাটি ১০-২৫ অর্থাৎ ১০ বছরের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্পকালীন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। দেশের মৌলিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া দেশে গতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে এ পরিকল্পনার প্রয়োজন। দেশের উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করে সুষম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠন করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, মানবসম্পদ ইত্যাদি গুণগত পরিবর্তনের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মূলত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, যে কারণে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো—

প্রথমত, পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত জনগণের খাদ্য বস্ত্রের সংস্থানের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সবসময় সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ বিশেষজ্ঞের দরকার হয়। বাংলাদেশে এরকম দক্ষ বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই সুষ্ঠু ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না বলে পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না।

চতুর্থত, পরিকল্পনা প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নের জন্য যে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন হয়, বাংলাদেশে তার অভাব রয়েছে। এটিও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চমতে, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ফলে, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এর ফলে পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সহজ হয় না।

মূলত, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো; যেমন— তথ্য উপাত্তের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চাভিলাস, দুর্নীতি ইত্যাদি ছাড়াও উপরে আলোচিত সমস্যা এবং অন্যান্য আরো কিছু কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয় না।

প্রশ্ন ▶ ২৫ অর্থনীতিবিদ আবিদ হোসেন মনে করেন বাংলাদেশের সম্পদের প্রাচুর্যতা কম হওয়া সত্ত্বেও যদি যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তবে ঐ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এদেশের উন্নয়ন দ্রুত করা সম্ভব। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আবিদ হোসেনের পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল কিন্তু ৫ বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা কার্যকর করতে কয়েক বছর সময় লাগে। সাধারণত পাঁচ বছরমেয়াদি পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

গ উদ্দীপকে আবিদ হোসেন বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বের কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকলেও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যথেষ্ট সময় নিয়ে এবং উপযুক্ত নীতি ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব। বাংলাদেশে বাসস্থানের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। প্রাপ্ত সম্পদের সাথে তা দারুণভাবে অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠায় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় জন্মহার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া কৃষি ও ভারী শিল্পের বিকাশ, বেকার সমস্যা সমাধান উন্নত জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলে বেকারত্ব কমবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, আয় বৈষম্য কমবে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু এ বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজ সুচিহ্নিত পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে আবিদ হোসেনের আশাবাদ বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ বালাদেশ সরকার ভিশন ২০২১-এর ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্য (২০১০-২০২১) সময় মেয়াদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

বর্তমান সকরার ২০২১ সাল নাগাদ যে দ্রুত বিকাশশীল সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা করেছে তাই হলো রূপকল্প-২০২১ এর ২২টি আশাদীপ্ত লক্ষ্যমাত্রা। এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশ নামিয়ে আনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ একসাথে শরু ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব নয় বিধায় সরকার একে দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করেছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অপরটি হলো সপ্তাম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ১ জুলাই ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হলো ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিল্পনার সময় মেয়াদ। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে ও প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর প্রেক্ষাপটে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হলো ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ আবিদ হোসেন তার অর্থনীতির শ্রেণিশিক্ষকের কাছ থেকে এদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। সে জ্ঞাত হয়, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই ছিল বেশি। */সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ৯/*

ক. নির্দেশিত পরিকল্পনা কী? ১

খ. মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উল্লেখ কর। ৩

ঘ. মাথাপিছু আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হ্রাস পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিকল্পনায় সরকারের নির্দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে তা বাস্তবায়ন করে তাকে নির্দেশিত পরিকল্পনা বলে।

খ যখন সুনির্দিষ্ট কতগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য কয়েক বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

এ পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছরের বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়। যেমন-বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে প্রণীত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা হলো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। এরূপ পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত থাকে না। এ পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্যসমূহ

১. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
২. দারিদ্র্য লাঘব ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
৩. রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ও বিকেন্দ্রীকরণ।
৪. অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি।
৫. ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
৬. আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদি।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

১. জিডিপি বার্ষিক ৫.৫% হারে বৃদ্ধি।
২. মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২.৫% হার বৃদ্ধি।
৩. পরিকল্পনাকালে ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান।
৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮ ভাগে হ্রাস ইত্যাদি।

অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ঘ বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণীত হয়। নিচে উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হলো–

প্রথমত, পরিকল্পনাটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ২.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এদেশে যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় তাতে এদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ চরম দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত হয়। এজন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির এ উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে মাথাপিছু আয় বার্ষিক শতকরা ২.৫০ ভাগের স্থলে মাত্র বার্ষিক শতকরা ১.১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে কৃষিকাজ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাই পরিকল্পনায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে কৃষি উপকরণসমূহের স্বল্পতা, কৃষকদের দারিদ্র্য, মানসিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হয়। কেবল চিনি উৎপাদন ছাড়া খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কোনো প্রচেষ্টাই সফলতা লাভ করেনি।

তৃতীয়ত, পরিকল্পনাটি শুরু করার সময় এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা প্রায় ৩ ভাগ। দেশের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিকল্পনা শেষে শতকরা ২.৮ ভাগে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, পরিকল্পনার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে আংশিকভাবে সফলতা লাভ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রশিদ, মিজান ও ইউনুস একটি কাজ যথাক্রমে ৫ দিন, ১০ দিন এবং ১৫ দিনে করতে পারে। রশিদ কম দিনে কাজটি করতে পারে বলে দ্রুত কাজটি সমাধান হয় এবং তার ফলও দ্রুত পাওয়া যায়। মিজান রশিদের চেয়ে দেরিতে কিন্তু ইউনুসের চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারে। এতে কাজের খরচ মাঝারি মান থাকে। এতে কাজের গতি খুব বেশিও হয় না, আবার তাড়াতাড়িও হয় না। ইউনুস দীর্ঘদিন ধরে কাজটি করে বলে তার কাজের দ্বারা ভিত্তি অনেক মজবুত হয়। কিন্তু সময় বেশি লাগে বলে খরচ আরও বেশি হয়। */পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ১০/*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কত প্রকার? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সমষ্টি— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রশিদের কাজের ধরন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে, তার বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. রশিদ ও ইউনুসের কাজের ধারার আলোকে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সময়ভেদে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

খ দীর্ঘমেয়াদে (যেমন ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে তাকে একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। অর্থাৎ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা একাধিক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার সমষ্টি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রশিদের কাজের ধরন স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করছে।

এ ধরনের পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো– জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচব্যবস্থার প্রসার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি লক্ষ্য সামাজিক স্বার্থে স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করা দরকার। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক বছরের বেশি অথচ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সময়সীমা বিবেচনা করে এই পরিকল্পনা করা হয়। সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা হ্রাস করে এ ধরনের পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অতএব বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা এমন কিছু পরিকল্পনা, যেখানে জাতীয় স্বার্থ অন্তর্নিহিত থাকে।

ঘ উদ্দীপকে রশিদের কাজের ধারা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। আবার ইউনুসের কাজের ধারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে নির্দেশ করেছে।

Teachingbd24.com

এ দুই ধরনের পরিকল্পনা দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত। সাধারণ সময়সীমার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময় ১-৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মেয়াদ ১০-২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ভেতর ব্যক্তির ক্ষুদ্রস্বার্থ বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থ ক্ষুদ্রস্বার্থ অপেক্ষা অগ্রাধিকার পায়।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা। এর মধ্যে অর্থনৈতিক অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভেতর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, সঠিক কর্মদক্ষতা ও দিকনির্দেশনা থাকে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা অর্থনৈতিকভাবে কম কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার দেশটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. 'ক' দেশের সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক অর্থবছর (জুলাই-জুন) মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতার নীতি কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গহণ করেছে।

স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন সব কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে যার বাস্তবায়ন স্বল্প সময় তথা এক বছরের মধ্যেই সম্ভব। অতি জরুরি প্রয়োজন যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল উন্নয়ন ইত্যাদি পরিস্থিতির মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং যে পরিকল্পনা এক বা দুই বছরের জন্য করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি আর্থিক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা নিতান্তই লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক হয় অর্থাৎ সরকার এক বছরের মধ্যে অর্থনীতির কোন কোন খাতে কতটা অগ্রগতি অর্জন করতে চায় এ পরিকল্পনায় তারই প্রকাশ ঘটে। সাধারণত রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ, সরকারের নেওয়া অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বিদেশের প্রকল্প সাহায্য দ্বারা এ পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করা হয়। অনুন্নত ও উন্নত সকল দেশই তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে কখনো কখনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে।

ঘ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ১৯৭৩ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ২০২১ সাল নাগদ দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে নিয়ে আসা। (২০১০-২০২১) সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. পরিকল্পিত অর্থনীতির সূত্রপাত হয় কখন? ১

খ. স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পার্থক্য লেখ। ২

গ. ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশে এ পর্যন্ত যতগুলো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা করেছে তা দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে? আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯২৮ সালে রাশিয়ায় পরিকল্পিত অর্থনীতির সূত্রপাত হয়।

খ স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য হলো–

১. সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ১ থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য হতে পারে। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে গ্রহণ করা বেশ জটিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অতি সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়।

গ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহের দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; মেয়াদকাল (২০১১-২০১৫)। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোত সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ঘ সৃজনশীল ১৯নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিখাতে গুণগত পরিবর্তনসহ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ১০-২০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করে। অপরদিকে, 'খ' দেশও তার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর, তাই ১-৫ বছরের জন্য পরিকল্পনা করে। মূলত প্রত্যেকটি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য থাকে দেশের সব মানুষের জীবনমান উন্নত করা।

[আইডিয়াল পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১১]

ক. PRSP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. "বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দেশ 'ক' এবং দেশ 'খ' এর দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনার ধরন বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'ক' এবং 'খ' দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে তুলনা করো। এ দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PRSP-এর পূর্ণরূপ হলো Poverty Reduction Strategy Papers.

Teachingbd24.com

খ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাসের জন্য সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দাতা দেশ এবং সংস্থা থেকে যে ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক সাহায্য বা মূলধন বলে। মূলধন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এর বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মূলধন তথা ঋণ ও সাহায্যের। তাই বলা যায়, সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশ ১০-২০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং 'খ' দেশ ১-৫ বছরের জন্য একটি পরিকলপনা করেছে যা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে বিবেচিত।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন খুবই জরুরি আর এই কাঠামোগত পরিবর্তন শুধু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই 'ক' দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিখাতে গুণগত পরিবর্তনসহ সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ১০-২০ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকেই ইঙ্গিত করে।

স্বল্প মেয়াদে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উন্নয়নের ভিত রচনা করে অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্যের উপর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। এছাড়া অর্থনীতিতে এমন কিছু বিষয় থাকে যা দ্রুত সমাধান করতে হয়, এজন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। তাই 'খ' দেশ তার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১-৫ বছরের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা দ্বারা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকেই বোঝায়।

ঘ উদ্দীপক 'ক' দেশে পরিকল্পনার রূপ হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অন্যদিকে 'খ' দেশের পরিকল্পনার রূপ হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। নিচে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে তুলনা করা হলো-

সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আবার স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পমেয়াদি ধরনের পরিকল্পনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম। অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশি। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যেমন—দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপকতা বৃহৎ। যেমন- বিশসালা পরিকল্পনা। এছাড়া রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন,-পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

স্বল্পসময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হলেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার, জনসংখ্যা হ্রাস, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন তথা অর্থনীতির সার্বিক কাঠামোগত পরিবর্তন স্বল্পমেয়াদে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। সুতরাং বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৩১ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১১]

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি কোন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতর নীতি কৌশল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ ধরনের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ সাধারণত ন্যূনতম দশ বছর হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নির্দেশ করে। বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ভিশন-২০২১ কে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কৌশলগত নির্দেশনা ও সামগ্রিক কর্মকৌশল প্রদান করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার এই সমগ্র নীতি কাঠামো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পথনির্দেশ দান করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে সর্বমোট ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ (পরিকল্পনার আকার) প্রাক্কলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট বিনিয়োগের ২২.৮% এবং বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ আসবে, যা মোট বিনিয়োগের ৭৭.২%। পরিকল্পনায় বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সংগ্রহ করা হবে ৯০.৭% এবং বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে ৯.৩%। তন্মধ্যে ০.৪ ট্রিলিয়ন টাকা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য কতগুলো মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকেই নির্ণীত হয়। পরিকল্পনা শেষে এসব লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ভিশন-২০২১ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ঘ উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি ৬ষ্ঠ -পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্যেসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০২১' নামে একটি চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি পূরণ করা হবে। এই লক্ষ্যসমূহ দুটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাগ করা হয়, যার প্রথমটি হচ্ছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মেয়াদকাল (২০১১-২০১৫)। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য বিমোচন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই এই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা, আইসিটির মাধ্যমে দেশকে ডিজিটালাইজেশন করা এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের প্রকল্পটিতে বর্তমান সরকার দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপরের উদ্দেশ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা রূপকল্প ২০২১ কে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একটি মহৎ প্রকল্প, যা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। সুতরাং, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই উক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ বর্তমান সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলা হয়।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এর ফলে দেশে উন্নয়ন সুষম হয়। অবশ্য এর জন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

ব্যাপকভিত্তিতে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলকে একসাথে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা দরকার যা কেবল একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব। তাই বলা যায়, সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

গ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো

প্রশ্ন ▶ ৩৩ করিম কোরিয়ার একটি মেডিকেল কলেজে পড়ে। সে দেখলো তার দেশের তুলনায় কোরিয়া অনেক বেশি উন্নত, কিন্তু তার দেশে এমন সব সম্পদ রয়েছে যা কোরিয়াতে নেই। করিমের দেশে রয়েছে বন ও সমুদ্র সম্পদ, আরো রয়েছে গ্যাস সম্পদ। তবে তার দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই, অপচয় হচ্ছে অধিকাংশ সম্পদের। তাই করিমের দেশ কাঙ্ক্ষিত সফলতার মুখ দেখতে পারছে না।

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদকাল কত বছর ছিল? ১

খ. কেন স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হয়? ২

গ. করিমের দেশের উন্নয়নে পরিকল্পনায় ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনা সম্পদের অপচয়রোধ করে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল ২০১১- ২০১৫, মোট ৫ বছর।

খ স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন কিছু কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রে সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ১টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনার দিক থেকে এদেশের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিক থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৭% ব্যয় করলেও অন্যগুলো তেমন সফলতা পায়নি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীতে অতিমাত্রায় দুর্নীতি বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি হ্রাস না পাওয়া, টাকায় অবমূল্যায়নে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধিসহ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় লক্ষ অর্জিত না হওয়ায় লক্ষ অর্জন হয়নি তাছাড়া আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতাও অনেকাংশে দায়ী। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? ১

খ. স্বল্পকালীন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনারই অংশ— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত সফলতা না আসার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কী পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদে (১০ থেকে ১৫ বছর) সুনির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা; আর সর্বাধিক ৫ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই হলো স্বল্পকালীন পরিকল্পনা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহু বছর ধরে চলে বলে একে একাধিক স্বল্পকালীন পরিকল্পনায় বিভক্ত করে ধাপে ধাপে এর বাস্তবায়ন করা হয়। একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্য এর অন্তর্গত স্বল্পকালীন পরিকল্পনাগুলোর সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। তাই বলা যায়, স্বল্পকালীন পরিকল্পানা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অংশ।

গ যে কোনো দেশেই ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ছোট-বড় অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দরকার হয় এবং সেজন্য কয়েক বছর সময় লাগে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের অগ্রগতির জন্য পাঁচ বছরমেয়াদি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭% ধরে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অর্থনীতিকে উর্ধ্বগমন স্তরে (Take off Stage) উপনীত করাই ছিল এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত ৭ ভাগের স্থলে হয় ৫.২১ ভাগ। খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়নি। এছাড়া পরিকল্পনা শেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.২-তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বার্ষিক ১.৪৮ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত সফলতা না

Teachingbd24.com

পাওয়ার কয়েকটি কারণ উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপক অনুযায়ী বলা যায়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সীমাহীন দুর্নীতি। ১৯৯৭ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের পর থেকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান নানান দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়ে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জিত না হওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় গতিহীনতা দেখা দেয়। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া টাকার অবমূল্যায়নে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসেনি।

ঘ স্বাধীনতা-উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরপর কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো— প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হবে তা হচ্ছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে উপরের পরিকল্পনাগুলো প্রণীত হয়। এ পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে এদেশের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে না এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যাও লাঘব হয় না। এজন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এগুলো হলো- প্রথমত, পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার পরিবর্তে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত যা দেশের বাস্তব অবস্থা ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। দেশের বেশিরভাগ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ দ্বারা অর্থায়ন করা যায়— এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের প্রয়োজনমতো প্রাপ্তি যথেষ্ট নয়। এর সাথে প্রয়োজন প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করতে হলে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনার কাজ পরিচালিত হলে তার সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়। চতুর্থত, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনাবিদ ও বাস্তবায়নকারী প্রশাসকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। তাছাড়া এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মতৈক্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়।

সুতরাং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

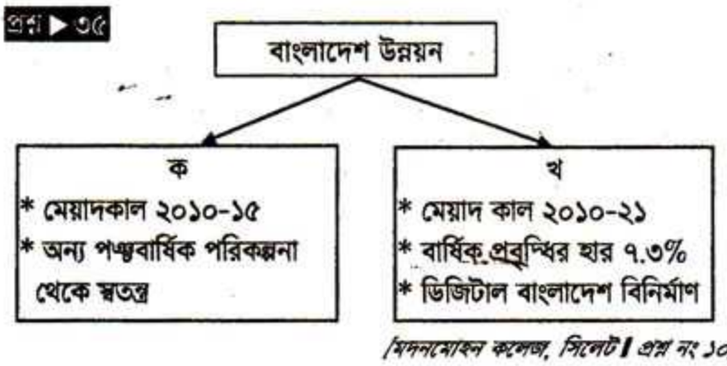

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশে শতকরা কতজন মানুষ দরিদ্র? ১

খ. 'উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে কী ধরনের দেশে উন্নীত হবে বলে তুমি মনে কর। যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা ২৩.৫ জন মানুষ দরিদ্র।

খ দেশের সকল প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই অর্থনীতির সকল খাতকে একত্রিত করে উন্নয়ন গতিশীল করা যায়। একমাত্র পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা নিয়োগস্তর বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করা যায়। দেশের মানবসম্পদকে পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ ও উন্নয়নের জন্য কর্মোপযোগী করে তোলা যায়। সুতরাং বলা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নের সহায়ক।

গ উদ্দীপকের 'ক' পরিকল্পনাটি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে। নিচে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো-

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৌশল প্রণয়নকালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি), দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকেও যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যা যথাক্রমে—

i. দ্রুত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
ii. টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা আয়বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমতা অর্জন;
iii. সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা;
iv. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত বেকারত্ব হ্রাস, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের সম্প্রসারণ;
v. প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা;
vi. কর্মমুখী প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
vii. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ; গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবিতকরণ;
viii. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
ix. আয় ও সম্পদের সুষম এবং ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা;
x. কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বহুমুখীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ;
xi. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা;
xii. সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
xiii. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হওয়া।

ঘ 'খ' পরিকল্পনাটি একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বশেষ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০১১) এবং দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (ষষ্ঠ ও সপ্তম) গ্রহণ করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়ায় এর সাফল্যের পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) সম্পাদন করতে চায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩% এ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করাই এই পরিকল্পনার মূলকথা। উচ্চ

https://teachingbd24.com

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ পরিকল্পনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ৫৪.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বাণিজ্য স্থাপন, বাণিজ্য জিডিপির অনুপাত ৫০% অর্জন এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে।

আইসিটি তথা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার স্কুল থেকেই কম্পিউটার শিক্ষাক্রম চালু করেছে। ফলে 'দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে এবং পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে একটি মধ্যমে আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶৩৬ রাব্বি চীনে একটি কলেজে পড়ে। রাব্বির বন্ধু টনি 'ক' দেশের নাগরিক। টনি জানায় তাদের দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে বন ও সমুদ্র। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় হচ্ছে এবং তারা অনুন্নত।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৯]

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. "পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ দর্শন" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে টনির দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে টনির দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে পরিকল্পনা বলে।

খ বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত প্রথমে অর্থনীতির সামগ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তারপর ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন খাতে দেশের সমুদয় শ্রম, বৈদেশিক মুদ্রা, কাঁচামাল ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় বিধায় সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই এক ধরনের ভবিষ্যৎ দর্শন বলা যায়।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৭ একটি দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও মাত্রা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। তবে সঠিক তথ্যের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, দুর্নীতি ইত্যাদি একটি দেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. সুষম উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'গ' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'ক' ও 'খ' পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

খ সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন পরিকল্পনা।

গ উদ্দীপকে 'ক' স্বল্পমেয়াদি এবং 'খ' মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা যেগুলো 'গ' অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তি স্বরূপ।

সাধারণত কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আবার, কয়েকটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

বর্তমানে ২০১০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চলছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে ২০১০-২০১৫ অর্থবছর সময়ের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবান ব্যর্থ হবে। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'রূপকল্প ২০২১; পূরণে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। কাজেই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক। আবার, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূরক।

ঘ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া উচিত। আবার, মূলধন সংগ্রহে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা রেখে প্রকল্পের আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। তা না হলে আয়তনের তুলনায় বাজেট তথা সম্পদের ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই থেমে যাবে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অবশ্যই যথোপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে হবে যাতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি না পায়।

দেশে বিলাসবহুল খাতসমূহ সংকুচিত রেখে জরুরি খাতসমূহে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষ জনশক্তি, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা, নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সময় সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বার্থে উপরিউক্ত বিষয়গুলো সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে।

Teachingbd24.com

অধ্যায়-১০: উন্নয়ন পরিকল্পনা

৩৪৩. রাশিয়ায় কত সালে প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটে? (জ্ঞান)
ক ১৮২৮ খ ১৯২৮
গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৩৮ **খ**

৩৪৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা কে প্রণয়ন করে? (জ্ঞান)
ক বেসরকারি কর্তৃপক্ষ খ বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ
গ সরকারি কর্তৃপক্ষ ঘ এনজিও কর্তৃপক্ষ **গ**

৩৪৫. বিশ্বের কোন দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়? (জ্ঞান)
ক যুক্তরাজ্যে খ রাশিয়ায়
গ যুক্তরাষ্ট্রে ঘ চীনে **খ**

৩৪৬. যে পরিকল্পনার মেয়াদ পাঁচ বছর বা তার চেয়ে কম তাকে কি পরিকল্পনা বলা হয়? (জ্ঞান)
ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা
খ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা
গ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
ঘ অতি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা **ক**

৩৪৭. কোন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে কম মূলধন প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক স্বল্পমেয়াদি খ মধ্যমেয়াদি
গ দীর্ঘমেয়াদি
ঘ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা **ক**

৩৪৮. কোন ধরনের পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কৌশলে পরিবর্তন আনা যায়? (অনুধাবন)
ক দীর্ঘমেয়াদি খ মধ্যমেয়াদি
গ স্বল্পমেয়াদি ঘ নির্দেশভিত্তিক **খ**

৩৪৯. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে কীসের সাফল্যের ওপর? (অনুধাবন)
ক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার
খ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার
গ বার্ষিক পরিকল্পনার
ঘ কাঠামোগত পরিকল্পনার **গ**

৩৫০. 'খ' একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশটি কৃষিতে উন্নত হওয়ায় সরকার তার উন্নয়ন পরিকল্পনা কৃষিকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করে। দেশটি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে? (প্রয়োগ)
ক সার্বিক পরিকল্পনা খ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
গ আংশিক পরিকল্পনা ঘ স্থানীয় পরিকল্পনা **গ**

৩৫১. সাধারণত কোন ধরনের অর্থনীতিতে বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ ইসলামিক ঘ স্বৈরতান্ত্রিক **ক**

৩৫২. দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে কি বলে? (জ্ঞান)
ক জাতীয় পরিকল্পনা
খ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা
গ আঞ্চলিক পরিকল্পনা
ঘ আংশিক পরিকল্পনা **গ**

৩৫৩. একাধিক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে কি বলে? (জ্ঞান)
ক আঞ্চলিক পরিকল্পনা
খ জাতীয় পরিকল্পনা
গ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা
ঘ কার্যগত পরিকল্পনা **গ**

৩৫৪. বাণিজ্য চক্রবিরোধী 'নিউডিল' কর্মসূচি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত সালে গৃহীত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৮৩৩ সালে খ ১৮৭৫ সালে
গ ১৯৩৩ সালে ঘ ১৭৩৩ সালে **গ**

৩৫৫. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনার প্রবক্তা কে? (জ্ঞান)
ক এল রবিন্স খ বারবারা উটন
গ গুনার মিরডাল ঘ হায়েক **গ**

৩৫৬. বাংলাদেশ ও ভারত পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি দেশ হওয়ায় তারা এক সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত দুই দেশের মধ্যে সংগঠিত এ রকম পরিকল্পনাকে কী বলে? (প্রয়োগ)
ক স্থানীয় পরিকল্পনা
খ জাতীয় পরিকল্পনা
গ আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা
ঘ আঞ্চলিক পরিকল্পনা **গ**

৩৫৭. বিভিন্ন খাতের কতগুলো প্রকল্পের সমন্বিত তালিকা, যা সরকারের এক বছর সময়ের উন্নয়ন নীতি, কার্যক্রম ও বিনিয়োগ বাস্তবায়ন করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
খ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
গ ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা
ঘ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা **খ**

৩৫৮. ADP সাধারণত কিসের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়? (জ্ঞান)
ক বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট
খ বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেট
গ রাজস্ব আয় ঘ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা **ক**

৩৫৯. বাংলাদেশে উন্নয়ন বাজেট কোন সর্বোচ্চ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত? (জ্ঞান)
ক পরিকল্পনা কমিশন খ অর্থ মন্ত্রণালয়
গ জাতীয় সংসদ ঘ একনেক **গ**

৩৬০. যে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নকালে সরকার জনসম্মুখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা পেশ করে তাকে কি বলে? (জ্ঞান)
ক বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
খ ঘূর্ণায়মান উন্নয়ন পরিকল্পনা
গ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
ঘ কাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা **ক**

৩৬১. অপরিকল্পিত অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনীতি যেখানে সম্পদের অসম বণ্টন এবং অপরিকল্পিক উন্নয়ন ঘটে। উক্ত অর্থনীতিতে কোন কারবার দ্রুত গড়ে উঠে? (প্রয়োগ)
ক একচেটিয়া কারবার খ যৌথ মূলধনী কারবার
গ অংশীদারি কারবার ঘ ডুয়োপলি কারবার **ক**

৩৬২. কোনো উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেটা নির্ণয় করাকে কী নির্ণয় বলে? (জ্ঞান)
ক উদ্দেশ্যাবলি খ উন্নয়নের হার
গ লক্ষ্যমাত্রা ঘ বিনিয়োগের হার **গ**

Teachingbd.com

৩৬৩. পরিকল্পনার সমতা কত প্রকার? (জ্ঞান)
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার **খ**

৩৬৪. মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও বিদ্যমান সম্পদের সমতাকে কী সমতা বলে? (জ্ঞান)
ক খাতভিত্তিক খ পশ্চাৎমুখী
গ আর্থিক ঘ কাঠামোগত **ক**

৩৬৫. পরিকল্পনা প্রণয়নের সর্বশেষ ধাপ কোনটি? (জ্ঞান)
ক উদ্দেশ্য নির্ণয় খ উন্নয়নের হার নির্ণয়
গ পরিকল্পনায় সমতা
ঘ পরিবর্তন যোগ্যতা নির্ণয় **ঘ**

৩৬৬. কোন ধরনের পরিকল্পনা বেশি গ্রহণযোগ্য? (জ্ঞান)
ক সুপরিবর্তনীয় খ দুষ্পরিবর্তনীয়
গ মাঝামাঝি ঘ কোনটিই নয় **গ**

৩৬৭. পুনর্বাসন ও জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত পুনর্গঠন কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল? (জ্ঞান)
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **ক**

৩৬৮. প্রথম দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতে বরাদ্দ কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ৬০০ কোটি খ ৩৬১ কোটি
গ ৩,২৬১ কোটি ঘ ৯৫২ কোটি **ক**

৩৬৯. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোন খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ছিল? (জ্ঞান)
ক কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন
খ শিল্প ও খনিজ গ শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ
ঘ পরিবহণ ও যোগাযোগ **ক**

৩৭০. 'রূপকল্প ২০২১'-এ প্রকৃত আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য কত ভাগ? (জ্ঞান)
ক ৬.১০% খ ১০%
গ ৮.০০% ঘ ২০% **খ**

৩৭১. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা হলো— (অনুধাবন)
i. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ii. বার্ষিক পরিকল্পনা iii. উপপরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৭২. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হলো— (প্রয়োগ)
i. কেন্দ্রীয় সংস্থা পরিকল্পনা গ্রহণ করে
ii. প্রতিটি খাতের জন্য পৃথক পরিকল্পনা
iii. বাস্তবায়ন কেন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৭৩. সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহের বৈদেশিক উৎস হলো— (অনুধাবন)
i. বিদেশ হতে সাহায্য
ii. বেসরকারি সঞ্চয় iii. বৈদেশিক ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৭৪. উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য হলো— (অনুধাবন)
i. জাতীয় বৃদ্ধির জন্য
ii. বাজেট প্রণয়নের জন্য
iii. আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৭৫. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো— (অনুধাবন)
i. প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা
ii. মানব উন্নয়ন iii. আয় বৈষম্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৭৬. বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হলো— (অনুধাবন)
i. মূলধনের অভাব ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
iii. দক্ষ মানবসম্পদের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৭ ও ৩৭৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিশুর একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি হওয়ার সুবাধে বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি ডিপিএস খুলে এবং অর্থ জমা করতে থাকে। সেখানে পাঁচ বছরে দ্বিগুণ লাভ দিবে। ফলে সে সেখানে অর্থ জমা দিতে আগ্রহী হয়।

৩৭৭. মিশু কোন পরিকল্পনার ইঙ্গিত করেছে? (প্রয়োগ)
ক দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা খ ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা
গ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ঘ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা **গ**

৩৭৮. উক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গড় বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধি
ii. কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধি
iii. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৯ ও ৩৮০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নগেন থাপা নেপালের নাগরিক। কিছুদিন আগে তার দেশে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে অনেক মানুষের জীবনহানি, শিল্প খাত, কৃষি খাত এবং মানুষের জীবনযাত্রায় বিপর্যয় নেমে এসেছে। তিনি দেখলেন যে, উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে।

৩৭৯. নগেন থাপার দেশের সরকার কোন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে? (প্রয়োগ)
ক স্বল্পমেয়াদি খ মধ্যমেয়াদি
গ দীর্ঘমেয়াদি ঘ অতি দীর্ঘমেয়াদি **ক**

৩৮০. উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা
iii. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com